প্রকাশকের নিবেদন

সুপণ্ডিত অধ্যাপক এবং অভিজ্ঞ পরীক্ষকদের সহায়তায় এই সহায়িকার কায়াগঠন। এম. এ. পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদের বিশেষতঃ বিপুল সংখ্যক বহিরাগত পরীক্ষার্থীর অসহায়তার কথা বিবেচনা করেই আমরা এই বিপুল উদ্যম করেছি। বাংলায় এম. এ পরীক্ষা দেবার জন্য প্রতি বৎসর বহু ছাত্রছাত্রী প্রস্তুত হন এবং প্রস্তুতি পর্বে দিশেহারা হয়ে থাকেন। বিপুল পাঠ্যতালিকা, ততোধিক বিপুল আনুষঙ্গিক গবেষণামূলক গ্রন্থাবলীর সমারোহ। খ্যাতনামা অধ্যাপকেরা 'বাজারে নোট্‌স্' সম্বন্ধে ভ্রূকুঞ্চিত ঘৃণা প্রকাশ করেন। যথোপযুক্ত পঠন-পাঠনের সুব্যবস্থা হওয়া বর্তমান সমাজে সুকঠিন। এমতাবস্থায় পরীক্ষার্থীদের অসহায়তা অনিবার্য। আমরা দাবী করি যে অসহায়দের জন্য যোগ্য সহায়িকার সুব্যবস্থা করেছি।

বিদ্যার্জন ও পরীক্ষায় কৃতিত্ব সমার্থক নয়। পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য ছাত্রকে সব সময় স্মরণ রাখতে হয় "You will be examined of what you can write, not of what you know." বস্তুতঃ অধীত বিদ্যার পরীক্ষা হয় না, অধ্যয়নের ফল যা লিখনের মধ্যে প্রকাশ পায় তারই মূল্যায়ণ হয়। এইজন্য ছাত্রছাত্রীকে প্রচুর লেখার অভ্যাস করতে হয়। আমরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে যথেষ্ট তথ্যসম্বলিত উত্তর রচনার যথাযোগ্য নিদর্শন দেখাবার চেষ্টা করেছি। আমাদের এই 'সহায়িকা' বাজারেই বিক্রয় হয় বটে কিন্তু 'বাজারে নোট্‌স্' বলতে যা বোঝায় সে জিনিস যে নয় তা যে-কোন ছাত্র বা ছাত্রী একবার চোখ বুলিয়ে গেলেই বুঝতে পারবেন। প্রতিটি পত্রে যা কিছু জানবার বিষয়, বিভিন্ন দিক থেকে যা কিছু আলোচিতব্য, বিষয়ের মধ্যে অনুপ্রবেশের জন্য যা কিছু সূত্র—সবই এই সহায়িকার মধ্যে পাওয়া যাবে। সর্বোপরি উত্তর লেখার কৌশল, বিষয়ানুসারিতা এবং উত্তরের আয়তনের সীমা সম্বন্ধে পাঠকের ধারণা যে অত্যন্ত স্বচ্ছ হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অল্প সময়ের মধ্যে বিশাল পরিধি পরিক্রমণ করতে হলে যে সংক্ষিপ্ততা, দ্রুততা এবং লক্ষ্যস্থিরতার প্রয়োজন, সহায়িকা দ্বারা সেই প্রয়োজন অবশ্যই মিটবে।

এই গ্রন্থে সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে সর্বপ্রকার জটিল-কুটিল প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় পত্রে পালি-প্রাকৃতের মূল পাঠ বাংলা ও রোমান হরফে দেওয়া হয়েছে। পৃথক্ গ্রন্থক্রয়ের কোন প্রয়োজন নেই। অধিকন্তু অনুবাদ, ব্যাকরণ-ঘটিত টীকা এবং প্রশ্নোত্তর পর্যাপ্ত পরিমাণে সন্নিবেশিত হয়েছে। বাংলা ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তরগুলি অতি সহজ করে লেখা। চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্বন্ধীয় যাবতীয় সম্ভাব্য প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করা হয়েছে এবং লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে অযথা পাণ্ডিত্যের ভারে রচনাকে ভারাক্রান্ত করা হয় নি। তৃতীয় ও চতুর্থ পত্রের পাঠ্য কাব্যগুলি সম্বন্ধে উদ্ধৃতি-সম্বলিত যে আলোচনা করা হয়েছে তাতে কবির প্রতিভা এবং কাব্যের বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য সহজে অধিগম্য হবে।

আমরা ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধ করি যে তাঁরা খোলা মন নিয়ে এই গ্রন্থখানিকে একবার পরীক্ষা করে দেখুন। প্রকাশকের এইটুকুই নিবেদন।

সূচীপত্র

প্রথম পত্র—প্রথমার্ধ

প্রশ্ন ১। বাঙ্গালাদেশে রচিত সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্য হইতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের কি কি উপকরণ সংগ্রহ করা যায় সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা কর।

উত্তর। ফসল ফলাইবার জন্য কর্ষিত ভূমি আবশ্যক, সে ভূমির উর্বরতারও প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যের ফসল ফলাইবার জন্য বাঙ্গালী কবিরা কর্ষণে ও সার-প্রদানে জমি তৈয়ারী করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী মানসিকতায় ও সাহিত্যরুচিতে বাংলা সাহিত্যের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। কিন্তু তখনও বাংলাভাষা পরিণত রূপ পরিগ্রহ করে নাই। বাঙ্গালীর মনীষা ও প্রতিভা তখন সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ ভাষার মধ্যেই আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছিল। বাংলা সাহিত্য সৃষ্ট হইবার পরও শিক্ষিত বাঙ্গালীরা সংস্কৃত ভাষাকেই সাহিত্যশিল্পের উৎকৃষ্ট বাহন মনে করিতেন।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আদিমতম নিদর্শন চর্যাপদগুলি হয়ত খ্রীষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে সংকলিত হইয়াছিল। তখন পাল রাজাদের শাসনকাল। সেই সময়ে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভূত প্রভাব না থাকিলেও সংস্কৃত চর্চার সমাদর ছিল। এই যুগের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে পণ্ডিতদের অনুমান যে বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস', ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার,' মুরারি মিশ্রের 'অনর্ঘরাঘব', ক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ডকৌশিক,' নীতিবর্মার 'কীচকবধ', প্রভৃতি সংস্কৃত রচনা বাঙ্গালী মনীষার দান। এই রচনাগুলির মধ্যে পৌরাণিক পরিবেশে বাঙ্গালীসুলভ গার্হস্থ্য জীবনরস আছে, সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয়, সহজ পরিহাসরসিকতা এবং মাধুর্যগুণ আছে। নিঃসংশয়ে বাঙ্গালীর রচনা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে সম্রাট দেবপালের সময়ে লেখা অভিনন্দের 'রামচরিত' কাব্যকে। অভিনন্দের রচনা কিছু ক্ষুদ্রাকার কবিতাও পাওয়া গিয়াছে। সম্রাট রামপালের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিত' কাব্যে দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় সম্রাট রামপাল এবং অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র উভয়েরই স্তুতি রচনা করেন। এই শ্লেষকাব্যখানি বাঙ্গালী প্রতিভার বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত।

সেনরাজারা ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদের সভাকবিরা সকলেই সংস্কৃত কাব্যাদি রচনা করেন। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ', গোবর্ধনের 'আর্যা সপ্তশতী', ধোয়ীর 'পবনদূত', উমাপতি ধর এবং শরণের লেখা বহু প্রকীর্ণ কবিতা বাঙ্গালীর বাণীশিল্পের পরিচয় বহন করে। এই সমস্ত কবিরা যে ভাবপরিমণ্ডল গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহাতেই বাংলা সাহিত্যের উন্মেষ ত্বরান্বিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতেও বাংলা অনুবাদ সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্যের যুগে চৈতন্য-পরিকরদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃতচর্চা শ্লাঘ্য মনে করিতেন। রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেন, শ্রীরূপ গোস্বামী এবং বৃন্দাবনবাসী অন্যান্য গোস্বামীরা সকলেই সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

বাঙ্গালী-রচিত বহু অ-বাংলা রচনার পরিচয় অনেকগুলি সংকলন গ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে। 'সদুক্তিকর্ণামৃত', 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়', 'বিদগ্ধমুখমণ্ডন', 'মানসোল্লাস', 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' প্রভৃতি পদসংকলনে শুধু বাঙ্গালীর রচনাই নয় বাংলাসাহিত্যের নবাঙ্কুরের সন্ধান পাওয়া যায়। একজন কবি লিখিয়াছেন,

গলৎ কাষ্ঠং চলৎ কুড্যং উত্তানং তৃণসঞ্চয়ম্।
গণ্ডুপদার্থি-মণ্ডুকাকীর্ণং জীর্ণং গৃহং মম॥

দরিদ্রের কুটীরের এই বর্ণনা পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ নয়। 'আর্যা সপ্তশতী'-তে নববধূর পতিগৃহে যাত্রার যে চিত্র আছে তাহা নিঃসংশয়ে বাঙ্গালী ঘরের ছবি। ধর্ম ও নীতিসম্পর্কহীন জীবনের বাস্তবচিত্র অঙ্কনেও কবিদের দক্ষতা প্রশংসনীয় শরণের একটি কবিতা ডঃ সুকুমার সেন তাঁহার বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে উদ্ধৃত করিয়াছেন। একটি গ্রাম্যবধূ হাট হইতে দ্রুতপায়ে ফিরিতেছে, কেশবাস সামলাইতেছে, মনে মনে হিসাব করিতেছে, গৃহপ্রত্যাগত ক্ষুধার্ত স্বামীর আহারের ব্যবস্থার জন্য দ্রুত গৃহে উপস্থিত হইবার উদ্দেশ্যে উল্লম্ফনে পথ অতিবাহন করিতেছে। এই চিত্রখানির বিশেষত্ব পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কবি জয়দেব ভাব-ভাষা-বাচনভঙ্গি-ছন্দ ব্যবহারে বাংলাভাষার শিল্পমুক্তির পথ দেখাইয়াছিলেন বলিয়া বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। "বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে" এবং 'চল সখি কুঞ্জম্ সতিমির পুঞ্জম্ শীলয় নীলনিচোলম্" প্রভৃতি পদ যে বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিক গঠনে কিরূপ সহায়ক হইয়াছিল তাহা সাহিত্যপাঠকের কাছে অবিদিত নহে।

প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় রচিত বাঙ্গালী কবিদের রচনা পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনচিত্র, গার্হস্থ্য সমস্যা, বাঙ্গালীর প্রিয় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ এই কবিদের উপজীব্য ছিল। কোন কবি লিখিয়াছেন,—

রাআ লুদ্ধ সমাজ খল বহু কলহারিণী সেবক ধূত্তউ।
জীবন চাহসি সুখ জই পরিহর ঘর বহুগুণ জুত্তউ॥

অন্য এক কবি লিখিয়াছেন,—

বালো কুমারো ছঅ মুণ্ডধারী।
উবাঅহীণা মুঁই এক্ক নারী॥
অহংনিসং বিসং খাঅই ভিখারী।
গঈ ভবিত্তী কিল কা হামারী॥

এই জাতীয় পদগুলি বাংলা সাহিত্যেরই পূর্বাভাস। টমাস সাহেব কর্তৃক আবিষ্কৃত 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' এবং মহামাণ্ডলিক বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাসের সংকলন 'সদুক্তিকর্ণামৃত' বাঙ্গালীর সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় বহন করিতেছে। ইহাতে দেখা যায় যে, বাঙ্গালীর সাধনায় বাংলা সাহিত্যের উপযোগী একটি কর্ষিত ভূমিখণ্ড

ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইতেছিল। বাঙ্গালীর রূপচেতনা ও রসচেতনার সুস্পষ্ট চিহ্ন এই সময়েই অঙ্কুরিত হইতেছিল। তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসপাঠের ভূমিকা-স্বরূপ বাঙ্গালীর রচিত অ-বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় অত্যাবশ্যক বলিয়া গণ্য।

প্রশ্ন ২। "বাংলা ভাষা উদ্ভবের পরেও অনেক কাল ধরিয়া বিদগ্ধ বাঙ্গালীর কাব্যানুশীলন সংস্কৃতেই হইত।" আলোচনা কর।

উত্তর। বাংলা ভাষার উদ্ভবকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের অনুমান যে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে সাহিত্যে ব্যবহারের উপযোগী বাংলা ভাষার প্রাথমিক রূপটি ফুটিয়া উঠে এবং তাহার আদিমতম নিদর্শন চর্যাপদ এবং ইতস্ততঃ প্রাপ্ত দুই চারিটি প্রকীর্ণ কবিতা। কথ্যভাষারূপে বাংলা হয়ত এই অঞ্চলের জনগণের মধ্যে দীর্ঘকাল পূর্বেই প্রচলিত হইয়াছিল কিন্তু উহার সাহিত্যিক প্রয়োগ ছিল না। তখন সংস্কৃত ভাষাই সাহিত্য রচনার প্রধান বাহন বলিয়া গণ্য ছিল। কেহ কেহ প্রাকৃত বা অপভ্রংশ ভাষায়ও সাহিত্য রচনা করিতেন।

চর্যাপদের পর সাহিত্যিক নিদর্শনরূপে কৃত্তিবাস ও চণ্ডীদাসের রচনাকে উল্লেখ করা যায়। এই দুই কবির কাল-নির্ণয় সুনিশ্চিত না হইলেও অন্ততঃ চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে যে ইহারা জন্মগ্রহণ করেন নাই, ইহা সুনিশ্চিত। এই দীর্ঘ কালসীমায় বাঙ্গালী-প্রতিভা নিষ্ক্রিয় ছিল না। কেহ কেহ হয়ত বাংলাভাষায়ও ছড়া গান বা কাব্য রচনা করিয়াছেন; কিন্তু রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তাহার নিদর্শন আজ অপ্রাপ্য। জলীয় লবণাক্ত আবহাওয়ায় বাংলাদেশে প্রাচীন পুঁথির সংরক্ষণ সম্ভবপর হয় নাই। সম্ভ্রান্ত সমাজে ও রাজদরবারে সংস্কৃত ভাষার সমাদর ছিল বলিয়া বিদগ্ধ বাঙ্গালীরা সংস্কৃত ভাষায় কাব্যানুশীলনেই উৎসাহ বোধ করিতেন।

বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষায় ন্যায়শাস্ত্র এবং আয়ুর্বেদ গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছে। কয়েকখানি কাব্যনাটকাদির নাম পাওয়া যায় যাহা বাঙ্গালী প্রতিভার দান বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। এই কবিদের সম্বন্ধে বাঙ্গালীত্বের দাবী প্রমাণিত হয় নাই, উহা বিতর্কের বিষয়। বাঙ্গালী গবেষকগণ প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন যে, বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস, ভট্ট নারায়ণের বেণীসংহার, মুরারি মিশ্রের অনর্ঘরাঘব, ক্ষেমীশ্বরের চণ্ডকৌশিক, নীতিবর্মার কীচকবধ প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙ্গালী-মনীষার দান। এই কাব্যগুলিতে বাঙ্গালীসুলভ গার্হস্থ্যরস, বুদ্ধির চাতুর্য ও পরিহাসরসিকতার পরিচয় আছে। বাঙ্গালীর রচনা বলিয়া নিঃসংশয়ে গ্রহণযোগ্য কাব্য অভিনন্দের 'রামচরিত'। সম্রাট রামপালদেবের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় একখানি অপূর্ব শ্লেষকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ঐ কাব্যের নামও 'রামচরিত'। একদিকে অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা, অপরদিকে সম্রাট রামপালের প্রশস্তিতে কাব্যখানি বাঙ্গালীর বৈদগ্ধ্যের চূড়ান্ত পরিচয়।

সেনরাজাদের আমলে বিদগ্ধ বাঙ্গালী কবিরা সকলেই সংস্কৃত ভাষায় কাব্যানুশীলন করিতেন। সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের সভাকবিরা সকলেই বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

কবিত্বগুণে তাঁহারা সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শিরোমণি হইয়া রহিয়াছেন। গোবর্ধন আচার্য লেখেন 'আর্যা সপ্তশতী', 'পবনদূত' কাব্য লিখিয়াছিলেন কবি ধোয়ী। উমাপতি ধর এবং শরণ নামক কবিদ্বয়ের লেখা বহু প্রকীর্ণ কবিতা আবিষ্কার করা হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই কাব্য ও কবিতাগুলি পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি পত্তন করিয়াছিল।

বিদগ্ধ বাঙ্গালীদের সংস্কৃত কাব্যানুশীলনের পরিচয় কতকগুলি সংকলন গ্রন্থেও পাওয়া গিয়াছে। শান্তিদেব নামক একজন বৌদ্ধকবি 'বোধি চর্যাবতার' নামে একটি সংকলন প্রকাশ করেন। উহাতে বাঙ্গালী কবিদের সংস্কৃত রচনা স্থান পাইয়াছে। আর একজন বৌদ্ধভিক্ষু কর্তৃক সংকলিত 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' গ্রন্থে বাঙ্গালীর রচনা বহু সংস্কৃত পদ আছে। লক্ষ্মণ সেনের মহাসামন্তচূড়ামণি বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাস 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামে একখানি সংকলনে দুই সহস্রাধিক কবিতা সংগৃহীত করিয়াছিলেন। উহাও বিদগ্ধ বাঙ্গালীর সংস্কৃতচর্চার পরিচায়ক। সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থাদি রচনায়ও বাঙ্গালী পণ্ডিতদের বিদগ্ধতার চিহ্ন আছে। শ্রীধর ভট্টের 'ন্যায়কন্দলী' বিদগ্ধ সমাজে সমাদৃত গ্রন্থ। চক্রপাণি দত্তের আয়ুর্বেদশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ভারতব্যাপী সমাদর লাভ করিয়াছিল। স্মৃতিশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন ভবদেব ভট্ট এবং জীমূতবাহন। গুণবিষ্ণু ও হলায়ুধ প্রতিভাবান্ রচয়িতারূপে সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে সর্বানন্দ বন্দ্যঘটী অমরকোষের 'টীকাসর্বস্ব' নামক ব্যাখ্যাপুস্তক লিখিয়া প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। বাংলা সাহিত্যের প্রথম উন্মেষক্ষণে প্রতিভাধর কবিরা সংস্কৃত চর্চাই করিতেন।

বাংলা সাহিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পরও পাণ্ডিত্যাভিমানী বিদগ্ধ বাঙ্গালীরা সংস্কৃত চর্চাকেই গৌরবজনক মনে করিতেন। 'ম্লেচ্ছ-ভাষিত প্রাকৃত' ভাষায় সাহিত্যচর্চা তাঁহাদের মতে পাপকর্ম বলিয়া গণ্য। তাঁহারা এই মতও প্রচার করিতেন যে, "অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ। ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥" সুতরাং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বাংলাভাষা চর্চা কিছুদিন পরিহার করিয়াছিলেন। আঞ্চলিক ভাষারূপে বাংলা যখন সুপ্রতিষ্ঠ, অনুবাদে, মঙ্গলকাব্যে ও পদাবলীতে বাংলাভাষার সাহিত্যগৌরব যখন স্বীকৃত তখনও কেহ কেহ সংস্কৃত ভাষায় কাব্যানুশীলন করিয়াছেন। একটি সুপরিণত, ঐতিহ্যপূর্ণ সর্বভারতীয় ভাষাকে ভাবপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ বাহন মনে করিয়াই পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর বিদগ্ধ ব্যক্তিরা সংস্কৃতে কাব্যানুশীলন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তসম্প্রদায়ের অনেকেই সংস্কৃত চর্চার পক্ষপাতী ছিলেন।

ষড়্দর্শনের বিশেষতঃ নব্যন্যায়ের বহু টীকাজাতীয় গ্রন্থ বাঙ্গালীরা রচনা করেন। মধুসূদন সরস্বতী 'অদ্বৈতসিদ্ধি' টীকা রচনা করেন এবং 'অদ্বৈতসিদ্ধান্ত বিদ্যোতন' নামক মৌলিক গ্রন্থ লেখেন। হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার, রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধীয় সংস্কৃত গ্রন্থাদি রচনা করেন। History of Navya Nyaya গ্রন্থের লেখক মনোমোহন চক্রবর্তী মন্তব্য করিয়াছেন যে, রঘুনাথ শিরোমণি হইতে

বিচারেও যুগবিভাগ করা যুক্তিসম্মত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কোন যুগই কোন ধর্মের একচেটিয়া প্রাধান্যে গড়িয়া উঠে নাই। তবে ডঃ দীনেশচন্দ্র 'হিন্দু বৌদ্ধযুগ' নাম দিয়াছিলেন এই জন্য যে, হিন্দুদের বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধপ্রভাবের বহু চিহ্ন ছিল। অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী বলিয়াছেন, "সমকালে প্রচলিত হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে আত্মরক্ষা-মূলক বিচিত্রমুখী প্রয়াসকে আশ্রয় করে আদিযুগের বাংলা সাহিত্য মুক্তি ও বিকাশ লাভ করেছিল।"

পুরাতন বাংলা সাহিত্যের একটি বৃহৎ অংশেই বৌদ্ধপ্রভাব মুদ্রিত হইয়া আছে। বাংলাভাষার আদিমতম নিদর্শন চর্যাপদগুলি স্পষ্টতঃই বৌদ্ধ প্রভাবান্বিত। মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে সহজযান, বজ্রযান, মন্ত্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতি যে সাধন-পদ্ধতিগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার বিশেষত্বই চর্যাপদের কবিগণ রূপকচ্ছলে বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই কবিরাও ছিলেন বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধক। শূন্যতা, করুণা, নির্বাণ, ভবচক্র, তথাগত প্রভৃতি বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দ তাঁহারা ব্যবহার করিয়াছেন, পুঁথিগত বিদ্যা অপেক্ষা অনুভূতিগত সত্যকে অধিকতর প্রাধান্য দিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম যেমন শীলধর্ম—religion of conduct তেমনি চর্যার ধর্মমতেও আচারাচরণের দিকেই বেশি ঝোঁক। সমাজের নিম্নশ্রেণীয়দের মধ্যেই বৌদ্ধধর্মের প্রসার ছিল। এই পদগুলিতেও দেখা যায় যে ব্যাধ, শবর, ডোম, শুঁড়ি, চণ্ডাল এবং কৃষক শ্রমিকশ্রেণীর কথাই শুধু বর্ণিত হইয়াছে। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই পদগুলিকে সরাসরি 'বৌদ্ধ গান ও দোহা' বলিয়াছিলেন। পুরাপুরি বৌদ্ধ না হউক, পদগুলি যে বৌদ্ধ প্রভাবিত তাহাতে সন্দেহ নাই।

শৈব সিদ্ধাচার্যদের গাথা বা নাথ সাহিত্য নামে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিখিত বলিয়া যে পুঁথিগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যেও বৌদ্ধ প্রভাবের চিহ্ন আছে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যেরাই এই গাথাগুলির নায়ক এবং তাঁহাদের কাহিনীও সুপ্রাচীন কালের। 'গোরক্ষবিজয়' বা 'মীনচেতন' গ্রন্থে যে মীননাথের কথা বলা হইয়াছে তিনি বোধহয় প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতান্ত্রিক লুই পা। কায়া-সাধনা এবং সন্ন্যাসধর্মের মাহাত্ম্যকথাও বৌদ্ধপ্রভাবের ফল। ময়নামতী ও গোপীচাঁদের পাচালীতে যে সিদ্ধাচার্য হাড়িপার কথা বলা হইয়াছে তিনও প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতান্ত্রিক জালন্ধরী পাদ। নাথ সাহিত্য নামে পরিচিত এই গাথাগুলিতে হিন্দু দেবদেবীদের নাম নাই। তন্ত্রশাস্ত্রের স্রষ্টা হরপার্বতী ছাড়া অন্য কোন পৌরানিক দেবতার উল্লেখ না থাকায় বৌদ্ধপ্রভাবের ইঙ্গিত সুপরিস্ফুট হইয়াছে।

ধর্মমঙ্গল সাহিত্য এবং শূন্যপুরাণের মধ্যে পণ্ডিতগণ সুস্পষ্ট বৌদ্ধচিহ্ন দেখিতে পাইয়াছেন। শূন্যপুরাণ বৌদ্ধ শূন্যবাদের ভিত্তিতে রচিত। ইহার লেখক রামাই পণ্ডিত সম্বন্ধে অনেকে ধারণা করেন যে ইনি ধর্মপালদেবের সমসাময়িক নবম শতাব্দীর বৌদ্ধ সাধক। শূন্যপুরাণ কাব্য হয়ত আধুনিক কালের রচনা। ধর্মমঙ্গল কাব্যও সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত হয় নাই। কিন্তু হিন্দু-প্রভাবিত মঙ্গলকাব্যের সহিত ইহার পার্থক্য আছে। ধর্মঠাকুরের পূজা করে ডোম, বাউরি, বাগদী প্রভৃতি

অন্ত্যজ শ্রেণীরা। ধর্মপূজা করিলে বর্ণহিন্দুরা জাতিচ্যুত হইতেন। ধর্মঠাকুরকে শূন্যমূর্তি বলা হইয়াছে। ধর্মমঙ্গলে দেবখণ্ড নাই, বৌদ্ধদের আদর্শে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা আছে। শাস্ত্রী মহাশয় ধর্মঠাকুরকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদেবতা বলিয়াছেন। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের এই অংশটিতে যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বহির্ভূত এবং অনার্য সংস্কৃতির অতিরিক্ত একটি বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রভাব আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।

ডাক ও খনার বচন নামে অনেকগুলি ছড়া লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। এই ছড়াগুলির প্রাচীনতা সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। এইগুলির মধ্যেও অন্তর্নিহিত বৌদ্ধপ্রভাব কল্পনা করা হয়। সাম্প্রতিক কালে আবিষ্কৃত হইলেও ছড়াগুলি মৌখিক সাহিত্যরূপে সুদীর্ঘ কাল হইতে সমাজে প্রচলিত। ইহাতে কোন ধর্মতত্ত্ব বা দেবভক্তি নাই—এগুলি সামাজিক সুভাষিত wisdom literature. জ্যোতিষ-গণনা, সাংসারিক প্রজ্ঞা, কৃষিকর্ম বিষয়ক উপদেশ, স্বাস্থ্য ও আচরণ সম্বন্ধীয় নির্দেশ ঐ ছড়াগুলির সামাজিক মূল্য। (বৌদ্ধধর্ম যেমন সৎকর্মের নির্দেশ দেয় এবং আচরণবিধি নিয়ন্ত্রণ করে, ডাক ও খনার বচনও তাহাই করে)। তাই অনেক সমালোচক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে হিন্দু দেবদেবীর উল্লেখহীন ছড়াগুলি এবং জনহিতকর উপদেশবাণীগুলি বৌদ্ধশাস্ত্র 'ধর্মপদের' অনুকরণেই বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইহাও বৌদ্ধ প্রভাবের ফল।

সুস্পষ্ট অঙ্গুলি নির্দেশ দ্বারা অথবা সুনিশ্চিত ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা বৌদ্ধপ্রভাব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া হয়ত কঠিন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের একটি বিরাট অংশ বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন দ্বারা যে প্রভাবিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। জয়দেব বুদ্ধদেবকে দশাবতারের অন্যতমরূপে বর্ণনা করিবার পর বুদ্ধদেব হিন্দুপুরাণের দেবতা হইয়া গিয়াছিলেন। ফলে এমন মিশ্রসংস্কৃতি গড়িয়া উঠে যে, বৌদ্ধলক্ষণগুলিকে পৃথকভাবে নির্দেশ করা সুকঠিন হইয়াছে।

প্রশ্ন ৫। বাংলা চর্যাপদ ও নাথ সাহিত্যের রচনাকাল ও কাব্যধর্মের তুলনা-মূলক আলোচনা সহকারে ইহাদের মধ্যে কোনও যোগসূত্র ও ইহাদের সাধনার বৈশিষ্ট্য কিছু থাকিলে তাহা প্রদর্শন কর।

উত্তর। বাংলা চর্যাপদ দশম ও একাদশ শতাব্দীর রচনা বলিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পণ্ডিত হরপ্রসাদশাস্ত্রীর আবিষ্কৃত পুঁথি, উহার সংস্কৃত টীকা, উহার ভাষা এবং ঐ কাব্যের আভ্যন্তরীণ ধর্মীয় তত্ত্ব, সর্বোপরি ঐ কাব্যে রূপকচ্ছলে বর্ণিত সমাজচিত্রকে প্রামাণ্য উপকরণ রূপে গ্রহণ করিয়া যথার্থ অনুমান করা হইয়াছে যে, সেন রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বে পালরাজাদের আমলেই বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যগণ গুহ্যসাধনা প্রণালী সম্বন্ধে চর্যাপদগুলি রচনা করেন। অপর পক্ষে, নাথ সাহিত্য নামে যে আখ্যানকাব্যের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে উহার রচনাকাল পণ্ডিতগণের মতে অষ্টাদশ শতাব্দী অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। অধ্যাপক সুকুমার সেন এই সাহিত্যকে শৈবসিদ্ধাচার্যদের গাথা বলিয়াছেন। এই গাথাগুলির কাহিনী যতই পুরাতন হউক, সাহিত্যরূপে এই কাহিনীগুলি সাম্প্রতিক কালেই রচিত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, লোকগীতিরূপে গোরক্ষনাথ, মীননাথ, হাড়িপা, ময়নামতী

এবং গোপীচন্দ্রের গান নাথগীতিকারূপে সুদীর্ঘকাল হইতে বাংলা দেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু একথা সত্য যে গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতন নামক পুঁথি এবং গোপীচাঁদের গান নামক বৃহৎ কাহিনীকাব্য সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে লিখিত হয় নাই। সুতরাং রচনাকালের বিচারে চর্যাপদ ও নাথ সাহিত্যের কালগত ব্যবধান অন্ততঃ সাতশ বৎসরের।

চর্যাপদ ও নাথসাহিত্য রচনার কালগত ব্যবধান সুদীর্ঘ এবং ইহাদের কাব্যধর্মও স্বতন্ত্র। প্রথম দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে যে চর্যাপদগুলি ক্ষুদ্রাকার স্বয়ংসম্পূর্ণ গীতি এবং নাথ সাহিত্য আখ্যানমূলক গীতিকা। চর্যাপদ যে বিশিষ্ট সঙ্গীত তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ পঞ্চাশটি পদের এই সংকলন গ্রন্থে কীটদষ্ট, ছিন্ন এবং বিনষ্ট পাতাগুলি বাদে যে সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ পাওয়া গিয়াছে সেই পদগুলির শীর্ষদেশে নানা রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে। রূপকের গূঢ় ব্যঞ্জনা দিয়া পদগুলি আবৃত এবং কবিরা নিজেদের বিশিষ্ট অনুভূতিকেই একমুখী ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছেন। অপর পক্ষে নাথগীতিকাগুলি Ballad বা Legend জাতীয় রচনা। কাহিনীগুলির অন্তর্নিহিত ধর্মীয় তাৎপর্য যাহাই হউক, কাহিনীগুলি সম্পূর্ণ মানবিক এবং বাস্তবধর্মী পরিবেশ রচনা দ্বারা কাব্যকে জীবনধর্মী ও জীবন্ত করা হইয়াছে। চর্যাপদগুলির মধ্যে এই জাতীয় কাহিনীরস ও মানবিকতা নাই। চর্যাপদগুলি প্রধানতঃ স্বসম্প্রদায়ভুক্ত সাধকদের উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল, বাংলার লোকজীবনের সর্বত্র এই কাব্যের প্রসার ছিল কিনা সন্দেহ। এই কাব্যের অনুলিপি কোথাও পাওয়া যায় নাই। চর্যাপদের ধর্মতত্ত্বগত প্রভাব পরবর্তী কোন কোন সাধন-প্রণালীতে প্রতিফলিত হইলেও কাব্যগত প্রভাবের প্রত্যক্ষতা দেখা যায় না। কিন্তু নাথগীতিকা ধর্মনিরপেক্ষ ভাবেও বাঙ্গালীজীবনের উপযোগী সাধারণ কাব্যের মর্যাদা পাইতে পারে। গোপীচাঁদ ও ময়নামতীকে অবলম্বন করিয়া যে নাথগীতিকা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা সাধারণ বাঙ্গালীর জীবনকাব্যের মতই জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং রচনাকালের মতই কাব্যধর্মের দিক হইতে এই দুই সাহিত্যে সুস্পষ্ট ভেদরেখা।

চর্যাপদ ও নাথসাহিত্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে বলিয়া মনে হয় এবং ইহার অন্তর্নিহিত সাধনতত্ত্বের বিচারেও ধর্মীয় মতবাদের দিক হইতে অনেকটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইতে পারে।

চর্যাপদে সহজযান মতাবলম্বীরা কায়া-সাধনার কথা বলিয়াছেন। তাঁহারা অদ্বয়তত্ত্বে বিশ্বাসী। শূন্যতা ও করুণাকে এক করিয়া মনের স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়মুখী বৃত্তিগুলিকে নিরুদ্ধ করাই তাঁহারা পরম কর্তব্য বলিয়া মনে করেন। সাধকদের জীবনের লক্ষ্য মহাসুখ অর্জন করা। 'দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ', 'চলিল কাহ্ন মহাসুহ সাঙ্গে', প্রভৃতি উক্তি চর্যাপদের সর্বত্র পাওয়া যায়। কায়া-সাধনা দ্বারা মহাসুখ অর্জন যেমন চর্যাপদের সাধকদের লক্ষ্য, নাথযোগীদের কাহিনীর তাৎপর্যও তাই। গোরক্ষবিজয় কাব্যের বিষয়বস্তু এই যে সাধনভ্রষ্ট গুরুকে সম্বোধিত করিবার জন্য শিষ্য গোরক্ষনাথ নাটুয়ার ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া গুরুর সম্মুখে নাচগান করিয়াছিল। "নাচেন্ত গোর্খনাথ

ঘুঙুরের রোলে। কায়া সাধ কায়া সাধ মাদলেতে বোলে॥" কায়া সাধনা দ্বারা, ইন্দ্রিয় সংযমের সাহায্যে মনোবিকার বন্ধ করাই উভয় সাহিত্যের ধর্মীয় লক্ষ্য।

চর্যার সাধকেরা গুরুবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। 'গুরু পুচ্ছিঅ জান', 'সদগুরু বোহেঁ জিতেল ভব বল', 'ভন্তি ন পুচ্ছসি নাহা' প্রভৃতি উক্তি প্রায় প্রতিটি পদেই পাওয়া যায়। নাথ সাহিত্যেও গুরুবাদেরই প্রাধান্য। মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা প্রভৃতি সকলেই গুরু এবং শিষ্যদের একান্ত নির্ভরস্থল। গুরুর প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসবশেই শিষ্য গোরক্ষনাথ গুরু মীননাথের চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। ময়নামতী তাঁহার স্বামী মাণিকচন্দ্রকে মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই হাড়িপার কাছে দীক্ষাগ্রহণ করিতে বলেন। মাণিকচন্দ্র অস্বীকৃত হওয়ায় মৃত্যুমুখে পড়েন। পরে তিনি নিজ পুত্র গোপীচাঁদকে হাড়িপার নিকট দীক্ষা গ্রহণে বাধ্য করেন এবং দ্বাদশ বর্ষ সন্ন্যাসধর্ম পালনের নির্দেশ প্রদান করেন। সুতরাং ধর্মীয় আদর্শে, দার্শনিকতায় ও সাধন-প্রণালীতে সুদূর কালের ব্যবধানে রচিত এই দুই জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে অন্তরঙ্গগত গভীর সাদৃশ্য রহিয়া গিয়াছে।

চর্যাপদের সাধনপ্রণালী গুহ্য। কবিরা আভিপ্রায়িক হেঁয়ালী ভাষায় রূপকের সাহায্যে সাধনতত্ত্বের কথা বলিয়াছেন। অনুরূপ রূপক এবং হেঁয়ালী নাথসাহিত্যেও আছে। সহজযানীরা বলেন 'উমর হরই পাণী ণ চ্ছিপই', চর্যার সাধক বলেন, 'রুখের তেন্তলী কুম্ভীরে খাঅ' দুহিল দুধু কি বাঁটে সামাঅ', নাথযোগীরা বলেন, 'পুখুরিতি পানী নাই পার কেন বুড়ে। বাসাঘরে ডিম্ব নাই ছাও কেন উড়ে॥' সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সাধনতত্ত্ব ও প্রক্রিয়াকে গোপন রাখার প্রচেষ্টায়ও উভয় সাহিত্যের সাদৃশ্য। চর্যাপদ ও নাথসাহিত্যের রচনাকাল ও কাব্যধর্ম স্বতন্ত্র হইলেও এই দুইটি সাহিত্য ধারার যোগসূত্র নিবিড় এবং সাধনবৈশিষ্ট্যেও বেশ সাদৃশ্য রহিয়াছে।

প্রশ্ন ৬। বাংলা সাহিত্যের বিকাশের পক্ষে তুর্কী আক্রমণের ফলাফল কি হইয়াছিল তাহা পঞ্চদশ শতাব্দীর সাহিত্য-ধারার উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দাও।

উত্তর॥ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলাদেশে তুর্কী আক্রমণ ঘটে, কিন্তু ইসলাম শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় কিছুদিন পর। তুর্কী আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে ছিল শাসনতান্ত্রিক শিথিলতা, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং বিরোধ ও অত্যাচারের করুণ ইতিহাস। সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্র রাজসভা, হিন্দু-মন্দির, বৌদ্ধ-বিহার এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অধ্যুষিত বড়-বড় গ্রামগুলি বিধ্বস্ত করা হইতেছিল। সমাজে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য ধ্বংসের চেষ্টাই সর্বাগ্রে হইয়াছিল। ইহার ফল হইয়াছিল সাহিত্য জগতে নিঃসীম অন্ধকার। ত্রয়োদশ শতাব্দী এবং চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সাহিত্য চর্চার কোন নিদর্শন ঐতিহাসিকদের হস্তগত হয় নাই।

কিন্তু এই অন্ধকার যুগেও বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক চৈতন্যে যে একটি বড় রকমের পরিবর্তন হইয়াছিল পরবর্তী কালের সাহিত্য-ধারা তাহা অভিব্যক্ত করিয়াছে। তুর্কী আক্রমণের আকস্মিক তীব্রতায় বাঙ্গালীর নিস্তরঙ্গ জীবনহ্রদে তরঙ্গ-বিক্ষেপের

সৃষ্টি হয়—আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির বিপরীতমুখী গতি একমুখী হইয়া উঠে, সাংস্কৃতিক সংকীর্ণতার অবসান ঘটে।

প্রাক্ তুর্কীযুগে ব্রাহ্মণ্য ও অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে দুরতিক্রম্য ব্যবধান ছিল। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে নিম্নবর্ণীয়দের চিন্তা, কর্ম ও আচারগত মিল ছিল না। উচ্চবর্ণীয়েরা উত্তর ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন এবং বাংলার অনার্য সংস্কৃতির অনুরাগীদের অন্ত্যজ বলিয়া দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন। রাজশক্তি ছিল উচ্চবর্ণীয়দের পৃষ্ঠ-পোষক। ইহার ফলে অখণ্ড বাঙ্গালী জাত গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। এই জন্য জাতীয় সাহিত্যও গড়ে নাই।

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে দেববাদ, শ্রুতি-পরায়ণতা, অধ্যাত্মনিষ্ঠা ও ভাববিলাসের প্রাধান্য ছিল। অপর পক্ষে অব্রাহ্মণ্য তথা অনার্য সংস্কৃতিতে প্রাণ-চৈতন্য, কর্মবাদ, জীবন-নিষ্ঠা ও বাস্তবতা ছিল প্রবল। এই দুই-ধারা সমান্তরাল রেখায় চলিত, কিন্তু মিলিত না। বহিরাগত তুর্কী আক্রমণের আঘাতে এই দুই-ধারার মিলন সম্ভাবনা সূচিত হয়। দেব-পরিকল্পনায় ও সাহিত্য-সাধনায় এই সংস্কৃতি-সমন্বয় প্রতিফলিত হইয়াছিল। বৈদিক দেবতাদের স্থলে অনার্য দেবতাদের আর্যীকরণ হইল। শিব, কৃষ্ণ, চণ্ডী, মনসা, শীতলা, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি দেবগণ আর্য-অনার্য মিলনের ফলে লৌকিক দেবসম্প্রদায়। এই দেবতাদের মাহাত্ম্যকীর্তনের জন্য লৌকিক কাহিনীও গড়িয়া উঠিল। রাজনৈতিক চরম দুর্ভাগ্যের মধ্যেও ইহা তুর্কী আক্রমণের একটি প্রত্যক্ষ সুফল।

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই মুসলমান শাসকদের মধ্যে কেহ কেহ সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া সাহিত্য সৃষ্টির উপযোগী পরিবেশ রচনা করিতে পারিয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কয়েকজন সুলতান এবং পদস্থ রাজকর্মচারী বাংলা সাহিত্য রচনায় প্রত্যক্ষ উৎসাহ দিয়াছিলেন। ইহারই ফলে অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণব-সাহিত্যের গীতিরস-ধারায় অভিষিঞ্চিত হইয়া বাংলার সাহিত্যভূমি শ্যামলসুন্দর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল।

তুর্কী আক্রমণের পর দীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্যের কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। এই যুগকে অন্ধকার যুগ বলা হয়। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে হয়ত গ্রামাঞ্চলে ছড়া-গান, ব্রতকথা, পাঁচালী, ঝুমুর প্রভৃতি লোকসাহিত্যের যথারীতি প্রচলন ছিল। কিন্তু রাজদরবারের পৃষ্ঠ-পোষকতায় কোন বিশেষ সাহিত্য রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। চৈতন্যজীবনীকার বৃন্দাবন দাস প্রাক্ চৈতন্যযুগের সামাজিক চিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

যোগীপাল মহীপাল ভোগীপাল গীত।
ইহা শুনিয়া সব লোক আনন্দিত॥
মঙ্গলচণ্ডীর গীত গায় জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে॥

বৃন্দাবন দাসের উল্লেখ হইতে অনুমিত হয় যে দেশে লোকসঙ্গীতের অভাব ছিল না, কিন্তু উন্নত সাহিত্য ছিল না। তুর্কী শাসকেরা প্রশ্রয় দিয়াছিলেন বলিয়াই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের উৎসমুখ খুলিয়া গিয়াছিল এবং সাহিত্য-গঙ্গার ত্রিস্রোতা প্রবাহিত হইয়াছিল।

তুর্কী আক্রমণের কয়েক শত বৎসর পর তীরভুক্তি অর্থাৎ ত্রিহুত রাজসভা এবং গৌড় দরবারকে কেন্দ্র করিয়া সাহিত্য-রচনার পীঠস্থান রচিত হইয়াছিল। ত্রিহুতের মৈথিল রাজগণ সংস্কৃত সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। সেখানে বিদ্যাপতির আবির্ভাব। বাংলা সাহিত্যচর্চার প্রধান কেন্দ্র হইল গৌড় দরবার। গৌড়েশ্বরদের সশ্রদ্ধ উল্লেখ বহু কবির রচনায় পাওয়া যায়। অনুমান করা হয় যে মহাকবি কৃত্তিবাস রাজা গণেশের উৎসাহে রামায়ণ রচনা করেন এবং সুলতান বারবক শাহের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় কবি মালাধর বসু ভাগবতের অনুবাদ করেন। হোসেন শাহের কর্মচারী চট্টগ্রামের জায়গীরদার লস্কর পরাগল খাঁর নির্দেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত রচনা করেন। পরাগলের পুত্র ছুটি খাঁর নির্দেশে শ্রীকর নন্দী অশ্বমেধ পর্বানুসারে মহাভারত লিখিয়াছিলেন। সুলতানেরা কবিদের নানা খেতাব খেলাৎ এবং জায়গীর দিতেন, কবিরাও সানন্দে রাজকীয় অনুগ্রহ শিরোধার্য করিতেন। বৈষ্ণব পদাবলী এবং মঙ্গলকাব্যের লেখকেরাও রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা হইতে বঞ্চিত হন নাই। মুসলমান কবিরাও কাব্যচর্চা করিতেন এবং হিন্দু কবিদের বর্ণিত বিষয় লইয়াও কাব্য লিখিতেন। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদরচনায় বহু মুসলমান কবি দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন।

তুর্কী আক্রমণের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়ার পরিণাম ঐতিহাসিকের বিচার্য। কিন্তু সাহিত্যে ইহার ফল খুব অশুভ হয় নাই। মুসলমান রাজশক্তির সংঘাতে বহুধা-বিচ্ছিন্ন বাঙালী জাতির মধ্যে এক নূতন প্রাণচৈতন্য সঞ্চারিত হয়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব সেই প্রাণচৈতন্যেরই মূর্ত বিগ্রহ। বাংলা সাহিত্যে পরবর্তী কালে যে চৈতন্যযুগ প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহাকেও তুর্কী আক্রমণের পরোক্ষ ফল বলা যাইতে পারে।

প্রশ্ন। চৈতন্য জীবনীকাব্যগুলিকে জীবনকথা ও তত্ত্ববাদের সার্থক সমন্বয়রূপে কতদূর গ্রহণ করা যায়?

উত্তর। শ্রীচৈতন্যের জীবনীকাব্যগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্যই এই যে ইহাদের মধ্যে চৈতন্যদেবের ভগবৎলীলা-বর্ণনাই প্রাধান্য পাইয়াছে। রাধা ও কৃষ্ণের সম্মিলিত অবতার রূপে নবদ্বীপবাসী জগন্নাথ মিশ্র এবং শচীদেবীর পুত্র নিমাই নরলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন—এই মনোভাব লইয়াই চৈতন্যজীবনী লেখা হইয়াছিল। তাই এই কাব্যে চৈতন্যদেবের জীবনকথা এবং তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মের তত্ত্বকথা একত্রে সমাবিষ্ট হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, এই ঐতিহাসিক মহাপুরুষের জীবৎকালেই তাঁহার ভক্তসম্প্রদায় তাঁহার মধ্যে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া তাঁহাকে অবতারের মর্যাদা দিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে নবদ্বীপে তাঁহার জন্ম। আপন ব্যক্তিত্ববলে তিনি সমাজে, ধর্মে ও সাহিত্যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনিয়াছিলেন। তিনিই কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ'। যে দেশের সাহিত্যে একমাত্র দেবমাহাত্ম্যই প্রচারিত হইত সেই দেশে মানবচরিত রচনায় মানবকে দেবোপম মাহাত্ম্যের অধিকারী হইতেই হইবে। চৈতন্যদেব দেবোপম ছিলেন বলিয়াই রক্তমাংসেগড়া ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া 'মঙ্গল' নামক জীবনীকাব্য রচিত হইয়াছিল। চৈতন্যদেবের জীবনকথার সঙ্গে অবতাররূপে তাঁহার আবির্ভাবের তত্ত্বকথা সমন্বিত হওয়ায় চরিত-গ্রন্থ চরিতামৃত হইয়া উঠিয়াছে, চৈতন্যজীবনী মঙ্গলকাহিনী বা ভাগবতকথা নামে পরিচায়িত হইয়াছে।

চৈতন্যদেবের জীবনীকাব্য প্রথম লেখা হয় সংস্কৃত ভাষায়। বাংলা ভাষা স্বপ্রতিষ্ঠ হইবার পরও বিদগ্ধ বাঙ্গালীরা বিষয়ের গুরুত্ব আরোপের জন্যে সংস্কৃত ভাষায়ই অনুশীলন করিতেন। মুরারিগুপ্ত সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্যচরিতামৃত কাব্য লেখেন। দামোদর পণ্ডিতের প্রশ্নের উত্তরে কাব্যখানি লেখা বলিয়া ইহা কড়চা নামে পরিচিত। চৈতন্যদেবের জীবৎকালেই এই কাব্য রচিত হয়। চৈতন্যদেবের অন্যতম পরিকর কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেন ১৫৪২ সালে চৈতন্যচরিতামৃত নামে মহাকাব্য লেখেন। ইনি 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নামে একখানি নাটকও রচনা করেন। এই কবি তাঁহার 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সখাসখী সহ চৈতন্য এবং চৈতন্যসহচররূপে কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রবোধানন্দ সরস্বতী সংস্কৃত ভাষায় 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত' নামে একখানি স্তবগ্রন্থ রচনা করেন। নবদ্বীপের পুরুষোত্তম আচার্য স্বরূপ-দামোদর নামে খ্যাত হন। ইনি সংস্কৃতে একখানি কড়চা গ্রন্থ রচনা করিয়া চৈতন্যদেবকে রাধাকৃষ্ণের যুগলাবতার রূপে প্রতিপন্ন করেন। সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্যদেব সম্বন্ধে লিখিত এই গ্রন্থগুলি বাংলা জীবনীগ্রন্থগুলিকে প্রেরণা এবং উপকরণ জোগাইয়াছিল বলিয়া জীবনীকাব্যে তত্ত্ববাদ ও জীবনকথা একত্রে সমন্বিত হইয়াছে।

বাংলায় চৈতন্যজীবনী লেখেন সর্বপ্রথম কবি বৃন্দাবন দাস। তিনি চৈতন্যদেবকে কৃষ্ণের অবতার মনে করিতেন। ভাগবত গ্রন্থে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত। তাই চৈতন্যলীলার গ্রন্থখানির নাম রাখা হইল 'চৈতন্যভাগবত'। আদি-মধ্য-অন্ত্য এই তিনটি খণ্ডে এই সুবৃহৎ গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। ইনি জীবনকথাকে ঈশ্বরের নরলীলারূপেই বর্ণনা করেন। তিনি বলিয়াছেন, "বেদগুহ্য চৈতন্যচরিত কেবা জানে। তাহা লিখি যাহা শুনিয়াছি ভক্তস্থানে॥" লোচনদাসের গ্রন্থখানির নাম চৈতন্যমঙ্গল। এই গ্রন্থে গৌরনাগরবাদের সমর্থন করা হইয়াছে। ঐতিহাসিক তথ্য অপেক্ষা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সাধনভজন বর্ণনায় ইনি অধিক মনোযোগী ছিলেন। ফলে জীবনকথার সঙ্গে তত্ত্বের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। জয়ানন্দ মিশ্র চৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থ লিখিয়া "চৈতন্যমঙ্গল" নাম দিয়াছিলেন। গ্রন্থখানি হয়ত ১৫৬০ সালে রচিত। তখন চৈতন্যধর্ম ক্রমশঃ তত্ত্ব

হইয়া উঠিতেছে। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবেরা এই গ্রন্থ সমাদর করেন নাই। চৈতন্যের আদি বাসস্থান, ব্যক্তিপরিচয় এবং মৃত্যুঘটনা বিশদ করিয়া বর্ণনা করায় তাত্ত্বিকেরা খুশি হন নাই। জয়ানন্দ মায়াবাদ বিশ্বাস করিতেন। "মিথ্যা ধন মিথ্যা জন মিথ্যা পরিবার। যথাত্র সম্পদ তথা বিপদ অপার ॥ কমল পত্রের জল জেন স্থির নয়। তেমত চঞ্চল জীব একত্র না রয়॥"—এই রকম মতবাদের জন্য ভক্তিবাদী গোস্বামীবা জয়ানন্দকে বর্জন করেন। চৈতন্যদেব পায়ে ইটের টুকরার আঘাতে অসুস্থ হইয়া মৃত্যুবরণ করেন—এই প্রকার লৌকিক কাহিনী বলিয়াছিলেন বলিয়াও জয়ানন্দ নিন্দিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ববাদ হইতে মুক্ত এই জীবনীকাব্যে ঐতিহাসিক তথ্যেরও বিকৃতি। ফলে জীবনকথা বা তত্ত্বকথা কোন দিক হইতেই কাব্যখানি প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"ই চৈতন্যজীবনীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই দার্শনিক কবি অপূর্ব মনীষাদীপ্ত রচনায় চৈতন্যদেবের জীবন এবং তৎকর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মতত্ত্বকে যুগপৎ উদ্ভাসিত করিয়াছেন। এই জীবনীকাব্যদ্বারা তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠ করেন। তাঁহার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী জীবনীকারেরা শুধু অলৌকিক জীবনকথায় ঈশ্বরেব নরলীলা বর্ণনা করিয়াছেন, জীবনের মধ্যে তত্ত্বের অনুপ্রবেশ দেখেন নাই। চূড়ামণি দাস 'গৌরাঙ্গ বিজয়' বা 'ভুবনমঙ্গল' নামক কাব্য লেখেন। চৈতন্যদেব সম্বন্ধে নানা গালগল্পই এই কাব্যে প্রাধান্য পাইয়াছে। জীবনকথা ও তত্ত্ববাদ সার্থক সমন্বয় লাভ করিয়াছিল কৃষ্ণদাসের কাব্যে। তিনি রাধাতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব এবং সাধ্যসাধন ও অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বের সঙ্গে মিশাইয়া চৈতন্যদেবের আদি মধ্য ও অন্ত্যলীলার বর্ণনা করিয়াছেন। শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের সঙ্গে চৈতন্যজীবনের প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলীর বর্ণনায় কৃষ্ণদাস চরিতকথাকে অমৃতকথায় পরিণত করিয়াছিলেন।

আধুনিক জীবনীকাব্য যাহাকে আমরা ইংরাজীতে Biography বলিয়া থাকি তাহা সমসাময়িক সমাজপরিবেশে জীবনের বাস্তবরূপ প্রতিফলিত করে। কিন্তু চৈতন্য-জীবনকথা প্রকৃতপক্ষে সন্ত-জীবনী যাহাকে Hagiography বলা যাইতে পারে। চৈতন্যদেবের লৌকিক জীবনবৃত্তের পরিচয় অপেক্ষা তাঁহার অসাধারণ বিশেষত্বগুলিই এই জাতীয় গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। তাই কোন কোন সমালোচক মন্তব্য করিয়াছেন যে চৈতন্য চরিতামৃতে চরিতের অভাব কিন্তু অমৃতের প্রাচুর্য। ধর্মতত্ত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্য লইয়া জীবনীকারেরা ভক্তিবশে ঈশ্বরের নরলীলা বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রশ্ন ৮। "জয়দেব বিদ্যাপতি ও ভারতচন্দ্র—এই তিন কবিই রাজসভার কবি ছিলেন। রাজসভার দোষগুণ এই তিন কবির সাহিত্যেই লক্ষ্য করা যায়।" —উক্তিটির যাথার্থ্য সম্বন্ধে তোমার অভিমত ব্যক্ত কর।

উত্তর। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশে রাজসভার দান খুবই উল্লেখযোগ্য। শুধু বাংলা সাহিত্য নয়, সব রকম নাগরিক সাহিত্যই সব দেশে রাজসভার

সুস্পষ্ট পৃষ্ঠপোষকতায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। লোকসাহিত্যের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত কাব্যনাটকাদি রাজসভার আদেশ-নির্দেশ-উৎসাহেই সৃষ্ট ও প্রচারিত হইয়াছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আদি-মধ্য-অন্ত্য যুগের দিকপালসদৃশ তিন জন কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি ও ভারতচন্দ্র বড় প্রত্যক্ষভাবে রাজসভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইহার পরিচয়ও তাঁহাদের কাব্যকলায় স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। রাজ্যসভাস্বলভ নানাগুণেও যেমন তাঁহাদের কাব্য সুশোভিত, তেমনি রাজসভার কৃত্রিম পরিবেশে যে আনুষঙ্গিক দোষাবলীর সম্ভাবনা ঘটে সেই দোষাবলী হইতেও তাঁহাদের কাব্য মুক্ত নয়।

কবি জয়দেব বীরভূমের কেন্দুবিল্ব গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনের সভায় ছিল তাঁহার সসম্মান প্রতিষ্ঠা। তিনি সংস্কৃতভাষায় গীতগোবিন্দ কাব্য রচনা করিলেও বাঙ্গালী সংস্কৃতির অনুকূল বলিয়া বাংলাসাহিত্যের আদিকবির সম্মান ও সমাদরলাভ করিয়াছেন। কবি বিদ্যাপতি মিথিলার অধিবাসী। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাশোভন করিয়া ইনি মাতৃভাষায় যে রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গালীরা সাদরে শিরোধার্য করিয়া লইয়াছে। নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রকে 'রায় গুণাকর' উপাধি দান করিয়া রাজসভায় গৌরবের আসন দিয়াছিলেন। ইনি খাঁটি বাঙ্গালী এবং বাংলাভাষায় বাঙ্গালীর কাব্য লিখিয়াছিলেন। এই তিনজন কবিই রাজসভায় সমাদৃত কবিরূপে রাজসভার উপযোগী কাব্যরচনা করিয়া সাহিত্যের ঐশ্বর্যযুগ রচনা করিয়াছেন।

রাজসভা একাধারে দোষ ও গুণের আকর। রাজসভায় বুদ্ধিমান পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটে। এখানে ঐশ্বর্যের দীপ্তি, বুদ্ধির প্রাখর্য, পাণ্ডিত্যের গাম্ভীর্য যেমন থাকে, তেমনি থাকে কৃত্রিমতা, বিলাসপরায়ণতা, নৈতিক শিথিলতা, কূটবুদ্ধিজাত ষড়যন্ত্র, ধর্মবুদ্ধির অভাব, পারস্পরিক ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতা। ফলে রাজসভাকে কেন্দ্র করিয়া নাগরিক জীবনে ভাল ও মন্দ দুইটি দিকই সমুদিত হয়। রাজসভাপুষ্ট বিদগ্ধ কবিকুলের রচনার মধ্যেও সেই সব দোষগুণ অনুক্রমিত হইয়া থাকে। ইহাদের রচনায় আদিরসের উদ্দামতা থাকে, ছন্দ ও অলঙ্কার শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় থাকে, ভাষাব্যবহারে বিদগ্ধতা ও শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় থাকে, পরিহাস-রসিকতা এবং অপরাপর শিল্পগুণের উৎকর্ষ থাকে। জীবনের সহজসুন্দর সরলচিত্র অঙ্কন অপেক্ষা রাজসভার কবিরা কৃত্রিম জীবনের বর্ণাঢ্য রূপাঙ্কনেই অধিকতর দক্ষতা প্রদর্শন করেন। বনফুলের মাল্যরচনা অপেক্ষা মণিরত্নের মহার্ঘ কণ্ঠভূষণ-রচনায়ই তাঁহারা অধিকতর উৎসাহী।

লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেব গীতগোবিন্দ কাব্যে রাজসভার ঐশ্বর্যদীপ্ত আড়ম্বর অতিসুন্দর ভাবে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন। কাব্যখানি 'হরিস্মরণের' কাব্য হইলেও ইহাতে 'বিলাসকলার কুতূহলই' বেশি। বস্তুতঃ রাজসভার রুচি অনুযায়ী তিনি আদি-রসাত্মক কাব্যই রচনা করিয়াছেন। কাব্যখানির ছন্দস্পন্দ ও শব্দঝংকার অপূর্ব।

পণ্ডিতকবির বিদগ্ধতায় এবং মণ্ডনশিল্পীর কুশলতায় কাব্যখানি রাজসভার উপযোগী অলঙ্কৃত সৌন্দর্যমূর্তি হইয়া উঠিয়াছে। রুচিবিকার এবং কৃত্রিমতা যেমন ইহার দোষ, তেমনি উন্নত ভাব, উন্নত ভাষা এবং নিপুণ শিল্পসৌষ্ঠব ইহার গুণ।

কবি বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী রচনায় ভাব-ভাষা-শিল্পগুণ বিদগ্ধ সদস্যসমাকুল রাজসভার উপযোগী। কিন্তু হৃদয়ের সহজ অনুভূতির স্থলে বুদ্ধির প্রাখর্য, ভাষার চাতুর্য এবং প্রকাশভঙ্গির কৃত্রিমতা উল্লেখযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। অধ্যাপক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "তাঁহার (বিদ্যাপতির) কবিতায় যে মণ্ডনকলাসিদ্ধ সৌকুমার্য ও বাক্‌নির্মিতির বিস্ময়কর পরিমার্জনা লক্ষ্য করা যায়, তাহা সম্ভবতঃ রসজ্ঞ রাজন্যবর্গ ও রাজসেবক কর্মচারিগণের রসতৃষ্ণা মিটাইবার জন্য রচিত হইয়াছিল।*** তাঁহার মার্জিত ছন্দ, রুচির নাগরিকতা, আদিরসের বাহুল্য ইত্যাদি প্রধানতঃ দরবারী আদর্শে পরিচালিত।"

কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগৃহীত কৃষ্ণনাগরিক ভারতচন্দ্রের রচনায় শিল্পগুণের যে উৎকর্ষ তাহা রাজসভার প্রভাবজাত মনে করা যাইতে পারে। অলঙ্কার প্রয়োগে ও ছন্দরচনায় বিদগ্ধ কবি রায়গুণাকর অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। অন্নদা ও বিদ্যার রূপবর্ণনায় পাদনখ হইতে কেশাগ্রভাগ পযন্ত প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তিনি বিচিত্র অলঙ্কারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন। অন্নদার আত্মপরিচয়ে শ্লেষ ও ব্যাজস্তুতির প্রয়োগ রাজসভার বিদ্বৎগোষ্ঠীরই উপভোগ্য। তোটক, তূণক, একাবলী, ভুজঙ্গপ্রয়াত প্রভৃতি ছন্দের নিপুণ প্রয়োগ পণ্ডিত ব্যক্তিরাই শুধু বুঝিতে পারেন। প্রচুর বিদগ্ধ উক্তি ও শিষ্টপ্রয়োগে কাব্যখানিকে মণ্ডিত করা হইয়াছে রাজসভাকে লক্ষ্য করিয়া। রাজসভার জন্য কাব্যে দোষস্পর্শও ঘটিয়াছে। অন্নদামঙ্গল—বিদ্যাসুন্দর কাব্য বড় কৃত্রিম। বাঙ্গালী জীবনের স্বভাবসুন্দর চিত্র ইহাতে নাই। এই কাব্যে বুদ্ধির কসরৎ বেশি, হৃদয়ধর্ম উপেক্ষিত। রাজসভাসুলভ আক্রমণাত্মক পরিহাসপ্রিয়তা ও লঘু কৌতুক কাব্যখানির ভাবগভীরতাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। নারীগণের পতিনিন্দা বর্ণনায়, শিবের বিবাহ, ব্যাসকাশী বিবরণ, কাজির বাড়িতে ভূতের অত্যাচার প্রভৃতি রচনা আদিরসাত্মক কুরুচি এবং খেয়ালী কল্পনার লঘুভঙ্গি মাত্র। রাজসভার প্রভাবেই এইরূপ ঘটিয়াছে।

এই তিনজন কবি সম্বন্ধে অধ্যাপক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। "জয়দেব, বিদ্যাপতি ও ভারতচন্দ্র—ইঁহারা প্রধানতঃ নাগরবৃত্তিচারী রাজসভার কবি। তিনজনের রচিত বিষয়বস্তুর মধ্যে উপাদান হিসাবে কিছু কিছু পার্থক্য থাকিলেও মনোভাব ও জীবনপ্রত্যয়ের দিক দিয়া খুব যে একটা বৈষম্য আছে তাহা মনে হয় না। জীবনের বহিরঙ্গণেই অধিকতর বিহার, ভাবাভঙ্গিমাকে শান দিয়া, পালিশ করিয়া ঘষিয়া মাজিয়া 'রাজকণ্ঠের মণিমালার মত' দ্যুতিময় করিয়া লওয়া তিনজনের বাক্‌-রীতিরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য।" বস্তুতঃ এই কবিত্রয়ের কাব্যে প্রকাশভঙ্গির উজ্জ্বলতা রাজসভার বিদগ্ধ পরিবেশের গুণ; লঘুচাপল্য, আড়ম্বরপ্রিয়তা এবং আদিরসাত্মক রুচি রাজসভার কৃত্রিমতা ও বিলাসপরায়ণতার দোষ।

ধারা বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রকে শ্যামল সৌন্দর্যে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই ধারাগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক বিচারে অনুবাদ সাহিত্যের ধারাই কালানুক্রমিকতায় প্রথম। ব্রতকথা ও পাঁচালী জাতীয় লোক-সাহিত্যের প্রচলন ছিল। উহা হইতে মঙ্গলকাব্যগুলির উৎপত্তি। কিন্তু রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ণাঙ্গ কাব্যরূপে অনুবাদ সাহিত্যই প্রথম কাব্যরূপ বলিয়া অনুমান করিবার সঙ্গত কারণ আছে।

অনুবাদ সাহিত্য পৌরাণিক আখ্যায়িকামূলক একজাতীয় পাঁচালী কাব্য। রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত-পুরাণ কাহিনীগুলির মূল উৎস। নিখিল ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শ এবং সভ্যতার বৈশিষ্ট্য এই কাহিনীগুলির মধ্যে অপূর্ব ব্যঞ্জনা লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের সহস্র-সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড এই কাহিনীসমূহের মধ্যে স্পন্দিত। সংস্কৃত ভাষা-বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া বাঙ্গালী কবিরা এই কাহিনীগুলিকে লোকভাষায় প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার ফলেই অনুবাদ সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় যে মালাধর, কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রভৃতি কবিরা ব্যাস-বাল্মীকির কাব্যের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই। তাঁহারা পুরাণ, উপ-পুরাণ এবং প্রবাদমূলক বহু বিষয়ও বাঙালী-রুচির উপযোগী করিয়া কাব্যে অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

অনুবাদ সাহিত্য পাঁচালী সাহিত্যের মতই গেয় কাব্য। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে পূজা-পার্বণ উপলক্ষে ইহা এখনও গান করা হইয়া থাকে। মহাকবি কৃত্তিবাসের 'শ্রীরাম পাঁচালী' কাব্যই সম্ভবতঃ প্রথম অনুবাদ সাহিত্য। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ মুদ্রিত হইয়াছিল তাহা আসল গ্রন্থ কি-না সন্দেহ আছে। উহার বহু অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কৃত্তিবাসের একটি 'আত্মবিবরণ' পাওয়া গিয়াছে। উহার প্রামাণিকতাও বিচারিত হইয়াছে এবং ঐতিহাসিকেরা অনুমান-সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ইনি সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোন এক সময়ে নদীয়া জিলার ফুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বনমালী ওঝা (মুখোপাধ্যায়)। ইনি বাল্মীকির অনুকরণে রামায়ণকাব্য লিখিলেও বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের চিত্ররূপ এবং বাঙ্গালী প্রকৃতির মূল বৈশিষ্ট্যকে কাব্যে প্রতিফলিত করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"সাত কাণ্ড রামায়ণ দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥"

ভারতীয় সভ্যতার মূল আদর্শের প্রতি অনুগত থাকিয়াও তিনি সীতার চরিত্রে বাঙ্গালী কুলবধূর সলাজ-সুন্দর মূর্তি এবং কৌশল্যা চরিত্রে বাঙ্গালী জননী-গৃহিণীর ব্যক্তিত্ব-মাধুর্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন; গুহকের আতিথ্য বর্ণনায়, সীতাকর্তৃক দেবর লক্ষ্মণের আদর বর্ণনায়, অযোধ্যার রাজ পরিবারের আভ্যন্তরীণ চিত্র রচনায় কবির মনে যে কিরূপ বাঙ্গালী সংস্কার বদ্ধমূল ছিল তাহা বুঝা যায়। অন্যান্য রামায়ণ রচয়িতাদের মধ্যে পাবনার অমৃত কুণ্ডার অদ্ভুত আচার্য নিত্যানন্দ) এবং মৈমনসিংহের দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী উল্লেখযোগ্য। ইহাদের রচনায়ও বাল্মীকির আক্ষরিকতা

নাই। তাঁহারাও বাঙ্গালীর গৃহপ্রীতি, সৌন্দর্যানুরাগ, পরিহাসপ্রিয়তা এবং প্রাণধর্মের স্বতঃস্ফূর্ততাকেই কাব্যরস প্রকাশের উপকরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রচনায় সর্বভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে বাঙ্গালীর রস-সংস্কারের সার্থক মিলন ঘটিয়াছিল।

ভাগবতের অনুবাদকদের মধ্যে শিরোমণি ছিলেন গুণরাজ খাঁ মালধর বসু। বর্ধমান জিলার কুলীনগ্রামের অধিবাসী মালধর অপূর্ব কবিকৃতির জন্য সুলতান বারবক শাহের কাছে 'গুণরাজ্ খাঁ' উপাধি পাইয়াছিলেন। তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই জানা যায় যে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের দশম-একাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে ১৩৯৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থরচনায় নিয়োজিত হন। তিনি আরও লিখিয়াছেন,

"ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া।
লোক নিস্তারিতে কহি পাঁচালী করিয়া॥"

তিনি তাঁহার কাব্যের নাম রাখিয়াছিলেন 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' বা 'গোবিন্দমঙ্গল' কাব্য। শ্রীচৈতন্যদেব এই কাব্যখানিকে বড় প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। ব্যাসদেবের কাব্যের শ্রীকৃষ্ণের অবতার জীবনের মহিমা পূর্ণভাবে প্রকটিত করিয়াও মালাধর বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের লৌকিক রূপটির কথা ভোলেন নাই। যশোদা ও কৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া বাঙ্গালীর বাৎসল্য রস, কৃষ্ণের গৃহবর্ণনায় আম-কাঠাল-নারিকেল-সুপারি-কদলী প্রভৃতি বৃক্ষের পরিবেশ রচনায় বাঙ্গালী-আনার যথেষ্ট পরিচয় ফুটিয়াছে। এখানেও বাঙ্গালীর রস-সংস্কার জয়যুক্ত হইয়াছে।

মালাধরের পরবর্তীযুগে বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব ছিল প্রচুর। ভাগবতের ভক্তিধর্মের প্রভাব অনুবাদ সাহিত্যের আদর্শকে বেশ পরিমার্জিত করে। ইহার ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে ভাগবতের অনুবাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ভাবের স্থলে মাধুর্যভাবের পরিচয় বেশী প্রকাশ পায়। ইহাও বাঙ্গালী-সংস্কার। চৈতন্যোত্তর ভাগবত গ্রন্থগুলি 'কৃষ্ণমঙ্গল' নামেই বেশি পরিচিত। গোবিন্দ আচার্য ও পরমানন্দের 'কৃষ্ণমঙ্গল', দ্বিজমাধবের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল', রঘুপণ্ডিতের 'কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিনী' প্রভৃতি কাব্যে অবতার কৃষ্ণের অসুরঘাতী বীরমূর্তির পরিবর্তে মাধুর্যময় প্রেমিক মূর্তিই বেশি ফুটিয়াছে। বাঙ্গালীসুলভ ভক্তিরসের বিহ্বলতাই ভাগবত অনুবাদের বিশিষ্টতা হইয়া উঠিয়াছিল।

ব্যাসদেব-কৃত সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে হইয়াছিল কিনা তাহার নিশ্চিত কোন প্রমাণ নাই। সঞ্জয়-কৃত মহাভারত অনেকের মতে পরাগলী মহাভারতেরই রূপভেদমাত্র। হোসেন শাহের কর্মচারী লস্কর পরাগল খাঁর নির্দেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস পরাগলী মহাভারত লেখেন। এই গ্রন্থখানির নাম 'ভারত পাঁচালী' বা 'পাণ্ডববিজয় কথা'। পরাগলের পুত্র ছুটি খাঁর নির্দেশে শ্রীকর নন্দী অশ্বমেধ পর্বকে ভিত্তি করিয়া ক্ষুদ্রাকার মহাভারত লেখেন। কবীন্দ্রের মহাভারতও আয়তনে খুব বৃহৎ নয়। উভয় কাব্যেই পাণ্ডবদের বীরত্বকথা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। তথাপি বাঙ্গালী পরিবারের কাহিনী, বাঙ্গালী মানুষগুলির সুখ-দুঃখের ঘাতপ্রতিঘাত

হইতে গল্পাংশ গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালী কবিরা নিজেদের রুচি তথা জনরুচি অনুযায়ী সাহিত্য রচনা করিয়াছেন।

পৌরাণিক নানাগল্প বাংলা মঙ্গলকাব্যের কাহিনী সূত্রে কবিরা বলিয়াছেন। চাঁদ সদাগর ও ধনপতির সমুদ্রযাত্রা প্রসঙ্গে সগররাজার উপাখ্যান বলা হইয়াছে। দুর্গামঙ্গল বা ভবানীমঙ্গলে মার্কণ্ডেয় পুরাণের গল্প বলা হইয়াছে। মহাভারতের মুচুকুন্দ কাহিনী উপলক্ষে 'মৃগলুব্ধ' নামক শিবমঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছে। প্রতিটি মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ডে বহু পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত। এইভাবে সংস্কৃত গ্রন্থগুলি হইতে বহু আখ্যান বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রশ্ন-১৩। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলাদেশে কৃষ্ণকথা কি ভাবে কোন্ কোন্ রূপকে আশ্রয় করিয়া প্রচলিত ছিল? পরবর্তী কালে ইহার কিরূপ রূপান্তর ও বিস্তার ঘটিয়াছিল তাহা বিশদভাবে আলোচনা কর।

[ক. বি. ১৯৫৯]

উত্তর। পূর্বভারতীয় অধিবাসীদের কাছে কৃষ্ণকথা বড় প্রিয় প্রসঙ্গ। 'কানু ছাড়া গীত নাই' ইহা বাংলাদেশের সুপ্রাচীন প্রবাদ। শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়লীলা প্রসঙ্গে বহু গীতি ও বহু কথা বাংলা দেশের আকাশে-বাতাসে ঘুরিয়া বেড়ায়। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে, এমন কি বাংলা সাহিত্য রচিত হইবার পূর্বেও সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ সাহিত্যে বহু প্রকীর্ণ কবিতায় কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ আছে। পূর্বভারতের বিভিন্ন আভীর পল্লীতে 'রাখালিয়া' গানরূপে কৃষ্ণকথার ছড়াছড়ি ছিল। সিন্ধী, পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, আহিরিয়া গানগুলিও কৃষ্ণবিষয়ক। এই সব গানে ও ছড়ায় প্রণয়লিপ্স লীলাময় কৃষ্ণের প্রেমের কথাই বলা হইয়াছে, কৃষ্ণকে লইয়া কোন তত্ত্ব গড়িয়া উঠে নাই।

প্রাক্ চৈতন্যযুগে ভাগবত ধর্মের প্রভাবে কৃষ্ণকথামূলক সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় রূপ প্রকটিত হইয়াছিল। "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্" এই ভাব অবলম্বনে চৈতন্যপূর্ব ভাগবত ও মহাভারত গ্রন্থে কাহিনীর মাধ্যমে কৃষ্ণকথা প্রকাশ করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ভূভারহরণের জন্য অত্যাচারী কংসকে দমন করিয়া, অহঙ্কারী দুর্যোধনকে পরাভূত করিয়া সাধুদের পরিত্রাণ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় এই কথা কাহিনীকাব্যের রূপ আশ্রয় করিয়া প্রাক্ চৈতন্যযুগের বিদগ্ধ সাহিত্যে ফুটিয়া উঠে। কিন্তু লোকসাহিত্যে কৃষ্ণসম্বন্ধে আদিরসাত্মক গান-গল্পই সংগীতাকারে প্রকাশ পাইয়াছিল। জয়দেব বিদগ্ধ সমাজের জন্য সংস্কৃত ভাষায় আদিরসাত্মক কৃষ্ণ-কথাই লিখিয়াছিলেন। হরি-স্মরণ এবং বিলাসকলা উভয় দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তাঁহার গীত-গোবিন্দ কাব্য 'মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি' হইয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণকে তিনি ঈশ্বরের অবতার করিয়াছেন এবং বর্ণনা করিয়াছেন প্রণয়লীলার বৈচিত্র্য। ইসলামপূর্বযুগে কৃষ্ণকথার এই বৈশিষ্ট্যই দেখা যায়।

তুর্কী আক্রমণের পর কৃষ্ণ-কথার কিঞ্চিৎ বিবর্তন ঘটিতে থাকে। মুসলমান শাসনকালে হিন্দু-ধর্ম ও সংস্কৃতিতে প্রচণ্ড আঘাত আসে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে

কৃষ্ণ-কথার রূপান্তর ঘটে। গীতির আশ্রয় হইতে কৃষ্ণ-কথা সুসংবদ্ধ কাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ করে। ভাগবতাদি গ্রন্থানুসারে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় মঙ্গল জাতীয় কাহিনীকাব্য রচিত হইতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ প্রজ্ঞাবান্ রাজনীতিজ্ঞ, তিনি সুদর্শনধারী সমরকুশল, তিনি অসুরঘাতা মল্লবীর এবং বহু অলৌকিক শক্তির আধার। দুর্বল, হতাশাক্লিষ্ট পরাধীন হিন্দুদের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের বীর্যময় কল্যাণরূপ ফুটাইয়া তুলিবার জন্য আখ্যান বর্ণনা করা হইয়াছিল। তবে মাধুর্যময় প্রেমিক কৃষ্ণের আদর্শও এই যুগে গড়িয়া উঠে। ভাগবতের অনুবাদক মালাধর বসু প্রাক চৈতন্যযুগেই লিখিয়াছিলেন "নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।" বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রেমিক কৃষ্ণের কাহিনী লিখিয়াছেন।

গীতিকাব্যরূপেও কৃষ্ণ-কথার ব্যাপক প্রসার চৈতন্য আবির্ভাবের পূর্বে উন্নত সাহিত্যশিল্প হইয়া উঠিয়াছিল। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিয়াও কৃষ্ণকথাকে শাশ্বত প্রেমগাথায় পরিণত করিয়াছিলেন। ধর্মমতনিরপেক্ষ প্রেম-সঙ্গীতরূপেও তাঁহাদের রচনা বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য।

দেখা যাইতেছে যে, চৈতন্য আবির্ভাবের পূর্বে কৃষ্ণকথা দুইটি স্বতন্ত্র কাব্যরূপ লাভ করিয়াছিল—একটি গীতিকাব্য, একটি আখ্যান কাব্য। উভয় ধারার কাব্যেই কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব স্বীকৃত কিন্তু তাঁহার কৃতকর্মে অলৌকিকতা থাকিলেও তিনি সাধারণ মানুষের মতই অনুভূতিসম্পন্ন। আখ্যানকাব্যগুলিতে অর্থাৎ ভাগবত কথায় এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণের দুষ্কৃতদমনের প্রসঙ্গ থাকিলেও মানবিকতাই প্রধান। কৃষ্ণকীর্তনের সূচনায় বড়ু চণ্ডীদাস অবশ্য বলিয়াছেন যে সৃষ্টিবিনাশকারী কংসের নিধনের জন্যই কৃষ্ণের জন্ম। তাঁহার কাব্যের নায়ক কৃষ্ণও মাঝে মাঝে বলিয়াছেন যে "আহ্মে হরি, আহ্মে বিষ্ণু, আহ্মে মহেশ্বর।" রাধা এবং বড়ায়ি কৃষ্ণকে বহুবার 'দেবচক্রপাণি, বৈকুণ্ঠপতি' বলিয়াছেন। তথাপি এই কাব্যে ভোগপরায়ণ, ষড়যন্ত্রকারী, প্রতিশোধ গ্রহণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একটি দুর্দান্ত গোপযুবকের মানবিক চিত্রই স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ প্রাক্‌চৈতন্যযুগে গীতি ও আখ্যানকাব্যের কৃষ্ণকথায় কৃষ্ণের মানবিকরূপ এবং ঐশ্বরিক রূপ যুগপৎ ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবেই কৃষ্ণকথা বিশুদ্ধ তত্ত্বকথায় পরিণত হইয়া উঠে।

কৃষ্ণকথার বিস্ময়কর বিবর্তন ঘটে চৈতন্যোত্তর বাংলা সাহিত্যে। শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিত্ব ও ধর্মমতের প্রভাবে পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতত্ত্বরূপে আদর্শায়িত হইয়া উঠেন। এবারে শ্রীকৃষ্ণ সৎ, চিৎ এবং আনন্দময় সত্তা। তিনি প্রেমিক শিরোমণি, প্রেমস্বরূপ। শ্রীরাধা তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি, তিনি প্রেমের পরাকাষ্ঠা, মহাভাবস্বরূপিণী। এইযুগের সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের নবীন মদনরূপেই কাব্যকথায় স্থান পাইয়াছেন। ইহার ফলে কৃষ্ণকথার ব্যাপক রূপান্তর ও বিস্তার ঘটিয়াছে।

চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব মহাজনেরা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যমূর্তির উপাসনা করেন নাই, মাধুর্যভাবেই প্রেমের কবিতা রচনা করিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হইল, "অসুর-ঘাতন কর্ম তাঁর কাজ নহে।" এই মতের অনুবর্তী হইয়া জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, রায়শেখর, বলরাম দাস প্রভৃতি কবিকুল গীতিসুরের কাকলিতে বাংলাদেশের

আকাশ বাতাস ধ্বনিত করিলেন। কৃষ্ণসম্বন্ধীয় কাহিনীগুলিও মাধুর্যমণ্ডিত হইয়া উঠিল। ভাগবত ও মহাভারত গ্রন্থাদিতে যেখানে কৃষ্ণকথা আছে সেখানেই কৃষ্ণ প্রেমিক শিরোমণি। অনুবাদ গ্রন্থগুলির নাম হইল কৃষ্ণমঙ্গল। হরিবংশ, ব্রহ্ম-বৈবর্তপুরাণ ও ভাগবত হইতে কাহিনী অংশ গ্রহণ করিলেও কৃষ্ণের প্রেমসত্তাকেই প্রাধান্য প্রদান করা হইয়াছে। বাণীকণ্ঠের 'শ্রীকৃষ্ণচরিত', পরশুরাম চক্রবর্তীর 'কৃষ্ণমঙ্গল', কৃষ্ণকিঙ্করের 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' প্রভৃতি কাব্যে শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্যরসে নিষিক্ত প্রেমিক পুরুষ। কৃষ্ণের জীবনকথা বর্ণনায় কবি কৃষ্ণকিঙ্কর মুখবন্ধে লিখিয়াছেন,

শারদ শশধর রঞ্জিত রাতি।
কিশলয় মল্লিকা ফুল অলি মাতি॥
সুখময় নেহারই শান।
মদনমোহন বেশবান॥

এই ভূমিকা স্পষ্টই নির্দেশ দেয় যে কবি ললিতমাধবের প্রেমলীলাই বর্ণনা করিবেন। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর ভাগবত গ্রন্থগুলি আদিরসাত্মক রচনারূপেই উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণকথা এই যুগে শৃঙ্গার ও হাস্যরসাত্মক গল্পকথায় পর্যবসিত হয়। কৃষ্ণমঙ্গল জাতীয় কাব্যগুলিতে কৃষ্ণের হাডুডু-লুকোচুরি খেলা, কৃষ্ণকালী ও কলঙ্কভঞ্জনের গল্প প্রভৃতি স্থান পাইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর পর ইংরাজ বণিকদের আমলে যাত্রা, পাঁচালী ঢপকীর্তনাদির মাধ্যমে কৃষ্ণকথার প্রচার ও প্রসার ঘটে। তাহার পর ঊনবিংশ শতাব্দীতে কৃষ্ণকথার মধ্যে কল্পনার অতিচার ও অন্ধভক্তির বাহুল্য প্রশমিত হয়। গৌরগোবিন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীরা বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে কৃষ্ণজীবনকে বিচার করিয়া কৃষ্ণকথায় যুগোচিত বিবর্তন সঞ্চার করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন ১৪। ঈশ্বরতত্ত্ব ও জীবনবোধের দিক দিয়া প্রাক্-চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যের পার্থক্যের প্রধান প্রধান সূত্র নির্দেশ করিয়া উভয় যুগের প্রতিনিধি-স্থানীয় মোট দুইজন বৈষ্ণব কবির রচনার তুলনামূলক আলোচনা কর।

উত্তর। বৈষ্ণব সাহিত্য বাংলার এক গৌরবময় ঐতিহ্য। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই বৈষ্ণব পদাবলী বাংলা সাহিত্যে গৌরবপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবীয় ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন বৈষ্ণব সাহিত্যে আদর্শগত ও প্রকাশগত পার্থক্য সূচনা করে। দ্বাদশ শতাব্দীর জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিলেও তিনিই মধুর-কোমলকান্ত পদাবলী রচনা করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের ভিত্তি পত্তন করেন। পরে মৈথিল কবি বিদ্যাপতি এবং বাংলার প্রাণের কবি চণ্ডীদাস বৈষ্ণব পদসাহিত্যকে গৌরবের উচ্চতম শিখরে প্রতিষ্ঠিত করেন। চৈতন্য-পূর্ব-যুগে মালাধর বসুর অনুবাদ-গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'কেও বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ইহাই প্রাক্ চৈতন্য-যুগের বৈষ্ণব সাহিত্য। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস প্রভৃতি অসংখ্য কবিকুল রাধাকৃষ্ণ প্রেমের অজস্র পদাবলী রচনা করেন, চৈতন্যজীবনী লেখা হয়, গৌরচন্দ্রিকা রচনা

হয়, বৈষ্ণব-দর্শনের ব্যাখ্যামূলক নিবন্ধ সাহিত্য রচিত হয় এবং বৈষ্ণব রসতত্ত্বের শাস্ত্রগ্রন্থও রচিত হয়। ব্যাপকার্থে এই বিপুল সাহিত্যকেই চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব সাহিত্য বলা চলে। তবে বিশুদ্ধ সাহিত্যরূপে পদাবলীকেই গ্রহণ করা উচিত। শ্রীচৈতন্যদেবকে মধ্যে রাখিয়া এই দিকের এবং ঐ দিকের পদাবলীর তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ঈশ্বরতত্ত্ব এবং জীবনবোধের দিক হইতে এই দুই যুগের পদাবলীর মৌলিক পার্থক্য আছে। ভাবরসে এবং রূপাঙ্গিকেও কিঞ্চিৎ প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়।

প্রাক্-চৈতন্য বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলা হইয়াছে। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'—এই নীতিতে বিশ্বাস রাখিয়াই শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপ ভাগবতাদি গ্রন্থে বর্ণনা করা হইয়াছে। মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার বিবরণও দিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাস তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার এবং রাধাকে লক্ষ্মীর অবতার রূপে গ্রহণ করিয়া রাধার সহিত কৃষ্ণের প্রণয়লীলার কাব্য রচনা করিয়াছেন; কিন্তু বলিয়াছেন যে কংসের নিধনের জন্যই বিষ্ণুর অবতার রূপ গ্রহণ। পদাবলী রচয়িতা চণ্ডীদাসের পদাবলীতে কংস হত্যার প্রসঙ্গ নাই। রাধার প্রণয়-কাহিনীই তাঁহার কাব্যের উপজীব্য। কিন্তু রাধা ও কৃষ্ণ দ্বৈত সত্তা, আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের দিক হইতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা। নরনারীর প্রণয়লীলায় যে জীবনবোধের গভীরতা এবং আবেগের উচ্ছলতা তাহাই চণ্ডীদাসের রচনাকে উৎকৃষ্ট কাব্যত্বে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে। মালাধর, মাধবেন্দ্র, যশোরাজ খাঁ, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদগুলিকেই প্রাক্-চৈতন্য পদাবলী বলে। চণ্ডীদাসই এই পদকর্তাসমূহের প্রতিনিধি স্থানীয়। চণ্ডীদাসের কাব্যে রাধা ও কৃষ্ণ তত্ত্বপরিমণ্ডলে নির্বাসিত হন নাই। তাঁহার কাব্যে ধর্ম-চেতনা অপেক্ষা শিল্পচেতনাই ছিল প্রবল। Theology এবং Art-এর নিবিড় সংযোগ থাকা সত্ত্বেও জীবনবোধের প্রখরতায়ই Art সৃষ্টি। মানবিক অনুভূতি ও রোমান্টিক আবেগ চণ্ডীদাসের পদাবলীকে তত্ত্বনিরপেক্ষ কাব্যসৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়াছে।

চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবসাহিত্যে তাত্ত্বিকতার প্রাধান্য ঘটিয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন "অসুর ঘাতন-কর্ম তাঁর কাজ নহে।" শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার, সাধ্যশিরোমণি প্রেমের প্রতিষ্ঠার জন্যই তাঁহার আবির্ভাব। রাধা ও কৃষ্ণ দ্বৈত সত্তা নয়। সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণই লীলাচ্ছলে দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তিই রাধাঠাকুরাণী রূপে প্রকট হইয়াছেন। চৈতন্যভক্তদের হাতে বৈষ্ণব-ধর্মের দার্শনিক পটভূমি স্বতন্ত্র হইয়া যায়। চৈতন্যদেবকে তাঁহারা রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত অবতাররূপে ব্যাখ্যা করেন। রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য অবলম্বনে গৌরনাগরবাদ গড়িয়া উঠে। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার প্রভৃতি ভক্তেরা শ্রীকৃষ্ণকে উহ্য রাখিয়া গৌরাঙ্গকেই পরম তত্ত্বরূপে গ্রহণ করিয়া গৌরপারম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার ফলে চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবদর্শনে ঈশ্বর সম্বন্ধে নূতন তত্ত্বতাৎপর্য গড়িয়া উঠে। বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীরাই তত্ত্বনিরূপণ করিয়াছেন, রূপগোস্বামী রসতত্ত্ব রচনা করিয়াছেন। এই তত্ত্বদ্বারাই চৈতন্যোত্তর পদাবলী ভাবে ও রূপে স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করিয়াছিল।

একদিকে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদাবলী অপরদিকে জ্ঞানদাস গোবিন্দদাসের পদাবলী তুলনা করিলেই ঈশ্বরতত্ত্ব এবং জীবনাবোধের গভীরতার দিক হইতে পার্থক্যটা বুঝা যায়। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির রচনায় বৈষ্ণবতা অপেক্ষা ব্যক্তিহৃদয়ের রসনিবিড়তা বেশি। কবিরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমানুভূতির সহিত একাত্ম হইয়া জীবনবোধের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু চৈতন্যোত্তর কবি জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস ব্যক্তিচেতনা অপেক্ষা গোষ্ঠীচেতনার প্রাধান্য দিয়াছেন। তাঁহারা ছিলেন 'মঞ্জরী' ভাবের সাধক। 'লীলাশুক'এর মত সখীভাবে ভাবিত হইয়া তাঁহারা প্রেমলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে যে-ভাবে রসপর্যায় নির্ণীত হইয়াছে তাঁহারা সেই তত্ত্বপথে চলিয়াছেন, জীবনপথের যাত্রী হন নাই। ব্যক্তিগত রসচেতনা অপেক্ষা সম্প্রদায়গত তত্ত্বচেতনাই পদকর্তা মহাজনদের কাব্যকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে।

প্রাক্-চৈতন্য পদাবলীতে কৃষ্ণসম্বন্ধীয় যেমন আখ্যান আছে, তেমনি আছে শৃঙ্গার রসাত্মক উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা। নরনারীর প্রেমলীলায় অনুভূতির যত বৈচিত্র্য ঘটে চণ্ডীদাস নিপুণ রূপকারের মত তাহার জীবনাশ্রয়ী রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। চৈতন্যোত্তর কবি গোবিন্দদাস বৈষ্ণবতত্ত্বের রসভাষ্য রচনা করিয়াছেন। গৌরচন্দ্রিকা পদেই হোক অথবা সম্ভোগ বিপ্রলম্ভের পদেই হোক চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদের চিত্র স্মরণে রাখিয়াই কবিরা পদরচনা করিয়াছেন। এইজন্য গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিদের রচনায় দর্শনতত্ত্ব প্রধান এবং কাব্যকলায় মণ্ডনশিল্পের আধিক্য; চণ্ডীদাসের পদাবলীতে ভাবের ঐকান্তিকতা ও প্রকাশের সরলতা অপূর্ব। গোবিন্দদাসের রচনায় মুখ্যভাব কৃষ্ণরতি এবং তিনি ধর্মদর্শনের আলোকবর্তিকা হাতে লইয়া কাব্যের ক্ষেত্রে পরিক্রমা করিয়াছেন। তত্ত্বসাপেক্ষতা দ্বারা এই যুগের কাব্যের রসমূল্য নির্ধারণ করিতে হয়। চৈতন্যদেবের আগে বা পরে সব সময়েই বৈষ্ণব সাহিত্য অতুলনীয় সম্পদ। কিন্তু ভাবের ব্যঞ্জনায় ও রসাস্বাদনের বৈচিত্র্যে এই দুই যুগের কাব্যে বেশ পার্থক্য অনুভব করা যায়।

প্রশ্ন ১৫। মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে ভাব ও রসের যে পার্থক্য আছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দাও। [ক. বি. ১৯৬১]

উত্তর। বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব সাহিত্য সমান্তরাল রেখায় চলিয়াছে; উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুইই আছে। বাংলা দেশের লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানে লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্যকীর্তন উপলক্ষে লৌকিক জীবনাশ্রয়ী কাহিনী অবলম্বনে মঙ্গলকাব্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। বাংলাদেশের সমসাময়িক সমাজজীবনের ছবি এই কাব্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্য বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত ছিল এবং এই কাব্যের কোন সাময়িক রূপ বা সামাজিক ভিত্তি নাই। ধর্মীয় প্রেরণাকে সঙ্গীতময় কাব্যকথায় প্রকাশের দিক হইতে এই দুই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

বৈষ্ণব সাহিত্যের পদাবলীগুলি রাধাকৃষ্ণের প্রেম অবলম্বনে গীতিমূলক এবং কৃষ্ণমঙ্গল জাতীয় এবং চৈতন্য জীবনীমূলক গ্রন্থগুলি আখ্যানমূলক। তবে বৈষ্ণব সাহিত্য বলিতে পদাবলী সাহিত্যই বুঝায়। ইহা কতকগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ গীতিকবিতার

সমষ্টি। পরে পদগুলি সাজাইয়া আখ্যানের সূত্রে গাঁথিয়া পালাকীর্তনের রূপ প্রদান করা হয়। পূর্বরাগ, মান, অভিসার, মাথুর প্রভৃতি পর্যায়ক্রমে পদগুলি সাজাইয়া রাধা-চরিত্রের ক্রমবিকাশ দেখাইয়া আখ্যান-কৌতূহল সৃষ্টি করা হইয়াছিল। নতুবা ইহাতে মঙ্গলকাব্যের মত সামাজিক জীবনাশ্রয়ী কোন বাস্তবধর্মী কাহিনী-কথা নাই। মঙ্গলকাব্যের অনুকরণে কৃষ্ণমঙ্গল ও চৈতন্যমঙ্গল কাব্য রচিত হইলেও ভাব ও রসের বিচারে মঙ্গলকাব্যের সহিত বৈষ্ণবসাহিত্যের দুস্তর প্রভেদ।

মঙ্গলকাব্যও বৈষ্ণবসাহিত্যের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। মঙ্গলকাব্য ঐহিকতাবাদী বৈষ্ণবসাহিত্য অধ্যাত্মবাদী। মঙ্গলকাব্যের ভক্তি লোভ ও ভয়ের সহিত মিশ্রিত, বৈষ্ণবকাব্যের ভক্তি বিশুদ্ধ প্রেম এবং ঐহিকতাবর্জিত। পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন, সর্বস্ব ত্যাগ ও অহমিকা বর্জনই বৈষ্ণবভক্তির আদর্শ। অপরপক্ষে, ধন চাই, মান চাই, মনোরমা ভার্যা চাই, বাঞ্ছিত পতি ও সুযোগ্য পুত্র চাই —এই বিরাট চাহিদাই মঙ্গলকাব্যের ভক্তি প্রেরণা। মঙ্গলকাব্যে মানুষের প্রার্থনা "ধনে পুত্রে মোর যেন বাড়ে ঠাকুরাল", "আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।" মঙ্গলকাব্য ইহকালে ঐশ্বর্য এবং পরকালে মুক্তি ও স্বর্গকামনা। কিন্তু বৈষ্ণবসাহিত্যে অহেতুকী কৃষ্ণরতিই প্রার্থনা, মুক্তিকামনা, বৈষ্ণবের কাছে 'কৈতবপ্রধান'। তাঁহারা বলেন, "ফল্গু করি মুক্তি মানি নরকের সম।" মঙ্গলকাব্য শুনাইয়াছে ঐহিক সুখ ও ঐশ্বর্যের আশ্বাসকথা, আর বৈষ্ণবকাব্য শুনাইয়াছে আত্মবিলোপের বৈরাগ বাণী। এইখানেই এই দুই কাব্য ধারায় আদর্শগত পার্থক্য।

সমাজভিত্তির বিচারে বৈষ্ণব সাহিত্যের সহিত মঙ্গলকাব্যের পার্থক্যের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে গোষ্ঠীভাবনা, সম্প্রদায়গত চেতনা এবং আত্মকেন্দ্রিকতা প্রবল থাকায় ইহাতে সমসাময়িক সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হইতে পারে নাই। বৈষ্ণবকাব্য বড় বেশি ব্যক্তিনিষ্ঠ। ইহার তুলনায় মঙ্গলকাব্য সমাজভিত্তিক এবং লোকসাহিত্যের লক্ষণাক্রান্ত। বাংলাদেশের সমস্ত অঞ্চলের কবিরাই ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের চিত্রায়ণ করিয়াছেন। তাই মঙ্গলকাব্য সর্ববঙ্গীয় জাতীয় সাহিত্যের রূপ পাইয়াছিল।

কাব্যরসের বিচার করিলেও মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে বৈষ্ণবসাহিত্যের আস্বাদ-বৈচিত্র্য অনুভব করা যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে উভয় কাব্যের ভক্তিরসের মধ্যে আদর্শগত প্রভেদটি মৌলিক এবং সেইহেতু রসাস্বাদনেরও ব্যতিক্রম। মঙ্গলকাব্যগুলিতে কাহিনী-রসের মাধ্যমে যে বাস্তবতার আস্বাদ আছে, বৈষ্ণবসাহিত্যের আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে তাহা প্রত্যাশিত নহে। বৈষ্ণবকাব্যে তত্ত্বনিরপেক্ষ রোমান্টিক প্রেমের মাধুর্য কম উপভোগ্য নয় এবং এই কাব্যের মানবিক আবেদনও উপেক্ষণীয় নহে। তবু প্রেমের ব্যঞ্জনা ও বিস্তারের জন্য যে গার্হস্থ্য পরিবেশের প্রয়োজন বৈষ্ণবকাব্যে তাহা নাই। ফুল্লরা-কালকেতু, ধনপতি খুল্লনার দাম্পত্য জীবনের যে বাস্তব পটভূমি তাহা রাধাকৃষ্ণ প্রেমে নাই। বৈষ্ণব প্রেম যেন স্বপ্নলোকের ব্যাপার, বাস্তব জগতের সহিত যোগসূত্র খুব নিবিড় নহে। বৈষ্ণবীয় সূক্ষ্মতা এবং মঙ্গলকাব্যীয় স্থূলতা উভয়ে মিলিয়া মধ্যযুগের

বাংলা সাহিত্যকে সম্পূর্ণতা দিয়াছিল। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস-লেখক মন্তব্য করিয়াছেন, "মঙ্গলকাব্যের মধ্যে ভাবরসের যে অভাব ছিল বৈষ্ণবসাহিত্য তাহা পূর্ণ করিয়াছে এবং বৈষ্ণবসাহিত্যের মধ্যে কাহিনীরসের যে অভাব ছিল তাহা মঙ্গলকাব্য পূর্ণ করিয়াছে। এই হিসাবে বৈষ্ণবকাব্যকে মঙ্গলকাব্যের পরিপূরক বলা যাইতে পারে।"

মধ্যযুগে বাংলাসাহিত্যের এই দুইটি ধারাই বাঙালীর ভাবকল্পনা ও হৃদয়-ধর্ম দ্বারা পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। বাঙালী হৃদয়ের তত্ত্বগভীরতা এবং জীবনবোধের উচ্ছলতা এই দুই কাব্যকে কেন্দ্র করিয়াই সার্থক হইয়াছিল। মঙ্গলকাব্যের জনপ্রিয়তা ছিল বেশী। কারণ এই কাব্যের আবেদন ছিল সার্বজনীন। ইহার কাহিনীরসে মানবমুখিতা থাকায় ইহার আস্বাদনের জন্য কোন দার্শনিক তত্ত্বজিজ্ঞাসার প্রয়োজন হইত না। এই কাব্যে দোষেগুণে-জড়িত গোটা মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি দেবতারাও এই কাব্যে মানব-প্রকৃতিসুলভ হিংসাদ্বেষাদির দ্বারা বিচিত্রবর্ণ হইয়া উঠিয়াছেন। মঙ্গলকাব্যের লক্ষ্যই মানুষ, দেবতা উপলক্ষ্য মাত্র। বৈষ্ণবকাব্য প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব তত্ত্বের রসভাষ্য। মানবিক অনুভূতির রূপকে অতীন্দ্রিয় প্রেমের রহস্যকথা বলাই বৈষ্ণবসাহিত্যের বিশেষত্ব। এই কাব্যের রস আস্বাদনে অন্তরঙ্গের প্রয়োজন, অধিকারিভেদ মানিতে হয়। মঙ্গলকাব্যের মত ইহা আপামর জনসাধারণের অসংস্কৃত মনের কাছে উপভোগ্য নয়। বৈষ্ণবসাহিত্য ছিল বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য, আর মঙ্গলকাব্য ছিল জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল বাঙ্গালীর জন্য।

১৬। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে যুগচেতনা ও গোষ্ঠীভাবনার অতিরিক্ত সার্বভৌম সাহিত্যচেতনা কতটা প্রকটিত হইয়াছে আলোচনা কর।

[ক বি., ১৯৬৭]

উত্তর। ইসলাম শাসনের কালকেই সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগ বলা হয়। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত কাল-সীমার মধ্যে যে বিপুল সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকেই মধ্যযুগের সাহিত্য নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। এই যুগে দেবদেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক আখ্যানকাব্যই সাহিত্যভাণ্ডারের প্রধান উপকরণ ছিল। এই সাহিত্যের নাম ছিল মঙ্গলকাব্য। বিভিন্ন দেব-দেবীর মাহাত্ম্যকথা কাব্যের বিষয় ছিল বলিয়া বিভিন্ন প্রকারের মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি হয়। ধর্মীয় চেতনা ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীভাবনাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলেও এই মঙ্গলকাব্যে ধর্মনিরপেক্ষ সর্বকালীন মানবিক রসের বিকাশ ঘটিয়াছিল। তাই সার্বভৌম সাহিত্যরূপেও মঙ্গলকাব্যের একটি স্থায়ী সাহিত্যমূল্য স্বীকৃত হইয়াছে।

মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্ভব-ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, লৌকিক ব্রতকথা এবং পাঁচালী গানের বিবর্তন ধারায় মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে পূর্ণাঙ্গ নাগরিক সাহিত্যরূপে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ঘটিলেও মেয়েলি ব্রতকথার মধ্যেই ইহার আখ্যানবীজ নিহিত ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের কোন কাব্যপুরাণ নাটকাদি হইতে ইহার আখ্যানাংশ গৃহীত হয় নাই। মানুষের পারিবারিক জীবনের বিশ্বাস, আদর্শ ও ব্যথাবেদনার ভিত্তিতেই লৌকিক জনশ্রুতিতে এই কাহিনীর প্রতিষ্ঠা।

সুতরাং এই কাহিনীগুলিতে দেবতাকে উপলক্ষ্য করিয়া জীবনের প্রতিরূপ রচনা করা হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যে দেবতার নরলীলার কথাই প্রধান। দেবখণ্ডে হরপার্বতীর কথা থাকে, সেকথাও লৌকিক কথার মত গাহস্থ্যজীবনের কাহিনী। শাপভ্রষ্ট কোন দেবতা নররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের সহায়ক হয়, স্বয়ং দেবতা স্বমূর্তিতেই মানুষকে অনুগ্রহ নিগ্রহ করিয়া থাকেন, তাঁহার চিন্তা ও আচরণ সবকিছুই মানুষের মত। সংস্কৃত পুরাণ, পাশ্চাত্ত্য Edda, Saga প্রভৃতি সাহিত্যে সংগ্রামমুখর জীবনের যে ছবি প্রকটিত সেই ছবিই মঙ্গলকাব্যকথায় পাওয়া যায়। তাই মঙ্গলকাব্যগুলি বাংলাদেশের বিশেষত্বে চিহ্নিত হইয়াও সার্বভৌম সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত।

মঙ্গলকাব্যগুলি যুগচেতনায় এবং সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীভাবনায় রচিত হইলেও ইহাদের কাহিনীঅংশ সার্বভৌম সাহিত্যকথার মতই অপূর্ব। মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগরের গল্প, চণ্ডীমঙ্গলে ব্যাধ কালকেতু ও বণিক ধনপতির বিচিত্র রোমাণ্টিক কাহিনী, ধর্মমঙ্গলে লাউসেনের রহস্যময় জীবনকথা উৎকৃষ্ট কাব্যকথার উপযোগী আখ্যান। এই কাব্যকথা বাংলাদেশের সর্বত্র পাঁচালী গানের মত প্রচারিত হইয়াছিল এবং ধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষে সবশ্রেণীর শ্রোতাবই মনোরঞ্জন করিত। কারণ মনসা, চণ্ডী, ধর্ম, শীতলা, অন্নদা, কালিকা, ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায় প্রভৃতি নানা দেবতার মাহাত্ম্যমূলক কাহিনীগুলিতে এমন কিছু মানবিক অনুভূতি ও সামাজিক চৈতন্যের পরিচয় আছে যাহা দেশকালপাত্র নির্বিশেষে নিত্যকালের সাহিত্যবস্তু হইবার উপযোগী। মঙ্গলকাব্যগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই সার্বভৌম সাহিত্যলক্ষণ আছে।

মনসামঙ্গলে চাঁদসদাগরের কাহিনীর ধর্মনিরপেক্ষ পৃথক সাহিত্য মূল্য আছে। চম্পকনগরের ধনী বণিক চাঁদসদাগর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাহার অনমনীয় পৌরুষ, সাহস ও সহনশীলতা মহাকাব্যের নায়কের যোগ্য গুণাবলী। বেহুলার সতীত্ব ও সনকার মাতৃত্ব শ্রেষ্ঠ কাব্যের উপযোগী বিষয়। এই কাহিনীতে দেবমহিমার অলৌকিক অংশ অতিক্রম করিয়াও নিত্যকালের মানবিক রস পাঠকহৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। মনসার ভাসান গান এবং পূর্ববঙ্গের রয়ানী গান জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর বাঙালীরাই আদরের সঙ্গে শ্রবণ করিয়া থাকে। লক্ষ্মীন্দরের অকাল মৃত্যুর শোকোচ্ছ্বাস এবং আশ্চর্য পুনর্জীবন লাভ মধ্যযুগের বাঙালী সমাজকে চমৎকৃত করিয়াছিল। মনসার পূজা প্রচার হইল কিনা তাহা সাধারণ শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ ততটা করে না, যতটা করে মানবিক অনুভূতির আবেগ। চাঁদসদাগরের কঠোরতা ভক্তির উত্তাপে বিগলিত হয় নাই, দ্রবীভূত হইয়াছিল স্নেহের উত্তাপে। মানবিক রসের ব্যঞ্জনার জন্যই মনসামঙ্গল শাশ্বত সাহিত্য।

চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলের সাহিত্যরসের মূলাধারও মানবিকতা। মুকুন্দরাম ও রূপরাম তাঁহাদের কাহিনীর মধ্যে মানবিকতার শাশ্বত পরিচয় ফুটাইয়া তুলিয়া মঙ্গলকাব্যকে প্রকৃত সাহিত্যের স্তরে উন্নীত করিয়াছেন। চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতু উপাখ্যান এবং ধনপতি উপাখ্যান সমাজজীবনের পরিপ্রেক্ষায় রচিত লৌকিক কাহিনী। এই কাহিনীর মধ্যে বাঙালীজীবনের গার্হস্থ্যরস কাব্যরসের উপাদান

হইয়াছে। কালকেতু, ফুল্লরা, মুরারি শীল, ভাড়ুদত্ত, বুলান মণ্ডল প্রভৃতি চরিত্র নিত্য-কালের সাহিত্যের বাস্তবচিত্র। খুল্লনা ও লহনার সঙ্গে ধনপতি সদাগরের দাম্পত্যজীবন একটি সুস্পষ্ট বাস্তবধর্মী চিত্র, তেমনি তাহার বিদেশযাত্রা, বন্দিত্ব এবং পুত্রের দুঃসাহসিক অভিযানের ফলে মুক্তিলাভ একটি কৌতূহলোদ্দীপক রোমান্টিক আখ্যান। ধর্মীয় প্রেরণায় রচিত দেবভক্তিমূলক কাহিনীর মধ্যে নিত্যকালের মানবিক রস উচ্ছলিত হইয়া উঠায় এই কাব্য শাশ্বত সাহিত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ধর্মমঙ্গল ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যকথা বিষয়ক হইলেও ইহা মুখ্যতঃ একখানি রোমান্টিক কাব্য। পাশ্চাত্ত্য Edda এবং Saga সাহিত্যের মতই ইহার রসের আবেদন। এই কাব্যের রঞ্জাবতী, কলিঙ্গা, কানাড়া প্রভৃতি নারীচরিত্র উৎকৃষ্ট আখ্যানকাব্যের নায়িকার যোগ্য। মহামদের কপট ষড়যন্ত্র, ইচ্ছাই ঘোষের বিদ্রোহ, লাউসেনের অভিযান, লখাই ও কালুডোমের প্রভুভক্তি ও কর্তব্যনিষ্ঠা—এই সমস্ত মানবিকতার রসে ধর্ম-মঙ্গল সমৃদ্ধ কাব্য। ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যকে অতিক্রম করিয়াও মানবিক অনুভূতির আবেগ এই কাব্যকথাকে সাহিত্য-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সাম্প্রদায়িক ধর্মের গোষ্ঠীচেতনা থাকা খুবই স্বাভাবিক। কবিগণ আপন আপন দেশ ও কালকে কাব্যের মধ্যে প্রতিফলিত করিয়া যুগচেতনার পরিচয়ও প্রস্ফুট করিয়াছেন সন্দেহ নাই। তবু একথা অনস্বীকার্য যে এই কাব্য-ধারায় কাহিনী-অংশে সার্বভৌম সাহিত্যচেতনা ছিল। নতুবা ধর্মসম্প্রদায়গুলি বিলুপ্ত হইবার বহুকাল পরেও এই কাব্যগুলি জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল কাব্যরসিকের আলোচনার বিষয় হইত না।

প্রশ্ন ১৭। শৈব-সিদ্ধাচার্যদের গাথাগুলির পরিচয় দাও। ইহারা কোন্ জাতীয় কাব্য? ইঁহাদের গাথায় ধর্মীয় আদর্শের কি বৈশিষ্ট্য আছে তাহা দেখাও।

উত্তর। শৈব সিদ্ধাচার্যদের কাহিনী অতি প্রাচীন। কিন্তু যে গাথাগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা বলিয়াই পণ্ডিতদের অনুমান। বৌদ্ধধর্মের অবসানকালে লোক তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্যদের আবির্ভাব ঘটে। ইঁহাদের মধ্যে একটি সম্প্রদায়কে যোগী বা নাথপন্থী বলা হইত। গোরক্ষনাথ, মীননাথ ও জলন্ধরী-নাথ প্রভৃতি সিদ্ধাচার্যদের প্রসঙ্গ খ্রীষ্টীয় নবম-দশম শতাব্দীতে সুপ্রচলিত ছিল। ইঁহারা অনেকেই তৎকালীন সমাজে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। চুরাশি জন সিদ্ধাচার্যের কথা তান্ত্রিক গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত আছে। ইহাদের গুহ্য সাধন-প্রণালী বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়া নানা ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে।

সিদ্ধাচার্যদের সম্বন্ধে নানা কাহিনীও আছে। অনেকের মতে মীননাথ এবং চর্যাপদের লুই পা একই ব্যক্তি। কৃষ্ণাচার্য বা কানুপার গুরু ছিলেন জালন্ধরীনাথ। ইনিই নাথ সাহিত্যে হাড়ি পা নামে খ্যাত বলিয়া মনে হয়। মীননাথের শিষ্যের নাম গোরক্ষনাথ। এই সমস্ত সিদ্ধাচার্য একদা সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। ওড়িয়া, হিন্দী, গুজরাটি, মারাঠি ভাষার লোকসাহিত্যেও এই সমস্ত সিদ্ধাচার্যের প্রসঙ্গ আছে।

বাংলাদেশে এইসব সিদ্ধাচার্যের কাহিনী লইয়া ছড়া-গান প্রভৃতি পূর্বেও ছিল কিন্তু লিখিত কাব্যরূপে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে পাওয়া যায় নাই। ইঁহাদের কাহিনী দুইভাগে পাওয়া গিয়াছে। একটি গোরক্ষনাথের কাহিনী, আর একটি ময়নামতী বা গোপীচাঁদের কাহিনী। এই দুইটি কাহিনীই সাধারণ লোকগাথার মত গায়কেরা গাহিয়া বেড়াইতেন—কোন উচ্চতর কবি-প্রতিভার সংস্পর্শে প্রণালীবদ্ধ কাহিনীকাব্য হইয়া উঠে নাই। অনুবাদ সাহিত্য বা মঙ্গলকাব্য যেরূপ পাঁচালী জাতীয় কাহিনীকাব্য এবং সুনির্দিষ্ট রূপকল্পনানুসারে রচিত, সিদ্ধাচার্যদের গাথাগুলি সেরূপ নয়। এই গাথাগুলির কোন সুনির্দিষ্ট রচয়িতাও নাই বলিয়া মনে হয়। গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতন নামে যে কাব্য পাওয়া গিয়াছে তাহার পুঁথিতে নানা-রকম ভণিতা। কোন পুঁথিতে ভীমসেন, কোন পুঁথিতে শ্যামদাস সেন, কোথাও কবীন্দ্র দাস। মুন্সী আব্দুল করিম যে তিনখানি পুঁথি পাইয়াছেন তাহাতে শেখ ফয়জুল্লার ভণিতা দেখা যায়। ইহাতে মনে হয়, লোকসাহিত্যের মত এই কাব্যকথা নিজের রচয়িতাকে হারাইয়া বসিয়া আছে এবং পালাগায়কেরা নিজ নিজ নামে ভণিতা দিয়াছেন। ময়নামতীর কাহিনীরও প্রকৃত রচয়িতার নাম পাওয়া যায় নাই। পুঁথিগুলিতে ভবানীদাস, দুর্লভ মল্লিক এবং সুকুর মামুদের ভণিতা পাওয়া যায়। এগুলি নামহীন লেখকদের ব্যাল্যাড জাতীয় লোকগাথা; গ্রামবাংলার সমাজে অপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল।

গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতন কাব্যখানির কাহিনী বড় রহস্যময়। শিষ্য গোরক্ষনাথ তাঁহার যোগভ্রষ্ট গুরু মীননাথের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন। মীননাথ একটি রুইমাছের রূপ ধরিয়া জলতলে থাকিয়া হর-পার্বতীর গোপনতত্ত্ব শ্রবণ করেন। পার্বতী ইহা জানিতে পারিয়া মীননাথ এবং তাঁহার সম্প্রদায়কে অভিশাপ দিলেন। মীননাথকে বলিলেন, "কদলীর দেশে তুমি চলহ সত্বর ॥ ষোলশত নারী লৈয়া কর গিয়া কেলি।" হাড়িপাকে বলিলেন, "হাড়ি হৈয়া চল তুমি মৈনামতীর ঘর। হাতে ঝাড়ু লহ তুমি কান্ধেতে কোদাল।" কানুপাকে বলিলেন, "তুরমনে চলি যাও ডাহুকা হইয়া।" এই প্রকার অভিশাপ অবলম্বনেই সিদ্ধাচার্যদের গাথা সৃষ্টি হইয়াছে। মীননাথের অভিশাপে গোরক্ষবিজয় এবং হাড়িপার অভিশাপে ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের কাহিনী।

গোরক্ষনাথ চরিত্রবলে অসাধারণ সংযমের পরিচয় দিয়াছিলেন। পার্বতী রূপসীর ছদ্মবেশ ধরিয়াও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার গুরু মীননাথ নারী প্রাধান্যের দেশ কদলীতে গিয়া মঙ্গলা ও কমলা নামে দুইটি নারী লইয়া ইন্দ্রিয়ভোগে মত্ত হইয়া রহিলেন। বিন্দুনাথ নামে তাঁহার একটি পুত্র জন্মিল। কানুপার নিকট এই সংবাদ পাইয়া গোরক্ষনাথ গুরুকে উদ্ধার করিতে গেলেন। কিন্তু সে রাজ্যে সন্ন্যাসীর প্রবেশ নিষেধ।

বুড়া যোগী পাইলে চোপাড়ে ভাঙ্গে গাল।
গাভুর যোগী পাইলে তুলিয়া দেয় শাল।

আধবয়সী যোগী পাইলে মধ্যখানে কাটে।
পোলা যোগী পাইলে পাটাত তুলি বাটে।

এই অবস্থায় গোরক্ষনাথ নর্তকীর ছদ্মবেশে কদলীতে গিয়া মাদল বাজাইয়া গান ধরিল। মীননাথ তাহা শুনিয়া নর্তকীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

নাট কর নাটুয়া তাল বাহ ছলে।
তোমার মাদল কেন 'গুরু গুরু' বলে।

তখন গোরক্ষনাথ—মাদলের সানে কথা গুরুরে বুঝাই।

নাচেন্ত যে গোর্খনাথ ঘাঘরের রোলে।
কায়া সাধ কায়া সাধ মাদলেতে বোলে।

ইহার পর গুরুর চৈতন্য সম্পাদিত হইল। তিনি বিষয়ভোগ ত্যাগ করিয়া শিষ্যের সঙ্গে কায়াসাধন করিতে চলিয়া গেলেন। ইহাই গোরক্ষবিজয়ের মর্মকথা।

ময়নামতীর কাহিনী সিদ্ধাচার্যদের দ্বিতীয় অদ্বিতীয় গাথা। ইহার মধ্যে মহাকাব্যের মহিমা আছে। ময়নামতী তাহার ভোগলুব্ধ স্বামীকে আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য হাড়িপাব শিষ্যত্ব গ্রহণ কবিতে বলেন। স্বামী সে কথা গ্রাহ্য না করায় তাহার মৃত্যু হয়। বালকপুত্র গোপীচাঁদকে সিংহাসনে বসাইয়া রাণী স্বয়ং রাজ্য পরিচালনা করিতেন। গোপীচাঁদেব বিবাহ হইল।

অদুনাকে বিয়া কৈল পদুনাকে পাইল দানে।
ষোল শত দাসী পাইল ব্যাভার কারণে।

নারী বেষ্টিত অন্তঃপুরে গোপীচন্দ্র ভোগমত্ত হইল। ময়নামতী চিন্তিত হইলেন এবং গোপীচাঁদকে হাড়িপার কাছে দীক্ষা দিয়া দ্বাদশ বৎসরের জন্য ব্রহ্মচর্য পালনে বাধ্য করিলেন। গোপীচাঁদ সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া গুরুর সঙ্গে দেশান্তরী হইল। দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপস্যায় গোপীচাঁদেব চিত্তশুদ্ধি হইল এবং বহুপ্রলোভন জয় করিয়া, বহু দুঃখ ভোগ করিয়া গোপীচাঁদ দেশে ফিরিলেন। এই কাহিনী কবিরা গভীর সাধনতত্ত্ব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানবিক রসে নিষিক্ত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা কায়াসাধন করিয়া দীর্ঘজীবী ও সুখী হওয়ার তত্ত্বকথাই সিদ্ধাচার্যদের কাহিনীর বিশেষত্ব। একটি বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের সাধনপ্রণালীর তাৎপর্য পরিস্ফুট করিবার জন্যই কবিরা ইতিহাস ও প্রবাদ-মিশ্র লোকগাথারূপে এই কাহিনীকে জনপ্রিয় রূপ প্রদান করিয়াছিলেন। এই গাথা শুধু উত্তর বঙ্গ অঞ্চলেই নয়, উত্তর ভারতেও ইহার প্রসার ঘটে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনারূপে প্রাপ্ত এই গাথাগুলি বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারের মূল্যবান সম্পদ বলিয়াই গণ্য।

প্রশ্ন ১৮। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে ধর্মাশ্রিত নয় এমন কাব্যধারা কোথায় কিভাবে সৃষ্ট হইয়াছিল তাহার বিবরণ আলোচনা কর। [ক. বি., ১৯৬৪]

অথবা, "সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলাসাহিত্যের গতানুগতিকতা ভঙ্গ করিয়াছিলেন কয়েকজন মুসলমান কবি।" আলোচনা কর। [ক. বি., ১৯৬৮]

উত্তর। অন্যান্য দেশের সাহিত্যের মতই বাংলা সাহিত্য সুপ্রাচীন কাল হইতেই ধর্মাশ্রিত। চর্যাপদ, বৈষ্ণবসাহিত্য, অনুবাদ ও মঙ্গলকাব্যগুলি সবই ধর্মীয় প্রেরণায় এবং দেবমাহাত্ম্য প্রকাশের প্রয়োজনে রচিত হইয়াছিল। বিশুদ্ধ মানবিক আবেগ ও লৌকিক প্রেরণা অবলম্বনে কিছু কিছু সাহিত্য গৌড় দরবার এবং রোসাঙ্ রাজসভাকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা সাহিত্যের পুষ্টি বিধান করিয়াছিল। ইহা ছাড়া লোকসাহিত্য-রূপে কিছু গীতিকাসাহিত্য (ballad) পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহ অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আঞ্চলিক ভূস্বামীদের অনেকেই সাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের দেশে প্রচুর সাহিত্য রচিত হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় মোগল শাসন যেমন আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিত না, তেমনি সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্যও কোন প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা করে নাই। তথাপি গৌড় দরবার ও আরাকান রাজসভার রাজা ও রাজকর্মচারীদের উৎসাহে নানা দিক হইতে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ঘটে। হোসেন শাহের পৌত্র সুলতান ফিরোজ শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় কবি শ্রীধর বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে কাব্য লেখেন। এই প্রণয়কথা ধর্মীয় আখ্যান নহে। পরবর্তীকালে কবি ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ ধর্মীয় সূক্ষ্ম আবরণ দিয়া এই কাহিনীকে কালিকামঙ্গল নামে অভিহিত করেন। কাশ্মীরী কবি বিহ্লণ চৌর পঞ্চাশিকা কাব্যে বিদ্যা ও সুন্দরের গোপন প্রণয়কথা লিখিয়াছিলেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলে সাবিরিদ খাঁর লেখা এই কাব্যকথা পাওয়া গিয়াছে। কথিত হয়, কঙ্ক নামক একজন কবি ধর্ম-সম্পর্ক বর্জিত এই প্রণয়কথার কাব্যরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। ধর্মের নির্মোক না পরাইলে সে যুগের কাব্যের সমাদর হইত না তাই বহু প্রতিভাবান কবি লৌকিক বিষয় লইয়া কাব্যরচনায় উৎসাহবোধ করিতেন না।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ধর্মাশ্রিত নয় এমন কাব্যধারা বিকাশ লাভ করে আরাকান রাজসভায়। এই রাজসভার অপর নাম ছিল রোসাং। এই অঞ্চল ছিল মগদস্যুদের আড্ডা। রাজা ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী কিন্তু রাজকর্মচারীদের অধিকাংশই ছিল ইসলাম ধর্মাবলম্বী। ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে থিরি-থু-ধম্মা (শ্রীসুধর্মা) রাজা হইয়া সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁহার লস্কর উজির আশরফ খাঁ ধর্মবিশ্বাসে সুফী ছিলেন এবং তাঁহার উৎসাহে ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামের কবি দৌলৎ কাজি 'লোরচন্দ্রাণী' নামে একখানি প্রণয়কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। কাব্যখানি 'সতী ময়না' নামেও পরিচিত। গোহারী দেশের রাজা লোরএর পত্নীর নাম ছিল ময়না। ইনি স্বামি-পরিত্যক্তা হইয়া প্রচণ্ড প্রলোভনের মুখেও সতীত্ব ধর্ম হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হন নাই। মোহরা দেশের রাজকন্যা চন্দ্রাণীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া লোর ময়নাকে ত্যাগ করে। এই কাহিনীকে দৌলৎ কাজি সম্পূর্ণতা দিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর থদো-মিন্তারের রাজত্ব কালে কবি আলাওল কাব্যখানিকে সম্পূর্ণ করেন।

আরাকান রাজসভার অনুগ্রহপুষ্ট কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন আলাওল। তাঁহার জীবনকাহিনী বিচিত্র, তাঁহার কাব্যরচনাও বিশিষ্ট। চট্টগ্রামের কবি আলাওল পিতার সহিত নদীপথে যাত্রাকালে জলদস্যুকর্তৃক আক্রান্ত হন, পিতা নিহত হয়

এবং আলাওল দাসরূপে আরাকানে বিক্রীত হন। ক্রমে তিনি রাজামাত্য মাগন-ঠাকুরের স্নেহভাজন হন। অশ্বারোহণ কৌশলে দক্ষতা দেখাইয়া তিনি সৈন্যদলে যোগ দিলেন, রাজরোষে পতিত হইয়া কারাদণ্ডও ভোগ করেন। পরে তাঁহার প্রতিভার যথার্থ পরিচয় ফুটিয়া উঠিল কবিরূপে। মাগনঠাকুরের নির্দেশে তিনি দৌলৎ কাজির অসমাপ্ত কাব্য লোরচন্দ্রাণী সমাপ্ত করেন এবং রোসাঙ্ রাজসভায় "তালিম আলিম" বলিয়া সমাদর লাভ করেন। তাঁহার জীবন উপন্যাসকাহিনীর মতই রোমাঞ্চকর।

আরাকানে যখন থিরি-সান্দ থুধম্মা (শ্রীচন্দ্র সুধর্মা) রাজত্ব করেন তখন তাঁহার প্রধান অমাত্য ছিলেন সুলেমান। আলাওল সুলেমানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। আলাওল লিখিয়াছিলেন, "শ্রীযুক্ত সুলেমান মহাগুণবন্ত। পরদেশী গুণী পাইলে আদরে পোষেন্ত॥" রাজানুগ্রহে আলাওল কাব্যরচনার চমৎকার প্রেরণা পাইলেন। মালিক মুহম্মদ জায়সীর হিন্দী কাব্য 'পদুমাবৎ' এর অনুকরণে আলাওল মাগনঠাকুরের নির্দেশে 'পদ্মাবতী' কাব্য লেখেন। আলাউদ্দিন কর্তৃক চিতোর আক্রমণ এবং রাণী পদ্মিনীর জহরব্রত অবলম্বনে এই ঐতিহাসিক কাব্যখানি লিখিত হয়। পারস্যোপন্যাস অবলম্বনে 'সয়ফুল-মুল্‌ক-বদিউজ্জমাল' নামক প্রণয়কাব্য রচনা করেন। রাজসেনাপতি সৈয়দ মহম্মদের অনুরোধে লেখেন 'হপ্তপয়কর'। এই কাব্যখানিও সাতটি প্রেমের গল্প। স্বয়ং রাজার আদেশে লেখা হয় "সেকেন্দরনামা"। ফার্সী কবি নিজামীর কাব্যানুসারে আলেকজান্দারের বিজয় অভিযান অবলম্বনে এই ঐতিহাসিক কাব্য লিখিত হইয়াছিল। আলাওলের 'তোহ্‌ফা', 'নবীবংশ' প্রভৃতি কাব্য ধর্মাশ্রিত সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ রচনাই জীবনাশ্রয়ী বিশুদ্ধ কাব্য, ধর্মনীতি প্রতিপাদন উহার উদ্দেশ্য নহে। তিনি ছিলেন প্রেমের কবি। 'পদ্মাবতী' কাব্যে প্রেম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—

প্রেম বিনে ভাব নাহি ভাব বিনে রস।
ত্রিভুবনে যত দেখ প্রেম হস্তে বশ॥
যার হৃদে জন্মিলেক প্রেমের অঙ্কুর।
মুক্তিপদ পাইল সে সবার ঠাকুর॥

আরাকানী সাহিত্যের প্রভাবে লৌকিক জীবন এবং মানবিক প্রেম অবলম্বনে ধর্ম-নিরপেক্ষ সাহিত্য বঙ্গ অঞ্চলেও বেশ সমাদৃত হয়। বহু মুসলমান কবি আরব্য ও পারস্য উপন্যাসের বহু প্রেমকাহিনী লইয়া বহু কাব্য রচনা করেন। গোলে বোকাওলি, লয়লা-মজনু, শিরি-ফরহাদ, ইউসুফ-জুলেখা প্রভৃতি প্রেমকাহিনী কাব্যের বিষয়বস্তু হইয়াছিল। আরবদেশের খলিফাদের বিষয় লইয়া বিশেষতঃ কারবালা কাহিনীর মর্মভেদ বিষয় অবলম্বনে কয়েকখানি করুণরসাত্মক কাব্যও রচিত হয়। বর্গীর আক্রমণ লইয়া মহারাষ্ট্র পুরাণ নামক কাব্য লেখেন গঙ্গারাম। ধর্মীয় নির্মোক পরাইয়া দিলেও কাব্যখানি বাস্তব-ইতিহাসমূলক। অষ্টাদশ শতাব্দীর অধিকাংশ সাহিত্যেই ধর্মীয় আবরণটা অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং কৃত্রিম।

পূর্ববঙ্গে ও মৈমনসিংহ অঞ্চলের যে লোকগীতিকাগুলি সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে লৌকিক জীবন এবং মানবিক প্রেমই সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য। মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, লীলা, মদিনা প্রভৃতি গ্রাম্য নারীদের প্রেমজীবন অবলম্বনে যে গাথা সাহিত্য রচিত হইয়াছিল তাহাতে কোন ধর্মসম্প্রদায়ের কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। এমন কি, হিন্দু মুসলমানের কোন বিভেদরেখাও কোন নারীর চরিত্রে ও কাহিনীতে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। লোকজীবনের মধ্য হইতে অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মেই ধর্মাশ্রিত নয়, এমন সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল।

প্রশ্ন ১৯। অষ্টাদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যে ও অনুবাদসাহিত্যে প্রাচীনযুগের ভক্তিবাদ ও ভাবকল্পনা কতটা রক্ষিত হইয়াছিল তাহা ঐ শতাব্দীর কয়েকখানি কাব্য আলোচনা করিয়া বুঝাইয়া দাও।

উত্তর। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দী অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে অবক্ষয়ের যুগ। মুসলমান-শাসন অবসিত প্রায়, ইংরাজ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, এইরূপ একটি যুগসন্ধিক্ষণে উন্নতস্তরের সাহিত্য-প্রতিভার অভ্যুদয় হইতে পারে নাই। অধিকাংশ কবি পুরাতনের অনুবৃত্তি করিয়াছেন, প্রাচীন কাব্যধারার দুর্বল অনুকরণের চেষ্টা করিয়াছেন। সমাজজীবনে যে নৈতিক অধঃপতন ও রুচিবিকার দেখা গিয়াছিল সাহিত্যে তাহার প্রতিফলন ঘটে। প্রাচীন যুগের ভক্তিবাদ ও ভাবকল্পনার মহত্ত্ব এই যুগের সাহিত্যে প্রত্যাশিত ছিল না।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রোসাঙ্ রাজসভাকে কেন্দ্র করিয়া যে বাংলাসাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা ধর্মমূলক ও দেবমাহাত্ম্যজ্ঞাপক সাহিত্য নয়। লৌকিক প্রেমের রোমান্টিক কাহিনী লইয়াই দৌলৎ কাজির লোরচন্দ্রাণী, আলাওলের পদ্মাবতী, হপ্তপয়কর প্রভৃতি কাব্য রচিত হয়। উহার প্রভাব গৌড় দরবারকেও প্রভাবিত করে। বাংলাদেশের ভূস্বামিগণের পৃষ্ঠপোষকতায় যে সাহিত্য গড়িয়া উঠে তাহাতে ধর্মের কিঞ্চিৎ প্রলেপ থাকিলেও ভক্তিবাদ ও নৈতিকতার মান উচ্চ ছিল না। ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর বাংলার নবাবী আমলে বিলাসী ধনিকগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। ইংরাজ বণিকদের উৎকোচে শাসনকর্তৃত্বের মধ্যে রুচিহীনতা ও ভোগপরায়ণতার প্রাধান্য ঘটে। এই সময় বাংলা সাহিত্যচর্চায় ভাঁটা পড়িয়াছিল। নূতন ধরনের প্রতিভাদীপ্ত রচনা ছিল না। শিবায়ন কাব্যের রামেশ্বর এবং অন্নদামঙ্গলের ভারতচন্দ্র ছাড়া কোন উল্লেখযোগ্য কবির পরিচয় এই যুগের সাহিত্যকে বিশিষ্ট করে নাই। বৈষ্ণবসাহিত্য, অনুবাদ বা মঙ্গলকাব্য—কোন ধারায়ই উন্নত ভাবকল্পনা বা ভক্তিরসের নিবিড়তা ফুটিয়া উঠে নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবসাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় যে, পদরচনার ভঙ্গি অত্যন্ত দুর্বল ও গতানুগতিক। বৈষ্ণব রস-শাস্ত্রের আলঙ্কারিক বিভাগ এবং রস-পর্যায় অনুসরণ করিয়া কৃত্রিম কাব্যকলায় কবিরা মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। এই যুগের বিশিষ্টতা ছিল পদ সংগ্রহ। গোকুলানন্দ সেন বা বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু সংকলিত হয়। রাধামোহন ঠাকুর পদামৃত সমুদ্র সংকলন করিয়া বাংলা পদের সংস্কৃত টীকা রচনা করিলেন। গৌরসুন্দর দাসের কীর্তনানন্দ, কমলাকান্ত দাসের পদরত্নাকর প্রভৃতি

পাণ্ডিত্য প্রকাশের উপযোগী সংকলন। হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তিপ্রকাশ অপেক্ষা সুর-তাললয়ের শুদ্ধতার নির্দেশ করিয়া বৈদগ্ধ্য প্রকাশ করাই সংকলয়িতাদের উদ্দেশ্য ছিল।

এই সময় কয়েকজন কবি কৃষ্ণমঙ্গল জাতীয় কাব্যও রচনা করেন। অভিরাম দাসের গোবিন্দবিজয় কাব্যে ও কবিচন্দ্রের ভাগবতামৃত গ্রন্থে কৃষ্ণভক্তির নিবিড়তার অভাব। বরং কৃষ্ণ সম্বন্ধে নানা কৌতুকপূর্ণ অপৌরাণিক গল্পকথা জনরুচির তৃপ্তি সাধন করিয়াছিল। রাধা ও কৃষ্ণ লুকোচুরি খেলিতেছেন, কৃষ্ণ গেণ্ডুয়া ও হা-ডুডু খেলিতেছেন, ছিদ্রযুক্ত কলসীতে জল আনিয়া রাধা কলঙ্কভঞ্জন করিতেছেন, কৃষ্ণ চকিতে কালী সাজিয়া রাধার মান রক্ষা করিতেছেন—এই সব কৌতুকপূর্ণ গল্পকথাই কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের উপাদান হইয়াছিল। ফলে প্রাচীন যুগের ভক্তিবাদ ও ভাব-কল্পনার খুবই অভাব দেখা যায়। এই সময় বৈষ্ণব নিবন্ধসাহিত্যে দার্শনিক বিচার হইয়াছিল এবং বৈষ্ণব মোহান্তদের জীবনীমূলক কিছু গ্রন্থও রচিত হয়। বংশীশিক্ষা, বিবর্তবিলাস, চৈতন্যরত্নাবলী, প্রেমবিলাস, নরোত্তম বিলাস, ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থ বৈষ্ণব ধর্মদর্শন এবং বৈষ্ণব আন্দোলন সম্বন্ধেই সীমাবদ্ধ ছিল।

এই যুগের অনুবাদসাহিত্যের মধ্যেও পূর্বতন ভক্তিবাদের নির্মল ধারাটি প্রবাহিত হয় নাই। অনুবাদকেরা মূল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অলৌকিক বর্ণনার বর্ণাঢ্যতার দিকেই বেশী মনোযোগী হইয়াছেন। পূর্বে উল্লিখিত কৃষ্ণমঙ্গল জাতীয় কাব্যগুলি আসলে ভাগবতেরই অনুবাদ; কিন্তু ভগবানে ভক্তি অপেক্ষা কাব্যকলার কৌশল এবং কৌতুকরস পরিবেশনের দিকেই কবিরা অধিকতর মনোযোগী হইয়াছিলেন। রামায়ণ ও মহাভারত কাব্যের যে অনুবাদ হইয়াছে তাহাতে বিশুদ্ধ ভক্তির প্রকাশ নাই, লৌকিক গল্পকথার প্রাধান্য। কবিচন্দ্র নামে রামায়ণ রচয়িতা শিবরামের যুদ্ধ, ভস্মলোচনের ও মহীরাবণের পালা প্রভৃতি বর্ণনায় বেশী উৎসাহী। জগৎরাম রায় (১৭৯১) ভক্তিভাব লইয়া 'অদ্ভুত আশ্চর্য রামায়ণ' লেখেন নাই। রামানন্দ যতি (১৭৬৬) নিজেকে বুদ্ধের অবতার বলিয়াছিলেন, আরও জানাইয়াছেন যে জগন্নাথ কাষ্ঠমূর্তিমাত্র, তাহার সেবা নিরর্থক। "বৃথা কাষ্ঠ সেবি কাল কাটা নয় ভাল।" রামানন্দ তাঁহার কাব্যে পূর্ববর্তী কবি মুকুন্দরামের সমালোচনাও করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাধাকান্ত মিশ্র 'শ্যামার মঙ্গল' কাব্যে প্রাচীন ভক্তিভাব ও অন্ধ বিশ্বাসের প্রতি বিদ্রূপ বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন।

দেখা যাইতেছে যে প্রাচীন যুগের সেই অন্ধভক্তি এবং দেবতাদের অলৌকিক শক্তিতে অন্ধবিশ্বাস কবিগণ আর সরলভাবে মানিয়া লয়েন নাই। ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগ প্রতিনিধি কবি। তাঁহার রচিত অন্নদামঙ্গল কাব্য, চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গলের মত ভক্তি-প্রণোদিত রচনা নয়। তাঁহার কাব্যখানি লৌকিক জীবনের কাহিনী। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার যে অন্নদার অনুগ্রহ পাইয়াছিলেন, কবি তাহাই কাব্যকলার কৌশলে বলিয়াছেন। তাঁহার কালিকামঙ্গল কাব্য বিদ্যা ও সুন্দরের লৌকিক প্রণয় কথা; ধর্মীয় আবরণটা নিতান্তই বাহ্যিক। বস্তুতঃ এই যুগের কাব্যধারায় ভক্তি ও বিশ্বাসের শিথিলতা, বিলাসব্যসনে অভ্যস্ত

সমাজের কলুষিত রূপ, আদিরস ও হাস্যের প্রাধান্য কবি-প্রেরণাকে বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই যুগের কাব্যে যেমন কৃত্রিম কাব্যকলার কৌশল এবং আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য সেই রকম বৈশিষ্ট্য ষোড়শ শতাব্দীর কাব্যধারায় প্রকট হয় নাই।

প্রশ্ন ২০। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলা রচনাকে কিভাবে এবং কতটা প্রভাবিত করিয়াছিল তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শন কর। [ক. বি., ১৯৬৪]

উত্তর। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলা কাব্য চূড়ান্ত সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সূচিত অনুবাদসাহিত্য, মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করে। এই সমৃদ্ধির মূলে সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যের প্রভাব নিতান্ত উপেক্ষণীয় ছিল না। অনুবাদকদের অনেকেই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন, মঙ্গলকাব্যের রচয়িতারা কাহিনীর মধ্যে সংস্কৃত পুরাণ ও কাব্য হইতে নানা প্রসঙ্গের উপস্থাপনা করিতেন এবং মহাজন পদকর্তারা প্রায় সকলেই ভাগবতাদি বৈষ্ণব শাস্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন। কাব্যের গঠনপ্রণালী এবং বিষয়বিন্যাসে সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যের অনুসারিতা লক্ষ্য করা যায়।

রামায়ণ ও মহাভারত সর্বাপেক্ষা বেশি জনপ্রিয় ছিল। ভাগবতের অনুবাদেও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ উৎসাহী ছিলেন। ভারতীয় সাহিত্যের স্তম্ভস্বরূপ এই গ্রন্থত্রয়ী স্পষ্টতঃ সংস্কৃত শাস্ত্র-প্রভাবিত। কবীন্দ্র পরমেশ্বর জৈমিনি ভারত অবলম্বন করেন। তাঁহার গ্রন্থে মহাভারতের দ্রোণ পর্বের শেষে যে রুদ্রস্তব আছে তাহার উল্লেখ আছে। পরাগলপুত্র ছুটি খাঁয়ের নির্দেশে শ্রীকর নন্দী যে মহাভারত লেখেন তাহাতে সংস্কৃত-সাহিত্য হইতে তিনি যৌবনাশ্ব, নীলধ্বজ-জনা, অনুশাল্ব, সুধন্বা এবং সুরথের কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন। ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে রাঢ়ের কবি রামচন্দ্র খান মহাভারত রচনায় জৈমিনীয় সংহিতার মর্মানুবাদ করেন। এই সময়েই পীতাম্বর নামক একজন কবি ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ অবলম্বনে ঊষা-অনিরুদ্ধ এবং নল-দময়ন্তী কাহিনী লেখেন। ইনি মার্কণ্ডেয় পুরাণ কাহিনীও বাংলায় লিখিয়াছিলেন। কামতা রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু কবি সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যের প্রভাবে কাব্য রচনা করেন। ইঁহাদের মধ্যে শঙ্করদেব খুব উল্লেখযোগ্য। তাঁহার 'রামবিজয়-নাটক' গ্রন্থখানিতে সংস্কৃত প্রভাবের পূর্ণ পরিচয় আছে।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেখা যায় যে প্রত্যেক কবি দেবখণ্ড অংশে সংস্কৃতসাহিত্যের স্পষ্ট অনুসরণ করিয়াছেন। চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীর ইঙ্গিত পাওয়া যায় বৃহদ্ধর্ম পুরাণে। এই কাব্যের প্রধান কবি মুকুন্দরাম দেবকাহিনী বর্ণনায় সংস্কৃতসাহিত্যের দ্বারস্থ হইয়াছেন। শিবের তপস্যা, মদনভস্ম, রতিবিলাপ ও পার্বতীর তপস্যা প্রভৃতি রচনায় কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের সুস্পষ্ট প্রভাব আছে। সংস্কৃত স্মৃতিশাস্ত্রের প্রভাবে যে সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলির যে বিধিনিষেধ প্রবর্তিত হইয়াছিল মঙ্গলকাব্যগুলির সমাজচিত্র তাহা দ্বারা বেশ প্রভাবিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা অযৌক্তিক নয়। সংস্কৃত পুরাণ কাহিনীর বহু উল্লেখ

মঙ্গলকাব্যের যত্রতত্র পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গলে লাউসেন-মহামদের বিরোধ কৃষ্ণ-কংসের বিরোধের অনুরূপ। লাউসেন-কর্পূরসেন লবকুশের ছায়ায় রচিত এবং লাউসেনের মায়ামুণ্ড প্রসঙ্গটিতে রামায়ণ কাহিনীর প্রভাব অনুমান করা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর শিবমঙ্গল কাব্যে এবং শ্রীধরের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে সংস্কৃতসাহিত্যের স্পষ্ট অনুসরণ দেখা যায়। পৌরাণিক শিবের আখ্যান রচনায় রামকৃষ্ণ রায় প্রখ্যাত সংস্কৃত কবিদের কাব্য হইতে উপকরণ গ্রহণ করিয়াছেন। শিবমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে মৃগলুব্ধ নামে যে কাহিনীকাব্য আছে তাহাতে শিবচতুর্দশীর ব্রতকথার প্রভাব আছে। বিদ্যাসুন্দর আখ্যায়িকার উৎস হইল চৌর পঞ্চাশিকা নামক সংস্কৃত কাব্য। সাবিরিদ খাঁ নামক একজন মুসলমান কবি প্রথম বিদ্যাসুন্দর কাব্য লেখেন। ডঃ সুকুমার সেন প্রমাণ করিয়াছেন, "সাবিরিদ খান কোন সংস্কৃত কাব্য বা কবিতা অনুসরণ করিয়াছিলেন।"

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব খুব কম ছিল না। স্মৃতি-শাস্ত্রের অনুশাসন, ভক্তিশাস্ত্রের শিক্ষা বাংলাসাহিত্যকে প্রভাবিত করে। সংস্কৃত পুরাণ এবং কাব্য-নাটকাদি হইতে আখ্যানাংশ ও বর্ণনাংশ গ্রহণ করিয়া বহু কবি তাঁহাদের কাব্যকে সমৃদ্ধ সুন্দররূপ প্রদান করিয়াছিলেন। সংস্কৃতের স্নেহচ্ছায়ার প্রশ্রয়েই এই দুই শতাব্দীর সাহিত্য বিপুলায়তন এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

প্রশ্ন ২১। বাংলা ব্রতকথা হইতে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব হইয়াছে কি না তাহা যুক্তি ও তথ্য অবলম্বনে আলোচনা কর। [ক. বি, ১৯৬৩]

উত্তর। বাংলাদেশে স্ত্রীসমাজে প্রচলিত ব্রতকথার সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। অধ্যাপক সুকুমার সেন 'ব্রতগীত-পাঞ্চালী'কে মঙ্গলকাব্যের উৎসরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। ব্রতগীত ছিল একপ্রকার আনুষ্ঠানিক উৎসব। গ্রাম্য দেবদেবীর কাছে গৃহস্থের কল্যাণ কামনায় যে অনুষ্ঠান হইত তাহাতেই "প্রাচীন কাহিনী ও রূপকথা একত্রিত হইয়া যে সেব আখ্যায়িকা কাব্যগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাকেই ব্রতগীত-পাঞ্চালী" বলা হইয়াছে। ইহাই ক্রমে মনসা, চণ্ডী ও ধর্মঠাকুরের মঙ্গলকাব্যে পরিণত হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস-লেখক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন "ব্রতকথা হইতেই মঙ্গলকাব্যরচনার প্রেরণা ও বিষয়বস্তু সংগৃহীত হইয়াছে।' অধ্যাপক অসিতকুমার বলিয়াছেন, "পুরাপুরি মহাকাব্য বা পুরাণের আকার লাভ করিবার পূর্বে মঙ্গলকাব্যগুলি গ্রাম্য মেয়েলি ব্রতছড়া ও লোকধর্মানুকূল কৃত্যের মধ্য দিয়া বিকাশলাভ করিয়াছে।" বস্তুতঃ ব্রতকথার সূত্র হইতে মঙ্গলকাব্য কথার উদ্ভব সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মুখ্যতঃ কোন মতভেদ নাই।

মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তু, গঠনপ্রণালী এবং উদ্দেশ্য বিচার করিলে বাংলার স্ত্রীসমাজে প্রচলিত ব্রতকথার সহিত ইহার সংযোগসূত্রগুলির সন্ধান মেলে। মঙ্গলকাব্যকে লিখিত সুপরিণত পূর্ণাঙ্গ কাব্য বলা চলে; কিন্তু ব্রতকথা সংক্ষিপ্ত মৌখিক লোকসাহিত্য মাত্র। এক সদাগর ও তাহার সাত পুত্রবধূকে অবলম্বন করিয়া ব্রতকথার বিবরণ লোকসাহিত্যে পাওয়া যায়। নারীসমাজে সুপ্রাচীন কাল হইতেই ইহা চলিয়া আসিয়াছে। এই সূত্র হইতে চাঁদসদাগর ও বেহুলা-লখীন্দরের সুমহৎ বিরাট কাহিনী মহাকাব্যাকার লাভ

করিয়া মনসামঙ্গল হইয়াছে। বিজয় গুপ্ত তাঁহার পদ্মাপুরাণ কাব্যে হরিদত্তকে আদিকবি বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই হরিদত্তই ব্রতকথাকে প্রথম পাঁচালীর আকার দিয়াছিলেন। বিষ্ণু পালের লেখা মনসামঙ্গল কাব্যেও ব্রতকথার ছাপ সুস্পষ্ট। দ্বিজ জনার্দনের ভণিতায় চণ্ডীমঙ্গলের একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। রচনাটি ব্রতকথা জাতীয়। উহাতে ধনপতির কহিনীর রেখাচিত্র আছে এবং কালকেতুর কাহিনী প্রসঙ্গক্রমে বলা হইয়াছে। মাধবাচার্যের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক অসিত বাবু লিখিয়াছেন, "কেহ কেহ অনুমান করেন, এইরূপে কোন চণ্ডীর গীতকে দ্বিজ জনার্দনের রচনা) অবলম্বন করিয়া মাধবাচার্য তাঁহার কাব্য গঠন ও চরিত্রগুলির রেখাপাত করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। এই ধরণের ব্রতকথাই মঙ্গলকাব্যের উৎস।"

মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তু ব্রতকথার অনুরূপ। ব্রতকথায় দেবতার অনুগ্রহ ও নিগ্রহের ক্ষমতা বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্তচ্ছলে একটি গল্প বলা হয়। মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তুও তাহাই। এই কাব্যের কাহিনী কোন পুরাণ বা কাব্য-নাটকাদি হইতে গৃহীত নয়। দেবতার পূজা না করিলে কি লাঞ্ছন এবং করিলে কি লাভ তাহা প্রমাণ করিবার জন্যই যেন চাঁদসদাগর, কালকেতু, ধনপতি, লাউসেন ও পুষ্পদত্তদের জীবনকথা বলা হইয়াছে। ব্রতকথায় যাহা ছিল মুখে মুখে বলা সংক্ষিপ্ত রেখা চিত্র তাহাই শাস্ত্রসম্মত জীবনাশ্রয়ী কাব্যকথায় পরিণত হইয়া মঙ্গলকাব্য হইয়াছে।

মঙ্গলকাব্যের গঠনপ্রণালীর মধ্যেও ব্রতকথার ছাপ আছে। লোকসাহিত্যরূপে ব্রতকথায় অলৌকিকতা, কনিষ্ঠ পুত্র বা পুত্রবধূর কৃতিত্ব, সাপ-বিড়াল-কাক-শৃগাল ভ্রমর প্রভৃতি ইতর প্রাণীর কৃতকার্য, মৃতের পুনর্জীবন, সতীত্বের পরীক্ষা, আগুন বিনা লোহার মটর সিদ্ধ করা, লোহার গণ্ডার তালপাতার সাহায্যে কাটিয়া ফেলা প্রভৃতি বিষয় থাকে যাহাকে পাশ্চাত্ত্য লোকসাহিত্যবিদ্‌গণ Motif বলিয়াছেন। মঙ্গলকাব্যের গঠনের মধ্যে এই সমস্ত উপকরণের প্রাচুর্য প্রমাণ করে যে, ব্রতকথার সহিত ইহার সংযোগসূত্র খুব ঘনিষ্ঠ।

উদ্দেশ্যের দিক হইতে বিচার করিলেও বলা যায় যে, ব্রতকথার সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের সুস্পষ্ট একতা। স্বামিপুত্রের ঐহিক কল্যাণ কামনায় অন্তঃপুরিকারা ব্রতপালন করিতেন, শুদ্ধাভক্তি তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না। মঙ্গলকাব্যের দেবতারাও 'যোষিতা'মষ্টদেবতা' এবং তাঁহাদের কাছে প্রার্থনা—'ধনে পুত্রে মোর যেন বাড়ে ঠাকুরাল' এবং 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।' সুতরাং নানা ঐক্যসূত্রে সঙ্গত ভাবেই অনুমান করা যায় যে ব্রতকথাই মঙ্গলকাব্যের উদ্ভবক্ষেত্র।

প্রশ্ন ১৬। মনসামঙ্গলের মূল কাহিনী উদাত্ত ও মহৎ; অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের সহিত তুলনায় এই মন্তব্য কতদূর সমর্থনযোগ্য তাহা আলোচনা কর।

[ক. বি., ১৯৬৬]

উত্তর। মঙ্গলকাব্যগুলি দেবমাহাত্ম্য কীর্তন উপলক্ষ্যে অপূর্ব কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এই কাহিনীগুলি সংস্কৃত কাব্য-পুরাণনাটকাদি হইতে ধার-করা নহে;

অথবা ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কোন প্রখ্যাত ঘটনাও নহে। সাধারণ লোকপ্রবাদ অথবা ব্রতকথার সূত্র হইতে কবি-কল্পনার সূত্রে গ্রথিত হইয়া এই কাহিনীগুলি বাংলাদেশের জনজীবনের প্রতিচ্ছবি রচনা করিয়াছে। কাহিনীগুলির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গুণ এই যে ইহাতে দেবমহিমাকে অতিক্রম করিয়াও মানবীয় রসের প্রাধান্য ঘটিয়াছে। চাঁদসদাগর-বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনী, কালকেতু ও ধনপতি-শ্রীমন্তের উপাখ্যান, পুষ্পদন্তের গল্প, লাউসেনের জীবনকথা এমন জীবনাশ্রয়ী ভঙ্গিতে বলা হইয়াছে যে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীচেতনা এবং ধর্মীয় সীমাবদ্ধতা পরিহার করিয়াও মঙ্গলকাব্যের কাব্যকথা নিত্যকালের সাহিত্যবস্তুতে পরিণত হইয়াছে। এই কাব্যকাহিনীসমূহের মধ্যে মনসামঙ্গল কাহিনীতে মহাকাব্যিক মহিমার উপকরণ প্রচুর। লাউসেনের কাহিনী কোন কোন কবির রচনায় বিশেষতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ঘনরামের কাব্যে মহাকাব্যসুলভ বিস্তার লাভ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে বিচার করিলে মনসামঙ্গল কাহিনীর মধ্যেই উদাত্ত গাম্ভীর্য এবং মানবিক মহত্ত্ব সমধিক পরিস্ফুট। চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীতে মানবিক রসের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও ঐ কাহিনী আখ্যানকাব্য-সুলভ কৌতূহলপ্রদ এবং ছোটগল্প বা উপন্যাসের মত আকর্ষণীয়। চারিত্রিক মহত্ত্বে, সর্বাঙ্গীণ বিস্তারে এবং জীবননীতির উচ্চতম আদর্শ-ব্যঞ্জনায় চাঁদসদাগরের কাহিনীর যে সমুন্নতি তাহা অন্য কোন মঙ্গলকাব্যের কাহিনীতে প্রাপ্তব্য নহে।

মনসামঙ্গল অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের তুলনায় আয়তনে বৃহৎ। কারণ এই কাব্যের মধ্যে দেবকাহিনী ছাড়াও দুইটি লৌকিক কাহিনীর ধারা আসিয়া মিলিত হইয়াছে। পুরাণ ও উপপুরাণাদিতে মনসার উৎপত্তি এবং হর-পার্বতীর সঙ্গে সম্পর্ক অবলম্বনে যত প্রকার উপাখ্যান বর্ণিত মনসামঙ্গলে তাহা অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহার মূল কাহিনীটি চাঁদসদাগর-বেহুলা-লখীন্দরকে লইয়া। ইহা একটি লৌকিক কাহিনী, হয় প্রবাদমূলক না-হয় ক্ষীণ ইতিহাস ভিত্তিক। এই কাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনীরূপে সংযুক্ত হইয়াছে শঙ্কর গাড়ুড়ী ও নেতার কাহিনী। কোন কোন মনসামঙ্গলে ধন্বন্তরি ওঝার গল্প। কাহিনীর শেষাংশ মূল কাহিনীরই অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে স্বামিসহ বেহুলার অনির্দেশ্য যাত্রা ও দেবসভার সন্তুষ্টি বিধান করিয়া স্বামীর জীবনলাভ ও প্রত্যাবর্তন বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া বেহুলা-লখীন্দরের পূর্বজীবনকথারূপে উষা অনিরুদ্ধের পালা মনসামঙ্গলকাব্যের শাখা-কাহিনীরূপে স্থান পাইয়াছে। মহাকাব্যে যেমন শাখা-কাহিনীর বিস্তার দ্বারা মূল-কাহিনীকে বিশালতা প্রদান করা হয় এই কাব্যের কাহিনীবিন্যাস পদ্ধতিটি তদনুরূপ। অন্য কোন মঙ্গলকাব্যে কাহিনী গঠনে এই প্রকার বৃহৎ পটভূমিকা গ্রহণ করা হয় নাই।

মনসামঙ্গলের কাহিনীর মধ্যে একটা উদাত্ত ভাব আছে। মনসাদেবীর পূজা-লোলুপতা বড় বেশি, চাঁদের মনে মনসার প্রতি ঘৃণাও ততোধিক তীব্র। এরূপ অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে নাই। মনসাদেবী যেরূপ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া চাঁদসদাগরের বিরোধিতা করিয়াছেন এবং চন্দ্রধর যেরূপ অনমনীয় পৌরুষ ও বীর্যবত্তার পরিচয় দিয়াছেন কালকেতু বা ধনপতি উপাখ্যানে তাহার শতাংশের একাংশও নাই। কাহিনী-

রসে উদাত্ত পরিবেশ সৃষ্টির পক্ষে বিরোধের এই তীব্রতা অনেকখানি সহায়ক হইয়াছে। মনসামঙ্গলের কাহিনীর পরিধিও বিস্তৃত। মানবজীবনের গভীরতম অনুভূতি ও মর্মস্পর্শী বেদনার অনুরঞ্জনে সমগ্র কাব্যখানি বিশিষ্ট। কালকেতু উপাখ্যানে রাজ্যপ্রাপ্তি, রাজ্যনাশ ও পুনরুদ্ধারের ব্যক্তিগত কাহিনী পাওয়া যায়। ধনপতি উপাখ্যানে কালীদহে কমলে-কামিনীর অলৌকিক দর্শনের ভিত্তিতে কাহিনীর সীমাবদ্ধ বিস্তার। লাউসেনের একের পর এক বিজয় কাহিনী ও মহামদের ষড়যন্ত্রের প্রচেষ্টা কাহিনীকে রোমান্টিক কৌতূহলে অভিনব করিয়া তুলিয়াছে। এই গল্পগুলির আখ্যানরস উপভোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু উদাত্ত গম্ভীরতার দিক হইতে বিচার করিলে চাঁদসদাগরের কাহিনী অতুলনীয়। চাঁদের সহিত বিরোধে মনসা গোয়ালিনী, মালিনী ও নটী সাজিয়া সদাগরকে বিপর্যস্ত ও দুর্বল করিতেছে, তাহার মহাজ্ঞান হরণ করিতেছে, ভরাডুবি করাইয়া তাহাকে সর্বস্বান্ত করিতেছে, রিক্তবিত্ত চাঁদের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করিতেছে, চাঁদের সুহৃদ্ ধন্বন্তরিকে ষড়যন্ত্র করিয়া হত্যা করিতেছে—এইরূপ ঘটনাপরম্পরায় কাহিনী উদাত্ত হইয়া উঠিয়াছে। কাহিনীর শেষাংশে বেহুলার অভিযানটিও এমন উদাত্ত গম্ভীর যে পাঠকচিত্ত স্বভাবতঃই সংকীর্ণতা পরিহার করিয়া বিস্তার লাভ করে। কাহিনী-পরিণামে চাঁদ বিরোধ ঘুচাইয়া মনসার পূজা করিতে স্বীকার করিলেও বিরাট বনস্পতি-পতনের উদাত্ত গাম্ভীর্যই কাব্যখানির ফলশ্রুতি। ট্রাজেডি রসাশ্রিত মহাকাব্যের নায়কের পতনের মত চাঁদসদাগরের পতন পাঠকমনে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়মিশ্রিত সহানুভূতির উদ্রেক করে।

মনসামঙ্গলের কাহিনীর মধ্যে মহৎ গুণের সমাবেশও প্রচুর। মহৎ কাব্যের উপযোগী সমুন্নত মহিমার আদর্শচরিত্রের জন্যই মনসামঙ্গল মহৎ। সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পটভূমিতে চাঁদসদাগরের মত দ্বিতীয় চরিত্র আর নাই। অনমনীয় পৌরুষের অধিকারী চাঁদসদাগরের অদৃষ্টে মানসিক দুঃখের চরম আঘাতও তাহাকে সংকল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। একে একে তাহার সাতটি পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার উদ্যানবাটিকা ধ্বংস হইয়াছে, প্রিয়বন্ধু নিহত হইয়াছে, সপ্তডিঙ্গা মধুকর নিমগ্ন হইয়াছে, তথাপি এই মহাবীর সমুন্নতশীর্ষ পর্বতশৃঙ্গের মত অবিচল মহিমায় দাঁড়াইয়া। মনসাকে শেষ পর্যন্ত সে প্রণাম জানাইয়াছে ভয়ে বা প্রয়োজনে নয়, প্রিয়জনের মনস্তুষ্টির জন্য। সনকার মাতৃত্ব, বেহুলার সতীত্ব, চাঁদসদাগরের পৌরুষ এবং মনসাদেবীর ক্রূরতা এই কাব্যে এমন ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যাহাতে ইহা রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী ও চরিত্রের মত লোকসাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সতী, সীতা, সাবিত্রীর নামের সঙ্গেই সমমর্যাদায় বেহুলার নাম বাংলাদেশে উচ্চারিত হয়। রামলক্ষ্মণ ভীমার্জুনের মতই চাঁদসদাগর পৌরাণিক মহিমায় উদ্ভাসিত। অপরাপর মঙ্গলকাব্যের কোন কাহিনীই এমন বিস্ময়কর মাহাত্ম্য অর্জন করে নাই। সুতরাং উদাত্ততা ও মহত্ত্বগুণে চণ্ডী, ধর্ম, অন্নদা, কালিকা, রায় প্রভৃতি যে-কোন মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর তুলনায় মনসামঙ্গলের কাহিনী শ্রেষ্ঠ।

প্রশ্ন ২৩। "মঙ্গলকাব্যে পৌরাণিক ও লৌকিক সংস্কৃতির এক বিচিত্র সমন্বয় হইয়াছে।" চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল অবলম্বনে এই উক্তির যাথার্থ্য বিচার কর। [ক. বি, ১৯৬৮]

উত্তর। চণ্ডী, মনসা ও ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য-কীর্তন উপলক্ষে যে কাব্যধারা বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছে তাহা এক মিশ্র উপাদানে রচিত। একদিকে সংস্কৃত সাহিত্য ও আর্যসভ্যতার সমুন্নত ঐতিহ্য, অপরদিকে লোকসংস্কৃতির চিরপ্রিয়, চিরপরিচিত ভিত্তি ভূমি। এই দুই স্বতন্ত্র সংস্কৃতির বিচিত্র সমন্বয়েই মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ও বিকাশ। মঙ্গলকাব্যের দেব-পরিকল্পনায়, কাহিনীগঠনে, আঙ্গিকপ্রকরণে এবং চরিত্রসৃষ্টিতে একদিকে যেমন পৌরাণিক সংস্কৃতির প্রভাব, অপর দিকে তেমনি লৌকিক সংস্কৃতির সুস্পষ্ট অনুসরণ। তাই মন্তব্যটি অসমীচীন নয় যে, "মঙ্গলকাব্যে পৌরাণিক ও লৌকিকসংস্কৃতির এক বিচিত্র সমন্বয় হইয়াছে।" মঙ্গলকাব্যের গঠন বিশ্লেষণ করিলে মন্তব্যটির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

মঙ্গলকাব্যের দেব-পরিকল্পনায় পৌরাণিক ও লৌকিকসংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। মনসা, চণ্ডী ও ধর্মঠাকুর বিশুদ্ধ পৌরাণিক দেবতা নহেন। তাহারা আর্যপূর্ব যুগ হইতেই যথাক্রমে সর্পের, বন্য পশুর এবং রোগনিরাময় ও প্রজননের দেবতারূপে গ্রামাঞ্চলে পূজিত হইতেন। সেই সব পূজানুষ্ঠানের কিছু কিছু চিহ্ন আজিও বর্তমান। দ্রাবিড়দের মঞ্চা আম্মা, ওরাওঁদের চাণ্ডী, কোলদের ভোমরায় প্রভৃতি দেবতা মঙ্গলকাব্যের 'যোষিতামিষ্টদেবতা'। ইহারা পরে পৌরাণিক সংস্কৃতির প্রভাবে শিব-কন্যা মনসা, শিব-গৃহিণী চণ্ডী এবং সূর্য বা যমদেবতা ধর্মরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। আর্যপূর্ব অর্থাৎ লৌকিক দেবতার সঙ্গে পৌরাণিক আর্য দেবতাকে মিলাইয়াই মঙ্গলকাব্যের দেব-পরিকল্পনা। Mr. H. Whitehead তাঁহার Village Gods গ্রন্থে তামিল দেবতা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বাঙ্গালা দেবতা সম্বন্ধেও সমান প্রযোজ্য। তিনি বলিয়াছেন "There has been a strong tendency in the Tamil country where Brahmin influence is strong, to connect the village goddesses with the Hindu pantheon."

মঙ্গলকাব্যের কাহিনী গঠনেও লৌকিক সংস্কৃতির প্রভাব অনুমান করা যায়। মনসামঙ্গলে চাঁদসদাগর-বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী, চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতু ও ধনপতি-শ্রীমন্তের কাহিনী এবং ধর্মমঙ্গলে লাউসেন-রঞ্জাবতীর কাহিনী কোন হিন্দু পুরাণে, এমন কি, কাব্য-নাটকাদিতেও কোথাও পাওয়া যায় না। নিঃসংশয়ে এই কাহিনীগুলি লৌকিক। ব্রতকথার লৌকিক কাহিনীগুলি হইতেই মঙ্গলকাব্য-কাহিনীর উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু কাহিনীর উপস্থাপনে পৌরাণিক প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। পুরাণের মতই মঙ্গলকাব্য দেবতা সম্বন্ধীয় আখ্যান। পুরাণ কাহিনীর একটি বিশেষ গঠন ছিল। কূর্ম পুরাণে ঐ গঠন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণাং পঞ্চলক্ষণম্॥

এই পাঁচটি লক্ষণ হুবহু না হইলেও মঙ্গলকাব্যের গঠনে অনুরূপ একটি ছাঁচ গড়িয়া উঠে। প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেই দেবখণ্ড ও নরখণ্ডের দুইটি স্পষ্ট বিভাগ আছে। দেবখণ্ডে সর্গ ও প্রতিসর্গ অর্থাৎ দেবতাদের গল্প এবং শাপভ্রষ্ট হইয়া কোন দেবতার নরজন্ম গ্রহণ। তারপর বংশ-বংশানুচরিত প্রভৃতি অংশে নরখণ্ড অর্থাৎ দেবতার পূজা-প্রচারকে তাৎপর্যপূর্ণ করিবার জন্য শাপভ্রষ্ট দেবতার নরলীলা অর্থাৎ মানবিক ব্যবহার। লৌকিক জীবনের স্পর্শে মানবিক কাহিনী জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই পুরাণের কাঠামোর মধ্যেও মঙ্গলকাব্যগুলি তত্ত্ব হইয়া উঠে নাই, কাব্যত্বে উত্তীর্ণ হইয়াছে। পুরাণকাহিনীর দেবতারা কারুণিক মঙ্গলাদর্শের প্রতীক। ভক্তবাৎসল্যে তাঁহারা শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের লৌকিক দেবতা ভয় ও প্রলোভন দেখাইয়া অনিচ্ছুকের নিকট পূজা আদায় করিয়াছেন। মঙ্গলকাব্যের কাহিনীতে পৌরাণিক ও লৌকিক আদর্শের মিলনের ফলে দেবতাদের আচরণে যেমন অনুগ্রহদাতার কল্যাণরূপ ফুটিয়াছে, তেমন নীচ স্বার্থপর প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রবৃত্তির পরিচয়ও প্রকাশ পাইয়াছে। কাহিনী-গঠনে এই ভাবে তত্ত্বাশ্রয়ী পৌরাণিক সংস্কৃতি ও জীবনাশ্রয়ী লৌকিক সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটিয়াছে।

মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিক-প্রকরণে আর্য-অনার্য দুই সংস্কৃতিরই মিশ্রণ দেখা যায়। পৌরাণিক আদর্শে রচিত মঙ্গলকাব্যের মধ্যে লোক-কথার বহু উপাদান সংমিশ্রিত হইয়াছিল। মঙ্গলকাব্যের প্রথমাংশে দেবকাহিনী আছে। মনসামঙ্গলে অযোনিসম্ভবা মনসার জন্মকথাকে পৌরাণিক পরিবেশ পরাইলেও লোক-কথার supernatural birth motif লক্ষ্য করা যায়। চণ্ডীমঙ্গলেও অনুরূপ অলৌকিকতা আছে। হর-পার্বতীর পৌরাণিক জীবনকথার সঙ্গে কৃষক শিবের গার্হস্থ্য জীবনের দারিদ্র্য চিত্র এবং হরগৌরীর কোন্দলের দৃশ্য মঙ্গলকাব্যের দেবকাহিনীকে লৌকিক পর্যায়ে আনিয়া ফেলিয়াছে। ধর্মমঙ্গলের গোড়ার দিকে সৃষ্টি পত্তনের বিবরণ, আদ্যদেবের কাহিনী, নিরঞ্জনের রুষ্মা প্রভৃতি অংশে লৌকিক বিষয়কে পৌরাণিক ভঙ্গিতে বলিবার চেষ্টা আছে। মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিকে বারমাসী, নারীগণের পতিনিন্দা, চৌতিশা স্তব, সতীত্ব পরীক্ষা, মহাজ্ঞানহরণ প্রভৃতি নানা বিষয় সন্নিবেশ করা হয়। পৌরাণিক কাহিনীতেও এই জাতীয় বিষয় আছে; কিন্তু মঙ্গলকাব্যে ইহারও বিশেষত্ব আছে। মনসামঙ্গলে রূপসী নারীকর্তৃক মহাজ্ঞানহরণ আছে, শঙ্কর গাড়ড়ীর স্ত্রীর নিকট হইতে তাহার মৃত্যু রহস্য জানার বিবরণ আছে, কনিষ্ঠ পুত্রবধূর দ্বারা অসাধ্যসাধন এবং তাহার সতীত্ব পরীক্ষার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। লোকসাহিত্যের বিস্তৃত ক্ষেত্র হইতেই এই সব উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। রামায়ণের সীতার অগ্নিপরীক্ষার আদর্শ হয়ত সম্মুখে ছিল, কিন্তু বেহুলার পরীক্ষা হইয়াছিল নানা রকমে শুধু অগ্নিযোগে নয়। সে পরীক্ষা-বিধি অবশ্যই লৌকিক। ধর্মমঙ্গলে লোহার গণ্ডার খণ্ড করার কথা আছে, পশ্চিমে সূর্যোদয়ের প্রসঙ্গ আছে। এই সব ব্যাপারের মধ্যেও লৌকিক সংস্কৃতির সুস্পষ্ট চিহ্ন। মনসামঙ্গলে চাঁদসদাগর বাণিজ্য যাত্রায় সমুদ্রমধ্যে নির্মিত পুরী দেখিয়াছিল, চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতি ও শ্রীমন্ত 'কমলে-কামিনী'র দৃশ্য সমুদ্রজলে দেখিয়াছিল। এই

দৃশ্যগুলি যথার্থ পৌরাণিক নয়, ইহাতে যে লৌকিক সংস্কৃতির সংমিশ্রণ আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মঙ্গলকাব্যকে অধ্যাপক সুকুমার সেন 'ব্রতগীত পাঞ্চালী' নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, গ্রাম্যদেবতার মাহাত্ম্য-প্রকাশের জন্য প্রাচীন কাহিনীর সহিত রূপকথা মিশাইয়া এই কাব্যের গঠন-বৈশিষ্ট্য। এই কাব্যে লৌকিক উপাদনের কথা সকল ঐতিহাসিকেরাই স্বীকার করিয়াছেন। চরিত্রসৃষ্টিতেও লৌকিক প্রভাব। চরিত্রগুলির নামকরণও তদ্ভব শব্দ দ্বারা; অবশ্য তৎসম শব্দও আছে। বেহুলা, সনকা, লখীন্দর, ফুল্লরা-খুল্লনা-লহনা, কলিঙ্গা-কানাড়া-লাউসেন ইত্যাদি নামে প্রধান পাত্রপাত্রীদের পরিচয় প্রদান লোকসংস্কৃতির চিহ্ন। সুতরাং মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ও গঠন-বৈশিষ্ট্য বিচার করিলে প্রচুর পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদনের যুগপৎ সমাবেশ পরিলক্ষিত হইবে।

প্রশ্ন ২৪। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত পদাবলী সাহিত্যের রূপ (form) ও ভাবের পরিণতি দেখাইয়া একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা কর। [ক. বি. ১৯৬৫]

উত্তর। পদাবলী সাহিত্যের উৎস-সন্ধানে মধুরকোমলকান্ত পদাবলীর রচয়িতা জয়দেব সরস্বতীর দ্বারস্থ হওয়া যায়। ব্যাপকার্থে গ্রহণ করিলে হাজার বছরের পুরানো বৌদ্ধ গান ও দোঁহাগুলিও পদাবলী। তবে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক যে পদগুলি বাংলাদেশে সুপ্রচলিত এবং সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে পদসমূহের সংকলন হইয়াছে তাহাই সাহিত্যের ইতিহাসে পদাবলী নাম পাইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শক্তিদেবতাকে অবলম্বন করিয়া রামপ্রসাদ-কমলাকান্ত প্রভৃতি কবিগণ যে গীতি রচনা করিয়াছিলেন তাহাও শাক্ত পদাবলী নামে অভিহিত। চতুর্দশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই পদাবলীর ধারা ভাবে ও রূপে কিঞ্চিৎ বিবর্তিত হইয়া একটানা প্রবাহিত হইয়াছে। ডঃ সুকুমার সেন বলিয়াছেন, "বৈষ্ণবপদাবলীর রচয়িতারা অধিকাংশই 'মহাজন বা মহান্ত' (অর্থাৎ সাধুপুরুষ বা গুরু) ছিলেন। এই জন্য সপ্তদশ শতাব্দের শেষভাগ হইতে বৈষ্ণব গীতিকবিতা 'মহাজন পদাবলী' নামেও খ্যাত হয়।"

পদাবলী সাহিত্য সংক্ষিপ্তার্থে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গীতিকবিতা। শ্রীচৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করিয়া এই পদ সাহিত্য প্রাক্-চৈতন্য এবং চৈতন্যোত্তর এই দুই ভাগে বিভক্ত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচিত পদসমূহ প্রাক্-চৈতন্যযুগের পদাবলীর নিদর্শন। ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ও বলরাম দাসাদি কবিদের রচনা ভাবে, রসে ও প্রকাশভঙ্গিতে নূতন পথ অবলম্বন করে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পদাবলীর আকৃতি-প্রকৃতি আরও কিছু বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করিয়াছিল। এই ভাবে পদাবলী সাহিত্যের সুদীর্ঘ ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে। চৈতন্যোত্তর পদকর্তারা ছিলেন একাধারে সাধক এবং কবি। তাঁহারা মহাজন আখ্যা পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের রচিত প্রেমসঙ্গীত লৌকিক প্রেমের কাব্যকথা মাত্র নয়, মহাজন-পদাবলী ভক্তিতত্ত্বের মহামূল্য বাণী। এই জন্যই প্রাক্-চৈতন্য এবং চৈতন্যোত্তর পদাবলী সাহিত্যের রসাস্বাদন একটু স্বতন্ত্র রকম।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে পদাবলী সাহিত্যের ভাবরস এবং রূপগঠন চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির রচনার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের কিছু পদাংশকেও পদাবলী বলা যায়। মাধবেন্দ্র পুরীর রচনা বলিয়া কথিত কিছু পদকেও প্রাক্ চৈতন্য পদাবলী বলে। এই পদগুলিতে কৃষ্ণপ্রেমের যে আবেগ প্রকাশ পাইয়াছে তাহার মানবিক আবেদন বেশ স্পষ্ট। ঈশ্বর-জ্ঞানে কৃষ্ণভক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় রূপের পরিচয় মাধবেন্দ্রের 'ভক্তিকল্পতরু' গ্রন্থে উৎকলিত পদগুলিতে দেখা যায়। মালাধরের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের উদ্ধৃত পদগুলিতে আত্মনিবেদিত ভক্তিধর্মের সঙ্গে ঐশ্বর্যময় কৃষ্ণের বর্ণনাই প্রধান। কৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব এবং গোপাঙ্গনাদের ভক্তিভাব অবলম্বনেই পঞ্চদশ শতাব্দীর কাব্যভূমি কর্ষিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যেও কাব্যকলার চরম উৎকর্ষ দেখাইয়াছিলেন কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। প্রাক্চৈতন্যযুগে ইঁহারা পদাবলী সাহিত্যকে গৌরবের উচ্চতম শীর্ষে উন্নীত করিয়াছিলেন। কবি বিদ্যাপতি শিল্পচাতুর্যে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি সৌন্দর্যপ্রিয় বিদগ্ধ কবি। তিনি রাধাচরিত্রে চিরন্তনী নারীর সমস্ত মাধুর্য বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। চৈতন্যোত্তর যুগের মত তিনি রাধাকে তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠা না দিয়া এমন মানবীরূপ দান করেন যে যে-মানবীর যৌবনচেতনা, রূপোল্লাস সম্ভোগাকাঙ্ক্ষা ও বিরহ বেদনা লৌকিক জীবনের অনুভূতি দিয়া গড়া। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে ভাব গভীরতা প্রেমের বেদনা, পূর্বরাগের মাধুর্য, আক্ষেপানুরাগের আর্তি সরল অথচ অনলঙ্কৃত ভাষায় জীবনাশ্রয়ী কাব্য হইয়া উঠিয়াছে, তত্ত্ব-সাপেক্ষতার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নাই।

ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবগত ও আঙ্গিকগত পরিবর্তন সাধিত হয়। চৈতন্য দেবের অলৌকিক জীবনের প্রভাবে পদাবলী সাহিত্যের গুণগত ও পরিমাণগত সমৃদ্ধি লক্ষণীয় হইয়া উঠে। উড়িষ্যায় রামানন্দ এবং বাংলায় যশোরাজ খাঁ পদাবলী রচনায় ব্রজবুলি প্রয়োগের সূচনা করেন। চৈতন্যদেবের জীবৎকালেই তাঁহার পরিকরেরা তাঁহাকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিতেন এবং ভক্ত কবিসম্প্রদায়ও মহাজন আখ্যায় ভূষিত হইলেন। বৈষ্ণবীয় দর্শন সৃষ্টিও এই যুগেই হয় এবং বৃন্দাবনের গোস্বামীদের প্রভাবে পদাবলী সাহিত্য নিয়ন্ত্রিত হয়। নরহরি, মুরারি, গোবিন্দ ঘোষ, বলরাম দাস, প্রভৃতি কবিকুল চৈতন্য প্রবর্তিত নূতন ধর্মালোকে পদ রচনা করিতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম এবং শ্রীরাধা তাঁহার আনন্দাংশের হ্লাদিনী শক্তি তিনি মহাভাব স্বরূপা, এই তত্ত্ব যেমন রাধাকৃষ্ণ পদাবলীকে প্রভাবিত করিয়াছে, তেমনি গৌরচন্দ্রিকা পদের সৃষ্টি করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যকে রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গৌরচন্দ্রিকা নামে একজাতীয় পদসাহিত্য এই যুগেই প্রথম রচিত হয়। গৌরতত্ত্বের প্রভাবে রাধাকৃষ্ণের পদাবলীরও রূপান্তর ঘটে। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস প্রভৃতি প্রতিভাধর ভক্ত কবিরা রাধার চিত্রাঙ্কনে চৈতন্যদেবের আদর্শকেই প্রতিফলিত করিতে থাকেন।

ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণবতত্ত্বের নানা রসপর্যায় পদসাহিত্যের ভাবরস এবং আঙ্গিক বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। শ্রীরূপ গোস্বামী 'উজ্জ্বল নীলমণি' নামক রসশাস্ত্রে বৈষ্ণবীয় চৌষট্টি

রস, অষ্টনায়িকা, শৃঙ্গার-রসের নানা বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করিলেন এবং সেই রস পর্যায় অনুসারে পূর্বরাগ, রূপানুরাগ, আক্ষেপানুরাগ, মান, অভিসার, মাথুর প্রভৃতি নানা পর্যায়ের পদ রচিত হইতে থাকে। সখ্য ও বাৎসল্য রসের পদ চৈতন্যপূর্ব যুগে ছিল না। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলাকে কাব্যের বিষয় করিয়া নূতন ধরনের অসংখ্য পদ রচিত হয়। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বল্লভদাস, রায়শেখর, শশিশেখর প্রভৃতি পদকর্তারা বাংলায় ও ব্রজবুলিতে ছন্দ ও অলঙ্কারের মণ্ডনশিল্পে সাজাইয়া বহু পদ রচনা করেন। পদগুলি ছিল বৈষ্ণব তত্ত্বের রসভাষ্য। উচ্চতম কবিত্ব ও শিল্পত্বের স্বর্ণপ্রভায় এই যুগের সাহিত্যাকাশ উদ্ভাসিত হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীকে বৈষ্ণব পদ সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদ সাহিত্যের কোন অভিনব উৎকর্ষ দেখা যায় নাই। এই যুগকে অনুবাদ ও আলঙ্কারিক কৃতিত্বের যুগ বলা হইয়া থাকে। মোগল শাসনের অবনতির যুগে সামাজিক জীবনে দুর্নীতিপরায়ণতা ও বিলাসিতার প্রভাব এই যুগের সবরকম কাব্যেই সংক্রামিত হয়। বৈষ্ণব পদসাহিত্যেও উন্নত প্রতিভার অভ্যুদয় হয় নাই। পূর্ব যুগের গৌরব আকড়াইয়া ধরিয়া রসশাস্ত্রের নিয়মাবলী পালন করিয়া এই যুগের কবিকুল পুচ্ছগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। ঘনশ্যাম দাস, মনোহর দাস প্রভৃতি কবিগণ স্পষ্টতই গোবিন্দদাসের ভাব ও ভাষার অনুকরণ করিয়াছেন। কোন কোন কবি শ্রীরূপ গোস্বামীর সংস্কৃত পদের বঙ্গানুবাদমাত্র করিয়াছেন। কবিত্বে বা সাধকত্বে কোন দিক দিয়াই সপ্তদশ শতাব্দী উল্লেখযোগ্য প্রতিভার পরিচয় দেয় নাই। কাব্যকলায় কৃত্রিমতা এই যুগের পদসাহিত্যে সূচিত হইয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পদাবলী সাহিত্যে যে রূপান্তর দেখা যায় তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য পালাকীর্তন রচনা এবং পদসংকলন গ্রন্থের সৃষ্টি। পালাকীর্তনে যেমন প্রসিদ্ধ কবিদের পদগুলি গ্রহণ করা হইত, তেমনি কাহিনী কৌতূহল সৃষ্টির জন্য, জনরুচির পরিতৃপ্তির জন্য অভিনব উদ্ভাবন করা হইত। চন্দ্রশেখর নামক কবি রাধার অবৈধ প্রেমের তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়াছেন। দীনবন্ধু দাস নামক একজন কবি গোষ্ঠলীলা বর্ণনায় শৃঙ্গার রসের আমদানি করিয়া সুবলের ছদ্মবেশে রাধাকে কৃষ্ণমিলনে পাঠাইয়াছেন। রাধার সতীত্ব পরীক্ষা, ছদ্ম বৈদ্য সাজিয়া কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে মিলিত হইতেছেন—এইরূপ নানা কৌতুক রসাশ্রিত গালগল্পযুক্ত পদাবলী রচনায় প্রবণতা অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য হইয়া উঠিয়াছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মানবিক রস, ষোড়শ শতাব্দীর তত্ত্বরস পদাবলী সাহিত্যকে যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব কবিরা সেই মর্যাদা অব্যাহত রাখিতে পারেন নাই। কারণ রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ-মূর্তিতে পরিণত হওয়ায় এবং বৈষ্ণব তত্ত্বের আলোকে রাধাপ্রেম ব্যাখ্যাত হওয়ায় এই যুগের পদসাহিত্য জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট রসবস্তু হইয়া উঠে নাই।

প্রশ্ন ২৫। "রাধাকৃষ্ণের পদাবলীর উদ্ভবের পর হইতে চৈতন্য-প্রেমধর্মের আদর্শের প্রতিফলন ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছিল।"—এই মন্তব্যের যথার্থতা বিচার কর। [ক. বি. ১৯৬৬]

অথবা, রূপ ও রসের দিক হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীর কিরূপ পরিবর্তন ধারা সাধিত হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও।
[ক. বি ১৯৬৮]

উত্তর-সঙ্কেত। পূর্ববর্তী প্রশ্নোত্তরটির মধ্যেই উত্তরের সূত্রগুলি আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলী শ্রীচৈতন্যের প্রভাবের ফলে অনেকটা তত্ত্বাশ্রিত হয় এবং ভক্ত ও দার্শনিক পণ্ডিত কবিগণ বৈষ্ণবীয় তত্ত্বদর্শন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মাবলী অনুসরণ প্রচেষ্টায় কাব্যরূপ অনেক ক্ষেত্রেই কৃত্রিম কলানৈপুণ্য হইয়া উঠিয়াছে।

রূপের দিক হইতে বৈষ্ণব পদাবলী ষোড়শ শতাব্দীতে স্বয়ং-সম্পূর্ণ গীতিকবিতাকার ধারণ করে। কোন সুনির্দিষ্ট আখ্যানধারা অনুসরণ করে না। 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থে কৃষ্ণরতির যে বিভিন্ন বিভাগ নির্দেশিত হইয়াছিল তদনুসারে পদকর্তারা পূর্বরাগ, মান, অভিসার, মাথুর, প্রেমবৈচিত্ত্য পর্যায়ে পদরচনা করিতেন। বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাই ব্যবহৃত হইয়াছে এবং কবিগণ ছন্দ ও অলঙ্কার রচনায় প্রভূত নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস, রায়শেখর প্রভৃতি পদকর্তাদের রচনায় ইহার দৃষ্টান্ত আছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পদাবলী কীর্তন প্রবর্তিত হওয়ায় পূর্ববর্তী কবিদের পদাবলী যেমন গ্রহণ করা হইয়াছে তেমনই এই যুগের কবিরা নূতন নূতন পদ রচনা করিয়া আখ্যান জাতীয় কবিতা লিখিতেন। গৌরচন্দ্রিকা নামক নূতন ধরনের পদরচনার খুব প্রসার ঘটে। মহাজন রচিত বহু সংস্কৃত পদেরও বঙ্গানুবাদ ও ভাবানুবাদ হয়।

রসের দিক হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীর পরিবর্তন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকথা প্রাক্‌চৈতন্য যুগে সাধারণ শৃঙ্গার রসাত্মক কাব্যমাত্র ছিল। চৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে বৈষ্ণবপদাবলী বৈষ্ণবীয় পঞ্চরসের মধ্যেই নিবদ্ধ হয়। শান্তরসাশ্রিত প্রার্থনা পদ, দাস্য রসাশ্রিত ভক্তিমূলক পদ, সখ্য ও বাৎসল্য রসাশ্রিত গোষ্ঠলীলা ও বাল্যলীলার পদ এবং মধুর রসাশ্রিত সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভের বহু পদ রচিত হয়। অষ্টনায়িকা কল্পনা, রসোদ্গার, সখী সংবাদ জাতীয় বহু রচনায় বৈষ্ণব পদে রস-বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর বহু কবি রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা অবলম্বনে কৌতুক রস ও লঘুতরল হাস্যরসের নানা কাহিনী রচনা করিয়াছেন। কৃষ্ণ চিকিৎসক ও নাপিতানী সাজিয়া রাধার সঙ্গে মিলিত হইতেছেন, রাধা সুবলের ছদ্মবেশে কৃষ্ণের সঙ্গে গোষ্ঠে মিলিত হইতেছেন, রাধাকৃষ্ণ হাডুডু খেলিতেছেন ; এই প্রকার বহু কৌতুকপূর্ণ তরল রচনায় বৈষ্ণব পদাবলী পরিণতি লাভ করিয়াছিল।

প্রশ্ন ২৬। "বাংলা বৈষ্ণবসাহিত্যে বৃন্দাবনের প্রভাব পদাবলীর ধারাকে কৃত্রিম প্রণালীতে প্রবাহিত করিয়া উহার কাব্যরস ক্ষুণ্ণ করিয়াছে।" —আলোচনা কর।
[ক. বি. ১৯৬৬]

উত্তর। প্রাক্‌চৈতন্য যুগে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদাবলী রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কাহিনীকে তত্ত্ব নিরপেক্ষ মানবিক রসের অপূর্ব রসসাহিত্যে উন্নীত করিয়াছিল। কিন্তু

চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলী সাহিত্য বৈষ্ণব তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়াই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। রাধা এবং কৃষ্ণ তখন আর ঈশ্বরের নরলীলার লৌকিক ব্যাপারমাত্র নয়, বৈষ্ণব দর্শনের আলোকে তাঁহারা রীতিমত তত্ত্বরূপে বিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন। ফলে মানবিক রসের স্বাভাবিক প্রণালী পরিহার করিয়া পদাবলী তত্ত্বকর্ষিত কৃত্রিম খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল। পদগুলির গুণগত উৎকর্ষ যথেষ্ট ছিল, পরিমাণগত আধিক্যও উল্লেখযোগ্য, পাণ্ডিত্যের দীপ্তিও অসাধারণ। তবুও প্রাত্যহিক জীবন হইতে একটু দূরে গিয়াই পদগুলির সৌন্দর্য-মাধুর্য দৃষ্টিগোচর হয়।

চৈতন্যোত্তর পদাবলীতে তাত্ত্বিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ। তাঁহাদের প্রভাবেই পরবর্তী বৈষ্ণব পদকর্তাগণ সচেতনভাবে বৈষ্ণবতত্ত্বের পদানুসরণ করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই কিছুদিনের জন্য বৈষ্ণব আন্দোলন স্তব্ধ ও নিষ্ক্রিয় হয়। কিন্তু অনতিবিলম্বেই ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে নূতন ভাবের যে জোয়ার আসে সেই ভাবস্রোত পরিচালনা করিয়াছিলেন বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামী। শ্রীরূপ, সনাতন, জীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট এই ছয়জন অসাধারণ পণ্ডিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের দৃঢ়ভিত্তি রচনা করিলেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যবর্গ বৈষ্ণব ভাবরাজি জনমানসে সঞ্চারিত করিলেন এবং অসংখ্য কবিশিল্পী সাহিত্যের আসর সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে লাগিলেন। শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ, বীরচন্দ্র জাহ্নবা দেবী, শান্তিপুর গোষ্ঠী, শ্রীখণ্ড সম্প্রদায় প্রভৃতি বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ঐকান্তিক চেষ্টায় বৈষ্ণবতা বাংলা দেশে প্রবল শক্তিরূপে দেখা দিয়াছিল এবং উহার প্রভাবে রাধাকৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক পদাবলী বৈষ্ণব তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া একটি বিশিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হইয়াছিল। অধ্যাপক অসিতকুমার লিখিয়াছেন, "বস্তুতঃ সপ্তদশ শতাব্দীতেই বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্য অসাধারণ শক্তি ও ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল। গুণগত উৎকর্ষের কথা ছাড়িয়া দিলে সংখ্যাধিক্যের দিক দিয়া এই যুগে বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রসার যে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে।" এই আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক এই বিপুল সাহিত্য যে কৃত্রিমতার পথ ধরিয়া কাব্যরসে উৎকৃষ্ট হয় নাই তাহারও ইঙ্গিত দিয়াছেন। তিনি বলেন, "কিন্তু সাহিত্যের উৎকর্ষ এবং নিষ্ঠার ঐকান্তিকতা বিচার করিলে সপ্তদশ শতাব্দীর স্ফীতকায় বৈষ্ণব সাহিত্যের অনেকটাই শূন্যগর্ভ মনে হইবে।"

শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে বৈষ্ণবীয় পঞ্চরস, চৌষট্টি প্রকার লীলারস, অষ্টনায়িকা, সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভের প্রকার ভেদ প্রভৃতি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিলেন। সনাতন জীবগোস্বামী প্রভৃতি গোস্বামিগণ ভাগবত গ্রন্থের ভক্তিতত্ত্বের অভিনব ব্যাখ্যা প্রদান করিলেন, চৈতন্য চরিতামৃতে গৌরতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, সখীতত্ত্ব বা মঞ্জরী ভাব, সাধ্যসাধন অচিন্ত্য ভেদাভেদ প্রভৃতি তত্ত্বের বিশদ আলোচনা ও ব্যাখ্যা হইল। পদকর্তারা এই তত্ত্বকে কাব্যের মধ্যে প্রতিপাদনে চেষ্টিত হইলেন। কারণ পদকর্তা কবিগণ ছিলেন একাধারে সাধক ও কবি। তাঁহারা 'মহাজন' আখ্যা পাইয়াছিলেন। এই জন্যই প্রেমের কবিতা তত্ত্বপরিকীর্ণ হইয়া কৃত্রিম হইয়া উঠে।

পদাবলী সাহিত্যের প্রথম যুগে প্রেমচেতনায় যে ভাবতন্ময়তা ছিল, হৃদয়ানুভূতির যে অকৃত্রিম স্বতোৎসারিতা ছিল, পরবর্তীকালে তাহা অনেকখানি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বুদ্ধির ও মননের প্রাধান্যে এবং আঙ্গিক সচেতনতায় রচনা খুব কৃত্রিম হয়। কাব্যত্বের বিচারে ইহা অবক্ষয়ের লক্ষণ। পূর্বরাগের পদ রচনায় কবি যদুনন্দন দাস শ্রীরূপ গোস্বামীর বিদগ্ধ মাধব নাটকের একটি শ্লোকের অনুকরণ করিয়া লিখিলেন,

মুখে লৈতে কৃষ্ণ নাম নাচে তুণ্ড অবিরাম
আরতি বাড়ায় অতিশয়।
নাম সুমাধুরী পাঞা ধরিবারে নারে হিয়া
অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয়॥

এই জাতীয় পদে ভক্ত বৈষ্ণবের নাম জপের ভাবটাই বড়, প্রেমিকার প্রথম প্রণয়ের ব্যাকুলতা এবং প্রেমিকের নামোচ্চারণের আনন্দ চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় না। বৃন্দাবনের প্রভাবই এই জাতীয় পদে প্রকট হইয়াছে। মাথুর পদাবলীতে বিপ্রলম্ভ রসের অপূর্ব নির্ঝর সৃষ্টি হয়। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদে সেই কাব্যসুধার অজস্র পরিচয়। গোস্বামীদের প্রভাবে নরোত্তম দাস যে মাথুর পদ লিখিয়াছেন তাহাতে বিরহবেদনা অপেক্ষা কৃষ্ণসেবার মনোভাবই প্রধান। নরোত্তম লিখিয়াছেন,

তোমা না দেখিয়া শ্যাম মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কি যমুনায় দিব ঝাঁপ॥
একবার পাইলে রাঙ্গা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে থুইয়া জুড়াব পরাণি॥
মুখের মুছিব ঘাম খাওয়াব পানগুয়া।
শ্রমেতে বাতাস দিব চন্দন আর চুয়া॥

এই পদগুলি ঠিক প্রেমিক কবির নয়, ভক্ত বৈষ্ণবের। চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদ অবস্থার অনুকরণেই রাধার ব্যাকুলতা প্রদর্শিত হইয়াছে। নরহরি গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে লিখিলেন,

"গম্ভীরা ভিতরে গোরা রায়। জাগিয়া রজনী পোহায়।"

অতএব বলরাম দাস রাধা সম্বন্ধে লিখিলেন, "কাল রাতি না পোহায়, কত জাগিব বসিয়া।" ইত্যাদি। বস্তুতঃ বৃন্দাবনীয় তত্ত্বদর্শন রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনীকে প্রভাবিত করার ফলে মানবিক অনুভূতির কাব্যরস প্রবাহ যে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। কাব্যকলার উৎকর্ষ ঘটিলেও কাব্যরসের বিচ্যুতি অবশ্যই ঘটিয়াছে।

প্রশ্ন ২৭। "শাক্তভাবাদর্শ একদিকে চণ্ডীমঙ্গল অভয়ামঙ্গলে, অপরদিকে শাক্ত পদশাখাকে আশ্রয় করিয়াছে।" শাক্তসাহিত্যের এই দুই রূপের তুলনামূলক আলোচনা কর। [ক. বি. ১৯৬৭]

উত্তর। শাক্তভাবাদর্শ অতি সুপ্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যকে প্রভাবিত করিয়াছে। এই বিশ্বসৃষ্টির মূলে একটি সৃজনী শক্তি আছে, সৃষ্ট বিশ্বের জন্য

আছে পালনী শক্তি এবং অবাঞ্ছিত বিশ্বের ধ্বংসের জন্য নাশিনী শক্তি। এই শক্তিকে মাতা কল্পনা করিয়া ধর্মে ও সাহিত্যে শক্তিবন্দনা করা হয়। ঋগ্বেদে আদ্যাশক্তির বন্দনা আছে দেবীসূক্তে। পরবর্তী কালে বিভিন্ন পুরাণে এই শক্তিকে চণ্ডিকা বলা হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি পুরাণে চণ্ডী, পার্বতী, অন্নদা, অন্নপূর্ণা, কালিকা প্রভৃতি নাম এবং নানা প্রকার রূপভেদের মধ্যে শক্তি দেবতার সৃজনী-পালনী-নাশিনী শক্তির পরিচয় বিধৃত হইয়া আছে।

বাংলা সাহিত্যে শক্তি দেবতার অধিকার নিতান্ত সামান্য নহে। বাংলা শাক্ত সাহিত্যে যে দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে সেই দেবতা লৌকিক ও পৌরাণিক উপাদানে গঠিত। সংস্কৃত পুরাণ অবলম্বনে পৌরাণিক দেবতার বিষয় লইয়া দুর্গামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল ও অন্নপূর্ণা মঙ্গলের মত অল্প কিছু সাহিত্য রচিত হয়। কিন্তু বাংলা মঙ্গল কাব্যের একটি বৃহৎ অংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লৌকিক উপাদানের বিষয়। চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডী এবং মনসা মঙ্গলের মনসা বিশুদ্ধ পৌরাণিক দেবতা নহেন। শক্তি দেবতারূপে ইহারাই বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে জাঁকাইয়া বসিয়াছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে শাক্ত ভাবাদর্শ মুখ্যতঃ পৌরাণিক ও লৌকিক চণ্ডীর আখ্যান অবলম্বনে প্রতিষ্ঠা পায়। লৌকিক চণ্ডীকে আশ্রয় করিয়া চণ্ডীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, অভয়ামঙ্গল প্রভৃতি বিভিন্ন নামে কালকেতু ও ধনপতি সদাগরের কাহিনী বর্ণিত হয়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে এই জাতীয় সাহিত্যেরই ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাক্ত সাহিত্যের নবরূপ ফুটিয়া উঠে। রূপে ও রসে ও ভাবাদর্শে অভিনব এক পদসাহিত্য এই যুগের শাক্ত সাহিত্যকে বিশিষ্টতা দিয়াছে। বৈষ্ণবপদাবলী দ্বারা প্রভাবিত শাক্তপদাবলীর উপাদান অবশ্য চণ্ডী, কালিকা, উমা, পার্বতী দুর্গা প্রভৃতি বিভিন্ন নামের একই পৌরাণিক শক্তিদেবী। তবুও চণ্ডীমঙ্গল অভয়ামঙ্গল প্রভৃতি আখ্যান কাব্যের সহিত শাক্তপদাবলীর আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত মৌলিক পার্থক্য অতি স্পষ্টভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শাক্ত সাহিত্যের এই দুই রূপের তুলনামূলক আলোচনায় প্রথমেই চোখে পড়ে কাব্যরূপের পার্থক্য। চণ্ডীমঙ্গল আখ্যান কাব্য, শাক্তপদাবলী গীতিসাহিত্য; একটিতে গল্পরসের কৌতূহল, অপরটিতে ভাবরসের ব্যঞ্জনা। শাক্ত ভাবাদর্শের মূলকথা যে ভক্তি সেই ভক্তিতেই এই দুই সাহিত্যের মধ্যে প্রধান প্রভেদ অভিব্যক্ত হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যে শক্তিদেবতাকে অনুগ্রহ-প্রদায়িনী ও নিগ্রহকারিণী শক্তিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে; কিন্তু শাক্তপদাবলীতে ইনি মোক্ষদায়িনী জননী। মঙ্গলকাব্যে দেবীর অনুগ্রহে কালকেতু রাজা হয়, নিগ্রহে ধনপতি সর্বস্বান্ত হইয়া বন্দী হয়। দেবীর কাছে প্রার্থনা—ধন দাও, পুত্র দাও, ঐশ্বর্য দাও, শত্রু নিপাত কর। ভয় ও স্বার্থবুদ্ধিতেই দেবীর প্রতি ভক্তির আধিক্য "ধনেপুত্রে মোর যেন বাড়ে ঠাকুরাল।" অথবা, "আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।"—এই জাতীয় স্বার্থবুদ্ধিই প্রধানতঃ ভক্তিভাবের হেতু। দেবীও নিজের পূজা প্রচারের স্বার্থে ভক্তকে অনুগ্রহ করেন এবং অভক্তকে নিষ্ঠুর ভাবে নিগ্রহ করেন।

শাক্তপদাবলীতে দেবীর অনুগ্রহ-নিগ্রহের ক্ষমতার কথা কোন লৌকিক কাহিনীর দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইবার চেষ্টা নাই। বাৎসল্যরস ও একনিষ্ঠ অহেতুকী ভক্তির উচ্ছলিত আবেগ গীতিকবিতার মাধুর্যের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া কবিরা কাব্যরচনা করিয়াছেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাৎসল্যভাবের পূর্ণ-বিকাশ নাই। কিন্তু শাক্তপদে ষড়ৈশ্বর্যময়ী ব্রহ্মরূপিণীকে কবিরা জননী কল্পনা করিয়া তাঁহার স্নেহাঞ্চলে আশ্রয় খুঁজিয়াছেন, শ্যামা মায়ের কোলের ছেলে সাজিয়া আবদার করিয়াছেন, অভিমান ও ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। শক্তি দেবতাকে তাঁহারা মৃত্যুভয়বারিণী ও মোক্ষদায়িনী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং সেই জগজ্জননীর চরণে নিজেদের নিঃশেষে নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন। শাক্তপদাবলীতে ভক্ত গৃহী, তান্ত্রিক সাধক যেমন ভাবে মাতৃমহাভাবের পরিচয় দিয়াছেন, ঠিক সেই ভাবেই রাজা-মহারাজ-উজির-দেওয়ানেরা অকুণ্ঠ ভক্তিভাব দেখাইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই ধর্মমতে শাক্ত ছিলেন। শাক্ত হওয়া মঙ্গলকাব্যরচয়িতার পক্ষে অনিবার্য ছিলনা। রামপ্রসাদ আগমনী-বিজয়ার পদগুলিতে কিঞ্চিৎ কাহিনী-কৌতূহল সৃষ্টি করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তথাপি শাক্ত সঙ্গীত গীতিকবিতাধর্মী, মঙ্গলকাব্যের মত আখ্যান বৈশিষ্ট্য হইতে প্রকাশ পায় নাই।

অভয়া মঙ্গল জাতীয় কাব্যের সহিত শাক্ত পদাবলীর আরও পার্থক্য আছে। মূল পার্থক্য অবশ্য ভক্তিভাবের এবং আঙ্গিক বৈচিত্র্যের। অন্য একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য এই যে শাক্তপদাবলীতে হিন্দুতন্ত্রের সুস্পষ্ট প্রভাব আছে। কায়া-সাধনার নানা কৃত্য পদাবলীতে বিভিন্ন রূপকে প্রকাশ করা হইয়াছে। তন্ত্র মতে শক্তিতত্ত্বের নানা প্রসঙ্গ শাক্তপদে রূপকচ্ছলে বলা হইয়াছে। জীবনাশ্রয়ী রূপকে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতেই মন্ময় গীতিকবিতার রসোৎকর্ষ সৃষ্টি হইয়াছে। জীবনে চরম দুঃখ কষ্টের জন্য জগতের জননীকে দায়ী করিয়া কবিরা যে ক্ষোভ এবং অভিমান প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সমকালীন জীবনের প্রতিচ্ছবিও রচিত হইয়াছে। সুতরাং শাক্ত ভাবাদর্শ যে দুই শ্রেণীর কাব্যধারা অবলম্বন করিয়াছিল তাহাতে কালগত ব্যবধানের সঙ্গে রসগত ও রূপগত পার্থক্যও স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রশ্ন.২৮। প্রথম যুগের মঙ্গলকাব্যের তুলনায় ভারতচন্দ্রের মঙ্গলকাব্যের ভাব-কল্পনা ও আলোচনা-ভঙ্গির রূপান্তরের প্রকৃতি নির্ণয় কর। [ক. বি. ১৯৬১]

উত্তর। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণসৌধ। অসাধারণ প্রতিভাধর এই পণ্ডিত কবি প্রাচীন যুগের মঙ্গলকাব্যের কাঠামোর মধ্যে এক অভিনব কাব্য-প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে রায় গুণাকর কবি ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল নামে 'নূতন মঙ্গল' রচনা করেন। এই মঙ্গলকাব্যখানি প্রাচীন যুগের মঙ্গলকাব্যের তুলনায় নানা কারণে অভিনব। ভাব কল্পনায় এবং আলোচনা ভঙ্গিতে কবি ভারতচন্দ্র পুরাতনের অনুবৃত্তির মধ্যেও বেশ উল্লেখযোগ্য রূপান্তরের আভাস দিয়াছেন।

ভারতচন্দ্র মুখ্যতঃ প্রাচীনযুগের মঙ্গলকাব্য রচনার পদ্ধতি অবলম্বন করেন। চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গলের মতই প্রথমে দেবকাহিনীতে হরগৌরীর প্রসঙ্গ এবং পৌরাণিক দেবতাদের বন্দনা। গ্রন্থের মধ্যে আত্মপরিচয় এবং পৃষ্ঠপোষকের উল্লেখ, স্বপ্নাদেশে গ্রন্থ রচনা প্রভৃতি প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের মতই লিখিয়াছেন। শাপভ্রষ্ট কোন দেবতাকে নররূপে জন্মগ্রহণ করাইয়া তাহার সহায়তায় দেবতার পূজা-প্রচার করা হইয়াছে। দেবীর অনুগ্রহ ও নিগ্রহের নানা পরিচয়ও গ্রন্থমধ্যে প্রাচীন কাব্যধারার অনুরূপ। সুতরাং বহিরঙ্গীয় ঠাটে ভারতচন্দ্র প্রাচীন কবি বিজয়গুপ্ত, ক্ষেমানন্দ ও মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবির পথই ধরিয়াছিলেন। কিন্তু ভাবকল্পনা, কাহিনী-বিন্যাস, দেব-পরিকল্পনা এবং আলোচনা-পদ্ধতিতে তিনি স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন করায় অন্নদামঙ্গল কাব্যখানি প্রাচীন মঙ্গলকাব্যধারার মধ্যেও বিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

প্রথম যুগের মঙ্গলকাব্যে যে ভক্তিভাব ছিল ভারতচন্দ্র তদনুরূপ ভক্তিভাব অবলম্বনে কাব্যরচনা করেন নাই। তিনি তাঁহার প্রতিপালক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব-পুরুষ ভবানন্দ মজুমদারকে শাপভ্রষ্ট দেবতা এবং অন্নদাদেবীর অনুগৃহীত রূপে প্রতিপাদন করিবার জন্য কাহিনী বিন্যাস করিয়াছেন। ভক্তিভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলে তিনি দেবখণ্ডে হরপার্বতীর প্রসঙ্গে এবং ব্যাসবৃত্তান্তে লঘুতরল হাস্যরসের ভঙ্গি অবলম্বন করিতেন না। কালিকামঙ্গল কাব্যে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীতে তিনি লৌকিক প্রেমের সাধারণ গল্পকথা শুনাইয়াছেন। কালিকা দেবীর কথা শুধু স্বচ্ছ আবরণ মাত্র, শুধু ক্ষীণসূত্রে দেবতার সঙ্গে মানব-প্রসঙ্গের সংযোগ মাত্র। অন্যান্য মঙ্গল কাব্যে যেমন দেবতার মর্ত্যপূজা প্রচারের বিবরণ দ্বারাই কাহিনীর বয়ন-শিল্প, অন্নদা মঙ্গলেও বাহ্যতঃ তাহাই। দেবী অন্নদা হরি হোড়ের গৃহে অধিষ্ঠিতা হইলেন। বার্ধক্যে হরি হোড় দ্বিতীয়া পত্নী গ্রহণ করায় সপত্নী কলহের জ্বালায় দেবী হরি হোড়কে ত্যাগ করিয়া ভবানন্দ ভবনে গেলেন। ভবানন্দের সহায়তায় মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে দমন করিতে পারিয়াছিলেন। তাই ভবানন্দ রাজ্যেশ্বররূপে দিল্লীর সনদ পাইল। ভবানন্দের কাছে মানসিংহ বিদ্যাসুন্দরের গল্প শুনিলেন। এই ভাবে কাহিনী বলায় লৌকিক কথা মানুষের ইতিহাস ধর্মীয় কাব্যের বিষয়রূপে স্বীকৃতি লাভ করিল। বিজয়গুপ্ত, মুকুন্দরামের মত ভাব-কল্পনা লইয়া রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেন নাই। দেবতার কথাকে উপলক্ষ করিয়া মানুষের কথা বলাই কবির লক্ষ্য।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের আলোচনা ভঙ্গি অর্থাৎ কাব্যাঙ্গিকও মঙ্গলকাব্যের সাধারণ রীতির কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম। তিনি অন্নদা, কালিকা ও অন্নপূর্ণা—এই তিনজন দেবীর উল্লেখ করিয়াছেন। অন্নদা ও অন্নপূর্ণার কি প্রভেদ তাহাও কোন স্থলে স্পষ্ট নয়। কালিকাদেবী বিদ্যাসুন্দর কাব্যে অতি সামান্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। অন্নদা মঙ্গলের প্রথম খণ্ডই সাধারণ মঙ্গলকাব্যের মত মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের অনুসরণে রচিত। কুবের পুত্র বসুন্ধর শাপভ্রষ্ট হইয়া হরি হোড় রূপে জন্মগ্রহণ করে। অন্নদা তাহার প্রতি প্রথম অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, পরে তাহাকে বর্জন করিয়া মহারাজ

কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব পুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের গৃহে যাত্রা করেন। ঐতিহাসিক ব্যক্তি ভবানন্দকেও কবি শাপভ্রষ্টরূপে দেখাইয়াছেন। কুবেরের অন্যতম পুত্র নলকুবেরকে দেবী অভিশাপ দিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর কবি যেভাবে কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তাহা ঐতিহাসিক কাব্য এবং লৌকিক প্রণয় কাব্যের মত, সাধারণ মঙ্গলকাব্যের অনুরূপ নহে। কাব্যাঙ্গিক বিচারেও তিনটি কাহিনী তিনটি স্বতন্ত্র কাব্যের বিষয়। অতি ক্ষীণসূত্রে একটি কাহিনীর সহিত অন্য কাহিনীর সংযোগ সাধন করা হইয়াছে।

ভারতচন্দ্র বিদগ্ধ কবি, রাজসভার কবি, নাগরিক রসরুচির কবি। তিনি প্রথম যুগের মঙ্গলকাব্য রচয়িতাদের মত সরল ভক্তি ও সরলভঙ্গি প্রকাশ করেন নাই। ভাবকল্পনায় ও আলোচনাভঙ্গিতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাব কল্পনায় তিনি নাগরিক রুচির আনুগত্য করিয়া শৃঙ্গার রসাশ্রিত হাস্যরসের প্রাধান্য দিয়াছেন। শিবের বিবাহ বর্ণনা, ব্যাসকাশীর প্রসঙ্গ, অন্নদার রূপবর্ণনা, নারীগণের পতিনিন্দা প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ে ভারতচন্দ্র পরিহাস-প্রিয়তা ও শৃঙ্গার-রসরুচির পরিচয় দিয়াছেন। বিদ্যাসুন্দর কাহিনীতে কবি শ্লীলতার সীমাও লঙ্ঘন করিয়াছেন; দেবভক্তির কোন শান্তসুন্দর পরিবেশ ঐ কাব্যে নাই। ভাষাশিল্পে, ছন্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগে, বৈদগ্ধ্যপূর্ণ শ্লেষবক্রোক্তিতে কবি যে আলোচনাভঙ্গির বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা প্রথম যুগের মঙ্গলকাব্যে দেখা যায় না। ভারতচন্দ্রের কাব্যের দেবতারা পৌরাণিক মহিমায় ভয়ভক্তির উদ্রেক করে না। শিব, দুর্গা, ব্যাস, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতারা বাংলাদেশের নরনারীর মত আচরণ করিয়া কৌতুকরসের বিষয় হইয়াছেন। দেবতাদের সম্বন্ধে এই জাতীয় রঙ্গব্যঙ্গ প্রথমযুগের মঙ্গল কাব্যে ছিল না। আসলকথা, কাব্যের অনেক স্থলেই দেখা যায় যে ভারতচন্দ্র পূর্বতন যুগের মঙ্গলকাব্যের মত কোন গভীর ভাবদ্যোতক মহাকাব্যের কাহিনী রচনা করিবার প্রয়াস করেন নাই। তিনি এমন আলোচনাভঙ্গি অবলম্বন করিয়াছেন যাহাতে জীবনের লঘুতরল দিকটি খণ্ড খণ্ড দৃশ্য রূপে চমকপ্রদ হইয়া উঠে। ভাবকল্পনায় ও আলোচনা ভঙ্গিতে এই বিশিষ্টতার জন্যই অন্নদামঙ্গল প্রাচীন মঙ্গলকাব্যধারায় কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম সৃষ্টি করিয়াছে।

প্রশ্ন ২৯। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে সমসাময়িক সমাজজীবনের প্রতিফলন কোথায় এবং কি পরিমাণে আছে তাহা নির্দেশ কর। [ক বি. ১৯৬৪]

উত্তর। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে পূর্বতন যুগের কাব্যধারার যথাসম্ভব অনুবর্তন হইয়াছিল এবং কিছু কিছু নূতন ধারারও সংযোজন ঘটে। ইসলাম শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে বাংলা সাহিত্য ত্রিস্রোতা হইয়াছিল। অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণবপদাবলী—এই তিনটি ধারায় প্রবাহিত সাহিত্য বাংলাদেশকে রসসিক্ত করিয়া তোলে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ত্রিধারার প্রবাহ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তদুপরি আরাকান রাজসভাকে কেন্দ্র করিয়া রোমান্টিক প্রণয় কাব্যের ধারা এবং উত্তর-পূর্ব বঙ্গের শৈবসিদ্ধাচার্যদের গাথা

বা নাথ সাহিত্যের ধারা এই যুগের সাহিত্য ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছিল। এই সাহিত্যের মধ্যে সমসাময়িক সমাজজীবনের যথাসম্ভব প্রতিফলন ঘটিয়াছিল।

সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজজীবনে একটা বড় রকমের বিবর্তন ঘটে। তখন মোগল শাসনের যুগ এবং বাংলাদেশেও নবাবী আমল। ভক্তির শিথিলতা, দেবতায় অবিশ্বাস, অন্ধ কুসংস্কার, বিলাস প্রবণতা, ভোগ-লোলুপতা, হীন ষড়যন্ত্র ও স্বার্থপরতা সমাজ-জীবনকে কলুষিত করিয়া তোলে। মোগল শাসনের অন্তিম লগ্নে দেশব্যাপী অনাচার অত্যাচারের উত্তাল তরঙ্গ। নবাবী শাসনে দুর্নীতি, কুটিল ষড়যন্ত্র ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা। সাধারণ মানুষের ধন, মান ও প্রাণের কোন নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা ছিল না। এই অবস্থায় কোন বৃহৎ মহৎ কাব্য রচিত হইবার পরিবেশ ছিল না। যে দুই একটি বিস্ময়কর প্রতিভা এই যুগে দীপ্যমান হইয়াছিল তাহাতেও স্পষ্টতঃ অবক্ষয়ের চিহ্ন ফুটিয়া উঠে। অনুবাদ, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব ও অন্যান্য সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত গ্রহণ করিলেই সাহিত্যে যুগচিহ্নের প্রতিফলন দৃষ্ট হইবে।

অনুবাদ সাহিত্যে প্রাচীনধারার অনুবর্তনে রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের অনুবাদ সংখ্যা অল্প নয়। তবে কবিরা কেহই আক্ষরিক অনুবাদের পথ গ্রহণ করেন নাই। কবিচন্দ্রের রামায়ণে শিবরামের যুদ্ধ, ভস্মলোচনের পালা, মহীরাবণের কাহিনী প্রভৃতি কৌতুকমিশ্র গল্পকৌতূহল সৃষ্টির চেষ্টা আছে। জগৎরাম রায়ের অদ্ভুত রামায়ণ' ভক্তি-প্রণোদিত রচনা কিনা সন্দেহ। রামানন্দ যতি রামায়ণ কাব্যে দেবভক্তিতে অনাস্থা প্রকাশ করিয়া জগন্নাথদেবের মূর্তিকে কাষ্ঠমাত্র বলিতেও দ্বিধা করেন নাই। সমসাময়িক সমাজজীবনে যে ভক্তিভাবহীনতা দেখা দিয়াছিল তাহারই প্রতিফলন সাহিত্যে হয়। ভাগবতের অনুবাদে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব এবং অসুরঘাতনের বর্ণনা অপেক্ষা রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার নানা কৌতুককর কাহিনী উদ্ভাবিত হইয়াছে। কবিচন্দ্রের ভাগবতে রাধাকৃষ্ণের লুকোচুরি খেলা, হাডুডু খেলা, রাধার কলঙ্কভঞ্জন প্রভৃতি বিষয় সোৎসাহে বর্ণিত। অনুবাদ সাহিত্যে ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা দেখা যায় না। মোগল শাসনের অবসানকালে জীবন সম্বন্ধে যে লঘুতরল মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহারই প্রতিফলন পৌরাণিক কাহিনীগুলিতে দেখা যায়।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমাজজীবনে কৃত্রিমতা ও বিলাসপ্রিয়তার প্রাধান্য ঘটে। আমীর ওমরাহ এবং ধনী ভূস্বামীদের অনুগ্রহপুষ্ট কবিরা কাব্যরচনায় কৃত্রিম কাব্যকলার অনুসরণ করিতেন। ইহার প্রভাব বৈষ্ণব পদসাহিত্যেও প্রতিফলিত হয়। বৈষ্ণব কবিরা রূপ গোস্বামী দ্বারা নির্দেশিত অলঙ্কার শাস্ত্রানুসারে কাব্য লিখিতেন। আলঙ্কারিক পাণ্ডিত্য প্রদর্শন, শব্দ ও ছন্দ প্রয়োগে চমকপ্রদ দক্ষতা দ্বারা বাহ্য-জৌলুষ বৃদ্ধির চেষ্টায় কাব্যধারা অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে উঠে। বৈষ্ণব পদ সাহিত্য সমাজ ভিত্তিক রচনা নয় বলিয়া সমাজ রুচির প্রভাব এই সাহিত্যে পরোক্ষ।

সমাজজীবনের ছবি অনেকটা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে মঙ্গল কাব্যধারা এবং ঐ জাতীয় সাহিত্যে। শিবমঙ্গল বা শিবায়ণ নামে যে কাব্যকথা রামকৃষ্ণ রায়

ও রামেশ্বর ভট্টাচার্যের রচনায় বিশিষ্টতা অর্জন করে তাহার মধ্যে নীতিভ্রষ্ট ক্ষয়িষ্ণু সমাজেরই প্রতিফলন। হর-পার্বতীর লৌকিক আখ্যান লঘুকৌতুক ও কুরুচিতে পরিপূর্ণ। রামানন্দ যতি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মুকুন্দরামের স্বপ্নাদেশ ও অলৌকিকতার নিন্দা করিয়াছেন। সমাজ জীবনে যে ভক্তিভাবের অভাব ছিল এবং বাস্তববুদ্ধি প্রখর হইয়াছিল তাহা এই যুগের অনেক সাহিত্যেই দেখা যায়। রাধাকান্ত মিশ্র 'শ্যামার মঙ্গল' নামক কাব্যে পূর্ববর্তী কবিদের গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণের অলৌকিকতা লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' কাব্যে বাংলাদেশে বর্গীর হাঙ্গামা বর্ণিত হইয়াছে। ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদামঙ্গল কাব্যে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের জীবনকথা লিখিয়াছেন। সমাজ রুচির আনুগত্যে তিনি পৌরাণিক প্রসঙ্গে শিব ও ব্যাসকে লইয়া হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন। লৌকিক প্রসঙ্গে সাধারণ মানুষের চিত্র রচনায় যুগধর্ম প্রতিফলিত করিয়াছেন। কালিকাদেবীর ক্ষীণ আবরণ দিয়া তিনি বিদ্যাসুন্দরের লৌকিক প্রণয়কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় আদিরস এবং হাস্যরসের প্রাধান্য সামাজিক কারণেই ঘটিয়াছে। শৈব সিদ্ধাচার্যদের ধর্মীয় কাহিনী নাথ সাহিত্যের মধ্যেও উত্তর পূর্ববঙ্গের সমাজজীবনের চিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাক্তসাহিত্যে যেমন চণ্ডীমঙ্গলাদির মত আখ্যানধারা ছিল তেমনি বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে শাক্ত পদাবলীর ধারাও প্রবহমান হয়। ঐ পদগুলিতে অনিশ্চিত জীবন-পরিণামের উৎকণ্ঠা ও দৈবনির্ভরতার মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। রাম প্রসাদের আগমনী-বিজয়া সঙ্গীতগুলির মধ্যে বাঙ্গালীর কৌলীন্যপ্রথা, দারিদ্র্য এবং গার্হস্থ্যজীবনের ছবি প্রতিফলিত। রায় মঙ্গল নামক কাব্যে দক্ষিণপূর্ব বাংলাদেশের সমাজজীবন, হিন্দুমুসলমানের সংঘর্ষ ও সমন্বয় স্পষ্ট রেখায় বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই যুগে যত রকম সাহিত্যই রচিত হইয়াছে তাহাতে সমাজের দুঃখকষ্ট, অনিশ্চয়তার উৎকণ্ঠা, কৃত্রিমতা, বিলাসপ্রিয়তা, কুরুচি এবং জীবনবোধের গভীরতার অভাব প্রতিফলিত হওয়ায় যুগোত্তীর্ণ নিত্যকালীন মহতী সৃষ্টি সম্ভাবিত হয় নাই।

প্রশ্ন ৩০। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে বাংলা সাহিত্যে কোন্ কোন্ নূতন প্রবণতার উন্মেষ হইয়াছিল তাহা অব্যবহিত পূর্ববর্তী সাহিত্যের স'হত তুলনা করিয়া দেখাও। [ক. বি. ১৯৬৫]

উত্তর। প্রাচীন যুগের কাব্যের মূল প্রেরণা ছিল দেবতায় অকুণ্ঠিত বিশ্বাস অর্থাৎ পুরাপুরি দৈবনির্ভরতা। প্রাচীন যুগের এই ভক্তিবাদ ও ভাবকল্পনা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে সর্বতোভাবে রক্ষিত হয় নাই। তাহা ছাড়া কিছু নূতন প্রবণতার উন্মেষ হইয়াছিল।

সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই দিল্লীর মসনদকে কেন্দ্র করিয়া কুৎসিত ষড়যন্ত্র এবং লোভ লালসার উদ্দামতা নাগরিক জীবনকে বিষাক্ত করিয়া তোলে। ঔরংজীবের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে মোগল শাসন শিথিল হয়। মুর্শিদকুলী খাঁ এবং তাহার উত্তরাধিকারীরা

বিলাসব্যসনে মত্ত হয়, দেশের ধনী জমিদার সম্প্রদায় ষড়যন্ত্র-পরায়ণ হইয়া উঠে। ইহার প্রতিফলন সমাজব্যবস্থায় ও সাহিত্য রচনায় সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

পঞ্চদশ শতাব্দী হইতেই অনুবাদ-সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণব পদাবলী এই তিনটি ধারায় বাংলা কাব্যের গতিপথ নির্ণীত হইয়াছিল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই তিন শ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যেই বাহ্যিক কারুকলা এবং ভক্তিভাবহীনতার প্রবণতা দেখা দিয়াছিল। কাশীরাম দাসের পর যাঁহারা রামায়ণ ও মহাভারত কাব্য লিখিয়াছেন তাঁহারা লঘু তরল ভঙ্গিতে কৌতুক কাহিনী বর্ণনার দিকেই বেশী ঝোঁক দিয়াছিলেন। কবিচন্দ্র শিবরামের যুদ্ধ, মহীরাবণের পালা, ভস্মলোচনের কাহিনী প্রভৃতি কৌতুক কাহিনী লেখেন। জগৎরামের রামায়ণে দেবভক্তিতে অনাস্থা প্রকাশ করা হইয়াছে এবং উদ্ভট গল্পের অবতারণা করা হয়। রামানন্দ যতি অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামায়ণ কাব্যে জগন্নাথ দেবের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—

দারুব্রহ্ম সেবা করি জেরবার হৈল।
বৃথা কাষ্ঠ সেবি কাল কাটা নহে ভাল॥

জগন্নাথদেবের মূর্তিকে শুধু কাঠ বলার দুঃসাহস ইনি দেখাইয়াছেন।

এই শতাব্দীতে যাঁহারা ভাগবতের অনুবাদ করিয়াছেন তাঁহারা কৃষ্ণভক্তির গভীরতার স্থলে লঘু হাস্যরসের কাহিনী কৌতূহল সৃষ্টির দিকেই বেশি মনোযোগ দিয়াছিলেন। রাধাকৃষ্ণের লুকোচুরি, হাডুডু খেলা, কৃষ্ণের কালীরূপ ধারণ, রাধার কলঙ্ক ভঞ্জনের জন্য ছিদ্রযুক্ত কলসীতে জল আনয়ন প্রভৃতি গল্পকথাই ভাগবতের উপজীব্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল।

মঙ্গলকাব্যের রচয়িতাদের মধ্যেও ভক্তিভাবের গভীরতার অভাব পরিস্ফুট হয়। রামানন্দ যতি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালকেতুকে শাপভ্রষ্ট ইন্দ্রকুমার বলেন নাই। তিনি অলৌকিক কাহিনী বর্ণনার জন্য পূর্ববর্তী কবি মুকুন্দরামের নিন্দা করিয়াছেন। রাধাকান্ত মিশ্র নামক একজন কবি 'শ্যামার মঙ্গল' নামক কাব্যে স্বপ্নাদেশে কাব্যরচনার প্রসঙ্গকে ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছেন,—

কেহ কহে মায়ের হইয়াছে প্রত্যাদেশ।
কেহ কহে দিলা দেখা ধরি নিজ বেশ॥
কেহ কহে জিহ্বাতে কবিতা দিল লিখি।
কেহ কেহ বলে আমি স্বপনেতে দেখি॥
যে পদ ধেয়ান করি না পায় বিধাতা।
মানব হইয়া কেহ কহে হেন কথা॥

এই জাতীয় অবিশ্বাসের মনোভাব এবং বিচার প্রবণতা অষ্টাদশ শতাব্দীর জনমানসে দেখা দিয়াছিল এবং সাহিত্যে তাহার প্রতিফলন ঘটিয়াছে। ভারতচন্দ্রের মত প্রতিভাবান্ কবিও প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের ভক্তিভাব এবং কাহিনী-গাম্ভীর্য অব্যাহত রাখিতে পারেন নাই। অন্নদামঙ্গল কাব্যে হর-পার্বতীর কাহিনী লঘু হাস্যরসের বিষয়। ব্যাস চরিত্র পৌরাণিক আদর্শ হইতে বিচ্যুত। কালিকাদেবীর নামে বিদ্যা ও সুন্দরের

লৌকিক প্রেম ও দেহ বিলাসের বর্ণনা যুগরুচিকে প্রকটিত করিয়াছে। ভক্তি ভাবের স্থলে হাস্য রসের তারল্যের দিকেই এই যুগের যে প্রবণতা ছিল তাহার অপার নিদর্শন এই যুগের রচনা শিবায়ন কাব্যগুলি। কৃষক শিবের অসংযত চরিত্র এবং দাম্পত্য জীবনের চিত্র অবলম্বনে যে কাহিনী রচিত হইয়াছে তাহা সাধারণ মঙ্গল কাব্যের ব্যতিক্রম। এই যুগেই রায় মঙ্গল ও সত্য নারায়ণের পাঁচালী জাতীয় কাব্য রচিত হইয়াছে। ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণ রায় এবং কুম্ভীর দেবতা কালু রায়কে লইয়া নিম্ন বঙ্গের সমাজজীবন ও হিন্দু মুসলমানের বিরোধ সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টার মধ্যে যুগধর্মের চিহ্ন ফুটিয়াছে।

ঐতিহাসিক ও মানবিক বিষয়কে কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা এই যুগের সাহিত্যের একটি প্রবণতা। রোসাঙ রাজসভায় সপ্তদশ শতাব্দীতে লৌকিক প্রণয় কাব্য 'লোরচন্দ্রানী' রচিত হয়। ইতিহাসের বিষয় লইয়া 'পদ্মাবতী', 'সেকেন্দার নামা' রচিত হয়। বাংলায় গঙ্গারামের লেখা 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' কাব্যে বর্গীর হাঙ্গামা কাব্যকথা হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাস্তববুদ্ধি, মানবিক প্রেরণা এবং সমসাময়িক যুগচেতনার দিকেই সাহিত্যের ঝোঁক।

অষ্টাদশ-শতাব্দীতেই সাহিত্যে গীতিপ্রবণতার আধিক্য দেখা যায়। ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যে প্রতিটি প্রসঙ্গের সূচনায় গীতকবিতা লিখিয়াছেন। কবিগান ও পাঁচালী সঙ্গীতে ঐগুলির প্রচুর প্রয়োগ ঘটিয়াছিল। এই যুগে শক্তিদেবতা অবলম্বনে বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে শাক্ত পদাবলীর গীতিধারা প্রবহমান হইতে থাকে। রামপ্রসাদের আগমনী বিজয়া, কমলাকান্তের পদাবলী নবপ্রবর্তিত ধারার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে এই যুগের অন্যতম প্রবণতা যুক্তিবাদ ও বিচারশীলতা। ইংরাজ বণিকেরা এবং পর্তুগীজ পাদ্রীরা প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর গদ্যভাষার অনুশীলন আরম্ভ হয়। তাহাতে সাহিত্যে যুক্তিবাদের প্রাধান্য ঘটে। সুতরাং এই যুগের সাহিত্য পুরাতনের পুনরাবৃত্তি হইলেও ইহার মধ্যে নবতর জীবন জিজ্ঞাসার ইঙ্গিত আছে। পুরাতন যুগের অনুরূপ মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছে; কিন্তু ভক্তির স্থলে অবিশ্বাস, শান্তরসের স্থলে হাস্যরসের বিকাশ, অনুভূতির সাবলীল প্রকাশ অপেক্ষা কৃত্রিম কাব্যকলার অবকাশ। এদিকে যুক্তিবাদ ও মানবিকতার স্ফুরণে সমসাময়িক সমাজ চেতনাও কাব্যকে বিশিষ্ট করে। তাই সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্য ভাবে, রসে ও প্রকাশভঙ্গিতে স্বতন্ত্র পথের সূচনা করিয়া দিয়াছিল।

প্রশ্ন ৩১। লোকসাহিত্যের প্রকৃত সংজ্ঞা নির্ণয় কর। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশে কি কি লোকসাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা উল্লেখ করিয়া উহার কাব্যমূল্য বিচার কর। [ক. বি ১৯৬৩]

উত্তর। লোকসাহিত্যের প্রকৃত সংজ্ঞা নির্ণয় খুবই কঠিন। লোকসাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁহার সুবিখ্যাত 'বাংলার লোকসাহিত্য'

গ্রন্থের প্রথম অনুচ্ছেদেই বলিয়াছেন, "লোকসাহিত্য কাহাকে বলে? এই বিষয়ে কেবল মাত্র আমাদের দেশের কেন, পাশ্চাত্ত্য সমালোচকদের মধ্যেও যে একটি সুস্পষ্ট ধারণা প্রচলিত আছে, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। তবে ইহার সম্বন্ধে একটি বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য সকল সমালোচকই প্রায় একমত হইয়া থাকেন যে, ইহা সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি, ব্যক্তিবিশেষের একক সৃষ্টি নহে।" লোক সাহিত্যকে উচ্চতর সমাজের নাগরিক সাহিত্যের বিপরীত অর্থেই গ্রহণ করা হয়। পাশ্চাত্ত্য Folk-lore শব্দের প্রতিশব্দরূপেই আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে লোকসাহিত্য শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। Encyclopaedia গ্রন্থে বলা হইয়াছে "The general usage is towards restricting the province of Folk-lore to the culture of the backward elements in civilised societies." সাধারণভাবে গ্রামের অশিক্ষিত নিম্নবিত্ত জনসাধারণের মধ্যে ছড়া, প্রবাদ, গান ও কথকতার যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটে তাহাকেই লোকসাহিত্য নামে পরিচয় দেওয়া হয়। এই সাহিত্যের কোন সুনির্দিষ্ট নামকরা লেখক থাকে না। শিল্পরচনার কোন পূর্বনির্দিষ্ট আদর্শও থাকে না। একান্তভাবে সহজ-কবিত্বের অধিকার লইয়াই লোক সাহিত্যের শিল্পীরা সাহিত্যরচনা করেন। বহু নিরক্ষর কবিও লোকসাহিত্যের স্রষ্টা। ইহাদের রচনা সমগ্র সমাজের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য এবং ইহার মধ্যে গ্রামীণ সংস্কৃতির সহজ সুন্দর পরিচয় ফুটিয়া উঠে। ব্যক্তি-বিশেষের যে রচনা ক্রমশঃ সাধারণ সমাজের নৈর্ব্যক্তিক রচনা হইয়া উঠে তাহাকেই সাধারণতঃ লোকসাহিত্যরূপে গ্রহণ করা হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলায় লোকসাহিত্যের নানা পরিচয় আধুনিক গবেষকদের চেষ্টায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোন কোন সমালোচক মনে করেন যে বাংলাদেশে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে যে মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হইয়াছে উহাও প্রকৃতপক্ষে লোকসাহিত্যের মার্জিত সংস্করণ। বাংলার পল্লীঅঞ্চলে যে ব্রতকথা ও ব্রত-গানাদি লোকসাধারণের মধ্যে বিশেষতঃ নারীসমাজে প্রচলিত ছিল তাহাই শিক্ষিত কবির হাতে পড়িয়া উচ্চতর সাহিত্য হইয়াছে। কেহ কেহ রোসাঙ রাজ-সভায় সাহিত্যকেও লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী লিখিয়াছেন, "চট্টগ্রাম রোসাঙের মুসলমানী বাংলা সাহিত্যেও একাধারে হিন্দু-মুসলমানের অভিজাত তত্ত্বচিন্তার স্থূল হলেও, প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। কিন্তু এই তত্ত্বচিন্তা সর্বত্রই লোকস্বভাবান্বিত হয়ে উঠেছে বলে এই সব রচনাকে সার্থক লোক-সাহিত্য বলে স্বীকার করে নিতে বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসের কোন দ্বিধা নেই।"

এইভাবে ব্যাপকার্থে গ্রহণ করিলে বাংলার সমস্ত গেয় কাব্য এবং আখ্যান-গীতিকেই লোকসাহিত্য বলা চলে। ঝুমুর, ধামালী প্রভৃতি লোকসঙ্গীতগুলি হইতেই উচ্চতর কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচিত হইয়াছে। চৈতন্য ভাগবতে আছে "মঙ্গলচণ্ডীর গীত গায় জাগরণে। দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে॥ যোগীপাল মহীপাল ভোগীপাল গীত। ইহা শুনিয়া সব লোক আনন্দিত॥" উল্লিখিত গীতগুলিও লোকসাহিত্য। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে নাথ গীতিকাগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহাও লোকসাহিত্য সন্দেহ নাই।

ছড়ায় ও গানে গোরক্ষনাথ মীননাথের কাহিনী বাংলার আকাশে বাতাসে ছড়াইয়াছিল। গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতন কাব্যে তাহারই প্রতিফলন। গোপীচন্দ্রের পাঁচালী, ময়নামতীর গান লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ রূপসৃষ্টি। কাহিনী রসের দিক হইতে ইহাদের মানবিক আবেদন যথার্থ সাহিত্য-গুণান্বিত। নাগরিক সাহিত্যের বিদগ্ধতা ইহাতে নাই, কিন্তু সরল ভাষায় ভাবের অকৃত্রিমতা সহজ কবিত্বে প্রকাশ পাইয়াছে।

লোকসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য উপকরণ সাম্প্রতিক কালে আবিষ্কৃত হইয়াছে পূর্ব-বঙ্গের মৈমনসিংহ জিলায়। ঐগুলি পরম উপাদেয় পল্লীগীতিকা। ইংরাজী Ballad সাহিত্যের মত এই গীতিকাগুলিতে জনশ্রুতিমূলক লৌকিক কাহিনী বর্ণিত। অশিক্ষিত পল্লীকবিরা আত্মনির্লিপ্তভাবে ব্যর্থ প্রেমের করুণ কাহিনী রচনা করিতেন। মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কঙ্ক ও লীলা, কমলা, ধোবার পাট, মদিনা, দেওয়ান ভাবনা প্রভৃতি গীতিকাগুলি করুণরসের অফুরন্ত নির্ঝর। বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতায় এবং গ্রাম্য-জীবনের প্রতিচ্ছবি রচনায় এই পল্লী কবিরা অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। এই গীতিকাগুলির মধ্যে কিছু রূপকথা-জাতীয় রচনাও স্থান পাইয়াছে। তথাপি এই গীতিকার মধ্যে বাস্তবধর্মী উপন্যাস সাহিত্যের লক্ষণ দেখা যায়। গীতিকায় বাক্‌শিল্প নাই, অলঙ্কার নাই, কাব্যকলার কৌশলও নাই। অকপট প্রাণের সহজ কথা সরলতম গ্রাম্যভাষায় প্রকাশিত হওয়ায় এই গীতিকাগুলিতে বিশুদ্ধ কবিত্বের মধুরতম অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে।

লোকসাহিত্যের মধ্যে ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা এবং সঙ্গীতের অংশও নিতান্ত কম নয়। আধুনিক কালে লোকসঙ্গীতের দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রভূত সংগীত সংগৃহীত হইয়াছে। পটুয়া, ভাদু, তুষু ও টুসু, ঝুমুর, জারি, ঘাটু, ভাটিয়ালী প্রভৃতি কত প্রকার গান বাংলার গ্রামাঞ্চল মুখরিত রাখে। বাংলাদেশের নানা ধর্মসম্প্রদায় নানা প্রকার লোকসঙ্গীতের সাহায্যে নিজেদের ধর্ম-চেতনা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির পরিচয় দিত। বাউল, মুর্শীদা, মারফতি প্রভৃতি সঙ্গীত বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। কবি বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথ বহু বাউল গান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রচুর বাউল সংগীত সংগ্রহ করেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া বিরাট এক কোষগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এই গানগুলিতে যেমন আছে সাধনতত্ত্ব এবং সাধন-প্রক্রিয়া তেমনি আছে উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার স্বাভাবিক কাব্যলক্ষণ। কাঙাল ফিকির চাঁদ, লালন ফকির, গোঁসাই চাঁদ প্রভৃতি ভণিতাযুক্ত বাউল গানগুলিতে বিশুদ্ধ ঈশ্বরভক্তির অকৃত্রিম আবেগ এমন চমৎকার রূপকব্যঞ্জনায় প্রকাশ পাইয়াছে যে উহাদের তত্ত্বনিরপেক্ষ কাব্যরস সর্বসাধারণের উপভোগ্য হইয়াছে। 'আমার ডুব্‌ল নয়ন রসের তিমিরে', 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কমনে আসে যায়', 'নিঠুর গরজী, তুই কি মানস মুকুল ভাজবি আগুনে' প্রভৃতি সঙ্গীতের বাণীভঙ্গি উৎকৃষ্ট কাব্যের ইঙ্গিত দেয়। এই সঙ্গীতগুলির বিপুল সমারোহ শুধু সাহিত্যের ভাণ্ডারকেই সমৃদ্ধ করে নাই বাংলার উচ্চতর গীতিসাহিত্যেরও প্রেরণা জোগাইয়াছে। বাংলাদেশের কবিগান, পাঁচালী

সঙ্গীত, শাক্তপদাবলী, দেহতত্ত্বের গান প্রভৃতি সব রকম সঙ্গীতের মধ্যেই লোকসঙ্গীতের সূক্ষ্মতর অথচ অনিবার্য প্রভাব অনুভব করা যায়।

লোকসাহিত্যের মধ্যে গ্রহণ করা হয় এইরূপ আরও কয়েকটি বিষয় আছে যাহা বিশুদ্ধ সাহিত্যপদবাচ্য নয় কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য। এইগুলিকে ছড়া, ধাঁধা ও প্রবাদ বলা হয়। ছড়া লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অংশ। শিশুর সঙ্গেই ছড়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। রবীন্দ্রনাথ 'ছেলে ভুলানো ছড়া'র আলোচনা করিয়াছেন, সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বহু মেয়েলি ছড়ারও সন্ধান পাওয়া গেছে। বৈচিত্র্যহীন একটানা সুরে অর্থহীন শব্দধ্বনির পুনঃপুনঃ আবৃত্তি ছড়ার বৈশিষ্ট্য। ছড়ার ছন্দের দান বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে নিতান্ত কম নয়। ধাঁধা আদিম সমাজের বিশুদ্ধ লোকসাহিত্য কি না সন্দেহ। ইহার মধ্যে বুদ্ধির খেলা, কৌতুকবোধ ও বাক্‌চাতুর্য লোকসাধারণের বিশিষ্টতা প্রকাশ করে। ধাঁধাগুলি ব্যক্তিত্ব-বর্জিত সাধারণের সম্পত্তি। প্রাচীন বহু কাব্যের মধ্যে নানাপ্রকার ধাঁধা পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের হেঁয়ালি পদগুলিও ধাঁধা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। 'বন থেকে এল টিয়ে সোনার টোপর মাথায় দিয়ে', 'নীর না ছুঁইবি সিনান করিবি', 'রূপের তেন্তুলি কুম্ভীরে খাএ'—এই সব পদ ধাঁধা সাহিত্যের দৃষ্টান্ত। প্রবাদের মধ্যে জনসমাজের ব্যাপক অভিজ্ঞতার পরিচয় সংক্ষিপ্ত সংহত ভাষণে প্রকাশ পায়। উচ্চতর নাগরিক সাহিত্যে লোকসাধারণের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ বাক্যগুলির প্রচুর ব্যবহার। আসলে এইগুলি লোকসাহিত্যেরই সম্পত্তি। লোকসাহিত্যের অধিকারকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করিলে বাংলা সাহিত্যের একটি বিরাট অংশকে প্রত্যক্ষতঃ এবং পরোক্ষতঃ ইহার অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং ইহার বিশুদ্ধ কাব্যমূল্যও স্বীকার করিতে হয়।

প্রশ্ন ৩২। টীকা লেখ :—

অদ্ভুত রামায়ণ [ক. বি., ১৯৬৮]

রামায়ণ কাহিনী অর্থাৎ রাম-রাবণের বিবরণাদি অবলম্বনে নানাপ্রকার অদ্ভুত কাহিনী আমাদের দেশে আছে। ঐ সব কাহিনীর উৎসরূপে সংস্কৃতে লেখা অদ্ভুত রামায়ণের উল্লেখ করা হয়। সংস্কৃতে লেখা রামায়ণের নানা রূপ দেখা যায়। বাল্মীকির লেখা সপ্তকাণ্ড রামায়ণই হয়ত আদি। হয়ত ঐ কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াই নানা কল্পিত কাহিনী গড়ে। বাল্মীকির নামে প্রচারিত যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ এবং অদ্ভুত রামায়ণে অনেক রকম অদ্ভুত গল্প আছে। ব্যাসদেবের নামে প্রচারিত অধ্যাত্ম রামায়ণেও নানা উদ্ভট কল্পনার পরিচয় আছে। অদ্ভুত রামায়ণে সীতাকে রাবণ-কন্যা ও রাবণকে শতমুণ্ড বলা হইয়াছে। দশরথের কন্যাদের কথা আছে। সীতাকর্তৃক সহস্রশীর্ষ রাবণের বধকাহিনী আছে। বাল্মীকির সপ্তকাণ্ডে যাহা নাই এমন সব অদ্ভুত উপাখ্যান অদ্ভুত রামায়ণে পাওয়া যায়। বঙ্গবাসী পত্রিকা হইতে এই কাব্যখানির বাংলা গদ্যে অনুবাদসহ একটি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রাচীন বাংলা রামায়ণ সাহিত্যের সহিত সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণের খুব নিকট সম্পর্ক আছে। মহাকবি কৃত্তিবাস মূল রামায়ণ রচনায় অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করিবার পর পরবর্তী কবিযশঃপ্রার্থীরা কাহিনী-কৌতূহল বৃদ্ধি করার জন্য মূল পথ ছাড়িয়া অদ্ভুত রামায়ণের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। পাবনার অমৃতকুণ্ডার কবি নিত্যানন্দ আচার্য এবং কবি চন্দ্রাবতী অদ্ভুত রামায়ণ হইতেই কিছু কাহিনী-উপকরণ আহরণ করেন। এমন কি, কৃত্তিবাসের ভণিতায়ও একখানি অদ্ভুত রামায়ণের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। এই পুঁথিতে রামের রাসনৃত্য আছে। অদ্ভুতাচার্যের ভণিতাযুক্ত 'শতস্কন্ধ রাবণ বধ' নামক একখানি পুঁথি পাওয়া যায়। ইহাতে সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণের অনুসরণ করা হইয়াছে। কৈলাস বসু অদ্ভুত রামায়ণের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছিলেন। মাণিকগঞ্জের রামশঙ্কর, সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিজ লক্ষ্মণ, ভবানীদাস প্রভৃতি রামায়ণ রচনায় অধ্যাত্ম রামায়ণ এবং অদ্ভুত রামায়ণ হইতে প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করিয়া কাব্যের কাহিনী-কৌতূহল বৃদ্ধি করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণের সঙ্গে বাংলা রামায়ণের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক।

অষ্টকালীন নিত্যলীলা [ক. বি., ১৯৬৬]

রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ সেবার জন্য বৈষ্ণব মোহান্তগণ সেবক ভক্তদের কিছু কিছু রীতিনীতি বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। সেই নিয়মগুলিকে কাব্যরসে মণ্ডিত করিবার জন্যই হয়ত কবি গোবিন্দ দাস "অষ্টকালীয় লীলা বর্ণন" করিয়াছিলেন। ৫১ সংখ্যক পদ-বিশিষ্ট এই কাব্যখানিকেই 'অষ্টকালীন নিত্যলীলা' বলা হইয়াছে। বৈষ্ণবদের ধারণা অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে নিত্যকিশোর কৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত নিত্যলীলায় মগ্ন হইয়া আছেন। সমস্ত দিন রাত্রির ২৪ ঘণ্টাকে আটটি প্রহরে ভাগ করা হয়। আট প্রহর ধরিয়া অর্থাৎ সমগ্র দিনরাত্রি ব্যাপিয়া যে লীলা নিত্যকাল ধরিয়া চলিতেছে তাহাই অষ্টকালীন নিত্যলীলা। ইহারই অনুকরণে অষ্টপ্রহর নামকীর্তনরীতি প্রবর্তিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

গোবিন্দদাসের অষ্টকালীন নিত্যলীলা কাব্যের অপর নাম 'একান্ন পদ'। এই নামে অনেক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে এবং এখনও কীর্তন গানে পদগুলির ব্যবহার হয়। পদগুলি সম্ভবতঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'গোবিন্দলীলামৃত' কাব্যের অনুকরণে রচিত। এক সূর্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া রাধাকৃষ্ণের দিনলিপি আর এক সূর্যোদয় পর্যন্ত কিরূপ হইল তাহা পর পর একান্নটি কবিতায় বলা হইয়াছে। বৃন্দা সখীর আহ্বানে ভোরে কুঞ্জভঙ্গ হইল, রাধা কৃষ্ণসঙ্গ ত্যাগ করিয়া নিজ গৃহে গেলেন। কৃষ্ণও মায়ের ডাকে শয্যাত্যাগ করিয়া দুগ্ধ দোহন করিতে লাগিল। সেই সময় রাধা স্নানে চলিয়াছেন। কৃষ্ণ দোহন শেষে গোধন লইয়া মাঠে গেলেন। সেখানে যমুনার তীরে মিলন হইল, জলকেলি হইল। কৃষ্ণ গৃহে ফিরিলেন, যশোদা দাসী পাঠাইয়া রাধাকে ডাকিয়া আনিলেন। রাধা আসিয়া কৃষ্ণকে রাঁধিয়া খাওয়াইয়া নিজগৃহে ফিরিলেন। অপরাহ্নে কুঞ্জগৃহে আবার মিলন হইল। দোলনায় দোলা হইল, রাধা ঘুমন্ত কৃষ্ণের

বাঁশী চুরি করিল। কৃষ্ণ মুরলী ভিক্ষা চাহিয়া লইলেন। অপরাহ্নকালীন প্রসাধন ও সাজসজ্জা হইল। উভয়ে স্ব স্ব গৃহে ফিরিলেন। কৃষ্ণ গোধনসহ গৃহে ফিরিলে যশোদা সস্নেহ সমাদর করিলেন। রাধাও গৃহে ফিরিয়া পরিজন সেবা করিল এবং পরিজনেরা নিদ্রিত হইলে নিভৃতে কৃষ্ণের কুঞ্জগৃহে অভিসার করিল। সেখানে সুখের মিলনরজনী অতিবাহিত হইল। প্রত্যহই এইরূপ লীলা চলে। ইহাই অষ্টকালীন নিত্যলীলা।

আলাওল [ক. বি, ১৯৫৯, ১৯৬১, ১৯৬৩]

আরাকান রাজসভায় শ্রীচন্দ্র সুধর্মার আমলে (১৬৫২—১৬৮৪ খ্রীঃ) আলাওল নামে একজন মুসলমান কবি ছিলেন। মাগন ঠাকুর (রাজার অমাত্য) এই শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আলাওল হিন্দী কবি মহম্মদ জায়সীর "পদুমাবৎ" কাব্যকে বাংলায় রূপ দেন। আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে কাহিনীভাগের মধ্যে ইসলামী জীবনযাত্রার কিছু সংমিশ্রণ থাকিলেও ইহার আলোচনারীতি প্রধানতঃ হিন্দুজীবন-দর্শনাশ্রয়ী। ইহার আকর্ষণ আখ্যানের অভিনবত্ব। বাংলা কাব্যে প্রচলিত বহুধাপুনরাবৃত্ত পৌরাণিক পরিমণ্ডলের সীমাতিক্রম করিয়া ইতিহাসের অনুপ্রবেশ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে আরও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ধর্ম প্রভাবোত্তীর্ণ মানবিক প্রেমের কাব্য-রূপায়ণ। এই কাব্যে বিষয়ের অভিনবত্বের সঙ্গে আস্বাদ বৈচিত্র্য যুক্ত হইয়া এক নূতন রস সঞ্চার করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে প্রেমকাহিনীর রূপকে অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাস ইহার প্রধান অবলম্বন।

আলাওলের অন্যান্য কাব্যগুলি—সয়ফুলমুলুক্ বদিউজ্জমাল (১৬৫৯), সপ্তপয়কর (১৬৬০), তোহ্ফা (১৬৬৪), সেকেন্দরনামা (১৬৭৬)।

আলাওলের জীবন নানা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। রাজরোষে তাহার ১১ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। তাঁহার উত্থান-পতন-বন্ধুর জীবনযাত্রার মধ্যে কি করিয়া তিনি এত পাণ্ডিত্য অধিকার করিলেন তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। যোগশাস্ত্র, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে তাঁহার অপরিসীম জ্ঞান ছিল। ইনি দৌলত কাজির অসমাপ্ত 'লোরচন্দ্রানী' বা 'সতীময়না' নামক কাব্যখানির শেষাংশ রচনা করিয়া কাব্যখানি সমাপ্ত করেন।

কড়চা, আর্যাতর্জা, ধুয়া, আখর [ক. বি., ১৯৬৫]

কড়চা—প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদানকে সাধারণতঃ কড়চা বলে। বৈষ্ণব-যুগে এই শব্দটিকে সংস্কৃত ভাষার মর্যাদা দেওয়া হইয়াছিল। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিকড়চায়াঃ শ্লোকঃ—ইত্যাদি। চৈতন্য-জীবন সম্বন্ধীয় বিবরণ-গুলিকেও কড়চা বলে। যথা—মুরারি গুপ্তের কড়চা, স্বরূপ দামোদরের কড়চা, গোবিন্দদাসের কড়চা ইত্যাদি।

কড়চা শব্দটি সম্ভবতঃ 'কারিকা' শব্দ হইতে উৎপন্ন। কারিকা অর্থে সংস্কৃত অভিধানাদিতে বলা হইয়াছে—কারিকা বিবরণ-শ্লোকঃ। কারিকাতু স্বল্পবৃত্তৌ বহোরর্থস্য সূচনম্। দিনলিপির আকারে রক্ষিত বিবরণ, জীবনবৃত্তান্ত বা ঐতিহাসিক

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণকেও কড়চা বলে। উনবিংশ শতাব্দীতে মিশনারীরাও শব্দটি ব্যবহার করিয়াছে।

আর্যাতর্জা—ঢাক ঢোল সহযোগে ছড়া জাতীয় রচনা একটানা সুরে গান গাওয়ার পদ্ধতিকে আর্যাতর্জা বলা হইত। ডঃ সুকুমার সেন বলিয়াছেন, "অষ্টাদশ শতাব্দের পূর্ব হইতেই ছড়া কাটিয়া ঢোল কাঁসর সঙ্গতে গান করার পদ্ধতি ধর্মঠাকুর ও শিবের গাজনে প্রচলিত ছিল। এইরূপ ছড়াকেও বলিত আর্যা অথবা তর্জা অথবা আর্যা-তর্জা।" আর্যা শব্দটি ছড়া জাতীয় পদ অর্থে সংস্কৃতে ব্যবহৃত হইত। যেমন, আর্যা সপ্তশতী। প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ ভাষায় লিখিত ছড়াকেও আর্যা বলা হয়। যেমন, শুভঙ্করের আর্যা। তরজা শব্দটির উৎপত্তি ফার্সী ভাষা হইতে; তবে মূলে শব্দটি আরবী 'তরজ', ইহার অর্থ রীতি বা ধরণ। একটি বিশেষ বাঁধা রীতিতে গান করা হইত বলিয়াই তর্জা বলা হয়।

ধুয়া—একটানা সুরে নির্দিষ্ট একটি পদ গান করিলে উহাকে ধুয়া বলে। শব্দটি ধ্রুবক>ধুঅঅ>ধুআ, ধুয়া। প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে প্রত্যেক অধ্যায়ের সূচনায় নির্দিষ্ট সুর-তাল লয়ে গেয় একটি পদ থাকিত। ঐ ধ্রুবপদটিকে ধুয় বলে। কীর্তন, পাঁচালী প্রভৃতি গানের সময় আবহ সঙ্গীত অর্থাৎ Back ground Music রূপে যে পদটি গান করা হয় তাহাকেও ধুয়া বলে।

আখর—অক্ষর শব্দ হইতে আখর শব্দের উৎপত্তি। পদাবলী কীর্তনে পারিভাষিক অর্থে পদের সরল ব্যাখ্যা বুঝায়। মহাজন পদের তাৎপর্য প্রকাশের জন্য কীর্তনিয়া নিজের ভাষায় আনুষঙ্গিক পদ রচনা করিয়া গানের সুরে মিলাইয়া দেন। ইহাই আখর। যেমন—মূল পদে আছে—"বিমল হেম জিনি তনু অনুপাম রে।"—গায়ক গাহিতে গাহিতে রচনা করিলেন—সে তনুর তুলনা নাই রে, কাঁচা সোনাকে হার মানায় রে—ইত্যাদি। ইহাকেই পদকীর্তনের আখর বলা হয়।

কবিশেখর

[ক. বি , ১৯৬৪]

'কবিশেখর' ভণিতা মধ্যযুগের পদাবলী সাহিত্যে এক দুরূহ সমস্যা। জনৈক কবি 'শেখর' ভণিতা ধরিয়া রায়শেখর, কবিশেখর, নৃপকবিশেখর, নবকবিশেখর প্রভৃতি নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বৈষ্ণবপদাবলী সংগ্রহে সেগুলি স্থান পাইয়াছে। পদগুলি একাধিক ব্যক্তির কিনা তাহা নির্ণয় করা প্রায় অসাধ্য। একটা ভণিতা আছে—"শ্রীরঘুনন্দন চরণ করি সার। কহে কবিশেখরের গতি নাহি আর।" কেহ কেহ বলিয়াছেন যে কবির প্রকৃত নাম বোধহয় শশিশেখর বা চন্দ্রশেখর। ইনি শ্রীখণ্ডের অধিবাসী রঘুনন্দনের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ইনি সম্ভবতঃ বর্ধমান জিলার পড়ান গ্রামের ভূম্যধিকারী ছিলেন।

মৈথিল বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া পরিচিত অনেকগুলি পদে 'কবিশেখর' ভণিতা পাওয়া গিয়াছে। বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ঐ সমস্ত পদকেই বিদ্যাপতির রচনার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। অথচ বিদ্যাপতি কবিশেখর উপাধি পাইয়া

ছিলেন এমন কোন প্রমাণ নাই। ইহাও কবিশেখর সম্বন্ধে আর এক সমস্যা। 'কবিশেখর' ভণিতাযুক্ত যে পদগুলিতে চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবীয় ভাবাদর্শের ব্যঞ্জনা অত্যন্ত প্রকট সেই পদগুলির ভাষা বিদ্যাপতির ভাষার মতই অনুরূপ হউক, পদগুলিকে বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করা যায় না। কবিশেখর ভণিতায় বাংলা ও ব্রজবুলি উভয়বিধ কবিতা পাওয়া যায়।

আর একজন কবিশেখরের উল্লেখ পাওয়া যায় 'গোপাল বিজয়' কাব্যের রচয়িতা-রূপে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সহিত এই কাব্যের আশ্চর্য মিল দেখা যায়। সম্প্রতি বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ডঃ দুর্গেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 'গোপাল বিজয়' কাব্যের একটি সুন্দর সটীক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই কাব্যের কবির নাম দৈবকীনন্দন, উপাধি ছিল 'কবিশেখর'। সুতরাং 'কবিশেখর' সমস্যার কোন সহজ সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। পদাবলী সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ অনেকেই পরস্পরবিরোধী যুক্তি ও সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন। যদি রায়শেখর এবং কবিশেখর একই ব্যক্তি হন তাহা হইলে তিনি যে অসাধারণ পণ্ডিত, দক্ষ বাণীশিল্পী এবং ছন্দরসিক ছিলেন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর [ক. বি., ১৯৬১]

পরমেশ্বর দাস নামে একজন কবি নিজেকে কবীন্দ্র বলিয়া পরিচয় দিয়া লিখিয়াছেন যে, চট্টগ্রামের শাসনকর্তা হোসেন সাহের সেনাপতি পরাগল খাঁর নির্দেশে তিনি মহাভারত রচনা করেন। কবি সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। অনুমান করা যাইতে পারে পরাগল খাঁই তাহাকে কবীন্দ্র উপাধি দিয়াছিলেন। পরাগলের রাজসভায় প্রত্যহ পুরাণপাঠ হইত। পরাগল মহাভারতের কাহিনী সম্বন্ধে কৌতূহলী হইলে কবি এই কাব্য লেখেন। কাব্যখানির নাম "ভারত পাঁচালী" বা 'পাণ্ডববিজয় কথা"।

পরাগল সমগ্র মহাভারত কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন কিনা বলা কঠিন। অধুনা-প্রাপ্ত দুইটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণে সমস্ত পালাটি পাওয়া যায় না। ডক্টর সুকুমার সেনের ধারণা, পরমেশ্বর অশ্বমেধ পর্ব লেখন নাই, ঐ পর্ব লিখিয়াছিলেন পরাগল পুত্রের নির্দেশে শ্রীকর নন্দী নামক একজন কবি। পরমেশ্বরের কাব্য আয়তনে নিতান্ত ছোট নয়। যদিও সমগ্র মহাভারত কথা একদিনে শোনাবার মত পাঁচালী রচনা করিতে বলা হইয়াছিল কিন্তু কাব্যখানি একদিনে পাঠযোগ্য নয়। সংক্ষিপ্তাকারে সমগ্র মহাভারত-কথাকে রূপায়িত করিয়া তোলা এবং মূল কাহিনীধারাকে সম্পূর্ণ অব্যাহত রাখা পরমেশ্বরের রচনার একটি বিশেষ কীর্তি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। পরবর্তী কবি শ্রীকর নন্দী পরমেশ্বরের কাব্যকে আদর্শস্বরূপ অবলম্বন করিয়া জৈমিনীসংহিতা অবলম্বনে অশ্বমেধ পর্ব-কথা বিশদ করিয়া লিখিয়াছিলেন।

কালিকামঙ্গল [ক. বি., ১৯৬৭]

কালীদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনমূলক লৌকিক আখ্যান কাব্যকে কালিকামঙ্গল বলে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতই এই কাব্যে দেবতার অনুগ্রহ-নিগ্রহের বিচিত্র কাহিনী

আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে কালিকামঙ্গল রচিত হয় নাই। বিদ্যা ও সুন্দরের গোপন প্রণয় কাহিনীর উপর একটু ধর্মীয় প্রলেপন দিয়া কালিকামঙ্গলের কাব্যকথা রচিত। বহিরঙ্গে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত শাপভ্রষ্ট নায়ক-নায়িকার কথা এবং নায়কের বিপদের দিনে কালিকাদেবীর অনুগ্রহ বিতরণ এবং নায়ক কর্তৃক পূজা প্রচার—এইটুকু মাত্র রাখিয়া কবিরা যুগরুচি অনুযায়ী আদিরসের লৌকিক কাহিনী উৎসাহের সঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। কাশ্মীরী কবি বিহ্লণের চৌর পঞ্চাশিকা নামে একখানি ক্ষুদ্র কাব্যে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর সূত্রপাত বলিয়া অনেকের ধারণা।

বিদ্যাসুন্দর কাহিনী সপ্তদশ শতাব্দীতে কালিকামঙ্গল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তৎপূর্বেই রোমান্টিক প্রেমের কাহিনীরূপে বাংলাদেশে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। হুসেন সাহের নাতি ফিরোজ সাহের রাজত্বকালে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে দ্বিজ শ্রীধর এই কাব্য লেখেন। এই কাব্যে কালিকার নামগন্ধও নাই। সাবিরিদ খাঁ নামে চট্টগ্রামের এক মুসলমান কবি ইসলামী কিস্‌সার ধরণে বিদ্যাসুন্দর গল্প লেখেন। এই কাব্যেও দেবদেবীর প্রসঙ্গ নাই। কবি কঙ্ক তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কাহিনীতে কালিকার উল্লেখ করেন নাই, সত্যপীরের মাহাত্ম্য বলিয়াছেন। কৃষ্ণরাম দাসের কালিকামঙ্গলই মঙ্গলকাব্যের ধারা যথার্থভাবে অনুসরণ করে। তিনি দেবখণ্ড অংশে কালিকাদেবীর পৌরাণিক পরিচয় বিশদভাবে দিয়াছিলেন। তবে লোকরুচি অনুযায়ী লৌকিক খণ্ড বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীই বেশি প্রচারিত হয়। প্রাণরাম চক্রবর্তী, কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তীর নামও কালিকামঙ্গল প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণরাম, প্রাণরাম এবং বলরাম—ইঁহারা তিনজনই নায়ক সুন্দরকে শাপভ্রষ্ট কালিকাভক্তরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। পরবর্তী কালে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন এবং রাধাকান্ত মিশ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর কাব্যধারায় কালিকামঙ্গল রচনা করিয়া অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেন। বিদ্যাসুন্দর কাহিনী অবলম্বনে কালিকামঙ্গলের কাব্যধারা আয়তনে ও গুণে নিতান্ত উপেক্ষণীয় ছিল না।

কাশীরাম দাসের মহাভারত রচনার কাল নির্ণয় [ক. বি., ১৯৬৬]

কাশীরাম দাসের মহাভারত রচনার কাল বিতর্কমূলক হইয়াছে। অনেকের ধারণা কাশীরাম স্বয়ং আদি-সভা-বন-বিরাট পর্বের রচয়িতা। বাকী পর্বগুলি তাঁহার আত্মীয়-স্বজনেরা রচনা করিয়াছেন। একখানি পুঁথিতে পাওয়া যায়—"আদি সভা বন বিরাটের কতদূর। ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর ॥" এখন তিনি মহাভারত-কথা সম্পূর্ণ না করিলেও সূচনা করিলেন কবে তাহা লইয়া পণ্ডিত মহলে মতভেদ।

'জগৎমঙ্গল' নামক একখানি প্রামাণিক গ্রন্থে কাশীদাসী মহাভারতের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থখানি ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। সুতরাং মহাভারত অবশ্যই তৎপূর্বে রচিত। মহাভারতের যত প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশের মধ্যেই অনুলিপিকরণের কাল নির্দেশ আছে। কোন পুঁথিতে ১৫৭৮, কোন খানায় ১৫৯৫, ১৬১৬, ১৬৩৩ ইত্যাদি। অথচ দুইখানি প্রামাণ্য পুঁথিতে কাব্য রচনার কাল পাওয়া যাইতেছে। একখানি পুঁথিতে আছে—

চন্দ্র বাণ পক্ষ ঋতু শাক সুনিশ্চয়।
বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কয় ॥

অঙ্কের দক্ষিণা গতির হিসাবে ১৫২৬ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে বিরাট পর্ব লেখা শেষ। অন্য একখানি পুঁথিতে আছে—

শশাঙ্ক বিধুমুখ রহিলা তিনগুণে।
রুক্মিণী নন্দন অঙ্কে জলনিধি সনে ॥

যোগেশচন্দ্র রায় সাংকেতিক ভাষা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে ১৫২৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দের রচনা। এই দুইখানি পুঁথিকে স্বীকার করিলে সন্দেহ হয় যে পুঁথির অনুলিপিকারদের দেওয়া তারিখ ঠিক নয়। পুঁথির প্রাচীনতা বাড়াইয়া মূল্যবৃদ্ধির জন্য পুঁথি সংগ্রাহকেরা অনেক সময় সন তারিখের কারচুপি করিতেন। এইরূপ অনুমান করাই সঙ্গত মনে হয় যে কাব্যরচনা অনেক পূর্বে আরম্ভ করিলেও কাশীদাস তাঁহার রচিত অংশ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে সমাপ্ত করেন।

কৃত্তিবাসের আত্মজীবনীর প্রামাণিকতা বিচার [ক. বি., ১৯৬৬]

কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীর ব্যাপারটা বড় রহস্যময় ছিল। নগেন্দ্রনাথ বসু এবং দীনেশচন্দ্র সেন সর্বপ্রথম 'কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণী' প্রকাশ করেন। তাঁহারা জানান যে বনগঞ্জের হারাধন দত্ত ভক্তিনিধির নিকট একটি প্রাচীন পুঁথিতে ইহা পাইয়াছেন। মূল পুঁথি কিন্তু কেহ চোখেও দেখেন নাই, ভক্তিনিধি মহাশয় প্রদত্ত নকলের উপর নির্ভর করেন। সেই নকলখানিও নাকি হারাইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় অনেকে এই 'আত্মবিবরণ'কে সাপের পা বা ডুমুরের ফুল বলিয়া ব্যঙ্গ করিলেন। এই অবস্থায় নলিনীকান্ত ভট্টশালী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংগৃহীত কৃত্তিবাসী পুঁথিতে কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয় জ্ঞাপক যে পয়ারগুলি পাইলেন তাহার সহিত ভক্তিনিধিপ্রদত্ত আত্মবিবরণের বেশ মিল দেখা গেল এবং অনুমান করা হইল যে কৃত্তিবাস নিজের জীবনকথা নিজেই কিছুটা লিখিয়া গিয়াছিলেন।

ভক্তিনিধি মহাশয় যে আত্মবিবরণের নকল নগেন্দ্রবাবু এবং দীনেশবাবুকে দিয়াছিলেন তাহার আসল ছিল নির্খোজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নগেন্দ্রবাবুর সংগ্রহ ক্রয় করিলে দেখা গেল ১২৪০ বঙ্গাব্দে লিখিত একখানি প্রাচীন পুঁথির তিনটি পৃষ্ঠা ঐ সংগ্রহে আছে। সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত একখানি প্রাচীন পুঁথিতে প্রথম তিনখানি পৃষ্ঠা নাই। হস্তাক্ষর এবং রচনাক্রম দেখিয়া বুঝা গেল যে উহা একই পুঁথি এবং উহাতে প্রদত্ত 'আত্মবিবরণ' প্রকাশিত আত্মবিবরণের অনুরূপ। সামান্য কিছু অদল বদল হয়ত প্রকাশক বুঝিয়া বা না বুঝিয়া করিয়াছেন। নলিনীকান্ত ভট্টশালীর এই আবিষ্কারের ফলে আত্মবিবরণের জাল অপবাদ দূর হইয়াছে। ভট্টশালী মহাশয় কৃত্তিবাসের গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়া দেখাইয়াছেন যে চার পাঁচখানি প্রাচীন পুঁথিতে কৃত্তিবাসের আত্মকথা আছে, তবে খুব সংক্ষিপ্ত ১০।১২ পঙ্‌ক্তি মাত্র। নগেন্দ্রবসুর সংগ্রহে প্রাপ্ত

পুঁথির আত্মবিবরণ ১৫২ পঙ্‌ক্তি। উহার ৫০টি পঙ্‌ক্তি দীনেশবাবু কর্তৃক প্রকাশিত আত্মবিবরণীর হুবহু অনুরূপ। প্রাচীন পুঁথির লেখায় ও পাঠোদ্ধারে নানা ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা। কৃত্তিবাসের নিজস্ব লেখনীমুখে কি লেখা হইয়াছিল তাহা জানেন মহাকাল। যে ধ্বংসাবশেষটুকু আছে তাহাতে এইটুকু প্রমাণিত হইয়াছে যে কৃত্তিবাসের 'আত্ম-বিবরণ' সাপের পা বা ডুমুরের ফুলের মত অলীক ব্যাপার নয়।

কৃষ্ণরাম দাস [ক. বি, ১৯৬০, ১৯৬৯]

কবি কৃষ্ণরাম দাস মঙ্গলকাব্য রচয়িতাদের মধ্যে অনন্যসাধারণ এই জন্য যে তিনি এক জীবনে কালিকামঙ্গল, রায়মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল এবং কমলামঙ্গল লিখিয়াছিলেন। এতগুলি মঙ্গলকাব্য রচনা কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়। সম্প্রতি ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য কৃষ্ণরামের কাব্যসমূহের পরিচয় প্রদান করায় দেখা যাইতেছে যে প্রথম শ্রেণীর কবির বিস্ময়কর প্রতিভাদ্যুতির পরিচয় না থাকিলেও কৃষ্ণরামের কবিত্বশক্তি এবং কল্পনাবিস্তার ক্ষমতা নিতান্ত উপেক্ষণীয় ছিল না। ছন্দ রচনায় ও কাহিনী গ্রন্থনে তাঁহার নৈপুণ্য ছিল। ভারতচন্দ্রীয় যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার স্থান কিছুটা ছায়াচ্ছন্ন।

কৃষ্ণরাম কলিকাতার নিকটবর্তী বেলঘরিয়ার সংলগ্ন নিমিতা গ্রামে ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ কালিকামঙ্গলে তিনি লিখিয়াছেন যে ১৫৯৮ শকাব্দে বিশ বছর বয়সে তিনি কাব্যরচনা করেন। অতএব কবির জন্মশক ১৫৭৮ অর্থাৎ ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দ। কবিরা জাতিতে কায়স্থ এবং তাঁহার পিতার নাম ভগবতী দাস। এই কবিবংশের সহিত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের আত্মীয়তা ছিল।

কৃষ্ণরামের প্রথম কাব্য কালিকামঙ্গল। ইহাতে বিদ্যাসুন্দরের প্রণয় কাহিনী আছে। তারকাসুরের পুত্র সুলোচন এবং পুত্রবধূ তারাবতী শাপভ্রষ্ট হইয়া সুন্দর ও বিদ্যা নামে জন্মগ্রহণ করে। এই কাব্যে মালিনীর নাম হীরা নয় বিমলা। বিদ্যার গর্ভজাত পুত্রের নাম পদ্মনাভ। পরবর্তী কবি ভারতচন্দ্রের কাহিনীর সঙ্গে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। দ্বিতীয় কাব্যে রায়মঙ্গলে ব্যাঘ্রবাহন দক্ষিণরায় নামক দেবতার মাহাত্ম্যকীর্তন। ইহাতে দুইটি কাহিনী আছে—বণিক পুষ্পদত্ত এবং বড়গাজি খাঁ। শেষের কাহিনীতে হিন্দুমুসলমান বিরোধের চিত্র ও সমন্বয় প্রচেষ্টায় কাব্যখানির সামাজিক ও ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট। তৃতীয় কাব্য ষষ্ঠীমঙ্গল নিতান্তই ব্রতকথা জাতীয় রচনা। সায় বেণের পুত্রবধূ ষষ্ঠীর অনুচর কালো বিড়ালকে অপমান করায় বিড়াল তাহার নবজাত পুত্রগণকে অপহরণ করিত। পরে ষষ্ঠীর পূজা করিয়া অপহৃত পুত্রগণ ফিরিয়া পায়। পরবর্তী কাব্য শীতলামঙ্গলে তিনটি কাহিনীতে বসন্ত রোগের দেবী শীতলার মাহাত্ম্য বর্ণিত। মদনদাস, কাজি এবং হৃষীকেশ সাধুর কাহিনীধারা, মুকুন্দরামের কাব্যের অনুরূপ। কবির শেষ কাব্য কমলামঙ্গল ব্রতকথা জাতীয় রচনা এবং ধনপতির গল্পের অনুসরণে গল্পকথা বর্ণিত। ব্রাহ্মণ সন্তান জনার্দন এবং তাহার বন্ধু বণিকপুত্রের কাহিনীর মধ্য দিয়া ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য বর্ণনা।

গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী [ক. বি, ১৯৬৪]

'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী'র রচয়িতা দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উলা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন, পিতা আত্মারাম, মাতা অরুন্ধতী। দুর্গাপ্রসাদের পত্নী হরিপ্রিয়া ছিলেন ভূকৈলাসের জমিদার গোকুলচন্দ্র ঘোষালের কন্যা। হরিপ্রিয়া দেবীই গঙ্গামাহাত্ম্য রচনার স্বপ্নাদেশ পাইয়াছিলেন। তদনুসারে তাঁহার স্বামী অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী রচনা করেন। ডঃ সুকুমার সেন লিখিয়াছেন, "গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণীর রচনাকাল জানা নাই। মোটামুটি বলিতে পারা যায় অষ্টাদশ শতাব্দের শেষ বিশ বছর।"

গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী অষ্টমঙ্গলা গান ; এক এক দিনের পালার নাম উল্লাস। মোট শ্লোকসংখ্যা ১৫৬ এবং রাগতালের উল্লেখ আছে। গ্রন্থখানির তিনটি খণ্ড। প্রথম খণ্ডে মেনকার গর্ভে গৌরীর জন্ম, শিবের সহিত বিবাহ এবং মাতৃশাপে গৌরীর গঙ্গায় রূপান্তর। গঙ্গার মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য একটি উপকাহিনী আছে, জয় রাজার পুত্র ও জামাতা সম্বন্ধে। দ্বিতীয় খণ্ডে ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা আনয়নের কাহিনী ও দিবোদাস প্রসঙ্গ। তৃতীয় খণ্ডে বলি-বামন উপাখ্যান ও ত্রিপুরবধ কাহিনী। সুতরাং কাহিনী সুশৃঙ্খলভাবে বর্ণিত নয় এবং বাঁধুনিও শিথিল। লেখকের বর্ণনা সারল্য এবং সরস কৌতুকের জন্য তৎকালীন সমাজে বেশ আদর হইয়াছিল। চাকদহের নিকটে আগত পূর্ববঙ্গীয় গঙ্গা স্নানযাত্রীদের বর্ণনায় কবি বেশ কৌতুক-প্রিয়তার পরিচয় দিয়াছেন। রাজনারায়ণ বসু তাঁহার আত্মকথায় লিখিয়াছেন যে গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণীর পালাগান হইত এবং সেই গানের সমাদর তিনি বাল্যকালে লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

গোবিন্দদাসের কড়চা [ক. বি, ১৯৫৯, ১৯৬১, ১৯৬৩, ১৯৬৯]

গোবিন্দদাসের কড়চা নামে চৈতন্যচরিতের একখানি খণ্ডিত কাব্য ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে শান্তিপুর নিবাসী জয়গোপাল গোস্বামী প্রকাশ করেন। গ্রন্থ সম্পাদক ও তাঁহার সমর্থক দীনেশচন্দ্র সেন দৃঢ়তার সহিত সিদ্ধান্ত করেন যে, এই গ্রন্থ বাংলা ভাষায় লিখিত প্রাচীনতম চৈতন্যচরিত। কিন্তু নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব মহল এবং ঐতিহাসিক পণ্ডিত ব্যক্তিরা গ্রন্থখানিকে জাল বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে জানা যায় যে, গোবিন্দদাস বর্ধমানের কাঞ্চনপুর নিবাসী শ্যামদাস কর্মকারের পুত্র। পত্নীর হাতে লাঞ্ছিত হইয়া তিনি গৃহত্যাগ করেন এবং কাটোয়ায় আসিয়া চৈতন্যদেবের ভৃত্যপদ গ্রহণ করেন। গোবিন্দ কর্মকার চৈতন্যদেবের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং দিনলিপি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিয়া গোবিন্দকে শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর কাছে পাঠাইয়াছিলেন। এইখানেই কড়চার বিবরণ শেষ হইয়াছে।

কড়চায় বর্ণিত এই বিবরণের কোনো সমর্থন চৈতন্যদেবের প্রামাণ্য জীবনীকাব্যে কোথাও পাওয়া যায় না। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে যে সব স্থানের নাম লিখিত হইয়াছে ষোড়শ শতাব্দীতে ঐ সব স্থানের চিহ্নও ছিল না। কড়চার ভাষায় জানালা, গেলাস,

আড়া, খড়ম প্রভৃতি শব্দ থাকায় ভাষা যে প্রাচীন নয় তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। এই সব প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা আধুনিক গবেষকেরা গোবিন্দদাসের কড়চাকে জয়গোপাল গোস্বামীর Black forgery বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন, বস্তুতঃ ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা গোবিন্দদাসের কড়চার যথার্থতা কিছুতেই সিদ্ধান্ত করা যায় না।

গোরক্ষ বিজয় [ক. বি., ১৯৬০, ১৯৬৭]

বাংলাদেশে বৌদ্ধ তান্ত্রিক প্রভাবের ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে, যে অভিনব সাহিত্যধারা সৃষ্ট হইয়াছিল গোরক্ষ বিজয় তাহার সার্থক নিদর্শন। গোরক্ষ নাথ সংক্রান্ত নানা কাহিনী সুদীর্ঘকাল যাবৎ বাংলাদেশে ও বাংলাদেশের বাহিরে জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। মুন্সী আবদুল করিম "গোরক্ষ বিজয়" নামে একখানি কাব্য আবিষ্কার করেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে তাহা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানির নাম গোরক্ষ বিজয় বা মীনচেতন। অনেকের ধারণা, এই কাব্যকথার রচয়িতার নাম শেখ্ ফৈজুল্লা। কিন্তু যে আটখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বিভিন্ন ভণিতা দেখা যায়। ফয়জুল্লা, কবীন্দ্র দাস, ভীমদাস, শ্যামদাস প্রভৃতি ভণিতা দেখিয়া মনে হয় যে, ইঁহারা কেহই গোরক্ষ বিজয়ের লেখক নহেন, পালা গায়ক মাত্র। দীনেশবাবু এবং করিম সাহেব ফয়জুল্লাকেই যথার্থ কবি বলিয়াছেন এবং সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের রচিত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

গোরক্ষ বিজয় আয়তনে খুব বৃহৎ নয়, কাহিনীটি কৌতূহলোদ্দীপক। গোরক্ষ নাথের গুরু মীননাথ কদলীর দেশে মঙ্গলা ও কমলা নামে দুইটি যুবতীর মোহে পড়িয়া কায়া-সাধন পদ্ধতি পরিহার করেন। গোরক্ষনাথ নর্তকীর ছদ্মবেশে মাদল বাজাইয়া গান করিয়া মীননাথের চৈতন্য সম্পাদন করেন এবং আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করেন। শিষ্য গোরক্ষনাথের জয় হইল এবং গুরু মীননাথের চৈতন্য সম্পাদিত হইল এবং এই অপূর্ব কাহিনীতে ইন্দ্রিয়সংযম ও কায়াসাধনার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হইল। ধর্মীয় তত্ত্বকে কাহিনী রসে নিষিক্ত করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

ঘনরাম চক্রবর্ত্তী [ক. বি, ১৯৬৩]

ধর্মমঙ্গল কাব্য ধারায় ঘনরাম চক্রবর্তী খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। দামোদর নদের তীরে কইয়ড় পরগণার কুকুড়া কৃষ্ণপুর গ্রামে কবির জন্ম। পিতার নাম গৌরীকান্ত, পিতামহ ধনঞ্জয়, মায়ের নাম সীতা। তাঁহার কাব্যে কীর্তিচন্দ্রের প্রশংসা থাকায় স্বভাবতঃ মনে হয় যে তিনি বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রমাণে অনুমান করা হইয়াছে যে, ১৭১১ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই কবি তাঁহার কাব্য রচনা সমাপ্ত করেন। ধর্ম ঠাকুরের মহাত্ম্য কীর্তন করিলেও ঘনরাম তাঁহার কাব্যে যে ভণিতাদি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে বারবার রামভক্তির উল্লেখ আছে। মনে হয়, তিনি ধর্মমতে রামভক্ত ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন "আশীর্বাদ কর যেন রাঘবে রয় মতি—"

ঘনরাম ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীকে চব্বিশটি পালায় বিভক্ত করিয়া মহাকাব্য রচনার প্রয়াস করিয়াছিলেন। কাহিনীর বিস্তার, ঘটনার বাহুল্য, চরিত্র সৃষ্টির মহিমায় ঘনরামের ধর্মমঙ্গল একখানি অপূর্ব গ্রন্থ। ঘনরাম ভারতচন্দ্রের মত বহু বিদগ্ধ উক্তি করিতে জানিতেন। তাঁহার রচনায় প্রচুর সুভাষিত আছে। লাউসেনের বীরত্ব, কর্পূরের ভীরুতা, এবং মহামদের কূটচক্র ঘনরাম নিপুণ ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। রমণীর মাতৃত্ব, স্ত্রীর পাতিব্রত্য, বীরাঙ্গনার বীরমূর্তি, দেবভক্তির গাঢ়তা, খলের নষ্টামি কবি এমন বাস্তব বুদ্ধির সহিত বর্ণনা করিয়াছেন যে, রামেশ্বর ও ভারতচন্দ্রের তুলনায় তাঁহার কবিত্ব যে কোনো অংশে কম নয় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

চন্দ্রাবতীর রামায়ণ [ক. বি , ১৯৬৭]

মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী একখানি ক্ষুদ্রাকার রামায়ণ কাব্য লিখিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ঘটনাটি সত্য হইলে প্রাপ্ত পুঁথিসূত্রে প্রাচীন কবিদের মধ্যে চন্দ্রাবতীকেই বাংলাসাহিত্যে প্রথম মহিলা কবির সম্মানে ভূষিত করিতে হয়। দ্বিজ বংশীদাস সপ্তদশ শতাব্দীর কবি। সুতরাং চন্দ্রাবতীও ঐ শতাব্দীর। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে ময়মনসিংহ অঞ্চলে গীতিকা-সাহিত্য পাওয়া গিয়াছে। মৈমনসিংহ গীতিকার সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে গ্রামের মেয়েদের গান শুনিয়া শ্রুতিলিপি লিখিয়া আনেন। পরে দীনেশবাবু প্রকাশ করেন। রামায়ণের ভাষাভঙ্গির মধ্যে মৈমনসিংহের গ্রাম্যভাষার বিশেষ পরিচয় নাই। পূর্বে এই রামায়ণের কথা মৈমনসিংহের কেহ বলেন নাই। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, এই বিদুষী মহিলা হয়ত লোকসাহিত্যের গাথারূপে রামায়ণ লিখিয়াছিলেন; স্ত্রীসমাজ তাহা গান করিত। চন্দ্রকুমার উহা সংগ্রহ করিয়া বেশ মার্জিত ও পরিবর্তিত করিয়া দীনেশবাবুকে দিয়াছিলেন।

চন্দ্রাবতীর রামায়ণ লোকসাহিত্যের অনুরূপ পালাগান, যথার্থ অনুবাদ কাব্য নয়। ইহার কাহিনী 'অদ্ভুত রামায়ণ' হইতে গৃহীত এবং ছড়ার সুরে গান করা হইত। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে দীনেশবাবু ইহা প্রকাশ করেন। চন্দ্রকুমারও সম্পূর্ণ কাব্যখানি উদ্ধার করিতে পারেন নাই। সীতার বনবাসের সূচনা পর্যন্ত আছে—হয়ত পাতাল প্রবেশ পর্যন্তই ছিল; কিন্তু শেষাংশ পাওয়া যায় নাই। সীতার ননদ কেকয়ীর কন্যা কুকুয়ার প্রসঙ্গ এই কাব্যে আছে। রাবণের মাহাত্ম্য বর্ণনা দ্বারা কাব্যের সূচনা—মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে যেমন আছে। তারপর রামের জন্ম, সীতার বিবাহ, সীতার বারমাসী ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কোন পারম্পর্য অথবা আনুষঙ্গিকতা রক্ষিত হয় নাই। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়াছেন "এই রামায়ণকথা লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, অনুবাদ সাহিত্যের সমপর্যায়ে ইহার স্থান হইতে পারে না।"

'ছোট বিদ্যাপতি বলি যাঁহার খেয়াতি' [ক. বি . ১৯৬৭]

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীখণ্ডের রামগোপাল দাস 'রসকল্পবল্লী' নামে একখানি পদ সংকলন করেন। তিনি 'শ্রীখণ্ডের শাখানির্ণয়' নামে লিখিত গ্রন্থে শ্রীখণ্ডের

রঘুনন্দনের শিষ্য কবিরঞ্জন নামীয় একজন বৈদ্যজাতীয় পদকর্তার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

ছোট বিদ্যাপতি বলি যাঁহার খেয়াতি।
যাঁহার কবিতা গানে ঘুচয়ে দুর্গতি॥

বিদ্যাপতির ভণিতায় বহু বাংলা ও ব্রজবুলি পদ বাংলা পদসংগ্রহ গ্রন্থগুলিতে উদ্ধৃত হওয়ায় বিদ্যাপতি সম্বন্ধে একটা বড় সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। বিদ্যাপতির ভণিতায় প্রাপ্ত সব রচনা যে মৈথিল কবি বিদ্যাপতির নয় তৎসম্বন্ধে সকলেই একমত। বিদ্যাপতি কবিরঞ্জন উপাধি পাইয়াছিলেন তাহারও প্রমাণ নাই। রায়শেখর নামক একজন কবি নিজ নামে ও কবিশেখর ভণিতায় বিদ্যাপতির অনুকরণে বহু ব্রজবুলি পদ লেখেন। ফলে কোন্ রচনা কাহার তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বিদ্যাপতির ভণিতায় লেখা বাংলা পদগুলি কিছুতেই মৈথিল কবির রচনা নয়।

শুন লো রাজার ঝি
তোরে কহিতে আসিয়াছি।
কানু হেন ধনে পরাণে বধিলি
একাজ করিলি কি।

এইরূপ পদ নিশ্চয়ই কোন বাঙ্গালী কবির রচনা। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রূপনারায়ণ তীরে মিলনের যে কাহিনী আছে তাহা সম্ভবত নকল বিদ্যাপতি ও নকল চণ্ডীদাসের মিলন। নরোত্তম-শিষ্য দীন চণ্ডীদাস এবং রঘুনন্দন শিষ্য ছোট বিদ্যাপতি কবিরঞ্জন সহজিয়া তত্ত্ব আলোচনার জন্য রূপনারায়ণ তীরে সম্মিলিত হইতে পারেন। ছোট বিদ্যাপতি রূপে যাহার খ্যাতি ছড়াইয়াছিল তিনি রামগোপাল-কথিত কবিরঞ্জন। ইনি বহু ব্রজবুলি পদও লিখিয়াছেন। "আরে সখি কবে শ্যাম ব্রজ আয়ব", "কি কব রাইয়ের গুণের কথা", "কি পুছসি রে সখি কানুক নেহ" প্রভৃতি পদ ছোট বিদ্যাপতির রচনা বলিয়াই মনে হয়। এই কবিকে গ্রীয়ার্সন Pseudo Vidyapati বলিয়াছেন। অসিতবাবু লিখিয়াছেন, "এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনশিষ্য বিদ্যাপতি নামে পরিচিত এক বাঙ্গালী কবি মিথিলার বিদ্যাপতির অনুকরণে কিছু কিছু ব্রজবুলি এবং বাংলা পদ লিখিয়াছিলেন। সেইজন্য 'ছোট বিদ্যাপতি' খেতাব লাভ করিয়াছিলেন।"

জাগরণ-পালা [ক. বি., ১৯৬৫]

সারা রাত্রি জাগরণ করিয়া নৃত্যগীতাদির যে অনুষ্ঠান করা হইত তাহাকে সাধারণতঃ 'জাগরণ' বা 'জাগের গান' বলা হইত। উত্তর বঙ্গে ধামালী গান প্রচলিত ছিল, ঝুমুর গানেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ গানগুলির যে অংশ গভীর রাত্রিতে না ঘুমাইয়া ভোর পর্যন্ত গাওয়া হইত তাহার নাম হইত জাগরণ পালা। ধামালীর মধ্যে 'রাধার শাক তোলা পালা", "কৃষ্ণের মাছধরা পালা" প্রভৃতি 'জাগের গান' বলিয়া কথিত। লৌকিক গল্প হালকা সুরে অশ্লীল ভঙ্গিতে গভীর রাত্রিতে গান করা হইত।

মঙ্গলকাব্যের যুগেও গভীর রাত্রিতে গেয় 'জাগরণ পালা' রচনা করা হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যের অনেকগুলি ছিল অষ্টমঙ্গলা—আটদিন ধরিয়া গান করা হইত। পূর্ববঙ্গে ইহার নাম 'রয়ানী' গান। উহার কোন অংশ রাত্রিতে গান করিবার জন্য নির্বাচিত হইলে উহাই 'জাগরণ পালা' নামে অভিহিত হইত। শ্রীমন্তের মশান কাহিনীটি চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে জাগরণ পালা। লখিন্দরের পুনর্জীবন লাভ এবং লাউসেনের পশ্চিমে সূর্যোদয় জাগরণ পালার মর্যাদা পায়। ডঃ সুকুমার সেন লিখিয়াছেন, "চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি পাঞ্চালী কাব্যের উপাখ্যানের ক্লাইম্যাক্স্ থাকে উপসংহারের ঠিক আগের কাহিনীতে। কাব্যের পক্ষে এটি সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা। এই অংশটি সারারাত ধরিয়া গাওয়া হইত বলিয়া এই পালার নাম জাগরণ'।" এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন, "চাটিগাঁ প্রভৃতি অঞ্চলে চণ্ডীমঙ্গলের নামান্তর 'জাগরণ'।"

ডাকের বচন, খনার বচন ক. বি., ১৯৬০, ১৯৬২

ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন "ডাক ও খনার নামে যে বচনগুলি বাংলাদেশে আজও প্রচলিত, তাহাও বোধহয় প্রাক্ তুর্কী আমলের চলতি প্রবাদ সংগ্রহ। কালে কালে তাহাদের ভাষা বদলাইয়া গিয়াছে মাত্র।" পণ্ডিতেরা এই কথা সাধারণভাবে সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু 'ডাক ও খনা'র পরিচয় আবিষ্কার আজ আর সম্ভব নহে। এই সব ছোট ছোট প্রবাদ-প্রবচন অংশে আদিম যুগের বাঙ্গালীর আধি-ভৌতিক মঙ্গল-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহারই ঐতিহ্যটুকু এই সকল রচনার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই প্রসঙ্গে সামাজিক মঙ্গলবোধের উৎকৃষ্ট নিদর্শন শুভঙ্করের আর্যাবলীর কথাও স্মরণ করার যোগ্য। লেখক এবং তাঁহার মূল লেখা হারাইয়া গিয়াছে, তবে তাঁহারা ও তাঁহাদের রচনা চিরকাল বাঙ্গালীর আধি-ভৌতিক জীবনসাধনার মাঙ্গলিক পথ-নির্দেশ করিয়াছে এবং করিবে। এইখানেই এই শ্রেণীর সাহিত্যের সার্থক মূল্য। ডাক শব্দটি জ্ঞানী অর্থে ব্যবহৃত হইত।

ডাক ও খনার বচনগুলি রচনার সময় বৌদ্ধপ্রভাব বঙ্গদেশ হইতে উৎপাটিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইহাতে পুষ্করিণী খনন, বর্ত্ম নির্মাণ, বৃক্ষরোপন ইত্যাদি সাধারণের উপকার জনক ধর্ম যে অবশ্য পালনীয় তাহা অনেকবার নির্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু একটিবারও হরি কিংবা অন্যকোন দেবতার নাম লইবার সূত্র গৃহস্থকে পালন করিতে আহ্বান করা হয় নাই। ভাষার জটিলতায় এই সব বচন মাণিক চাঁদের গান হইতেও অনেক পূর্ববর্তী বলিয়া মনে হয়। খনার বচনের প্রচলন অত্যন্ত অধিক। কালক্রমে তাহাদের ভাষা ক্রমশঃ সহজ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ডাকের বচন ততদূর প্রচারিত হয় নাই। এইজন্য সেইগুলি ভাষার প্রাচীনতা অনেকাংশে রক্ষা করিয়াছে। নিম্নলিখিত বচনগুলির ভাষা খুব প্রাচীন—

(১) বুঝা বুঝিয়া এড়িব লুণ্ড
আগল নৈলে নিবারিব তুণ্ড॥

ডাক নামক জনৈক গোপ ডাকের বচন প্রণয়ন করেন বলিয়া কথিত আছে। ডাক শব্দ সম্ভবতঃ ডাকিনী শব্দের পুংলিঙ্গ এবং ব্যক্তিবিশেষের নাম নাও হইতে পারে। 'প্রসিদ্ধ ঘোষণার যোগ্য মূল্যবান্ কথা' অর্থে 'ডাকের বচন' (famous saying) ব্যবহৃত হইতে পারে। বোধ হয় বঙ্গভাষা স্ফুরণের ঐগুলি প্রাক্ চেষ্টা। ভাষা ও ভাবদৃষ্টে মনে হয় ৮০০—১২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই সকল বচন রচিত হইয়াছিল। যুগে যুগে ভাষার সংস্কার হওয়ায় এইগুলি বর্তমানে সহজাকারে পরিণত হইয়াছে। উহারা একজাতীয় জাতীয় সম্পত্তি। হয়তো প্রাচীনকালে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে উহাদের রচনায় সাহায্য করিয়াছে। কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা এই সমস্ত বচন রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কালিদাস ও গোপালভাঁড় যেমন বাংলার পাড়াগেঁয়ে সমস্ত রসিকতা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন, বঙ্গদেশের জ্ঞানের ক্ষেত্রেও সেইরূপ সেকালে ডাক ও খনা নামধেয় প্রকৃত কিম্বা কল্পিত ব্যক্তিদ্বয় একাধিকবার স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইসব বচনে কবিত্ব নাই। উহারা কঙ্কালসার সত্য, ভাষা উহাদিগকে সাজাইয়া বাহির করে নাই। অনাড়ম্বর ভঙ্গিতে অতি সংক্ষেপে কথাগুলি প্রচারিত হইয়াছে।

খনা ও ডাকের বচন দুইরূপ সামগ্রী। খনা কৃষক ও গৃহাচার্যের নজির। ডাকের বচনে জ্যোতিষ ও ক্ষেত্রতত্ত্বের কথা আছে বটে কিন্তু তাহাতে মানব চরিত্রের ব্যাখ্যাই বেশী।

খনার বচন—(১) খনা ডেকে বলে যান
রোদে ধান, ছায়ায় পান।
(২) যদি বর্ষে মাঘের শেষ
ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।
(৩) খাটে খাটায় লাভের গাঁতি।
তার অর্ধেক কাঁধে ছাতি॥
ঘরে বসে পুছে বাত।
তার ভাগ্যে হা-ভাত॥

ডাকের বচন—(১) গাছ রুইলে বড় কর্ম।
মণ্ডপ দিলে বড় ধর্ম॥
যে দেয় ভাত পানী শালী।
সে না যায় যমের বাড়ী॥
(২) স্বর্ণ, ভূমি, কন্যা দান।
বলে ডাক স্বর্গে যান॥

তন্ত্রবিভূতি **ক. বি., ১৯৬৮**

উত্তর বঙ্গের এক প্রাচীন মনসামঙ্গলের কবির নাম তন্ত্রবিভূতি। অধ্যাপক আশুতোষ দাস গ্রন্থখানির আবিষ্কার এবং সম্পাদনা করিয়া সম্প্রতি ডি-লিট উপাধি পাইয়াছেন। অধ্যাপক সুকুমার সেন মনে করেন যে কবির নাম বিভূতি এবং তিনি

জাতিতে তাঁতি ছিলেন বলিয়া নামের পূর্বে 'তন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। কবির ব্যক্তি-পরিচয় বা অভ্যুদয় কাল সম্বন্ধে ডঃ সেন কিছু সন্ধান দেন নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে উত্তর বঙ্গের জগজ্জীবন ঘোষাল মনসামঙ্গল লিখিয়া খ্যাতি লাভ করেন। তন্ত্রবিভূতির পুঁথি আবিষ্কারের পর দেখা যাইতেছে যে তন্ত্রবিভূতির রচনা জগজ্জীবন বেমালুম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মনসার আখ্যায়িকা উত্তরবঙ্গে যে কিরূপ স্বতন্ত্র ছিল এবং দেবখণ্ড ও নরখণ্ডে অন্যান্য অঞ্চলের কাব্যের তুলনায় যে পার্থক্য ছিল, তন্ত্রবিভূতির কাব্য তাহার আদর্শের সন্ধান দিয়াছে। বঙ্গদেশের প্রান্তীয় অঞ্চলে উত্তর ভারতের আর্য সংস্কারের পরিবর্তে আর্যেতর গ্রামীণ সংস্কার যে প্রবলতর ছিল এবং সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত সমাজজীবনকে প্রভাবিত করিয়াছিল তন্ত্রবিভূতির মনসা-কাহিনী তাহার প্রমাণ। মনসার জন্ম, বিষের উৎপত্তি, শৈবধর্মের স্বরূপ, চন্দ্রপতি সদাগর ও তাহার পারিবারিক কাহিনী আর্যেতর সমাজজীবনের ছায়ায় রচিত।

তন্ত্রবিভূতির কাব্যখানি মালদহ জিলার কালিয়াচক অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। উত্তর বঙ্গের জগজ্জীবন ঘোষাল ও জীবন মৈত্রেয়ের মনসামঙ্গলে বিজয় গুপ্ত, বংশী দাস ও কেতকা দাসের তুলনায় যে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাহার মূল ছিল তন্ত্র-বিভূতির প্রতিভায়। কবির বর্ণনা-শক্তি, চরিত্রসৃষ্টি ও কাহিনীগ্রন্থন-নৈপুণ্য বেশ প্রশংসার যোগ্য।

দুঃখী শ্যামানন্দ [ক. বি, ১৯৬৪]

উড়িষ্যার ধারেন্দা বাহাদুরপুর গ্রামে সদ্‌গোপ বংশে শ্যামানন্দের জন্ম। ইঁহারা উড়িষ্যাবাসী হইলেও ইঁহাদের পূর্বপুরুষ বাঙালী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম কৃষ্ণ মণ্ডল, মাতার নাম দুরিকা। দুরিকার অনেক সন্তান শৈশবে মারা যায় বলিয়া নবজাতকের নাম রাখা হয় দুঃখী। পিতামাতার যত্নে বাল্যে দুঃখীর শিক্ষাবিধানের সুব্যবস্থা হইয়াছিল।

দুঃখী বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়া অম্বিকা কালনায় এক বৈষ্ণব মন্দিরে উপস্থিত হন। ঐ মন্দিরের সেবায়েত হৃদয়চৈতন্য দুঃখীকে দীক্ষা দিয়া নাম রাখেন কৃষ্ণদাস। অতঃপর কৃষ্ণদাস বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া বৃন্দাবনে উপনীত হইলে শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহাকে সুশিক্ষিত করিয়া তোলেন এবং তাঁহার কৃষ্ণভক্তির গভীরতা দেখিয়া নাম রাখেন শ্যামানন্দ।

চৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের পর যে তিনজন বিখ্যাত প্রচারক বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের দায়িত্ব লইয়া সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন শ্যামানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। পশ্চিমবঙ্গে শ্রীনিবাস, উত্তরবঙ্গে নরোত্তম এবং উড়িষ্যায় শ্যামানন্দ বৈষ্ণবধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। খেতুরির মহোৎসবে ইনি সদলবলে যোগ দিয়াছিলেন। উৎকলের বহু অত্যাচারী জমিদার এবং দুর্ধর্ষ দস্যু শ্যামানন্দের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বগুণে দুর্বৃত্ততা ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে। বীরেন্দ্রগ্রামের অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত দামোদর শ্যামানন্দের প্রধান শিষ্য। শের খাঁ নামক একজন মুসলমান দস্যুকে দীক্ষা দিয়া শ্যামানন্দ

"চৈতন্যদাস" নাম রাখেন। পদকল্পতরু সংকলনে চৈতন্যদাসের পদ সংকলিত আছে। চৈতন্যদাস একজন ভাল কীর্তনিয়া ছিলেন। সুবর্ণরেখা অঞ্চলের রাজা রসিক মুরারি সস্ত্রীক শ্যামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বৈষ্ণব-সমাজে পাণ্ডিত্যে, পদরচনায় ও চরিত্রমাহাত্ম্যে দুঃখী শ্যামানন্দ প্রভৃত সম্মানের আসন অধিকার করিয়াছিলেন। আনুমানিক ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামানন্দ দেহরক্ষা করেন।

শ্যামানন্দের কিছু কিছু পদরচনা 'দুঃখী কৃষ্ণদাস', 'দীনকৃষ্ণদাস', ও 'দুঃখিনী' ভণিতায় পাওয়া যায়। ইনি সখীভাবের সাধনায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার নামে কয়েকখানি সাধন-নিবন্ধ বৈষ্ণব-সমাজে প্রসিদ্ধ। 'উপাসনা সার', 'ভাবমালা', 'অদ্বৈততত্ত্ব' এবং 'বৃন্দাবন-পরিক্রমা' তাঁহার ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ের পরিচায়ক।

দৌলতকাজি—লোরচন্দ্রাণী [ক. বি., ১৯৬২, '৬৪, '৬৭, '৬৯]

আরাকান রাজসভার নাম ছিল রোসাঙ। সেই রাজসভার কবি ছিলেন দৌলত কাজি। রাজা থিরি-থু ধম্মার (শ্রীসুধর্মা—১৬২১-১৬৩৮) সমরসচিব আশরফ খানের পৃষ্ঠপোষকতায় দৌলতকাজি লোরচন্দ্রাণী বা সতীময়না নামক কাব্যখানি অর্ধসমাপ্ত করিয়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

দৌলতকাজি চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গতঃ সুলতানপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষ হিন্দু ছিলেন। ইনিও বাল্যকাল হইতে সংস্কৃত ভাষা এবং হিন্দুশাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করেন। তাঁহার 'লোরচন্দ্রাণী' কাব্যের রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৬২২ হইতে ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। এই সময় কাব্যখানির তিনভাগের দুইভাগ লিখিয়া কবি কালকবলিত হন। পরে সান্দ-থু-ধম্মার (চন্দ্রসুধর্মা ১৬৫২-৮৪) রাজত্বকালে প্রধান মন্ত্রী সোলেমানের নির্দেশে কবি আলাওল কাব্যখানিকে ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত করেন।

'লোরচন্দ্রাণী' দৌলতকাজির প্রতিভার বিস্ময়কর পরিচয় এবং তাহা কবিত্বশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কিন্তু কাব্যখানি তাঁহার মৌলিক রচনা নয়। কাব্যরচনার হেতু বর্ণনায় কবি নিজেই বলিয়াছেন যে 'গুজ্রাতী গোহারী ঠেট ভাষায়' লেখা মিঞা সাধনের 'মৈনা কো সৎ' নামক রূপকথা হইতে তিনি কাহিনীর উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। এই কাহিনীটি রূপকথা ও লোকগাথারূপে পূর্বভারতের বহু অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। বিশ্বভারতী হইতে ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল 'লোরচন্দ্রাণী' কাব্য সুসম্পাদন করিয়াছেন। এই কাহিনীর মূল উৎস পাওয়া যায় চতুর্দশ শতাব্দীর মুল্লা দাউদের লেখা 'চন্দায়ন' কাব্যে। 'মৈনা সতবন্তী' নামক আর একখানি হিন্দী কাব্যও পাওয়া গিয়াছে। হিন্দী লোকগাথায়ও লোরক-চন্দ্রাণী-মৈনা-মঞ্জরীর নানা কাহিনী আছে। এই সমস্ত উপকরণই হয়ত দৌলত কাজির করায়ত্ত ছিল।

দৌলতকাজি পুঁথি সমাপ্ত করেন নাই। লোর তাঁহার পত্নী ময়নাকে পরিত্যাগ করিয়া গোহারী দেশের রাজা মোহরার সুন্দরী কন্যা চন্দ্রাণীর প্রণয়াসক্ত হয়। চন্দ্রাণী ছিল বিবাহিতা; কিন্তু তাহার স্বামী বামন ও নপুংসক। লোর বামনকে হত্যা করে

এবং চন্দ্রাণীকে বিবাহ করিয়া গোহারী রাজ্যের অধীশ্বর হয়। এদিকে ময়না বিরহ-কাতরা। সেই সুন্দরী যুবতীকে করায়ত্ত করিবার জন্য ছাতন নামক একজন লম্পট রাজকুমার রত্তনা নাম্নী এক কুট্টনীকে পাঠায়। সে একটি 'বারমাসী' গাহিয়া যৌবন-সুখের বর্ণনা দিতে থাকে। দৌলতকাজি এইটুকু লেখার পরই মৃত্যুমুখে পড়েন। সতী ময়না বহুদুঃখের পর এক ব্রাহ্মণকে দূতরূপে পাঠাইয়া লোরের সন্ধান করেন এবং অনুতপ্ত লোর ফিরিয়া আসায় উভয়ের মিলন হয়, এই অংশটুকু লিখিয়া কবি আলাওল দৌলতকাজির মৃত্যুর ৩০ বৎসর পর কাব্যখানিকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছিলেন।

'নিরঞ্জনের রুষ্মা' [ক. বি, ১৯৬৭]

শূন্য পুরাণে "নিরঞ্জনের রুষ্মা" নামে কৌতূহলোদ্দীপক একটি অংশ আছে। ইহার মূল বিষয় এই যে সদ্ধর্মীরা বৈদিক ব্রাহ্মণদের দ্বারা অত্যাচারিত হইলে আদিদেব ধর্মঠাকুর নিরঞ্জন অর্থাৎ শূন্যমূর্তি দেবতা মুসলমান সেনাপতির বেশ ধরিয়া ব্রাহ্মণদের মঠ মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ইহাই নিরঞ্জনের রুষ্মা বা প্রচণ্ড ক্রোধ-প্রকাশ। এই ব্যাপারের মধ্যে কিঞ্চিৎ ইতিহাস-ভিত্তি আছে এবং ব্রাহ্মণ্য ও অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দ্বন্দ্বের কাহিনী আছে।

শূন্যপুরাণে আছে যে জাজপুরে ব্রাহ্মণেরা অন্ত্যজাতির উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করিত।

"এইরূপে দ্বিজগণ করে সৃষ্টি সংহরণ এ বড় হৈল অবিচার।
অন্তরে জানিয়া মর্ম বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম মায়ারূপী হৈল খোন্দকার॥
হৈয়া যবনরূপী শিরে ধরে কালটুপী হাতে ধরে ত্রিরকস কামান।
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয় খোদায় হৈল এক নাম॥
নিরঞ্জন নিরাকার হৈল ভেস্ত অবতার মুখেত বলয়ে দম্মাদার।
যতেক দেবতাগণ সবে হৈয়া একমন আনন্দেতে পরিল ইজার॥
ব্রহ্মা হৈল মহম্মদ বিষ্ণু হৈল পেগাম্বর আদম হৈল শূলপাণি।
গণেশ হৈল কাজি কার্ত্তিক হৈল গাজি ফকীর হৈল যত মুনি॥
তেজিয়া আপন ভেক নারদ হৈল শেখ পুরন্দর হৈল মৌলানা।
চন্দ্র সূর্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে সভে মিলি বাজায় বাজনা॥
আপনি চণ্ডিকা দেবী তিঁহ হৈল হায়া বিবি পদ্মা হৈল বিবি নূর।
যতেক দেবতাগণ হৈয়া সবে একমন প্রবেশ করিল জাজপুর॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা ফিড়্যা খায় রঙ্গে পাখড় পাখড় আল্লা বোল।
সেবিয়া ধর্মের পায় পণ্ডিত রামাই গায় এ বড় বিষম গণ্ডগোল॥

শূন্যদেবতা নিরঞ্জনের এই নিষ্ঠুর ক্রোধের বর্ণনা ধর্মপূজা বিধান, শূন্যপুরাণ এবং সহদেব চক্রবর্তীর 'অনিলপুরাণ' কাব্যে আছে। এই অংশের বাকীটুকু 'কলিমা জালাল' বা বড় জালালি। আরবী শব্দ কলিমা=বাক্য, জালাল=প্রচণ্ড, রুদ্র। মুসলমান অত্যাচারকে হিন্দু দেবতার সাময়িক ক্রোধ এবং পরিণামে আশীর্বাদরূপে বুঝাইবার দুর্বল

মানসিকতার অদৃষ্টবাদী পরিচয় এই অংশে প্রকাশ পাইয়াছে। 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' রূপকথা জাতীয় কৌতুককাহিনী; কিন্তু ইহার অন্তরালে জাতীয় জীবনের অনেক ঐতিহাসিক রহস্য আছে।

প্রাচীন পদাবলী সংকলনসমূহ [ক. বি., ১৯৬৭]

প্রাচীন পদাবলী সংকলনের ইতিহাস যেমন বিচিত্র তেমন বিপুল। বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির আদি যুগে চর্যাপদ, সদুক্তিকর্ণামৃত, কবীন্দ্র বচনসমুচ্চয়, মানসোল্লাস, বিদগ্ধ-মুখমণ্ডন, প্রাকৃতপৈঙ্গল প্রভৃতি সংকলনের পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদসাহিত্যের যুগেও বহু সংকলন গ্রন্থ পাওয়া যায়। এই সংকলনগুলি বহু কবিকে মহাকালের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে, শ্রেষ্ঠ রচনার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় সাধন করাইয়াছে, কবিদের অভ্যুদয়কাল সম্বন্ধে আলোক সম্পাত করিয়াছে এবং যুগরুচির পরিচয়ও দিয়াছে। প্রাচীন বৈষ্ণবপদাবলীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংকলনের পরিচয় প্রদত্ত হইল।

রামগোপাল দাস বা গোপাল দাসের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী (১৬৭৩ খ্রীঃ) সম্ভবতঃ আদি সংকলন। তাঁহার পুত্র পীতাম্বর দাসের সংকলনের নাম 'রসমঞ্জরী'। ইহাতে রসতত্ত্বের বৈষ্ণবীয় ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পদসংগ্রহ করা হইয়াছে। এই জাতীয় অন্যান্য সংকলনের নাম মুকুন্দ দাসের 'সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়', শশিশেখরের 'নায়িকা-রত্নমালা'।

কাব্যরসের আস্বাদনবৈচিত্র্যের জন্য এবং ভাল ভাল পদের সংরক্ষণের জন্য যে সংকলনগুলি রচিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ক্ষণদাগীতচিন্তামণি (১৭০৪ খ্রীঃ)। ত্রিশটি 'ক্ষণদা' বা বিভাগে ইনি রসপর্যায়ক্রমে ৪৫ জন কবির তিন শতাধিক পদ সংকলন করেন। ভক্তিরত্নাকরের কবি ঘনশ্যাম দাস (নরহরি চক্রবর্তী) 'গীতচন্দ্রোদয়' এবং 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি' নামে দুইখানি সংকলন প্রকাশ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে শ্রীনিবাস আচার্যের প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুর 'পদামৃতসমুদ্র' নামক সংকলনে ৭৪৬টি পদ সংগ্রহ করিয়া 'মহাভাবানুসারিণী' নামে সংস্কৃত ভাষায় টীকা লেখেন। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সংকলনের নাম 'পদকল্পতরু'। সংকলয়িতার নাম গোকুলানন্দ সেন। মুর্শিদাবাদের টেঞা-বৈদ্যপুর গ্রামে বৈদ্যবংশে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাঁহার জন্ম। তিনি বৈষ্ণব-সমাজে 'বৈষ্ণবদাস' নামে পরিচিত। এই নামে পদরচনা ও সংগ্রহ করিয়াছেন। ইনি কীর্তন-গায়ক ছিলেন এবং 'গীতকল্পতরু' এই নামে পদসংগ্রহ করেন। পরে ইহাই 'পদকল্পতরু' নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৪০ জন পদকর্তার তিন হাজারেরও অধিক পদ ইহাতে সংকলিত।

বৈষ্ণব পদসংকলনের সংখ্যা প্রচুর। গৌরসুন্দর দাসের 'কীর্তনানন্দে' ৬০ জন কবির সাড়ে ছয়শত পদ আছে। দীনবন্ধু দাসের 'সংকীর্তনামৃতে' ৪০ জন কবির পাঁচশত পদ আছে। এই সংকলনে চণ্ডীদাস-ভণিতার একটি পদও নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সংকলিত হয় কমলাকান্ত দাসের 'পদরত্নাকর', নিমানন্দ দাসের

"ভবানী ভবের গান মালসীমায়ুর" [ক. বি, ১৯৬৬]

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব হইতেই নানা প্রকার ছড়া, লোকগীতি, কবি, তরজা, সারি, জারি, ঢপ প্রভৃতি নানাধরনের সঙ্গীত প্রচলিত হয়। আখড়াই, হাফ-আখড়াই, টপ্পা প্রভৃতি কত গানই যে ছিল তাহার হিসাব করাই কঠিন। জয়নারায়ণ ঘোষাল তাঁহার 'করুণানিধান বিলাস' নামক গ্রন্থে এইসব গানের মোটামুটি এক ফিরিস্তি দিয়াছেন। সেই বিবরণে আছে—

সংকীর্তন নানা ভাঁতি অপূর্ব সুন্দর
গড়াহাটি রানিহাটি বিরহ মাথুর।
পাঁচালী অনেক ভাঁতি রামায়ণ স্বর,
কথকথা তরজ তে শাড়িতে প্রচুর।
ভবানী ভবের গান মালসীমায়ুর,
গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী বিজয়াতে ভোর।
সাপড়িয়া বাদিয়ার ছাপের লহর
বাঙ্গলার নব গান নূতন ঝুমুর।

উক্ত উদ্ধৃতির ইঙ্গিত এই যে ভবানী-পার্বতী এবং ভব-শিবের পৌরাণিক বা লৌকিক বিষয় অবলম্বনে একজাতীয় সঙ্গীতের প্রচলন ছিল এবং সেই সঙ্গীতের নাম ছিল মালসী এবং মায়ুর। ভবানীর গান মালসী এবং ভবের গান মায়ুর—এইরূপ অর্থও হইতে পারে। বস্তুতঃ দেখা যায় যে দুর্গা-কালী বিষয়ক বহু সঙ্গীত 'মালবশ্রী' নামক রাগিণীতে গাওয়া হইত। ঐ রাগিণীরই রকমারি ও মিশ্রস্বরে শাক্ত সঙ্গীতগুলি গেয়। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, ভৃগুরাম দাস, নরচন্দ্র, জগৎদুর্লভ প্রভৃতি কবিরা বহু মালসী গান রচনা করেন। মালবশ্রী শব্দের বিকৃত উচ্চারণের ফলেই হয়ত মালসী শব্দের উৎপত্তি। মায়ুর শব্দটিও একটি প্রাচীন রাগের নাম। শিবের মাহাত্ম্য-কীর্তন করিবার জন্য বিশেষ স্বরে গেয় শিবসঙ্গীতগুলিকে মায়ুর সঙ্গীত বলা হইত। শিবমঙ্গল কাব্যের সঙ্গে সংযুক্ত শিবের গান, গাজন উপলক্ষে শিবের গানকে মায়ুর বলা হইত। আধুনিক কালে প্রসাদী শ্যামাসঙ্গীতকে অঞ্চলবিশেষে মালসী গান বলে; কিন্তু মায়ুর গানের প্রচলন আর দেখা যায় না।

সঞ্জয়ের মহাভারত [ক. বি., ১৯৬৮]

মহাভারতের আদি অনুবাদকদের মধ্যে সঞ্জয়ের নাম শোনা যায়। পরাগলী মহাভারতের রচয়িতা কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং অব্যবহিত পরবর্তী কবি শ্রীকর নন্দী ষোড়শ শতাব্দীতে মহাভারতের আংশিক কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মনে করিয়াছিলেন যে ইঁহাদেরও পূর্বে সঞ্জয় নামক কোন ব্রাহ্মণ কবি মহাভারতের আদি অনুবাদক। সঞ্জয়ের ভণিতাযুক্ত কিছু প্রাচীন পুঁথি তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ভণিতায় আছে—

ভরদ্বাজ উত্তম বংশেতে যে জন্ম।
সঞ্জয়ে ভারতকথা কহিলেক মর্ম॥

দেব অংশে উৎপত্তি ব্রাহ্মণ কুমার।
সঞ্জয় রচনা কৈল পাঁচালি প্রকার॥

ব্যাসদেবের শিষ্য গবল্গণ নামক মুনির পুত্র সঞ্জয় অন্ধ ছিলেন। ব্যাসদেব তাহাকে দিব্যদৃষ্টি দান করিয়া সম্রাট ধৃতরাষ্ট্রের একান্ত সচিব নিযুক্ত করেন। ইনিই সমগ্র মহাভারত কাহিনীর প্রবক্তা। মূল মহাভারতের যত্রতত্র 'সঞ্জয় উবাচ' দেখা যায়। পৌরাণিক এই সঞ্জয়ের সঙ্গে লিপিকর বা গায়েনরা কোন গোলমাল করিয়াছেন কিনা বলা যায় না। আধুনিক গবেষকরা দেখাইয়াছেন যে কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসের লেখা মহাভারতের পুঁথিগুলির সঙ্গে 'সঞ্জয়'-ভণিতাযুক্ত পুঁথিগুলির হুবহু মিল। একজন অন্য জনের অন্ধ অনুকরণ করিয়াছেন। পরমেশ্বরের ঐতিহাসিক পরিচয় প্রমাণিত হইয়াছে, সঞ্জয় সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। এমতাবস্থায় অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সঞ্জয় নামে কোন কবির অস্তিত্ব নাই। যদি কেহ থাকেন তাহা হইলে তিনি পরমেশ্বরের পরবর্তী এবং স্বল্প প্রতিভাধর অনুকারী কবি। পরমেশ্বরের পুঁথিতে 'দ্রৌপদীর যুদ্ধ' শীর্ষক কোন আখ্যান নাই। সঞ্জয় ভণিতায় ইহা আছে। এই যুক্তি দেখাইয়া কেহ কেহ সঞ্জয় নামা কবির পৃথক অস্তিত্ব দাবী করিয়াছেন।

মহারাজ নরনারায়ণ [ক. বি., ১৯৬৫]

মহারাজ নরনারায়ণ কুচবিহারের অধিপতি ছিলেন। ইনি ১৪৭৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে আসামের সঙ্গে রাজ্যের সীমানা বিরোধ অবলম্বনে আহোম রাজ চুকামফা স্বর্গদেবের কাছে একখানি পত্র লেখেন। পত্রখানি বাংলা গদ্যে লেখা এবং প্রাচীনতম বাংলা গদ্যের আদিমতম নিদর্শন বলিয়া গণ্য। এই পত্রসূত্রেই মহারাজ নরনারায়ণ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন।

নরনারায়ণের পত্রখানি স্পষ্টই ইঙ্গিত দেয় যে দীর্ঘকাল ধরিয়া দৈনন্দিন কাজকর্মে বাংলা গদ্যভাষায় প্রচুর ব্যবহার চলিতেছিল। এই সময় কুচবিহার, আসাম এবং ভুটানের মধ্যে বাংলা গদ্যেই পত্র ব্যবহার চলিত। নরনারায়ণের পত্রে ভাষাবিন্যাসে চারুত্ব ছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন, "তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে।"

পত্রখানির ভাষায় সংস্কৃত শব্দাদির ব্যবহার, বাক্যের অন্বয় এবং বক্তব্যের স্পষ্টতা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগেই বাংলা গদ্যের যে সুন্দর কাঠামো তৈয়ারী হইয়াছিল মহারাজ নরনারায়ণের পত্রখানি তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত।

মহারাষ্ট্র পুরাণ [ক. বি, ১৯৬৭]

গঙ্গারামের লেখা 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' বা 'ভাস্কর পরাভব' পুরাণের প্রলেপে লেখা এক বিস্ময়কর ঐতিহাসিক কাব্য। বাংলাদেশে বর্গীর অত্যাচারের এক নিখুঁত নিপুণ ইতিহাস কাব্যখানিতে পাওয়া যায়। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে মৈমনসিংহের কেদারনাথ মজুমদার মহারাষ্ট্র পুরাণের পুঁথির সন্ধান দেন। তিনি জানান যে কিশোরগঞ্জ মহকুমার ধরীশ্বর গ্রামে গঙ্গারামের জন্ম। তাঁহার কৌলিক উপাধি দেব, কিন্তু মুসলমান

জমিদারের কর্মচারীরূপে চৌধুরী উপাধি পান। জঙ্গলবাড়ীর মুসলমান জমিদারের কর্মচারীরূপে তিনি মুর্শিদাবাদ নবাব দরবারে যাতায়াত করিতেন বলিয়া বর্গীর হাঙ্গামা সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। ১৭৪২-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে বর্গীর উৎপাত। গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাণ পুঁথিতে দেখা যায় যে গ্রন্থখানি ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। "ইতি মহারাষ্ট্র পুরাণে প্রথম কাণ্ডে ভাস্কর পরাভব। শকাব্দ ১৬৭২ সন ১১৫৮ সাল তারিখ ১৪ই পৌষ রোজ শনিবার।"—এইভাবে স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্নরূপে গ্রন্থ-রচনার কাল নির্দেশিত হইয়াছে। অধ্যাপক রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গারামকে যশোহর নড়াইলের অধিবাসী মনে করেন। কিন্তু দত্ত-উপাধিক এই কবি মহারাষ্ট্র পুরাণের লেখক কিনা তাহার নিশ্চিত প্রমাণ নাই। ব্যোমকেশ মুস্তাফী কবিকে পশ্চিমবঙ্গীয়রূপে নিঃসংশয়িত প্রমাণ উপস্থিত করেন নাই। সুতরাং কেদারনাথ প্রদত্ত বিবরণই যুক্তিপূর্ণ মনে হয়।

মহারাষ্ট্র পুরাণের প্রথম কাণ্ডের নাম ভাস্কর পরাভব। অন্য কাণ্ড আর লেখা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কাব্যের বহিরাবরণ পুরাণের মত। পৃথিবীতে অবিচার অত্যাচার দেখিয়া ব্রহ্মা জর্জরিতা পৃথিবীকে লইয়া শিবের কাছে গেলেন। শিব নন্দীকে পাঠাইয়া মারাঠা-রাজ সাহুকে অত্যাচারী দমন করিতে বলিলেন। শিবানুচর ভাস্কর পণ্ডিত বর্গীর অর্থাৎ অশ্বারোহী সৈন্যসহ বাংলাদেশে নিষ্ঠুর অত্যাচার করিল। সেই পাপে পার্বতী ক্রুদ্ধা হইয়া ভাস্করকে বর্জন করিলেন। আলিবর্দি কৌশল করিয়া ভাস্করকে হত্যা করায় হাঙ্গামা শেষ হয়।

এই কাব্যখানিতে পৌরাণিকতা প্রলেপমাত্র। বর্গীর অত্যাচারের জলন্ত বিবরণ এবং তৎসংক্রান্ত ঐতিহাসিক তথ্য, ব্যক্তি ও স্থানের পরিচয় এমন নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণিত যে কাব্যখানিকে স্বচ্ছন্দে ঐতিহাসিক কাব্যের গৌরব প্রদান করা যাইতে পারে।

মালাধর বসু [ক. বি., ১৯৬১]

ইনি গুণরাজ খাঁন উপাধিক মালাধর বসু। ইনি বর্ধমানের কুলীন গ্রামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি কুলীন কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার পিতা ভগীরথ, মাতা ইন্দুমতী এবং পুত্র সত্যরাজ খান।

সেকালে রাজকার্যে হিন্দুকর্মচারীদের বেশ হাত ছিল। রাজা ও সুলতানদের মত দরবারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও সাহিত্য ও শাস্ত্রচর্চার পোষকতা করিতেন। নিজেরাও সুযোগ ও যোগ্যতামত কাব্যরচনা করিতেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এমনই এক রাজকর্মচারী গৌড়েশ্বরের সংবর্ধনা লাভ করিয়াছিলেন। মালাধর বসু সুলতান রুকুনুদ্দীন বারবক্ সাহের কাছে 'গুণরাজ খান' উপাধি পাইয়াছিলেন। ১৩৯৫ শকাব্দে (১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে) মালাধর এক কৃষ্ণলীলা কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন ভাগবত, হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ অবলম্বনে। তাঁহার গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণবিজয়। সাত বৎসর পরে (১৪৮০-৮১ খ্রীষ্টাব্দে) এই শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য শেষ হয়। যতদূর জানা গিয়াছে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কৃষ্ণলীলা বিষয়ক প্রথম বাংলা কাব্য। ইহা অতি সুললিত কাব্য।

কবির ভক্তহৃদয়ের পরিচয় কাব্যের মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। মালাধরের পুত্র সত্যরাজ খান যখন পুরীতে শ্রীচৈতন্যের সহিত প্রথমবার মিলিত হন তখন মহাপ্রভু তাঁহার পিতার রচিত কাব্যের প্রশংসা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম অনুবাদের গৌরবই শুধু মালাধর বসুর প্রাপ্য নয়, তিনি প্রাক্‌চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগের ভাবধারার মধ্যে সেতুবন্ধন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনায়, গোপিকাগণের বিরহার্তি বর্ণনায় ও যুদ্ধাদির বর্ণনায় মালাধর সমান উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা ভাগবতে কোথাও এমন সুন্দরভাবে নাই। ইহা মালাধরের নিজস্ব রচনা—

যমুনার কূলে যবে বংশীতে দেই সান।
ফিরিয়া যমুনা নদী বহই উজান ॥
কদম্বের তলে যবে বংশীনাদ দিল।
তা শুনি ময়ূরপক্ষ নাচিতে লাগিল ॥
যথান যতেক বৃক্ষ ছিল বৃন্দাবনে।
বংশীর নাদে ফুল ধরে তরুগণে ॥

তিনি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেরই শুধু পথিকৃৎ নহেন, তাঁহারই প্রেরণায় পরবর্তীকালের অনেক কবি শ্রীকৃষ্ণের গৌরবময় চরিত্র অবলম্বনে কাব্য রচনা করেন।

মৃগলুব্ধ [ক. বি., ১৯৬৮]

শিবের কাহিনী অবলম্বনে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে যে কাব্যধারার সন্ধান পাওয়া যায়, তাহার একদিকে আছে শিবমঙ্গল বা শিবায়ণ কাহিনী আর একদিকে মৃগলুব্ধ নামে শিবমাহাত্ম্যবিষয়ক পুঁথিও পাওয়া গিয়াছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে মৃগলুব্ধের কাহিনী শুধু চট্টগ্রাম অঞ্চলেই প্রচলিত এবং সেইখানেই দুখানি পুঁথি আবিষ্কার করিয়াছিলেন মুন্সী আব্‌দুল করিম।

শৈবপুরাণে শিবচতুর্দশীর একটি ব্রতকথা আছে। হস্তিনাপুরের রাজা মুচকুন্দ এবং তাঁহার রাণী শিবচতুর্দশীর ব্রত সম্পাদন করিয়া সশরীরে স্বর্গে গিয়াছিলেন। একটি ব্যাধ কদাচারে লিপ্ত ছিল। ইন্দ্রের শাপে একটি বিদ্যাধর ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করে। শিবচতুর্দশীর রাত্রিতে ঝড়বৃষ্টিতে পথ হারাইয়া বনের মধ্যে এক বেলগাছে সে আশ্রয় নেয়। বৃক্ষতলে ছিল এক শিবলিঙ্গ। ব্যাধের নড়াচড়ায় কিছু বিল্বপত্র শিবের মস্তকে পড়ায় ব্যাধের মুক্তি ঘটে। এই কাহিনী অবলম্বনে চট্টগ্রামের রামরাজা ও রতিদেব যে কাব্য রচনা করেন তাহাই মৃগলুব্ধ নামে পরিচিত। দীনেশচন্দ্র সেন রঘুনাথ রায় নামে মৃগলুব্ধের তৃতীয় লেখকের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কাব্যখানির সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

কবি রামরাজা জাতিতে মগ ছিলেন। প্রথমে হয়ত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন পরে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই কবির আবির্ভাব। রতিদেবও চট্টগ্রামের লোক এবং ১৬৭৪ খ্রীঃ রামরাজার পর তাঁহার কাব্য রচিত হয়।

রাধামোহন ঠাকুর [ক. বি., ১৯৬২]

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য শ্রীনিবাসের প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুর পাণ্ডিত্যে, কবিত্বে এবং বৈষ্ণবতায় অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি অভিজাত বংশীয় গুরুর স্থান অধিকার করিয়া তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করেন। মহারাজ নন্দকুমার তাঁহার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

রাধামোহনের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব তাঁহার পদসংকলন 'পদামৃতসমুদ্র'। কীর্তন-গানের উপযোগী পদগুলি তিনি নির্বাচন করিয়াছিলেন। সংকলনে মোট পদসংখ্যা ৭৪৬। ইহার মধ্যে তাঁহার নিজের রচিত পদ ২২৮টি। তিনি ৩৯ জন পদকর্তার পদ গ্রহণ করেন। সংগ্রহ ব্যাপারে তিনি কবি গোবিন্দদাসের প্রতি অধিকতর পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার নিজের এবং গোবিন্দদাসের পদসংখ্যা পাঁচ শতাধিক। তাঁহার নিজের পদগুলিও গোবিন্দদাসের অনুকরণ।

রাধামোহনের সংকলন পদামৃত সমুদ্রের একটি বড় বিশেষত্ব এই যে তিনি প্রতিটি পদের টীকা রচনা করিয়াছেন সংস্কৃত ভাষায়। টীকার নাম "মহাভাবানুসারিণী"। চর্যাপদের যেমন মুনিদত্তকৃত 'নির্মল গিরা' নামক সংস্কৃত টীকা আছে, পদামৃত-সমুদ্রেরও সংস্কৃত টীকা আছে। টীকা রচনায় রাধামোহন বিস্ময়কর পাণ্ডিত্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তাৎপর্য ব্যাখ্যা এবং অপূর্ব রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন।

সেকশুভোদয়া [ক. বি, ১৯৬৪, ১৯৬৮]

সেকশুভোদয়া ভাঙা সংস্কৃতে লেখা একখানি অপূর্বগ্রন্থ। সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে জালালুদ্দিন তাব্রিজি নামক একজন মুসলমান গ্রন্থখানি রচনা করেন। এই গ্রন্থে রাজা লক্ষ্মণসেনের আমলে কিছু কিছু গল্প অদ্ভুত ভঙ্গিতে বলা হইয়াছে। এই গ্রন্থে সভাকবি ধোয়ী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে তিনি জাতিতে তন্তুবায় ছিলেন। জয়দেবের প্রণয়িনী নটি পদ্মাবতীর প্রসঙ্গও এই গ্রন্থখানিতে পাওয়া যায়। পাহাড়পুরের মন্দিরের ভিত্তিগাত্রে কুয়ার ধারে শিশুর গলায় দড়ির যে ছবিটি আছে তাহার ব্যাখ্যা আছে সেকশুভোদয়া গ্রন্থে। লক্ষ্মণসেনের সভার এক গায়কের গান শুনিয়া কোনো মুগ্ধা নারী ঘড়ার পরিবর্তে নিজের ছেলের গলায় দড়ি বাঁধিয়া কুয়ার মধ্যে নামাইয়া দেয়।

সেকশুভোদয়া গ্রন্থে একজন 'সেক' অর্থাৎ মুসলমান ফকিরের মঙ্গলময় অভ্যুদয়ের গল্প বলা হইয়াছে। লক্ষ্মণ সেন একজন ফকিরের মোহে মুগ্ধ হন। আমাত্যবর্গের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও এই ফকিরকে তিনি প্রচুর সম্পত্তি দান করেন এবং গৌড়ে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দেন। তাব্রিজি সাহেব সেই কাহিনী বলিয়াছেন এবং ব্যাকরণ বন্ধনহীন ভাঙা সংস্কৃত ভাষায় লক্ষ্মণসেনের প্রশংসামূলক নানা কাহিনী লিখিয়াছেন। লক্ষ্মণসেন কলসী কাঁখে এক সুন্দরী বৌয়ের তালপাতার মাকড়ীর ফাঁকে বাণ চালাইয়া ছিলেন, উমাপতিধরকে হত্যার আদেশ দিয়াছিলেন এই সব নানা গল্প ভাঙা ভাঙা ভাষায় বলা হইয়াছে। একটি পদে আছে "শ্রীমৎ লক্ষ্মণসেন মহাবীর, কর্ণরন্ধ্রে ভেজে

তীর ॥' আর একটি পদে আছে, "হও যুবতী পতিএ হীন, গঙ্গা সিনাইবাক জাইয়ে দিন ॥" এই গ্রন্থের কাহিনী-কৌতূহল চমৎকার এবং ইহাতে বাংলা ছড়াগানের প্রাচীন রেশ রক্ষিত হইয়াছে।

শিবায়ন [ক. বি., ১৯৬১]

বাংলাসাহিত্যে শিবায়নের উদ্ভব ঘটিয়াছে সপ্তদশ শতাব্দীতে। শিব যদিও অতি প্রাচীন দেবতা তথাপি শিবমঙ্গল বা শিবায়ন কাব্যে শিবের পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনী মিশাইয়া যে কাব্যকথা রচিত হইয়াছে তাহা সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে হয় নাই। শিবায়নকে অনেকে মঙ্গলকাব্য ধারার অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহেন নাই এই কারণে যে, ইহাতে দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য কোনো লৌকিক গল্প কথা নাই। এই কাব্যে শিব সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনী যেমন দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, শিবের তপস্যা, পার্বতীর তপস্যা, মদনভস্ম, সমুদ্রমন্থন, বিষপান প্রভৃতি বিষয় আছে। লৌকিক অংশে শিবের গৃহস্থালী চাষবাস, মাছধরা উপলক্ষে বাগ্দিনীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা, পার্বতীর সহিত দাম্পত্য কলহ, পরে শাঁখারীর ছদ্মবেশে শাঁখা পরাবার ছলে উভয়ের মিলন—এই কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীকে সার্থকভাবে সমন্বিত করিয়া কোনো কবিই উচ্চস্তরের কাব্য রচনা করিতে পারেন নাই। অথচ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রতিভাবান কোনো কোনো কবি শিবায়ন রচনায় হাত দিয়াছিলেন।

শঙ্কর কবিচন্দ্র নামে একজন কবির উল্লেখ পাওয়া যায়, হয়ত ১৬৮০ খৃঃ কাব্যখানি লেখা হয়। ইহাতে মচ্ছধরা ও শঙ্খপরা শীর্ষক দুইটি পালা আছে। রামকৃষ্ণ রায়ের শিবায়ন কাব্যের পুঁথি ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে অনুলিখিত বলিয়া ধরা হয়। কাব্যখানি ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের দিকে রচিত হইতে পারে। রামকৃষ্ণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শিবের পৌরাণিক কাহিনী বিশদ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শিবায়নের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন রামেশ্বর ভট্টাচার্য। ইনি শিবকাহিনীর লৌকিক অংশ সুবিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই কবি ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ভাষাশিল্পে ও অলঙ্করণ চাতুর্যে রামেশ্বর প্রথম শ্রেণীর কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

শিক্ষাষ্টক [ক. বি., ১৯৬০]

শ্রীরূপ গোস্বামীর সংকলিত 'পদ্যাবলী' নামক গ্রন্থে 'শিক্ষাষ্টক' নামে আটটি সংস্কৃত শ্লোক আছে। শ্লোক কয়টিকে তিনি চৈতন্যদেবের নিজের রচনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের জীবনীকারেরা তাঁহাকে অসাধারণ পণ্ডিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি তরুণ বয়সে বিদ্বজ্জন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থাদির কোন পরিচয় জানা যায় না। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের তিনি যে উপদেশ দিতেন তাহাই শিক্ষাষ্টক। ইহার

মধ্যে বৈষ্ণবের বিশুদ্ধ জীবনাদর্শের কথা বলা হইয়াছে। শ্লোকগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। চেতোর্দর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপণম্
শ্রেয়ঃ কৈরব-চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধি বর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্বাত্ম-স্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্॥

২। নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

৩। তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

৪। ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

৫। অয়ি নন্দতনুজকিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলিসদৃশং বিচিন্তয়॥

৬। নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥

৭। যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎসর্বং গোবিন্দবিরহেন মে।

৮। আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

শূন্য পুরাণ [ক. বি, ১৯৫৯, ১৯৬০, ১৯৬২]

রামাই পণ্ডিতের ভণিতাযুক্ত শূন্য পুরাণের পুঁথি সাহিত্যের ইতিহাসে এক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। রামাই নামটি ধর্ম সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রদ্ধাপূর্ণ ঐতিহ্য লাভ করে। কয়েকখানি পুঁথিতে 'আগমপুরাণ' 'অনাদ্যের পুঁথি, 'শূন্য পুরাণ' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। নগেন্দ্রনাথ বসু এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, ইহা 'ধর্মবিষয়ক প্রাচীনতম পুঁথি এবং সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দীর রচনা। দীনেশচন্দ্র সেন এই অভিমতের সমর্থন করিয়াছিলেন, কিন্তু আধুনিক গবেষকেরা শূন্য পুরাণের পুঁথির প্রাচীনতা স্বীকার করেন না।

কেহ কেহ রামাই পণ্ডিতের অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়াছেন। বস্তুতঃ রামাই সম্বন্ধে বহু বিতর্ক হইয়াছে এবং সমস্ত গবেষণাই অনুমানমূলক।

শূন্যপুরাণ পঞ্চাশটি উপচ্ছেদে বিভক্ত। সংস্কৃত পুরাণের অনুকরণে লেখা। ইহার সূচনায় আছে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা। আর আছে ধর্মপূজা ও কৃত্য বিষয়ক নানা অনুষ্ঠানের উল্লেখ। ছড়ার আকারে বিচ্ছিন্নভাবে বইখানি লেখা। "হরিশ্চন্দ্র রাজার" কাহিনী আছে, আর আছে 'নিরঞ্জনের রুষ্মা" নামে একটি কাহিনী। শূন্যপুরাণের দেবতা নিরঞ্জন শূন্যমূর্তি; তিনি রুষ্ট হইয়া মুসলমান সেনাপতি বেশে বিধর্মীদের কঠোর শাস্তি দিয়াছিলেন। রচনার এই অংশে মুসলমানী প্রভাব স্পষ্ট। বৌদ্ধেরা শূন্যমূর্তির উপাসক। কেউ কেউ মনে করিয়াছেন যে শূন্য পুরাণে বৌদ্ধ প্রভাবও আছে। যে সব পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহার বহু স্থলে আধুনিক শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার। গ্রন্থখানি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক এবং অন্ত্যজ শ্রেণীর বাঙালীদের ধর্মসাধনার ইতিহাসও বটে।

শ্রীকর নন্দী [ক. বি, ১৯৬৪]

চট্টগ্রামের জায়গীরদার পরাগল খাঁ সুলতান হোসেন শাহের লস্কর সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার সভায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত রচনা করেন। অন্যতম সভাকবি শ্রীকর নন্দীকে পরাগল জৈমিনী সংহিতা অনুসারে অশ্বমেধ—পর্বের বর্ণনা করিতে আদেশ দেন। শ্রীকর নন্দীর সঙ্গে পরাগলপুত্র ছুটি খাঁর বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল। ছুটি খাঁর প্রকৃত নাম ছিল নসরৎ খাঁ। পরমেশ্বর এবং শ্রীকর উভয়েই পিতাপুত্রের অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীকর নন্দী লিখিয়াছেন,

খান পরাগল সুত পিতৃভক্ত অতি
বাপের সংহতি সে নৃপতি সেনাপতি।
চিরকাল জীবন্ত লস্কর ছুটি খান
যাহার লভিয়া সে প্রেম সন্নিধান।
শ্রীকর নন্দীএ যে পয়ার রচিল
জৈমিনি কহিলেক যেহেন দেখিল।

ছুটি খাঁ যুদ্ধপ্রিয় তরুণ বীর। পাণ্ডবদের অসাধারণ শৌর্যের কাহিনী তাঁহাকে উল্লসিত করিত। তাই শ্রীকর তাঁহার কাব্যের মধ্যে বর্ণনা সংক্ষিপ্ত বজায় রাখিয়াও যৌবনাশ্ব, অনুশাল, নীলধ্বজ জন', সুধন্বা, সুরথ, হংসধ্বজ, প্রমীলা-অর্জুন,

প্রথম পত্র ঃ দ্বিতীয়ার্ধ

প্রশ্ন ১। বাংলা সাহিত্যের নবযুগ বিলাতী সভ্যতার সংস্পর্শেই গড়িয়া উঠিয়াছে। এই যুগের সূচনায় বিভিন্ন সাহিত্যধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রসঙ্গে যুগবৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর।

উত্তর। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দীকেই সাধারণতঃ নবযুগ বলা হইয়া থাকে। আধুনিকতার কিছু কিছু লক্ষণ অর্থাৎ নবজাগৃতি বা Renaissance-এর কিছু কিছু পরিচয় পূর্ব হইতে সূচিত হইলেও শ্রীরামপুর মিশন এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পরই বাংলা সাহিত্যের আকৃতি ও প্রকৃতিতে অভাবনীয় পরিবর্তন সূচিত হইতে থাকে। এইজন্য সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই নবযুগের কালনির্দেশ করিয়া থাকেন। মিশনারী ও ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতদের গদ্য রচনায়, রামমোহনের বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভায় এবং ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় নবযুগের দুন্দুভিধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে বিস্ময়কর বিদ্রোহাগ্নি জ্বালাইয়া যে ভবিষ্যৎকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল নবযুগের পথ তাহাতেই রেখাঙ্কিত হইয়া উঠে।

এই নবযুগে ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনোলোকে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। পুরাতন ধর্মবিশ্বাস ছিল না কিন্তু জ্ঞানবাদী দৃষ্টিতে প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের পুনর্বিচার করা হইতে থাকে। প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতনতার সঙ্গে সমাজের নূতন বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা-বোধ জন্মায়। সংবাদপত্র এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে মানবতাবোধ, জাতীয়তার অভিমান, বিজ্ঞানবুদ্ধি এবং যুক্তিবাদের প্রবণতা সূচিত হয়। অন্ধ সংস্কারের অবসান ঘটায় বাঙ্গালীর যে মানসমুক্তি ঘটে তাহার সুস্পষ্ট প্রতিফলন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সাহিত্যকর্মের মধ্যে দেখা গিয়াছিল। এই সময়কার সাহিত্যধারার মধ্যেই নবজাগরণের সমস্ত লক্ষণগুলি অভিব্যক্ত হইয়াছিল।

নবযুগের সাহিত্যে গদ্যরচনার বিকাশ ঘটে, পদ্যসাহিত্যে নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হয় এবং রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার ফলে নাট্যসাহিত্যের বিস্ময়কর বিকাশ হইয়াছিল। দেবনির্ভর গতানুগতিক সাহিত্যসাধনা ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সমাপ্ত হইয়াছিল। মিশনারীদের উদ্যমে বাঙ্গালী মনীষীরা মননশীল গদ্যরচনায় হাত দিলেন, ঈশ্বরগুপ্ত ও মধুসূদনের কণ্ঠে নূতন যুগের কাব্যবাণী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল এবং কলিকাতার অভিজাত সংস্কৃতিতে জীবনধর্মী নাট্যসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ দেখা দিল। ইহার ফলে সব দিক হইতে বাংলা সাহিত্যের মধ্যে যুগধর্মের বৈশিষ্ট্য দৃশ্যমান হইয়া উঠিল।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রাচীন ঐতিহ্য কিছুই নাই। চিঠিপত্রে বা দলিলদস্তাবেজে গদ্য ব্যবহার থাকিলেও সাহিত্য রচনায় গদ্য ব্যবহারের কথা অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে কল্পনা করা যাইত না। খ্রীষ্টান মিশনারীরা ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলা গদ্যরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের প্রতিরোধের জন্য জাতীয়তাবাদী বাঙ্গালীরা গদ্যপ্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। ধর্মীয় বিতর্কের মধ্য দিয়া যুক্তিপূর্ণ মননশীল সাহিত্যের ভিত্তি পত্তন হইল। এই সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিবার উপায়রূপে উদ্ভাবিত হইল সাময়িক পত্র। পাশ্চাত্য দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ ও জীবনজিজ্ঞাসা সাময়িক পত্রের মাধ্যমে সাহিত্যক্ষেত্রে অনুপ্রবিষ্ট হইল। রামমোহন, ভবানীচরণ, ভূদেব, রাজনারায়ণ, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি মনীষিবর্গের অভ্যুদয় ঘটিল। বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে নবযুগের শঙ্খধ্বনি ঘোষিত হইল। বাংলা কথাসাহিত্যের দিগন্তেও অরুণোদয় ঘটিয়াছিল। বাংলা গদ্যরীতি সুনির্দিষ্ট হওয়ায় উপন্যাস সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভাবিত হইল। প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভূদেব, বঙ্কিম, রমেশ দত্ত, প্রতাপ ঘোষ, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি যুগসচেতন মনীষীদের রচনায় নবযুগ দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছিল।

পুরাতন কাব্যধারার স্থলে নবযুগে রূপ ও রস [illegible] নব নব কাব্যধারার সূত্রপাত হয়। বাঙালীর প্রতিভা [illegible] কিছু [illegible] হইয়া পড়িলেন। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় [illegible] ও [illegible] চর্চা। মধুসূদন মহাকাব্যধারার প্রবর্তন করিয়া পৌরাণিক [illegible] করিলেন এবং দেবতাদের স্থলে মানবতার [illegible] লৌকিক [illegible]। [illegible] বীভৎস [illegible] বৃত্র কর্তৃক নির্জিত [illegible] কঠোর [illegible] ও [illegible] করিলেন। নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণ খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে একরাষ্ট্রে সংহত করিবার জন্য [illegible] মিলনের চেষ্টা করিলেন। [illegible] স্বর ধ্বনিত হইল এবং তাঁহার অনুবর্তীরা ছন্দ [illegible] বহু বৈচিত্র্য [illegible] গীতিকবিতার [illegible] এবং অভিনবত্ব সম্পাদন করিলেন।

নূতন যুগে সাহিত্যের আর একটি অভিনব অধ্যায় নাটকের সৃষ্টি। ইংরাজদের চেষ্টায় রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা এবং ইংরাজী ও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের মাধ্যমে নাট্যসাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন হয়। অচিরেই যুগজিজ্ঞাসা ও সমাজসংস্কারের প্রেরণায় নাট্যসাহিত্যের বিস্তার ঘটিতে থাকে। কীর্তিবিলাস ও ভদ্রার্জুন প্রভৃতি মৌলিক নাটক-রচনায় যে সূচনা হয় তাহা রামনারায়ণ, মধুসূদন ও দীনবন্ধু প্রভৃতি প্রতিভাবানের হাতে যথার্থ নাট্যরূপ লাভ করে। বহু সামাজিক সমস্যা, জাতীয় জীবনের বহু আশা আকাঙ্ক্ষা বাংলা নাট্যসাহিত্যকে অনুপ্রাণিত করিয়া সাহিত্যের জয়যাত্রার পথ সুগম করে। নবযুগে চিন্তার ক্ষেত্রে যে বিপ্লবাত্মক বৈশিষ্ট্য উন্মোচিত হয়, সাহিত্যের রস-বিকাশ এবং আঙ্গিক উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিপ্লবাত্মক বৈশিষ্ট্য নবযুগের বাণী ঘোষণা করিয়াছিল।

প্রশ্ন ২। "বাংলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য এবং আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের মাঝখানে যে কবিওয়ালাদের গান দেখা দিয়েছিল তার সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্য উপেক্ষণীয় নয়।"—আলোচনা কর।

[ক. বি. ১৯৬৫]

উত্তর। প্রাচীন কাব্যধারা শেষ হয় ভারতচন্দ্রের তিরোধানের পর ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে এবং নূতন যুগের নবীন কাব্যধারার সূচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মধুসূদনের আবির্ভাবের পর। এই দুই কাব্যধারার মধ্যবর্তী কালে কবিওয়ালাদের গানের যুগ। ডঃ সুশীল দে Nineteenth Century Bengali Literature গ্রন্থে বলিয়াছেন যে "The flourishing period of the Kabiwalas was between 1760 and 1830." কবিওয়ালাদের সপক্ষে এবং বিপক্ষে নানা মন্তব্য করা হয়। ইহারা ভালমন্দ যাহাই হোন ইহাদের সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্য নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। সাহিত্যের ইতিহাসে ইহারা বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করিয়াছেন, "ইংরাজদের নূতনসৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ-রাজার সভার উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান।" বস্তুতঃ নাগরিক জীবনে ভোগবিলাসের পরিবেশে লঘুরসের পৌরাণিক বিষয়ক আদিরসাত্মক সঙ্গীতের প্রসার ঘটে। এই গায়কদের 'কবি' নামের সম্মানে ভূষিত করা হয় নাই। মধুসূদন কবিওয়ালাদের Vile poetaster বলিতেন। কেহ কেহ মন্তব্য করিয়াছেন, ভারতচন্দ্রের পর বাংলা কবিতার আসর যাহারা দখল করিলেন তাঁহারা কবি নহেন, কবিওয়ালা।" রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে কবিওয়ালারা "অত্যন্ত লঘু সুরে উচ্চৈঃস্বরে চারিজোড়া ঢোল চারিখানি কাঁশি সহযোগে সদলে সবলে চীৎকার করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিত।"

কবিওয়ালারা কিঞ্চিৎ উপেক্ষিত ও নিন্দিত। ইহারা সুশিক্ষিত মার্জিতরুচি-সম্পন্ন ছিলেন না। কিন্তু সহজ কবিত্বে, শব্দচয়নে, বুদ্ধিপ্রাখর্যে, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে এবং সঙ্গীতযোগ্যতায় ইহারা প্রশংসার দাবী করিতে পারিতেন। ইহারা মুখে মুখে গান বাঁধিতেন। কোন কোন গান শ্রোতারা স্মৃতিভাণ্ডারে সঞ্চয় করিতেন। বহু সঙ্গীত কালক্রমে মহাকালের কুক্ষিগত হইয়া যাইত। ঈশ্বরগুপ্ত তাঁহার সংবাদপ্রভাকর পত্রিকায় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কবিওয়ালাদের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া না রাখিলে হয়ত ইহাদের সম্বন্ধে কিছুই জানা যাইত না। ঈশ্বরগুপ্ত গোঁজলা গুঁইকে আদি কবিয়াল বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে এই কবির অভ্যুদয়। ইঁহার শিষ্য রঘুনাথও খ্যাতি অর্জন করেন। রাসু, নৃসিংহ, হরুঠাকুর প্রভৃতি খ্যাতিমান কবিওয়ালাদের অনেকেই রঘুনাথকে গুরুর সম্মান দিয়াছেন। এইভাবে শিষ্যপরম্পরায় কবিওয়ালারা বাঙ্গালী সমাজের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করিয়াছিল। কবির লড়াই তৎকালে এক উপভোগ্য অনুষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইত। কেষ্টা মুচি, নিতাই বৈরাগী, রামবসু, ভোলা ময়রা

ঠাকুর সিং, নীলমণি পাটনী, মতি পসারী, চিন্তা ময়রা, এণ্টুনি ফিরিঙ্গি, যজ্ঞেশ্বরী প্রভৃতি বহু কবিওয়ালার বহু গান দীর্ঘকাল সঙ্গীতপ্রিয় বাঙ্গালীর মুখে মুখে ধ্বনিত হইত।

কবিওয়ালাদের গানের একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যমূল্য আছে। তাঁহারা সাহিত্যতত্ত্ব বা রসশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন না। তাঁহারা উচ্চশিক্ষার অধিকারীও ছিলেন না। তাঁহাদের রচনায় উচ্চ কল্পনাশক্তি বা শিল্পসংযমের পরিচয় প্রকাশ পাইত না। ইঁহাদের রুচি খুব মার্জিত ছিল না এবং মাত্রাজ্ঞানের অভাব ছিল। তথাপি এই কবিদের কোন কোন গান অপূর্ব কবিত্বে মণ্ডিত। হরুঠাকুর "পীরিতি নাহি গোপনে থাকে"—এই পদটি পূরণ করিতে গিয়া গাহিলেন,

পীরিতি নাহি গোপনে থাকে
শুন লো সজনি, বলি তোমাকে
শুনেছ কখন জলন্ত আগুন
বসনে বন্ধন করিয়া রাখে ?

চন্দননগরের কবিয়াল নৃসিংহ সখী-সংবাদের একটি গানে লিখিয়াছিলেন,

শ্যাম প্রদীপের আলো প্রকাশ পাইল
চন্দ্রমা লুকাল গগনে
ওহে, গোখুরের জল জগৎ ব্যাপিল
সাগর শুকাল তপনে।

গোঁজলা গুঁই-এর একটি পদের প্রেমতত্ত্ব ও প্রকাশভঙ্গিকে কোন কোন সমালোচক উচ্চপ্রশংসা করিয়াছেন। এইসব কবিদের স্বাভাবিক দার্শনিক উপলব্ধিও উল্লেখযোগ্য।

তোমাতে আমাতে একই কায়া
আমি দেহপ্রাণ তুমি লো ছায়া
আমি মহাপ্রাণী তুমি লো মায়া
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি।

কোন কোন কবিওয়ালার পদে চমৎকার লিরিক লাবণ্য প্রকাশ পাইত। কেহ কেহ শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার প্রয়োগে উৎকৃষ্ট কলাকৌশল প্রদর্শন করিতেন। রামবসু একটি পদে লিখিয়াছিলেন,

যখন হাসি হাসি সে আসি বলে
সে হাসি দেখে ভাসি নয়নজলে
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় ধরিতে
লজ্জা বলে—ছি ছি ধরো না।

প্রশ্ন ৫ "আধুনিক বাংলাকাব্যের ইতিহাসে ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন, ও বিহারীলাল, এই তিনজন তিনটি স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তক। তিন ধারাতেই অনুবর্তীর অভাব ঘটেনি।"—তথ্যযোগে আলোচনা কর এবং এই তিন ধারার ভবিষ্যৎ কাব্যপরিণতির উপর প্রভাবের পরিমাণ নির্ণয় কর। [ক বি. ১৯৬২

"উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আখ্যানকাব্য ও গীতিকাব্য এই দুই ধারাই পাশাপাশি প্রবাহিত হইয়াছে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত আখ্যান-কাব্য সরিয়া দাঁড়াইয়াছে।"—আখ্যানকাব্যের এই তিরোধানের কারণ দেখাইয়া উনবিংশ শতকের শেষার্ধে গীতিকাব্যের উদ্ভব ও অগ্রগতির ইতিহাস বিবৃত কর। [ক. বি ১৯৫৯]

উত্তর। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক শাখার প্রথম কবি তিনজন—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং বিহারীলাল চক্রবর্তী। ঈশ্বর গুপ্ত ছোট বড় বিভিন্ন শ্রেণীর কবিতা লিখেছেন। মধুসূদন প্রধানত চর্চা করেছেন মহাকাব্যের। বিহারীলাল গীতিকাব্যের স্রোতপথ রচনা করেছেন। এঁদের প্রত্যেকেই হয়তো শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন নি নিজ নিজ ধারায়, কিন্তু প্রথম প্রবর্তকের মর্যাদা এঁদের প্রত্যেকের অবশ্যপ্রাপ্য।

ঈশ্বর গুপ্ত ভর্ৎসিত হয়েছেন পুরাতন পন্থী বলে। কবি ওয়ালাদের একচ্ছত্র রাজ্যে তার জন্ম। তাদের প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পারেননি তিনি। কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উষা মুহূর্তের কাব-নায়ক তিনি।

ঈশ্বর গুপ্ত খুব উচ্চ স্তরের কবিতা রচনা করেননি। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর কৌতূহল, তথ্যের পর তথ্য, বর্ণনার পর বর্ণনা তার কাব্যে। ঈশ্বরতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব, স্বদেশপ্রেম, নারীপ্রেম, সমসাময়িক ঘটনা যে কোন বিষয়েই অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণায় কাব্য পরিবেশ ভেঙেছেন। ঈশ্বর গুপ্ত তাই 'minor poet'

তা সত্ত্বেও একটি বিষয়ে গুপ্ত-কবি অন্যের কাছে আদর্শস্থানীয়—তা তাঁর রঙ্গব্যঙ্গাত্মক রচনা। বাংলা প্রহসনে ব্যঙ্গবিদ্রূপ—ঈশ্বর গুপ্তের হাস্যরস থেকেই এসেছে বলা যায়। আদিরসের ফেনোচ্ছলতা তার কবিতায় আছে—কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত ব্যঙ্গ কবিতার পথ সূচনা করে দিলেন বলেই বাংলা সাহিত্যে পরবর্তী কালে হাস্যরস উন্নত ভাবরসে হয়েছে। পরবর্তী রঙ্গলাল, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র এমন কি বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত তাঁর পথ অনুসরণ করেই হাস্যরসে ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

উনিশ শতকের বাংলা আখ্যানকাব্য ইতিহাসের দিক থেকে রঙ্গলালের আবির্ভাব পূর্বে হলেও—মধুসূদনই এক্ষেত্রে আশাতীত সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। আধুনিক যুগের প্রথম কবি মধুসূদন। মহাকাব্যের অপরিচিত ধারাকে গৌড়-বঙ্গে নিয়ে এলেন মধুসূদন। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বমুহূর্তে আখ্যান কাব্যের চর্চায় মশগুল রঙ্গলাল। মধুসূদনের যুদ্ধ-বর্ণনার অসিঝনৎকারে পুরাতন যুগ

সম্পূর্ণ মুছে গেল। নবযুগের নবীন অরুণোদয় সূচনা করল মেঘনাদবধ কাব্য। বাঙালী মানসের আশা-আকাঙ্ক্ষা নৈরাশ্য-বেদনা রূপায়িত হল 'মেঘনাদবধ'-এ। সংস্কারের জাল ছিঁড়ে মন মুক্তি পেল নবযুগের উদার উন্মুক্ত মহাকাশে। মধুসূদন তাঁর যুগান্তকারী প্রতিভার পরিচয় দিলেন মহাকাব্যের গভীর পরিবেশ রচনা করে, কাব্যের পরিণাম-রমণীয়তায় এবং সর্বোপরি উচ্চ ভাবপ্রকাশের উপযোগী ভাষা এবং ছন্দ নির্মাণের ভিতর দিয়ে। অমিত্রাক্ষরের ভিতর ধরা পড়ল সমুদ্রতরঙ্গের 'অনিয়ন্ত্রিত কলরোল'। মধুসূদনের সমসাময়িক আর দুই মহাকবি হেম-নবীন। হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার, নবীনচন্দ্রের রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস, মহাকাব্য-ধারায় উল্লেখ্য রচনা। কিন্তু মধুসুলভ সাফল্য এঁদের কারও প্রাপ্য নয়।

বাংলা গীতিকবিতার ক্ষেত্রে আধুনিকতার পথিকৃৎ বিহারীলাল চক্রবর্তী। পর-বর্ণনা নয়—বাইরের সমারোহ নয়—একান্ত মনের গভীর কথাটি নিভৃতে বললেন বিহারীলাল। এই জন্য বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথের কাছে 'ভোরের পাখি'। বিহারীলালই বাংলা কাব্যকে বস্তুভাবনা থেকে মুক্তি দিলেন। মন্ময় কল্পনাকে প্রাধান্য দিয়ে মর্মলোক উদ্ঘাটন করলেন।

আধুনিক গীতিকবিতার জনক বিহারীলাল চক্রবর্তী। কিন্তু কবি হিসেবে বিহারীলাল জনপ্রিয় ছিলেন না। দীর্ঘদিন বিহারীলাল ব্যক্তির অনুভূতির কথা ব্যক্তিগত করেই প্রকাশ করেছেন—সে অনুভূতির অংশীদার করেন নি অপরকে। তা'ছাড়া বিহারীলালের কবি-ভাবনায় conformity-র অভাব। একই ভাবনার দীর্ঘ-বিবৃতি, কথা বলতে বলতে মধ্যপথে বিষয়ান্তরে পরিক্রমা—বিহারীলালের কাব্যের ত্রুটি। অন্তরঙ্গ কবি-ভাবনার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ কোথাও সুনিয়ন্ত্রিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ তাই সারদামঙ্গলকে 'খণ্ড খণ্ড কবিতার' সমষ্টি রূপে মূল্যায়ন করেছেন।

বিহারীলালের কবিপ্রাণতার আর একটি বৈশিষ্ট্য তিনি একনিষ্ঠ প্রকৃতিপ্রেমিক। নিসর্গপ্রীতি আধুনিক গীতিকবিতার একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিহারীলাল নিসর্গ-সৌন্দর্য দেখেছেন গভীর তন্ময়তার সঙ্গে। ব্যক্তিত্ব বিগলিত। 'Dilution of Personality'—T. S. Eliot। সে দেখায় এবং দেখার আনন্দে। বিহারীলাল এখানে রোমান্টিক। বিচিত্রসুন্দর তাঁর নিসর্গ জগৎটি। আনন্দ-রংবাহারে সে জগৎ মায়ালোক সৃজন করে।

বিহারীলাল তাঁর ভাষা ব্যবহারেও অনুরূপ মন্ময়-পথ অবলম্বন করলেন। এখানে মনের কথা মনের মত সহজ ভাষায় বললেন। ভাষা-অনুশীলন নেই—প্রসাধন এবং ভাষার রাজকীয় বিলাসের দিকে তিনি দৃষ্টি দেননি। বরং যে সহজভাবে অনুভূতিশীল মনের কাছে আবেদন জানায় সে ভাষা ব্যবহার করেছেন। সাধারণ ভাষা ব্যঞ্জনাগুণে অসাধারণত্বের মহিমা পেয়েছে। কিন্তু মাঝে মাঝে আবেগ নিয়ন্ত্রিত হয়নি বলে বিহারীলাল একটু অসংযতভাষী হয়ে উঠেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গীতিকবিতার উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ। অবশ্য বাঙালী ঐতিহ্যে গীতিভাবনা বীজাকারে ছিল অতি সুপ্রাচীন কাল থেকে। বৌদ্ধগান, চর্যাপদ,

বৈষ্ণবপদ, শাক্তপদ, বাউল গান—এদের ত কথাই নেই। কিন্তু আধুনিক গীতিভাবনার সঙ্গে প্রাচীন গীতিকবিতার পার্থক্য আছে। আধুনিক গীতিকবিতা—কবির একান্ত অনুভূতির প্রকাশ—Expression of 'intense personal emotions'—। এর সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন চিত্তচমৎকারী ভাষা এবং শ্রুতিমধুর ছন্দের। গীতিকবিতার এই নবীন ধারার প্রবর্তক বিহারীলাল। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল প্রমুখের কাছে গীতিকবিতার এক ধরনের যৌবনমুক্তি ঘটল। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের হাতে এই ধারাই পূর্ণ বিকশিত হল।

ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যগণ (বঙ্কিম, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল, মনোমোহন) ঈশ্বর গুপ্তের পথ পরিত্যাগ করে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছেন। বঙ্কিমের হাতে উপন্যাস, দীনবন্ধুর হাতে নাটক, রঙ্গলালের হাতে আখ্যানকাব্য মুক্তিলাভ করে। তবে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যগণ গুরুর প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করলেও রঙ্গব্যঙ্গমূলক কবিতার প্রবর্তক রূপে ঈশ্বরগুপ্ত কালের সীমা অতিক্রম করে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রভাবশীল। সমসাময়িক বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করে হেমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের উত্তরাধিকারিত্ব স্বীকার করেছেন। বিহারীলাল ও প্রথমদিকে ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যধারা অতিক্রম করতে পারেন নি। মধুসূদন মেঘনাদবধ রচনা করে যে Pseudo classical কাব্যধারার প্রবর্তন করেন হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্রের মত দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিভাধরদের হাতে তা ব্যর্থ হয়ে যায়। হেমচন্দ্র কাহিনীকাব্য রচনাতে পটু—মহাকাব্যের মত সংহতি তাঁর তথাকথিত মহাকাব্য 'বৃত্রসংহারে' দুর্লভ। নবীনচন্দ্রও রোমান্টিক প্রেম কাহিনীর আখ্যানকাব্য রচনা করে পটুত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস মহাকাব্য হিসেবে ব্যর্থ হলেও বিচ্ছিন্ন প্রেমকাহিনীসমূহের সমষ্টিরূপে মর্যাদা পাবে। অধিকন্তু মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র যখন মহাকাব্য রচনায় ব্রতী হন—তখন বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য রচনার লগ্নই আসেনি। দ্বিতীয়ত, মধু-হেম-নবীন প্রত্যেকেই গীতিকবিতা রচনা করেছেন। সুতরাং মহাকাব্য রচনার প্রেরণা এঁদের কাছে মৌলিক ছিল না। তৃতীয়ত, মধুসূদন ছাড়া হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের প্রতিভা ছিল দ্বিতীয় স্তরের - মহাকাব্য রচনার অনুকূল নয়। তাই মহাকাব্য এই যুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই অবসিত হয়েছে।

বিহারীলালের শিষ্যত্ব স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে যে যুগান্তরের ভাবগঙ্গা আনয়ন করেছেন তাতেই বিহারীলালের ধারা মৃত্যুঞ্জয়ত্ব লাভ করেছে। এতদ্ভিন্ন মধু-হেম-নবীন এঁরা মহাকাব্য রচনা করে খ্যাতি লাভ করতে চাইলেও—প্রত্যেকেই গীতিকাব্য রচনা করেছেন [মধুসূদন—ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা, চতুর্দশপদী, হেমচন্দ্র—খণ্ড কবিতাবলী (১ম ও ২য়), নবীনচন্দ্র—অবকাশরঞ্জিনী]। মোট কথা উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলা সাহিত্যে যে গীতিপ্লাবন এসেছে—তাতে ঈশ্বরগুপ্তের রঙ্গতামাসার জঞ্জাল ভেসে গেছে- মধুসূদনের প্রবর্তিত ক্লাসিক কাব্য আপন মত্ততা নিয়ে গর্বিত ঐরাবতের ন্যায় স্রোতাপন্ন হয়েছে, আর রবীন্দ্রনাথের মঙ্গল শঙ্খনিনাদ নব নব পথে বিহারীলাল-প্রবর্তিত গীতিকবিতার ধারাকে বিচিত্র পথচারী এবং বহুভাবপ্রকাশমান করে তুলেছে। লগ্ন

নির্বাচনে এবং উত্তর সাধক সৃষ্টিতে বিহারীলালের কৃতিত্বই তাঁর গীতিকবিতার ধারাকে দীর্ঘজীবী করেছে।

প্রশ্ন ৮। "ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম।"—বিহারীলালের কবিকৃতির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি অবলম্বনে আধুনিক (১৮৯০ সালে রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্য প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত) বাংলা গীতিকবিতার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত কর। [ক. বি, ১৯৬৮]

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে যে সমস্ত গীতিকবির আবির্ভাব হয়েছিল, তাদের মধ্যে বিহারীলালের গীতিসুরের বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে তাঁর কৃতিত্ব নির্ণয় কর। [ক. বি. ১৯৬৯]

বিহারীলালকে আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার আদিপ্রবর্তক বলিয়া আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [ক. বি. ১৯৬০]

উত্তর। আধুনিক বাঙলা কাব্যে গীতিভাবগঙ্গোত্রী আনয়নের প্রথম ভগীরথ বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-৯৪), রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'ভোরের পাখি'। বিহারীলাল আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসকে কাব্যবিষয়ের অঙ্গীভূত করলেন। ডঃ সুকুমার সেনের ভাষায় —"বিহারীলাল আপন নিভৃত মনের গোপন কথাটি কাব্যে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। ব্যক্তি অনুভূতিকে তিনি কাব্যের বিষয় করেছেন।" রবীন্দ্রনাথ বিহারীলাল সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

"তাহার মনের চারিদিক ঘিরিয়া কবিত্বের একটি রশ্মিমণ্ডল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিত,—তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ একটি কবির আনন্দ ছিল।"

বিহারীলালের কাব্য আনন্দ বেদনার প্রকাশ। Ruskin যাকে বলেছেন 'expression by the poet of his own feelings'—বিহারীলালের কাব্য তাই।

বিহারীলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সঙ্গীত শতক' (১৮৬২)। তারপর ক্রমান্বয়ে 'বঙ্গ সুন্দরী' (১৮৭০), 'নিসর্গ-সন্দর্শন' (১৮৭০), 'বন্ধুবিয়োগ' (১৮৭০), 'প্রেম-প্রবাহিণী' (১৮৭১), 'সারদা মঙ্গল' (১৮৭৯), 'সাধের আসন' (১৮৯৫-৯৬) প্রভৃতি আত্মপ্রকাশ করে।

বিহারীলালের কাব্যকবিতা সম্বন্ধে প্রশংসা অপ্রশংসার অন্ত নেই। কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার—বিহারীলালের পূর্বে একক ভাবে গীতিকাব্য চর্চা আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে আর কেউ করেন নি। প্রথম পথিকের যাত্রাপথ হয়তো কিছু কণ্টকিত। তাই ভাবানুযায়ী ভাষার প্রসাধন এবং অনুশীলন নেই। তাছাড়া "বাষ্পাকুল কবিকল্পনার মধ্যে আবেগের বেগ কম হইলে লেখনীর দৌড় মসৃনতর হইত।" এতে যে অভিযোগটি স্পষ্ট তা হচ্ছে—বিহারীলালের কাব্যে অস্পষ্টতা, আবেগ-প্রাধান্য—এবং কল্পনার দিগন্ত-অতিক্রমী গতি। ভাবাবেগের অনুশীলন

গীতিকাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আধুনিক বাঙলা কাব্যে প্রথম গীতিকবির তা ছিল না বলে তাঁর কবিতা দুষ্পাঠ্য হয়নি—এও তাঁর কম কৃতিত্ব নয়।

বিহারীলালের কাব্য-কবিতার তালিকা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, ১৮৭০ সালেই তাঁর অধিক সংখ্যক কাব্যগ্রন্থের রচনাকাল। বাঙলা গীতিকবিতার মুক্তির সন হিসেবে এটি চিহ্নিত হতে পারে। বিহারীলালের অধিকাংশ কাব্য সর্গবন্ধ। 'বন্ধু-বিয়োগে'র রচনারীতি সরস নয়। 'নিসর্গ সন্দর্শন', 'প্রেম-প্রবাহিণী' ও 'বঙ্গসুন্দরী' নানা দিক থেকে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। 'নিসর্গ সন্দর্শনে' প্রকৃতিপ্রীতি, 'প্রেমপ্রবাহিণী'তে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি, ও 'বঙ্গসুন্দরী'তে কবির 'দৈন্য অতৃপ্তির' প্রকাশ। 'প্রেম প্রবাহিণী'কে জনৈক সমালোচক 'কবিচিত্তের প্রথম জাগরণের ইতিহাস' রূপে চিহ্নিত করেছেন। আধুনিক গীতিকবিতার বিষয়—প্রেম, প্রকৃতি ও ব্যক্তি। বিহারীলালের কাব্যে এ 'তিনে'র প্রথম সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। কিন্তু তিনখানি কাব্যেই বিহারীলালের কল্পনা অনুভূতির অতীন্দ্রিয় মায়ালোক থেকে হঠাৎ বস্তুপৃথিবীতে এসে আহত হয়েছে। তাছাড়া ঘটনা ও বস্তু-বর্ণনার অসামঞ্জস্য অনেক সময় রসিক চিত্তে দুর্বহ হয়েছে।

বিহারীলালের 'সারদা মঙ্গল' ও 'সাধের আসন' কাব্য দুখানিতে তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। 'সারদা মঙ্গলে' কবির ব্যক্তি-অনুভূতি চূড়ান্ত প্রকাশ লাভ করেছে। প্রেম, প্রকৃতি, বিষাদ, আনন্দ-বেদনা সব মিলিয়ে মাঝে মাঝে কাব্য-চমৎকৃতির চমক লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ এ কাব্যে কবির সচেতনতার পরিবর্তে আত্মভাবতন্ময়তা খুঁজে পেয়েছেন। এখানে ভাবের এবং ভাষার অনুশীলন ও সংযম প্রকাশ পায়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কাব্যখানি আধুনিক গীতিকাব্যের প্রথম সার্থক নিদর্শন। প্রচণ্ড ব্যাকুলতা কবির এ কাব্যে। 'সাধের আসনে' বিহারীলাল দার্শনিক, পণ্ডিত। কিন্তু 'সারদা মঙ্গলে' তিনি অনুভবসর্বস্ব কবি।

প্রাক-রবীন্দ্রযুগের আর একজন কবি—দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৫-১৯২০)। মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন—"দেবেন্দ্রনাথের কল্পনা চৈত্র-বৈশাখের রৌদ্রমদিরা পানে—অশোকের রাঙ—চম্পকের সৌরভে...মাতিয়া ওঠে।" দেবেন্দ্রনাথ প্রকৃতি-বিলাসী প্রকৃতি-প্রেমিক। ডঃ সুকুমার সেনের ভাষায়—"দেবেন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা স্বতঃস্ফূর্ত এবং আবেগ-উচ্ছ্বসিত।"

দেবেন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থগুলির 'ফুলবালা', 'উর্মিলা' কাব্যদ্বয় ১২৮৭ সালে প্রকাশিত হয়। 'গোলাপ গুচ্ছ', 'অশোক গুচ্ছ', 'পারিজাত গুচ্ছ', 'অপূর্ব নৈবেদ্য' সবগুলিই প্রকাশিত হয় ১৩১৯ সনে।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে নারীপ্রেমকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু সে প্রেমের পরিণতি ঘটেছে বাৎসল্য রসে। দেবেন্দ্রনাথ প্রকৃতির রাজ্যে ফুলকে বেশি ভালোবেসেছেন; তাঁর কাব্যে বিচিত্রবর্ণ ফুলের শোভাযাত্রা। দেবেন্দ্রনাথ ভাবুক কবি—কিন্তু আত্মহারা নন। ডঃ সেন তাঁকে গার্হস্থ্য প্রেমের রোমান্টিক কবি বলেছেন। বিহারীলালের

মত তিনি কাব্যকলা সম্পর্কে উদাসীন নন। দেবেন্দ্রনাথের প্রসন্ন মানসিকতা তাঁর কবিতা থেকে আবিষ্কার করা যায়।

"ঘোমটা খুলিবে না'ক ? থাক তবে বসি
আমি করি কাব্যপাঠ রজনী জাগিয়া
একি ! একি চাঁপাগুলি গেছে বুঝি খসি।
খোঁপা চাহে ফুলগুলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া।"

প্রভৃতি অংশে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ভাবোচ্ছ্বাসকে কাব্যে মুক্তি দিতে পেরেছেন।

দেবেন্দ্রনাথের গীতিপ্রবণতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বিভিন্ন সমালোচক উল্লেখ করেছেন।

(১) দেবেন্দ্রনাথের ভাষায় কুণ্ঠা থাকলেও—লঘুহাস্যতরঙ্গিত ভাবের আবেগ তাঁর নিজস্ব।

(২) সমাসোক্তি এবং সম্বোধনের রীতি তাঁর কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

(৩) উপমা উৎপ্রেক্ষায় দেশবিদেশের কাব্যকাহিনীর ইংগিত।

সনেট রচনায় দেবেন্দ্রনাথ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কবি হিসেবে দেবেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব তাঁর 'Phrasal music'-এ, সুন্দর চিত্রকল্পের ব্যবহারে—সর্বোপরি ভাব-ভাষার একাঙ্গিক সম্মিলনে। দেবেন্দ্রনাথ প্রাক্-রবীন্দ্রযুগের সার্থক গীতিকবি। বিহারীলালের ধারাকে পরিপুষ্টিদানে দেবেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অবশ্য স্মরণীয়।

এ যুগের আর একজন কবি অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৮)। বিষয়বস্তু এবং ভাবানুশীলনের দিক দিয়ে বড়াল কবি স্বতন্ত্র। বিষয়বস্তুতে সংহতি এবং সংযম তাঁর কবিমানসের বৈশিষ্ট্য। মোহিতলাল মন্তব্য করেছেন—'আধ-আলোছায়াময়ী রহস্যরূপিণী জ্যোৎস্না-নিশীথিনী বড়াল কবির কল্পনার অনুকূল'। অক্ষয়কুমার রোমান্টিক। ডঃ সুকুমার সেনের মতে দেবেন্দ্রনাথ ভাব সম্মেলনের কবি, অক্ষয়কুমার 'প্রেম বৈচিত্র্যের'। গার্হস্থ্য প্রেম ও নারী প্রেম অক্ষয়কুমারের কাব্যের অবলম্বন। কিন্তু তাঁর কাব্যে এর প্রসার অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও সমালোচক অক্ষয়কুমারের আবেগে বুদ্ধির অনুশাসন ও 'ভাবনাউদ্বেলতা' লক্ষ্য করেছেন।

অক্ষয়কুমারের কবিভাবনা ও কাব্যাঙ্গিকে রবীন্দ্র প্রভাব সুস্পষ্ট। ডঃ সেনের মতে বিহারীলালের প্রৌঢ় কবিতা ও রবীন্দ্রনাথের কৈশোর কবিতার সেতুবন্ধ অক্ষয়কুমার। অক্ষয়কুমারের কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা খুব বেশি নয়। তাঁর 'প্রদীপ' (১২৯০), 'কনকাঞ্জলি' (১২৯২), 'ভুল' (১২৯৪), ও 'শঙ্খ' (১৩১৭) পরপর আত্মপ্রকাশ করে। তারপর তাঁর পত্নীবিরহের কাব্য 'এষা' ১৩১৯ সালে প্রকাশিত হয়। উল্লিখিত রচনা-পঙ্ক্তি থেকে অক্ষয়কুমারের কবিমানসের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—

(১) অক্ষয়কুমার প্রেমের কবি—নারীপ্রেম তাঁর কাব্যের 'একমাত্র' বিষয়।

(২) এ প্রেম উপলব্ধির বস্তু—তাই বিরহ আছে।

(৩) অক্ষয়কুমারের আবেগ-তীব্রতা বাইরে অচঞ্চল—অন্তরে কবিকে ভাবাবিষ্ট ও 'তন্দ্রাতুর' করেছে।

(৪) অক্ষয়কুমারের ভাষায় সংহতি ও সংযম রয়েছে।

(৫) ভাব ও তার রূপায়ণে সামঞ্জস্য আছে।

(৬) শব্দ ও পদের লালিত্য অক্ষয়কুমারের প্রেম কবিতাকে সার্থকতা দান করেছে।

অক্ষয়কুমার ব্রাউনিঙের সঙ্গে তুলনীয়। ঈশ্বর বিশ্বাসেই তাঁর সব প্রশ্নের সমাধান। কিন্তু মানবকে উপেক্ষা করেননি। 'মানবীর তরে কাঁদি—যাচিনা দেবতা।' অক্ষয়কুমারই দেহকে অবলম্বন ও অতিক্রম করে প্রেম ও সৌন্দর্যের সন্ধান করলেন। অক্ষয়কুমার আধুনিক রোমান্টিকদের সার্থক পথ-স্রষ্টা।

এ যুগের আর কয়েকজন কবি—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, গোবিন্দচন্দ্র দাস, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ও কামিনী রায়।

সুরেন্দ্রনাথ প্রধানত আখ্যান-কবি রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু স্বভাবে তিনি গীতিকবি। তাঁর পরিচয় লাভ করা যায়—তাঁর মৃত্যুর পরে। সুরেন্দ্রনাথ ও প্রেমের কবি। তাঁর 'মহিলা কাব্য'-খানি ঊনিশ শতকের গীতিকবিতার ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুরেন্দ্রনাথের প্রেম ও সৌন্দর্য-চিন্তা আবেগ এবং মননের সম্মিলনে রস-চরিতার্থতা লাভ করেছে। ভাব ও ভাষার ক্লাসিক সংযম তাঁর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাস ডঃ সুকুমার সেনের অনেক প্রশংসা লাভ করেও শেষপর্যন্ত "বাসনাদিল এবং প্যাসনেট" কবি। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গোবিন্দ দাসের কবিকৃতির মর্মবাণী আবিষ্কার করেছেন। তাঁর মতে গোবিন্দ দাসে মোহিতলাল-পূর্ব যুগের বলিষ্ঠ দেহবাদ স্বীকৃত। 'আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ' একথা গোবিন্দ দাসই বলেছেন। অন্যদিকে এই কবিই দুঃখ-দহন বেলা শেষের বাঁশি শুনেছেন। বলেছেন—

'দিন ফুরায়ে যখনে আমার দিন ফুরায়ে যায়
মাঝের নদী বইছে মাঝে দিনটা গেল দুপা কাছে
এক পা কেবল পারে আছে এক পা দিছি নায়—'

এ কবিতাংশে রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া'র দুঃখবাদের ছোঁয়া ও তীব্রতা লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিবেদনা এমন কাব্য মহিমামণ্ডিত হতে খুব অল্পই দেখা গেছে। পূর্ব বঙ্গের প্রকৃতি গোবিন্দ দাসের কাব্যেস্বরূপে আত্মপ্রকাশিত। কিন্তু সর্বোপরি তিনি প্রেমের কবি। পত্নীপ্রেমেই তাঁর সাথকতা। 'কামনার কালীদহে কালীয় নাগের মত সুখে অহরহ'—আত্মোপলব্ধির তীব্রতা প্রকাশ পেয়েছে আলোচ্য অংশে। গোবিন্দদাসের স্থান গীতি কবি হিসেবে এযুগে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ'-এ তাঁর গীতি-ভাবনা আত্মপ্রকাশ করেছে।

গিরীন্দ্রমোহিনী, কামিনী রায় প্রভৃতি কবিরা গার্হস্থ্য প্রেমকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনের আশা-হতাশা প্রকম্পিত শিখায় স্বতঃপ্রকাশিত এঁদের কাব্যে।

গীতিকবিতার এ ধারার অবসান ঊনবিংশ শতকে। পূর্ণ পরিণতির জন্যে বাঙলা গীতিকবিতা তখন থেকে যুগান্তরের শিল্পী কবি রবীন্দ্রনাথের জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল।

প্রশ্ন ৭। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা মহাকাব্যের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতির ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত কর এবং এই মহাকাব্য-ধারার দ্রুতবিলুপ্তির কারণ নির্দেশ কর। (ক. বি ১৯৬৭)

ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে আধুনিক বাংলা আখ্যানকাব্যের উদ্ভব ও পরিণতির ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত কর। (ক বি. ১৯৬৫)

ঊনবিংশ শতাব্দীর আখ্যায়িকাকাব্য ও মহাকাব্যের পার্থক্য নির্ণয়-পূর্বক উভয় শ্রেণীর কয়েকজন কবির রচনার তুলনামূলক আলোচনা কর। (ক বি ১৯৬৫)

উত্তর। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আখ্যানকাব্য ও মহাকাব্য রচনার একটা প্রবল প্রেরণা এসেছিল। কিন্তু এই কাব্যধারা প্রচণ্ড আবেগ ও উচ্ছ্বাস নিয়ে আবির্ভূত হলেও এর প্রবাহ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। প্রায় সমকালেই বিহারীলাল-প্রবর্তিত গীতিকাব্যের ধারা প্রবহমান হয়ে মহাকাব্যধারার আবেগকে প্রশমিত করেছিল। আখ্যানসব জন্য যে স্বাভাবিক ব্যাকুলতা পাঠকমনে থাকে সেই ব্যাকুলতাকে পরিতৃপ্ত করার জন্য এই সময়েই উপন্যাস সাহিত্যের প্রসব ঘটে। রঙ্গলাল মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের রচিত আখ্যানকাব্য ও মহাকাব্য সাহিত্যে বিস্ময়কর অবদান সন্দেহ নেই। যোগ্য উত্তরসূরীর অভাবে এই ধারার যথোচিত বিকাশ ঘটার উপায় ছিল না। অক্ষয় চৌধুরী, ঈশান বন্দ্যোপাধ্যায় স্বল্পায়তন আখ্যানকাব্য লিখেছিলেন। বিশালায়তন মহাকাব্য রচনার চেষ্টা করেছিলেন যোগীন্দ্রনাথ বসু, বলদেব পালিত, দীননাথ ধর প্রভৃতি। কিন্তু গীতিপ্রবণতাই ছিল বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যগত মূল সুর। সুতরাং মহাকাব্যধারা অচিরেই বিলুপ্ত হয়ে গেল এবং গীতিকাব্যের ধারা রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে শতত্তরঙ্গ ভঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে। উপন্যাস সাহিত্যের আবির্ভাব, গীতিকাব্যের প্রাধান্যপ্রাপ্তি, মহাকাব্যোচিত প্রতিভার অভাব প্রভৃতি কারণে মহাকাব্যধারা ক্রমশঃ নিঃশুষ্ক হয়ে এসেছিল। তবু এই কাব্যরশ্মি ঊনবিংশ শতাব্দীর অপরাহ্নকালকে উদ্ভাসিত করে রেখেছিল। তারই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিম্নে প্রদত্ত হল।

আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম দান বাংলা আখ্যানকাব্য এবং মহাকাব্য। মধুসূদন এই ধারার সিদ্ধ সাধক। কিন্তু মধুসূদনের আবির্ভাবের পূর্বক্ষণে যিনি বাংলা কাব্যকে নতুন ভাব, নতুন কথা, নতুন আঙ্গিক প্রকাশের সুযোগ দিয়েছিলেন তাঁর নাম রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭—৮৭)। ডঃ সুকুমার সেন রঙ্গলালের 'প্রতিভায় কল্পনার 'স্ফূর্তি'র কথা বলেছেন এবং 'দীপ্তির' অভাব লক্ষ্য করেছেন। যথার্থই রঙ্গলালের প্রতিভা

বিষয়ের উপযোগী ছিল না। আধুনিক যুগের নতুন ভাব-ভাবনাকে যথার্থ চরিতার্থতার সঙ্গে রূপায়িত করতে পারেন নি তিনি। তাঁর পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৮), কর্মদেবী (১৮৬২), শূর সুন্দরী (১৮৬৮), কাঞ্চী কাবেরী (১৮৭৯) বাংলা কাব্যজগতে যথেষ্ট সাড়া জাগায় নি। অথচ ঐতিহাসিক কাহিনীকে রোমান্সমণ্ডিত করে পরিবেশন করতে রঙ্গলালের বেশ কৌতূহল ছিল। তাছাড়া রঙ্গলালের কবিমানুষটির ভিতর একটি একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক বাস করত। কিছু কিছু কবিতায় আবার মধুসূদনের অনুকরণ চেষ্টাও আছে। মোট কথা রঙ্গলালের কাব্য রোমান্স পিপাসাই তৃপ্ত করে; পরিণত কবিভাবনা বা উন্নত জীবনদর্শনের স্বাদ দেয় না।

বাংলা কাব্যজগতে 'রাজবসন্তপ্রদনির' সমারোহ সৃষ্টি করল মধুসূদনের আবির্ভাব। মধুসূদনের প্রথম উল্লেখযোগ্য কাব্য তিলোত্তমাসম্ভব (১৮৬০)। তিলোত্তমাসম্ভবের কাহিনীভাগ মহাভারত থেকে পরিকল্পিত। কাব্যখানির কাহিনীঅংশে দৈন্য। মধুসূদন এখানে নবাবিষ্কৃত ছন্দ-প্রবাহে উল্লসিত। তাই এ কাব্যে সাধারণ narrative poem-এর গুণও স্বল্প। মধুসূদনের প্রতিভা এখানে উষা মুহূর্তের প্রথম জাগরণে তন্দ্রাজড়িত। শব্দ ছন্দ এখানে পরিবর্তন সহ করে। মূল কাহিনীকে অবলম্বন করে মধুসূদন গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টির সুযোগ নষ্ট করেছেন এ কাব্যে। শর্মিষ্ঠার নবলব্ধ অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহারই কবির প্রধান প্রেরণা। চারটি সর্গে সমস্ত কাব্যখানি 'রোমান্টিক কল্পনার জলাভূমি'।

মধুসূদনের প্রতিভার স্পষ্ট স্বাক্ষরচিহ্নিত কাব্য মেঘনাদবধ (১৮৬১)। মধুসূদনের ভাব এখানে উচ্চ কল্পনায় অধিষ্ঠিত। তিনি ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত ভাষা এবং ছন্দ আবিষ্কার করেছেন। কবির মন সফল হয়েছে রাবণের grand চরিত্র পরিকল্পনায়—favourite ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ নির্মাণে এবং সীতা-প্রমীলার যুগ্ম আদর্শ পাশাপাশি সংস্থাপনে।

মেঘনাদবধ-এ মধুসূদন আধুনিক যুগের প্রথম কবি। সে আধুনিকতা প্রাচীন সংস্কার-মুক্তিতে, কবির মন এবং মননে এবং নবযুগের বিশিষ্ট জীবনবোধের উদ্বোধনে। দুর্লভ সফলতা মুদ্রিত হল মধুসূদনের এ কাব্যে। প্রচলিত সংস্কারের পাথর ভেঙে কবি ঝরণা নামালেন। অথচ বিষয়বস্তু গ্রহণ করলেন মূল বাল্মীকি রামায়ণ থেকে। মধুসূদন জানতেন কি করে পুরনো কাহিনীর নতুন যুগোপযোগী ভাষ্য রচনা করতে হয়।

মহাকাব্যের পরিকল্পনার জন্য যে উচ্চ কবিত্বশক্তির প্রয়োজন 'মেঘনাদবধ'-এর কবি তার পরিচয় দিয়েছেন এ কাব্যের বিভিন্ন সর্গ রচনায়। রোমান্টিক গীতিসুর 'মেঘনাদবধ'-এ অসুলভ নয়। কিন্তু ক্লাসিক কাব্যের epic grandeur তাতে নষ্ট হয়নি। শ্রেষ্ঠ কবি যে একাধারে ক্লাসিক ও রোমান্টিক—তা প্রমাণিত হয়েছে মধুসূদনের নবযুগের আলংকারিক মহাকাব্যে।

মধুসূদনের রাম-রাবণের যুদ্ধ-কাহিনীতে মাঝে মাঝে গ্রীক এবং লাটিন আদর্শের ছোঁয়া লেগেছে—অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য প্রভাব অঙ্কিত হয়েছে—একথা এযুগের নামী

সমালোচকেরাও স্বীকার করেছেন। তাঁরা নিদর্শন স্বরূপ দ্বিতীয় সর্গের ষড়যন্ত্রমুখর দেব-কাহিনী, তৃতীয় সর্গের প্রমীলার পতি-সমাগম এবং অষ্টম সর্গের নরক বর্ণনার কাহিনী উল্লেখ করেছেন। বীররস এবং করুণরসের দুর্লভ সমন্বয়ের মহাকাব্যখানিতে দেশকালাতীত আবেদন লক্ষ্য করা যায়। নয়টি সর্গে সমাপ্ত মহাকাব্যখানি আরিস্ততল কথিত এপিক সংজ্ঞায় সম্পূর্ণ ধরা দিয়েছে। এর কাহিনীতে complete whole in itself, রূপায়ণে grand kind of verse, অনুকরণে গুরুগম্ভীর বিষয়বস্তু। মধুসূদন রচিত অমিত্রাক্ষরে সমুদ্র গর্জের প্রচণ্ড আলোড়ন ধরা পড়ল। বাংলা মহাকাব্যের ইতিহাসে মধুসূদনের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা রইল।

মধুসূদনের সমসাময়িক কালে আর দুজন মহাকবির আবির্ভাব হয়। এঁরা হচ্ছেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) এবং নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)। হেমচন্দ্র মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্য উভয়ই রচনা করেছেন। এমন কি গীতিকবিতাও রচনা করেছেন। হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার (১৮৭৫-৭৭) এক কালে 'মেঘনাদবধ'-এর মর্যাদা অতিক্রমী হয়েছিল। এমন কি, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এ কাব্যের সু-উচ্চ স্থান নির্দেশ করেছিলেন।

বৃত্রসংহার—দেবরাজ ইন্দ্র এবং অসুর বৃত্রের স্বর্গ অধিকার নিয়ে বিরোধের কাহিনী। কাহিনীর স্বর্গ-মর্ত্য বিস্তৃত অবয়বে মহাকাব্য রচনার উপাদান ছিল প্রচুর। তা ছাড়া সুরাসুরের যুদ্ধ কাহিনী যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারত। কিন্তু হেমচন্দ্রের প্রতিভায় মহাকাব্য রচনার উপযোগী শক্তি ছিল না। ঘটনা-বস্তুর কার্যকারণ-পরম্পরা, মহাকাব্য রচনায় 'বস্তু বিন্যাসের নীরন্ধ্র ব্যাপকতা' এ কাব্যে নেই। শ্বাসরোধী উত্তেজিত আবহাওয়ার একান্ত অভাব। চতুর্বিংশ সর্গে সমাপ্ত কাব্যখানি ছন্দোপরিবর্তন স্বীকার করেছে। কিন্তু এতে গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে ভিন্ন বাড়েনি। চরিত্র রচনায়ও হেমচন্দ্র আশানুরূপ সাফল্য দেখাতে পারেন নি। মহাকাব্যের আবহাওয়া মাঝে মাঝে কলুষিত হয়েছে চরিত্রের একান্ত সাধারণ জীবন-সম্ভব চিন্তাভাবনায়। মহাকাব্যের বিস্তৃতি সত্ত্বেও উদারতার অভাব দেখা দিয়েছে অনেক সময়েই। যুদ্ধ বর্ণনার কবি হিসেবে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত হেমচন্দ্রের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু এরূপ দু'একটি প্রসংগ ছাড়া হেমচন্দ্রের মহাকবি সুলভ দক্ষতা তেমন ধরা পড়েনি।

চরিত্রগুলির ভিতর ইন্দ্র তেজ-রহিত। বৃত্র—স্ত্রৈণ। শচী—বাঙালী রমণী। ঐন্দ্রিলা নারীজীবনের সংকীর্ণ পরিধি অতিক্রম করে আর অগ্রসর হতে পারেন নি। ছন্দো-ব্যবহার, অলংকার-বিন্যাস কোন দিক দিয়েই সার্থকতার স্বাক্ষর রাখেননি হেমচন্দ্র।

নবীনচন্দ্র সেনের তিনখানি মহাকাব্য—'রৈবতক' (১৮৮৬), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩), এবং 'প্রভাস' (১৮৯৬) একত্রে ত্রয়ী নামে পরিচিত। আর্য-অনার্য জাতির মিলনাদর্শ উপস্থাপিত করা মহাকাব্যের উদ্দেশ্য ছিল। এ কাহিনীতে বস্তুগত দৈন্য ছিল না একথা অনায়াসে বলা যায়। ডঃ সুকুমার সেনের ভাষায় এর বিষয়বস্তু "মহাকাব্যোচিত মহৎ ও প্রশস্ত বটে।" কিন্তু কবি আখ্যান পরিকল্পনায় এবং রচনায় সে মহত্ত্ব রক্ষা

করতে পারেন নি। কৃষ্ণের অন্যমনস্কতা এবং দুর্বাসার ক্রোধে রৈবতকের কাহিনীর সূত্রপাত। অনার্যরাজ বাসুকির সঙ্গে ষড়যন্ত্রে এ কাহিনীর অগ্রগতি। সুভদ্রাহরণে রৈবতক কাহিনীর উপসংহার। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীষ্মের পতনের পর 'কুরুক্ষেত্র'-এর কাহিনীর সূচনা। উত্তরার বাহুপাশ ছিন্ন করে অভিমন্যুর যুদ্ধযাত্রায় এবং জরৎকারু-বাসুকি ও দুর্বাসার মন্ত্রণায় কাহিনীর কৌতূহল সঞ্চার। অভিমন্যুর মৃত্যু এবং তাঁর চিতাগ্নির 'দীপ্তশিখা'য় মহাভারতের স্ফুটচিত্রে 'কুরুক্ষেত্র' কাহিনীর উপসংহার। 'প্রভাস' এর কাহিনী আরম্ভ হয়েছে কৃষ্ণের লীলা-সংবরণের আভাসে। যাদবগণের আত্মকলহ, যদুকুলধ্বংস, কৃষ্ণের মহাপ্রয়াণে কাহিনীতে গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছে। শ্রীক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনায় কাব্যখানির উপসংহার। 'রৈবতক' বিংশ সর্গে সমাপ্ত। 'কুরুক্ষেত্র' সপ্তদশ সর্গে এবং 'প্রভাস' ত্রয়োদশ সর্গে উপসংহার লাভ করেছে। দীর্ঘ পরিসরে বিন্যস্ত কাহিনীকে কাজে লাগাতে পারেন নি নবীনচন্দ্র। আর্য-অনার্যের সংঘাতচিত্রে ঐতিহাসিকতা অক্ষুণ্ণ রাখেন নি নবীনচন্দ্র। তাছাড়া কাব্যের ঘটনা বা বিষয়বস্তুর conformity ও বজায় থাকে নি। 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস'-এ নারী-চরিত্র স্ফুটতর। সুভদ্রা, শৈলজা, জরৎকারু চরিত্রে বিভিন্ন প্রভাব সত্ত্বেও মাঝে মাঝে স্বাতন্ত্র্যের আভাস আছে। কিন্তু কৃষ্ণ-অর্জুন-দুর্বাসা এঁরা প্রাণহীন। কৃষ্ণের স্বপ্ন-বিলাস, অর্জুনের প্রেমপিপাসা, দুর্বাসার ক্রোধদৃপ্ত ব্রহ্মমহিমা চরিত্রগুলিকে মর্যাদা-স্খলিত করেছে। নবীনচন্দ্র মহাকবি হিসেবে কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। প্রতিভার স্ফূর্তি দীপ্তি কোনটিই এতে নেই।

উনিশ শতকের এই মহাকবিরা মহাকাব্য রচনা করেছেন—গীতিসুরের জন্ম দিয়েছেন। আবার পাশাপাশি রচনা করেছেন আখ্যানকাব্য। মধুসূদন প্রসঙ্গে আমরা 'তিলোত্তমাসম্ভবের' নাম করেছি। নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্রও একাধিক আখ্যানকাব্য রচনা করেছেন। হেমচন্দ্রের 'চিন্তাতরঙ্গিনী' (১৮৬১)-তে রঙ্গলালের ভঙ্গীরই প্রাধান্য। কল্পনার প্রসার কিংবা কবিত্বশক্তির স্বতঃস্ফূর্ততা নেই। 'বীরবাহু' (১৮৬৪) আখ্যান-কাব্য হিসেবে অসফল। কাহিনী পরিকল্পনায় সংযম-সংহতির একান্ত অভাব। তাঁর 'আশাকানন'কে (১৮৭৬) 'সাঙ্গরূপক' কাব্য বলে ডঃ সুকুমার সেন অভিহিত করেছেন। 'ছায়াময়ী' (১৮৮০) যদিও দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'র রীতি অবলম্বনে রচিত তথাপি 'ছায়াময়ী'র কাব্যরস রসিকের চিত্তকে পরিতৃপ্ত করে না। মনে হয়, আখ্যানকাব্য এবং মহাকাব্য রচনার তুলনায় কিছু রঙ্গব্যঙ্গমূলক সমসাময়িক বিষয় নিয়ে রচিত কবিতায় অথবা দু'একটি লিরিক রচনায় হেমচন্দ্র কবিকৃতির অধিকারী।

নবীনচন্দ্র দুখানি আখ্যায়িকা কাব্য রচনা করেন 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫) এবং রঙ্গমতী (১৮৮০)। 'পলাশীর যুদ্ধ' পঞ্চ সর্গে সমাপ্ত কাব্য। নায়ক সিরাজদ্দৌল্লা মীরজাফর প্রভৃতির ষড়যন্ত্র কাহিনীতে সংঘাত সৃষ্টি করেছে। ছন্দোলালিত্য কাব্যখানির প্রধান আকর্ষণ। কিন্তু লিরিক উচ্ছ্বাসের যত্রতত্র বাড়াবাড়ি। রচনারীতি মাঝামাঝি

রকম। 'রঙ্গমতী'তে রাঙ্গামাটীর কাহিনী। নায়ক বীরেন্দ্র। নায়িকা কুসুমিকা। নায়ক-নায়িকার মৃত্যুতে কাব্যের করুণরস-পরিণতিতে তপস্বিনীর 'স্বপ্নশেষ রঙ্গমতী সুন্দর কানন' দর্শনে তরল হয়েছে। কাব্যখানির রূপায়ণে মধুসূদনের অপটু অনুকরণ মাঝে মাঝে ধরা পড়েছে।

উনবিংশ শতকের আখ্যায়িকা কাব্যের ইতিহাসে মধুসূদনের একক স্বাতন্ত্র্য। হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র সেই পথের পথিক। কিন্তু তাঁরা শক্তিহীন, প্রতিভা দীন। মধুসূদন প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবাদ-প্রতিম উক্তি স্মরণ করি—"সুপবন বহিতেছে। পতাকা উড়াইয়া দাও। তাহাতে নাম লেখ—'শ্রীমধুসূদন"।

প্রশ্ন ৮। রবীন্দ্র কাব্যধারার আবির্ভাবের সহিত উনবিংশ শতকের বাংলা গীতিকবিতাধারার যোগাযোগ নির্ণয় করিতে চেষ্টা কর। (ক. বি. ১৯৬৪)

উত্তর। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের কাব্যধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়ের একটা নিবিড় সংযোগ আছে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই রবীন্দ্র কাব্যধারার প্রথম অভ্যুদয়। অবশ্য তৎপূর্বেও কবিকাহিনী (১৮৭৮), ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৮৭৮), বনফুল (১৮৮০) এবং ভগ্নহৃদয় (১৮৮১) প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই রচনাকে নিজেই বলেছেন "অপরিণত মনের প্রকাশ অপরিণত ভাষায়।" বস্তুতঃ রবীন্দ্রকাব্যের উন্মেষপর্বকে ১৮৮২ সাল থেকেই চিহ্নিত করা চলে। কারণ সন্ধ্যা সঙ্গীত (১৮৮২) থেকেই তাঁর রচনা যথার্থ কবিতা হয়ে উঠেছে। কবি বলেন, "লেখা যখন কবিতা হয়ে উঠেছে তখন থেকেই তার ইতিহাস।"

রবীন্দ্রপ্রতিভা উন্মেষের এই ইতিহাসধারায় বিহারীলাল প্রবর্তিত গীতি কাব্যধারার প্রত্যক্ষ যোগ আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিকাহিনী, বাল্মীকি-প্রতিভা, ভগ্নহৃদয় প্রভৃতি রচনায় কবি বিহারীলাল প্রভাব বিকীর্ণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সচেতন ভাবেই তা গ্রহণ করেছিলেন। বিহারীলালকে তিনি গুরুর সম্মান দিয়েছিলেন। বিহারীলালের মতই তিনি আপন মনের নভৃত কথাকেই ছন্দোবদ্ধ বাণীবিন্যাসে রূপায়িত করে তুলেছিলেন। রবীন্দ্র-প্রতিভায় এই গীতিকাব্যের উৎসারের প্রস্তুতিপর্বও উনবিংশ শতাব্দীর গীতিকবিতায় সূচিত হয়েছিল। বিহারীলালের পরবর্তীকালেই কয়েকজন আত্মমগ্ন, রোমান্টিক স্বপ্নে বিভোর কবির অভ্যুদয় ঘটে। পত্রিকায় বিহারীলালের কবিতা প্রকাশিত হত। রবীন্দ্রনাথ সাগ্রহে তা পাঠ করতেন। বাংলার কাব্যভূমিতে তখন গীতিকবিতারই রসসেচন চলেছিল। আখ্যানকাব্য ও মহাকাব্যধারার প্রবাহ হয়েছিল স্তিমিত।

উনবিংশ শতাব্দীর মহাকবিদের রচনায়ও অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত গীতিরসের নির্মল নির্ঝর প্রবাহিত হত। মহাকাব্যগুলির মধ্যে গীতি-প্রবণতার কথা ছেড়ে দিলেও মধুসূদন, হেম-নবীন প্রভৃতি কবিরা গীতিকাব্য রচনায় যোগ্যতার স্পষ্ট পরিচয় দিয়েছিলেন। মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা, চতুর্দশপদী এবং অন্যান্য কবিতা গীতিরসের মাধুর্যে

ভরা। কবির ব্যক্তিজীবনের অনুভূতিরস ঐ সব রচনায় উচ্ছলিত হয়েছে। হেমচন্দ্রের আশাকানন, কবিতাবলী, চিত্তবিকাশ, প্রভৃতি কাব্যে কবির প্রেমচেতনা, প্রকৃতিচেতনা, ব্যক্তিজীবনে অন্ধত্বের বেদনা মর্মস্পর্শী ভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে। কল্পনাশক্তিতে এবং সরস প্রাণের আরতিতে হেমচন্দ্র গীতিকবির প্রতিভাই দেখিয়েছেন। অপর মহাকবি নবীনচন্দ্রের গীতিরস-প্রবণতা ও আবেগচাঞ্চল্য রবীন্দ্র কাব্যধারার আবির্ভাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত। রোমান্টিক কল্পনার অতিচার ও ভাববিহ্বলতার পরিচয় থাকলেও নবীনচন্দ্রের 'অবকাশ রঞ্জিনী' উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা। কবির ব্যক্তি-আত্মা ছন্দিত বাণীর মাধুর্য সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই জাতীয় লিরিক রবীন্দ্র আবির্ভাবের আগমনী সঙ্গীতের মতই সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গীতিকাব্যধারায় বিহারীলালের অনুবর্তীরূপে যে কবিকুল প্রভাত কলরবে বাংলার কাব্যকানন মুখরিত করে তুলেছিলেন তাঁদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং দেবেন্দ্রনাথ সেনই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পটভূমি যেন এঁদের রচনা দ্বারা গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ নারী-সৌন্দর্য, প্রকৃতিপ্রেম, অনন্তের আকুতি এবং জীবন সম্বন্ধে গভীর রহস্যবোধের আবেগ দিয়ে উচ্চস্তরের গীতিসুরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই ভাবধারা এবং প্রকাশভঙ্গির মধ্যে তন্ময়তার চমৎকারিত্ব তার পূর্ববর্তী কবিগণের মধ্যেও দেখা দিয়েছিল।

অক্ষয়কুমার বড়াল কবিধর্ম এবং কবিকর্মে বিহারীলালের ভাবশিষ্য। তিনি নারী-মহিমা ও প্রেমের পবিত্রতা দিয়ে এক সুরভিময় কাব্যপরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিলেন। দাম্পত্যপ্রেমের পূত মহিমা তাঁর পত্নীবিয়োগের শোকগাথা 'এষা' কাব্যে প্রকাশ পেয়েছিল। প্রেম ও সৌন্দর্যের বেদীমূলে আরতি করবার জন্য তিনি 'প্রদীপ', 'কনকাঞ্জলি', 'শঙ্খ', 'ভুল' প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। কবি রোমান্টিক অনুভূতির আবেগ নিয়ে ইন্দ্রিয় জগতের রূপচেতনা থেকে অতীন্দ্রিয় রহস্যের দ্বারদেশে পৌঁছেছিলেন। সেই রহস্যদ্বার উন্মোচন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

প্রেম ও সৌন্দর্যের রোমান্টিক স্বপ্নে বিভোর ছিলেন কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী প্রবক্তা কবিরূপে তিনি বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী'র আদর্শে 'মহিলা কাব্য' রচনা করেন। নারীকে তিনি জননী ও জায়ার সম্মানিত আসনে বসিয়ে পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন। ক্লাসিক সংযম ও লিরিক উচ্ছ্বাসকে সমন্বিত করে এই কবি সাম্যের শাসনের মধ্যে অসীমের আকুতি সঞ্চার করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের 'ছবি ও গান' থেকে 'চিত্রা-কল্পনা' কাব্যকাল পর্যন্ত সৌন্দর্যমূর্তির যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপচেতনার ধ্যানস্বপ্ন দেখা যায় তার সৃজ্যমান রূপটি দেখা দিয়েছিল কবি গোবিন্দ দাস ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের কাব্যসাধনায়। এই দুইজন কবিই ছিলেন রূপসাধনার কবি। 'প্রেম ও ফুল', 'কুঙ্কুম', 'কস্তুরী' প্রভৃতি কাব্যে গোবিন্দচন্দ্র দাস অনাবৃত জীবনপ্রীতি ও প্রত্যক্ষ রূপমোহ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। নারীপ্রেম সম্বন্ধে বলেছেন "আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংসসহ।" ঘোষণার ভঙ্গিতে বলেছেন

"রূপেব পূজাবী আমি রূপেব পূজাবী"। দেবেন্দ্রনাথ সেনও বস্তুনিষ্ঠ কবি। কবি কীটসেব মতই তিনি সৌন্দর্যসম্ভোগেব কবি। প্রথব রূপচেতনা নিয়ে তিনি ঊর্মিলা, অপূর্ব বীবাঙ্গনা, অপূব ব্রজাঙ্গনা প্রভৃতি কাব্য লেখেন। তাঁব লেখা অশোকগুচ্ছ, গোলাপগুচ্ছ, পাবিজাতগুচ্ছ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যবুদ্ধিব সঙ্গে বোমান্টিক বসমাধুর্য অবলীলাক্রমে সমন্বিত হযেছে। এই কাব্যধাবা বাঙ্গালী চিত্তেব স্বাভাবিকতাব পক্ষে বড অনুকূল। তাই ববীন্দ্রনাথেব গীতিকাব্যধাবাব সঙ্গে এই ধাবাব স্বাভাবিক যোগাযোগ কিছুমাত্র অপ্রত্যাশিত নয়।

প্রশ্ন ৯। বাঙলা গদ্যের বিকাশে মিশনারীদের এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের দানের পরিমাণ আলোচনা কর।

উত্তর। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে গদ্যেব ব্যবহাব প্রায দুর্লভ। মধ্যযুগেব সমস্ত সাহিত্যই, তা ভাবেব সাহিত্যই হোক আব জ্ঞানেব সাহিত্যই হোক পদ্যে বচিত। চৈতন্য চবিতামৃতেব মত বিশুদ্ধ তত্ত্ব গ্রন্থ এবং ভক্তিবত্নাকব, নবোত্তম বিলাস প্রভৃতি সমাজ ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থও কবিতায বচিত হযেছে। অষ্টাদশ শতকে বাংলা গদ্যেব প্রকৃত সূচনা। কিন্তু তাঁর পূর্বেও কিছু অস্পষ্ট নিদর্শন লাভ কবা যায। ষোডশ শতাব্দী হতেই নিতান্ত প্রযোজনে হিসাব-নিকাশ, চুক্তি, চিঠিপত্র প্রভৃতি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই গদ্যেব ব্যবহাব ছিল। এব মধ্যে ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে লেখ কুচবিহাবেব মহাবাজ নবনাবাযণেব একখানি পত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বচিত কিছু কিছু দলিলদস্তাবেজে মুসলমানী বাক ভঙ্গিমা এব দৈনন্দিন জীবনেব অভাব অভিযোগ অভিব্যক্তি লাভ কবেছিল গদ্যে। এই শতকে স্থ-বিশেষে বাজকাযে বাংলা গদ্যেব ব্যবহাব হত। বৈষ্ণব সহজিযাদেব কডচাজাতীয ধর্মতত্ত্ব বিষযক ছোট ছোট পুস্তিকাতেও গদ্যবীতিব ব্যবহাব সুলভ। অষ্টাদশ শতকে গদ্য শুধু কাজকর্ম পবিচালনাব জন্যেই ব্যবহৃত হত। এগুলি সাহিত্যিক প্রযোজনে বচিত নয়। মহাবাজ নন্দকুমাবেব পত্র, বৈষ্ণবপবকীযাবাদেব সমর্থক বচনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কবা যায।

বাংলা গদ্যে পর্তুগীজ মিশনাবীদেব দান সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। পর্তুগীজ বোমান ক্যাথলিক পাদ্রীগণ বাঙালী হিন্দুমুসলমানগণকে ছলে বলে কৌশলে ধর্মান্তবিত কবতে গিযে বাঙলা গদ্যগ্রন্থেব প্রযোজন বোধ কবলেন। দেশীয ভাষা লিখতে এবং শিখতে হ'লে গদ্য গ্রন্থেব একান্ত প্রযোজন। মানো-এল-দাঁ-আসসুম্প-সাও নামক একজন পর্তুগীজ পাদ্রী বাংলা ভাষায দুখানি পুস্তিকা বচনা কবেন। (১) Vocabulario—emidioma Bengalla Portuguez (১৭৪৩ খৃঃ) অর্থাৎ পর্তুগীজ—বাংলা ভাষায ব্যাকবণ। (২) কৃপাব শাস্ত্রেব অর্থভেদ। এতে বোমান ক্যাথলিক ধর্মতত্ত্ব সবল বাংলায ব্যাখ্যা কবা হয়েছে। ভাষাব নিদর্শন—

"দুই পহর বাইতে মেলা কবিল বনেব মৈধে ডাকাইতে তাহার লাগাল পাইল। পালা দিতব ঘরের কাছে তাহার..... ডাকাতি করিয়া নিল। তাহার পরে হাকিমেব

স্থানে আরম্ভ করিল।" এই গ্রন্থ দুইখানি অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে রোমান হরফে মুদ্রিত হয়েছিল। দোম-আন্তু-নিও-দে রোজারীও নামক আর একজন ক্যাথলিক পাদ্রী 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' নামক আর একখানি প্রশ্নোত্তরমূলক পুস্তিকা লিখেছিলেন। ইনি ধর্মান্তরিত বাঙ্গালী খৃষ্টান। এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়নি, পাণ্ডুলিপি আকারে এখনও রক্ষিত আছে। ভাষার নমুনা—"বলিরাজা বড় ধর্মিষ্ঠ ছিল, মহা দাতা ছিল, যে যাহারে চাহিত তাহারে তাহা দিত। এ কারণ পরমেশ্বর ব্রাহ্মণ রূপে হইয়া একপদ দিয়া পৃথিবীতে, একপদ দিয়া পাতালে, আর পদ স্বর্গে এই রূপে বলিরাজারে ছলিলেন।"

অতঃপর ১৮০০ খৃঃ শ্রীরামপুরে বাংলা দেশে সর্বপ্রথম প্রটেস্টান্ট মিশন প্রতিষ্ঠা হয়। এ যুগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা পাদ্রী সম্প্রদায়কে সুনজরে দেখতেন না বলে উইলিয়াম কেরী ও তাঁর অনুচরবর্গ শ্রীরামপুরে মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় থেকে কেরী ও মার্শম্যানের উদ্যোগে নানা ভারতীয় ভাষায় বাইবেল মুদ্রিত হতে থাকে। উইলিয়ম কেরী বাইবেল অনুবাদ করতে গিয়ে বাংলা ভাষার ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেছিলেন। তিনি শুধু পণ্ডিতদের দ্বারা বাংলা গ্রন্থ রচনা করিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন না। বাইবেল অনুবাদে তিনি অবশ্য কিছুমাত্র কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। কিন্তু বাঙলার সাধু ও কথ্যরীতিতে যে তাঁর অধিকার ছিল তা তাঁর 'কথোপকথন' (১৮০১), 'ইতিহাস মালা' (১৮১২) থেকে বোঝা যায়। 'কথোপকথন' সিভিলিয়ানদের ভাষা শিক্ষাদানের নিমিত্ত রচিত হয়। এতে সাধারণ বাঙলার দৈনন্দিন জীবনের পরিচয়—সব সমাজের আচার-ব্যবহার, আলাপ-আলোচনা বাঙলার সরল রূপে রচিত। ভাষার নিদর্শন :

"ওলো তোর ভাতার কাজে কেমন ভাল বাসে বল শুনি। আর তাহার কথা কহ কেন? এখন আর আমাদের কি তার আদর আছে? নূতনের দিকে মন রাখিবেকে পুরাণের দিকে কে চাহে?"

কথোপকথন কেরীর নিজের রচনা কিনা তা বলা যায় না। তিনি এর সংকলক। সম্ভবত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাঁকে এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। কেরীর 'ইতিহাসমালা' ইতিহাস নয়—লৌকিক কিংবদন্তীর সমষ্টি। তবে পদবিন্যাস পরিচ্ছন্ন। ইংরেজী ধরণের পদাবন্যাস দুর্লভ। কেরী বাঙলা সাহিত্যের রচনা অপেক্ষা সংগঠক ও প্রবর্তকের গৌরব লাভ করে বাঙলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ডঃ সুশীলকুমার দে মহাশয়ের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় : William Carrey is the spiritual father of Teechand.

১৮শ শতকের শেষ ভাগে যে সব তরুণ সিভিলিয়ান চাকরী নিয়ে এদেশে আসে তাদের দেশীয় ভাষা, ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য গভর্ণর জেনারেল ওয়েলেসলীর চেষ্টায় ১৮০০ খৃঃ অব্দের মে মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮০৭ সালে কেরী এই কলেজের বাঙলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। গদ্যগ্রন্থের অভাব দেখে তিনি সংস্কৃত পণ্ডিত এবং আরবী ফারসী মুন্সিদের দ্বারা কয়েকখানি

বাঙলা গদ্যগ্রন্থ রচনা করে মুদ্রিত করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে উইলিয়ম কেরী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামরাম বসুর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া গোলোকনাথ শর্মার হিতোপদেশ, তারিণীচরণ মিত্রের ওরিয়েণ্টাল ফেব্যুলিষ্ট, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্, হরপ্রসাদ রায়ের পুরুষপরীক্ষা এবং কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পদার্থ তত্ত্বকৌমুদী', 'আত্মতত্ত্ব কৌমুদী' প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থ সমূহের ভিতর একমাত্র 'তোতাকাহিনী' এবং 'পুরুষ পরীক্ষা' পরবর্তী যুগেও গল্পরসের জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাইরে প্রচার লাভ করেছিল। অধিকাংশ গ্রন্থের ভাষা এমন বিশৃঙ্খল, অসঙ্গত, উৎকট যে প্রায় অপাঠ্যের পর্যায়ে পড়ে। ইংরেজী, ফার্শী ও সংস্কৃতের মিশ্রণে এমন এক অরাজক ভাষা এরা সৃষ্টি করেছিলেন যে সাহিত্য রচনা দূরের কথা সাধারণ সহজ ভাব প্রকাশও দুরূহ হয়ে পড়েছিল।

উইলিয়ম কেরী প্রথম বাঙলা ভাষা শিখেছিলেন রামরাম বসুর কাছে। রামরামকে কেরীর মুন্সী বলা হয়। তাঁর দুখানি গ্রন্থ—'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১), 'লিপিমালা' (১৮০২। বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য কোন সাহিত্যগুণের জন্য নয়। রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। রামরাম বসু প্রতাপাদিত্যের জ্ঞাতি। তিনি নিজেও প্রতাপাদিত্যের সম্বন্ধে অনেক জনশ্রুতির সংবাদ রাখতেন। সুতরাং জাতীয় বীরের চরিত্র রচনায় তিনি যোগ্যতম ব্যক্তি মনে করে কেরী তাঁকে এ গ্রন্থ রচনার ভার অর্পণ করেছিলেন। রামরাম অকারণে অজস্র ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেছেন। ফলে গ্রন্থখানি জটিল এবং দুষ্পাঠ্য হয়েছে। তাছাড়া পদ সংগঠন এবং পদান্বয় সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা খুব পরিষ্কার নয়। ভাষার নিদর্শন :

'তাহার মধ্যস্থলে ক্রোশাধিক চারিদিকে আয়তন গড় কাটাইয়া চারি বিহন্দে এমারৎ সমস্ত তৈয়ার হইয়া বিলক্ষণ ব্যবস্থিত পুরী প্রস্তুত হইল।" অথচ এর এক বৎসর পরে রচিত তাঁর পত্র লিখনের পদ্ধতিতে তিনি যে সব কাহিনী বর্ণনা করেছেন—তার স্বচ্ছন্দ ভঙ্গী আছে। প্রথম গদ্য সাহিত্যিকের গৌরব তাঁর প্রাপ্য নয়। কিন্তু প্রথম বাঙলা মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে রামরাম বসুর স্বতন্ত্র স্থান ইতিহাসে নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শ্রেষ্ঠ লেখকের মর্যাদা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রাপ্য। প্রাক্-রামমোহন কোন লেখককে পাণ্ডিত্য, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি এবং গদ্য শিল্পীরূপে মর্যাদা দিতে হলে —তিনি নিশ্চয়ই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। তাঁর 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), 'হিতোপদেশ' (১৮০২), 'রাজাবলি' (১৮০৮), 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' (১৮১৩-প্রকাশ ১৮৩৩) এবং 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' (১৮১৭) উল্লেখযোগ্য রচনা। মৃত্যুঞ্জয়ের উল্লিখিত গ্রন্থরাজির মধ্যে 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' রামমোহনের বেদান্ত গ্রন্থের বিরুদ্ধে রচিত। এতে মৃত্যুঞ্জয়ের নাম ছিল না। মৃত্যুঞ্জয়ের এক শ্রেণীর গ্রন্থে ভাষার ভিতর সংস্কৃতের জটিলতা রয়েছে। যেমন 'বত্রিশ সিংহাসনের' ভাষা। কিন্তু পরবর্তী কালে রচিত গ্রন্থে এ ত্রুটি ক্রমে অবলুপ্ত হয়েছে। 'রাজাবলি' এবং প্রবোধচন্দ্রিকার স্থানবিশেষের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল। মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষার দুটি

গুণ : (১) তিনি সাধুভাষার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ দেখিয়েছেন। (২) গ্রাম্য চলিত ভাষা ব্যবহারে তিনি কুণ্ঠাহীন। ভাষা নিদর্শন : মোরা চাষ করিব, ফসল পাব ; রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই অন্ন করিয়া খাব, ছেলেপিলেগুলি পুষিব।······শাক-ভাত পেট ভরিয়া যেদিন খাই সেদিন ত জন্মতিথি।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ পর্বে বাঙলা গদ্য সুগঠিত হয়নি, সুপরিণতও হয়নি, হওয়া স্বাভাবিকও নয়। কেরী, রামরাম বসু, অথবা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এঁরা কেউ অল্প শক্তিমান ছিলেন একথা বলা যায় না। কিন্তু গঠনের প্রথম পর্বে বাঙলা গদ্য কিছুতেই জড়তা মুক্ত হতে পারে নি। রামমোহন বাঙলা গদ্যকে কৈশোর ক্রীড়ার সুযোগ দিয়েছিলেন ; আর মৃত্যুঞ্জয় ছিলেন বাঙলা গদ্যের প্রস্তুতি গৃহের ধাত্রীমাতা। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। এখান থেকেই বাঙলা গদ্য বহুভাবপ্রকাশমান পথে অগ্রসর হয়েছে ; কিন্তু চিরচলিষ্ণুতার প্রথম সোপানে হিসেবে স্মরণীয় ভূমিকা পাবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গদ্য শিল্পিবৃন্দ।

প্রশ্ন ১০। 'দিগদর্শন' থেকে 'বঙ্গদর্শন' পর্যন্ত বাঙ্‌লা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাস বিবৃত কর।

উত্তর। বাংলা গদ্যের উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশে সাময়িক পত্রের দান অপরিসীম। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন বাংলা সাহিত্যে খোলা হাওয়ার বাতায়ন খুলে দিয়েছিল বাংলা সাময়িক পত্রিকা। বাংলাদেশে অষ্টাদশ শতকের শেষে ইংরেজী সাময়িক পত্রের আবির্ভাব হয়। হিকি সাহেবের 'বেঙ্গলগেজেট' ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। তারপরেও অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে দু'একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি প্রায়ই ইংরেজীতে মুদ্রিত এবং ইংরেজ কর্তৃক সম্পাদিত হত।

বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্র মুদ্রিত করেন শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায়। ১৮১৮সালে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয় 'দিগ্‌দর্শন' 'দিগদর্শন'এ ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা থাকত। প্রকৃতপক্ষে পত্রিকাটি ছিল স্কুলপাঠ্য। কেউ কেউ বলেন—গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের 'বাঙ্গাল গেজেট'। এটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৮১৮ সালে কলকাতা থেকে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। পরে জানা গেছে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের পত্রিকাটি বের হয় ১৮১৮ সালের জুন মাসে। 'দিগ্‌দর্শন' প্রকাশিত হবার পর ঐ বৎসর মে মাসে মিশনারীদের উইলিয়াম এবং মার্শম্যানের সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করে সাপ্তাহিক পত্র 'সমাচার দর্পণ'। সমাচার দর্পণে যথেষ্ট পরিমাণে সংবাদ থাকত। অধিকাংশ সময় শ্রীরামপুরের পণ্ডিত মুন্সীগণ এ পত্রপত্রিকাগুলিতে সংবাদ লিখতেন—তবে তাঁদের নাম অপ্রকাশিত থাকত।

সমাচার দর্পণে মাঝে মাঝে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার থাকত। এর প্রতিরোধ কল্পে ১৮২১ সালে রামমোহন রায় এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবর্তনায় বের হল 'সম্বাদকৌমুদী' (সাপ্তাহিক)। রামমোহন প্রগতিশীল। ভবানীচরণ প্রাচীনপন্থী। ফলে উভয়ের মধ্যে বিরোধ অমীমাংসিত আকার ধারণ করল। ভবানীচরণ 'সম্বাদকৌমুদী'

ত্যাগ করে ১৮২২ সালের মার্চে 'সমাচার চন্দ্রিকা' (সাপ্তাহিক)-কে মুক্তি দিলেন। রক্ষণশীল এ পত্রিকার বহুল জনপ্রিয়তা ছিল। এ সময়ে আরও দু'একটি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যেমন—স্কুল-বুক-সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত পশ্বাবলী (জীবজন্তু বিষয়ক), সংবাদ তিমির নাশক, বঙ্গদূত ইত্যাদি। দেশের মানুষ তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, সমাজ সংস্কৃতির রূপ দেখতে পেল এই পত্র-পত্রিকাগুলির ভিতর।

১৮৩১ সালে ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করল 'সংবাদ প্রভাকর'। মাসিক, সাপ্তাহিক, দ্বিসাপ্তাহিক, এর বিভিন্ন সংস্করণ দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ১৮৩৯ এর ১৮ই জুন সংবাদ প্রভাকরের দৈনিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ভারতীয় ভাষায় 'সংবাদ প্রভাকর'ই প্রথম দৈনিক পত্রিকা। ঈশ্বর গুপ্ত নিজে কোন কোন দিক দিয়ে প্রাচীনপন্থী ছিলেন। কিন্তু তাঁর পত্রিকায় নানা প্রগতিশীল বিষয়ের আলোচনা হত। পরবর্তীকালের বহু খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি এ পত্রিকায় লিখতেন। সংবাদ প্রভাকর ছিল সাহিত্যধর্মী প্রথম সংবাদপত্র। বাংলা দেশের সাহিত্যকে উন্নতির পথ দেখিয়েছিল এ পত্রিকা। সমসাময়িক আর দু'একটি উল্লেখযোগ্য পত্রপত্রিকা হচ্ছে—'জ্ঞানান্বেষণ', 'বিজ্ঞানসেবধি' ইত্যাদি। এরা আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান আলোচনার পথ প্রশস্ত করেছিল। সংবাদ প্রভাকরের পাশাপাশি আর যে কয়েকটি পত্রিকা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লাভের অধিকারী তারা তত্ত্ববোধিনী (১৯৪৩), বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৮৫১) এবং মাসিকপত্রিকা (১৮৫৪)।

অক্ষয়কুমারের সরস গদ্য এবং ধীশক্তিতে মুগ্ধ হয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। 'তত্ত্ববোধিনী' সম্পাদনার ভার অক্ষয়কুমারের হস্তে সমর্পিত হল। ইতিহাস, পুরাবৃত্ত, বিজ্ঞান, সাহিত্য নানাবিষয় আলোচনা হত 'তত্ত্ববোধিনী'তে। তত্ত্ববোধিনী সম্পর্কে সম্ভ্রমসূচক মন্তব্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

বিবিধার্থ সংগ্রহের সম্পাদক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। বাংলা দেশের জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে রাজেন্দ্রলালের নাম পরম শ্রদ্ধার সংগে স্মরণীয়। পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পাঠক এবং জনসাধারণকে অবগত করানো হয়েছিল এই বলে-যে পত্রিকা "আবালবৃদ্ধবণিতা সকলের পাঠযোগ্য" এবং "অতি কোমল ভাষায় লিখিত হইবেক।" বিভিন্ন বিষয় পরিজ্ঞানার্থ চিত্রাদিরও উল্লেখ ছিল। সকল উপস্থাপনার প্রতিশ্রুতি শেষ অবধি রক্ষা করা হয়নি। তাছাড়া গদ্যের ক্ষেত্রে রাজেন্দ্রলালের হাত খুব পাকা ছিল না।

'মাসিক পত্রিকা' পূর্বোল্লিখিত পত্রিকাসমূহের মতোই দায়িত্ব পালন করেছিল। বিবিধার্থ সংগ্রহ উচ্চ নীতি প্রচার করে, সংবাদ প্রভাকর আপন উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করে—আর তত্ত্ববোধিনী গুরুগম্ভীর ভাষায় নানা উচ্চ বিষয় রূপায়িত করে—মাসিক পত্রিকা বাংলা কথা-সাহিত্যকে অভিনন্দন জানায়। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' আত্মপ্রকাশ করেছিল 'মাসিক পত্রিকায়'।

বাংলা সাময়িক পত্রের পরবর্তী পর্ব আরম্ভ হল। এ পর্বের প্রধান পত্রিকা—সোম প্রকাশ (১৮৫৮), অবোধ বন্ধু (১৮৬৩) এবং সুলভ সমাচার। 'সোমপ্রকাশ'

এবং 'সুলভ সমাচার'এ রাজনীতি এবং সমাজনীতি প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল। সাহিত্যিকদের নানা অনুশীলনে সাহায্য করেছিল—অবোধবন্ধু। অবোধবন্ধু সম্পর্কে জীবনস্মৃতিতে এর উপযোগিতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ এবং পত্রিকাটিকে 'প্রভাতের শুকতারা' বলে উচ্চপ্রশংসা করেছেন। আলোক সমুজ্জ্বল যুগের পূর্ব মুহূর্তের অন্ধকার এবং অজ্ঞতা দূর করেছিল এই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তনের পত্রিকাগুলি।

বঙ্গসাহিত্যে এরপর বঙ্গদর্শনের (১৮৭২) আবির্ভাব প্রভাত সূর্যের দীপ্তি নিয়ে। কোথায় গেল বিজয় বসন্ত, কোথায় গেল গোলেবকাউলি—কোথায় গেল সব ছেলে ভুলানো ছড়া। এত আশা, এত আলো এত স্বপ্ন কোথা থেকে এসে বঙ্গ সাহিত্যের প্রাঙ্গণ আলোয় আলো করে দিল। এক অর্থে বঙ্কিম প্রতিভার দুর্লভ সিদ্ধির প্রতিশ্রুতি নিয়ে এল বঙ্গদর্শন।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রই বঙ্গদর্শনের একামাত্র লেখক ছিলেন না। তিনি ছিলেন এ পত্রিকার মূল নীতি এবং মূল আদর্শ নিয়ন্তা। বঙ্কিম যুগ অতিক্রম করে এ পত্রিকা যুগান্তরে আপন প্রভাব বিস্তার করেছিল। নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শনের সম্পাদনাভার গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য পত্রিকা-স্থাপনকে মহাপুরুষের কীর্তির সংগে তুলনা করেছেন। বঙ্কিম এক যুগকে অন্য যুগের সংগে অন্বিত করেছিলেন; বঙ্গদর্শন ছিল তার মাধ্যম।

বঙ্কিমের হাতে বঙ্গদর্শন একটি পত্রিকা মাত্র ছিল না। এটি ছিল একটি যুগ, একটি দৃষ্টিভঙ্গী, একটি আদর্শ। সে যুগের সমস্ত বাঙ্গালীর চিন্তা সংহত হয়েছিল বঙ্কিমের মধ্যে। বঙ্কিম-মানস উনিশ শতকের মনোজগতের সার্থক পরিচয় বহন করেছিল।

পূর্বকালের ঔপন্যাসিক বঙ্কিমকে প্রবন্ধ সম্রাটরূপে পাই বঙ্গদর্শনে। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমের প্রধানত দুটি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়—(১) নব্যবঙ্গীয় যুবকদের ধ্যান ধারণা (২) বিশেষ জীবনবোধে প্রজ্ঞাবান বঙ্কিম। বঙ্কিমের বিশিষ্ট চিন্তার পরিচয় বঙ্গদর্শন।

বঙ্কিম সম্পাদিত লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র সরকারের নাম উল্লেখযোগ্য। ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণমূলক রচনা, উদ্দীপনামূলক সাহিত্য এবং উপন্যাস, কবিতা বঙ্গদর্শনের কলেবর পূর্ণ করত। বঙ্গদর্শন একটি সংস্কৃতি-বান্ যুগের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করেছিল। এখানেই তার সর্বাধিক মহিমা।

প্রশ্ন : "১৮১৩ হইতে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিবর্তনকে রামমোহন পর্ব নামে চিহ্নিত করিতে পারি।" —এই অভিমতের সার্থকতা নিরূপণ উপলক্ষ্যে উক্ত পর্বের বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (ক. বি. ১৯৫৯)

উত্তর। রাজা রামমোহন রায়ের জন্মকাল সম্ভবতঃ ১৭৭৪ সাল। কেউ কেউ হয়তো দাবী করিয়াছেন যে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকাল ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ। বাংলা দেশের সমাজ ও সাহিত্য ক্ষেত্রে রামমোহন আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে। বস্তুতঃ ১৮১৩ হইতে ১৮৩৩ পর্যন্ত একটানা

বিশ বৎসর কাল তিনি বাংলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একাধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। দেশে তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ও শোষণ চলিতেছিল। সমগ্র দেশ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। খ্রীষ্টান পাদ্রীরা হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য অতিশয় আগ্রহশীল। এই সময় পুরুষসিংহ রামমোহনের আবির্ভাব। তিনি সংবাদ পত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া, যুক্তি-তর্কমূলক প্রচুর প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করিয়া, শাস্ত্রগ্রন্থাদি অনুবাদ ও ভাবার্থ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালী জাতিকে আত্মস্থ ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। রামমোহনের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে এবং তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া স্বপক্ষীয় ও বিপক্ষীয়দের উদ্যমে বাংলায় একটি নূতন সাহিত্য যুগ গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই যুগকে ঐতিহাসিক বিচারে রামমোহন পর্ব নামে অভিহিত করা কোন ক্রমেই অসঙ্গত নহে।

১৮১৩ সালের পর রামমোহন কলিকাতায় বাস স্থাপন করেন। তাহার পর দীর্ঘ বিশ বৎসর যাবৎ বহু গ্রন্থাদি রচনা করেন এবং অন্য সকলকেও গ্রন্থ রচনায় অনুপ্রাণিত করেন। তাঁহার নিজের সাহিত্যকর্মকে দুই ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথমতঃ তিনি জাতীয় ঐতিহ্যের পুনরভ্যুত্থানের জন্য প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বেদান্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। দুই তিন বছরের মধ্যেই বেদান্ত-সার, ঈশ-কঠ-মাণ্ডুক্য প্রভৃতি উপনিষদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেন। তারপর কয়েক বৎসর ধরিয়া সমাজ ও ধর্ম বিষয়ে প্রতিবাদীদের সহিত বিচার-বিতর্কের উদ্দেশ্যে প্রস্তাব রচনা করেন। উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ, ভট্টাচার্য, গোস্বামী, কবিতাকার, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী প্রভৃতি ব্যক্তির সহিত বিচার এবং এই জাতীয় আরও গ্রন্থ লেখেন। সহমরণ সম্পর্কেও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন সাহিত্যিক প্রেরণার বশবর্তী হইয়া রামমোহন লেখনী ধারণ করেন নাই। এইজন্য তাঁহার রচনায় যুক্তির সারবত্তা এবং উন্নত রুচির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রামমোহনের ভাষা সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্তের মন্তব্যটি প্রণিধান যোগ্য। "দেওয়ানজী জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টত্ব ছিল না।" রামমোহন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক ছিলেন না। কিন্তু একটি সাহিত্য যুগের স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন।

১৮১৩ হইতে ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত কালসীমার মধ্যে সাহিত্যের যাহা ইতিহাস তাহাতে রামমোহনের ব্যক্তিত্ব চিহ্ন সুপরিস্ফুট। এই সময়-কালের মধ্যে বহু গ্রন্থ প্রকাশ হয়। সংবাদ পত্রেরও প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীরামপুর মিশন, স্কুল-বুক-সোসাইটি, ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটি বহু পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করে। রামমোহনের প্রতিবাদীরা তাঁহার অভিমতকে খণ্ডন করিবার জন্য গ্রন্থ রচনা করেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীনাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি রামমোহনের বিরুদ্ধাচারী ছিলেন। ইঁহারা কিন্তু রামমোহন দ্বারা রীতিমত প্রভাবিত। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' নামক গ্রন্থ লেখেন। ইনি 'কবিতামৃতকূপ' নামে বালক-পাঠ্য গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ছদ্মনামে ১৮২৩

খ্রীষ্টাব্দে 'পাষণ্ড-পীড়ন' নামক গ্রন্থ লিখিয়া রামমোহনকে তীব্র ভাবে আক্রমণ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' নামে একখানি পুস্তিকা লেখেন। ইহা ব্যতীত তিনি 'পদার্থ কৌমুদী' ও 'আত্মতত্ত্ব কৌমুদী' নামে দুইখানি দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্টান বিরোধিতার সময় রামমোহনের সহকারী ছিলেন; পরে বিরোধী দলে যোগ দেন। ইনিও রামমোহনের আদর্শে ভাগবত, মনুসংহিতা ও রঘুনন্দন স্মৃতির অনুবাদ লেখেন। প্রমথ শর্মা ছদ্ম নামে 'নববাবু বিলাস' এবং ভোলানাথ ছদ্ম নামে 'নববিবি বিলাস' লেখেন, এবং স্বনামে কলিকাতা কমলালয় ও দূতী বিলাস লিখিয়াছিলেন। এই প্রতিভাবান ব্যক্তির রচনাও রামমোহন পর্বেরই অন্তর্ভুক্ত।

বাংলার সাহিত্য-যুগ গঠনে সংবাদ পত্রের দান নিতান্ত অল্প নয়। রামমোহন ইহারও অগ্রদূত। ভবানীচরণের সহযোগিতায় মিশনারী আক্রমণের প্রতিরোধের জন্য তিনি 'সংবাদ কৌমুদী' নামক পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহারই অনুপ্রেরণায় অনেকগুলি পত্রিকার প্রতিষ্ঠা হয়। নীলমণি হালদারের 'বঙ্গদূত', ভবানীচরণের 'সমাচার চন্দ্রিকা' রামমোহনের প্রতিবাদে প্রতিষ্ঠিত। রামমোহন বাঙ্গালী চিত্তে জাগরণের যে গান জাগাইয়াছিলেন তাহাই ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল 'সংবাদ প্রভাকর', 'সংবাদ তিমিরনাশক' এবং জ্ঞানান্বেষণ' প্রভৃতি পত্রিকায়। বস্তুতঃ রামমোহন প্রবর্তিত জ্ঞানানুশীলনের ধারা এই কয় বৎসর অনুসৃত হইয়াছিল। তাই এই যুগকে রামমোহনের যুগ বলাই উচিত।

প্রশ্ন ১২। বাঙলা গদ্যের বিবর্তনে রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, ভূদেব-প্রমুখ কয়েকজনের দান সম্বন্ধে যাহা জান লেখ।

বাঙলা গদ্যকে কৈশোর ক্রীড়ার উপযোগী করে তুলেছিল রামমোহনের (১৭৭৪-১৮৩৩) লেখনী স্পর্শ—মন্তব্য করেছেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যের বিকাশের ধারা' নামক গ্রন্থে। ভাষার ক্ষেত্রে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় একজনকত্ব অপেক্ষা বহুমাতৃকত্বই স্বীকার করেছেন। বাঙলা গদ্যকে যাঁরা পরিপূর্ণ বিকাশের পথে নিয়ে গেছেন তাঁরা হচ্ছেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, ভূদেব প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরবর্তী কালে যে সাধু বাঙলা গদ্যের ছাঁদটি বেঁধে দিয়েছিলেন—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার পূর্বেই সেই ধরনের গদ্যরীতি অনেকটা আয়ত্তে আনতে পেরেছিলেন। পরীক্ষা নিরীক্ষার স্তর অতিক্রম করে সাধুগদ্যের প্রথম রূপ ধরতে পেরেছিলেন। একমাত্র মৃত্যুঞ্জয় ছাড়া সে যুগের আর কেউ বাঙলা গদ্যরীতির আদর্শ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। অতঃপর বাঙলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে রামমোহনের দান উল্লেখযোগ্য। ১৮১৫ সাল থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত মোট পনের বৎসরের মধ্যে তিনি অন্তত ত্রিশখানি বাঙলা পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। তিনি প্রধানত সমাজ ও ধর্মসংস্কারের উদ্দেশ্যেই পুস্তিকা লেখেন। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন প্রতিপক্ষের সংগে তর্কযুদ্ধে বিজয়ী হয়ে। ক্ষুরধার মনীষার পরিচয় দিয়েছেন রামমোহন। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের

অনুবাদের মধ্যে 'বেদান্ত গ্রন্থ' 'বেদান্ত সার' বিভিন্ন উপনিষদের অনুবাদ এবং বিতর্কমূলক রচনার মধ্যে 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার', (১৮১৮), 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৮), 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক নিবর্তক সম্বাদ' (১৮১৮-১৮১৯), কবিতাকারের সহিত বিচার' (১৮২০), 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১), 'পথ্যপ্রদান', 'সহমরণ বিষয়ক' (১৮২৩) প্রভৃতির কথা উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া তিনি 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' ও 'ব্রহ্মসঙ্গীত' রচনা করেছিলেন। তিনি 'ব্রাহ্মণ সেবধি' নামক পত্রিকার সম্পাদনাও করেছেন। তাঁর বিতর্কমূলক ভাষার ঋজুতা ও তীক্ষ্ণতা এবং অনুবাদের আক্ষরিক প্রাঞ্জলতা সে যুগে বিস্ময়কর সন্দেহ নেই। সংস্কৃত ভাষায় সন্ধি ও সমাসের জটিলতা ও আড়ম্বর দেখা যায়। কিন্তু সেই জটিল প্রকরণ বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে রামমোহন মনে করতেন না। তাঁর মতে সংস্কৃত সন্ধি প্রকরণ ভাষায় উপস্থিত করলে 'তাবৎ গুণদায়ক' না হয়ে "আক্ষেপের কারণ হয়।" ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর গদ্য সম্পর্কে যা বলেছিলেন তার তাৎপর্য প্রণিধানযোগ্য: "দেওয়ানজী জলের মত ভাষায় লিখিতেন ....।" তাতে কোন বিচার বিবাদ ঘটলে লেখক মনের অভিপ্রায় ও ভাবসকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেত। এজন্য সকলেই অনায়াসে তাঁর ভাষা ও সাহিত্য হৃদয়ঙ্গম করতেন। কিন্তু সে লেখায় শব্দের পারিপাট্য তেমন ছিল না। রামমোহনের গদ্যে সাবলীল প্রাণশক্তির একান্ত অভাবই তাঁকে বিতর্ক পুস্তিকার লেখকে পরিণত করেছে। সাহিত্যিকের গৌরব লাভ করতে পারেননি। বোধহয় তিনি তা কোনদিনই কামনা করেননি। তিনি প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রের পূর্বপক্ষ উত্তরপক্ষের বিতর্ক রীতির অনুসরণ করে অগ্রসর হয়েছেন বলে ভাষা যে পরিমাণে চিত্তাকর্ষক হয়েছে সে পরিমাণে আদর্শ গদ্য হয়ে উঠতে পারেনি। দু'একটি রচনা ভিন্ন অন্যত্র তাঁর গদ্য কদাচিৎ অর্থগৌরব ছাড়িয়ে শিল্পগৌরব লাভ করেছে। সরসতা ও শ্রীছাঁদ তাঁর গদ্যে প্রায়ই অনুপস্থিত। রামমোহন সমসাময়িক যুগের মানুষকে—মানুষের প্রয়োজনকে—প্রয়োজন সাধনের উপায়কে দেখেছিলেন যুক্তির নিরিখে, বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে। তাইত রামমোহন মানবপন্থী। কিন্তু সেই মানবতন্ত্রের অভ্যুদয় মস্তিষ্কের মানবধর্মে যুক্তি ও বিচারের পথে তাঁর নিরুত্তাপ গদ্যরচনা, সংযত-বাক্যবিন্যাস— এটা ন্যায় ধর্মী মনন ক্রিয়ারই ফল। আর তার আবেদনও পাঠকের বুদ্ধি ও নৈয়ায়িক চিত্তবৃত্তির কাছে। তাঁদের হৃদয়াবেগ জাগরিত করার কোন প্রচেষ্টাই ছিল না। রামমোহনের গদ্যের দৃষ্টান্ত:

"সূর্য যেমন জগতের চক্ষু হইয়া অপরিষ্কৃত বস্তু সকলকে লোককে দেখাইয়া ও আপনি বস্তুর সংসর্গ দ্বারা অন্তর্দোষ বহির্দোষ কোন দোষে লিপ্ত হয়েন না সেইরূপ...... আত্মা সকল দেহেতে প্রবেশ করিয়া লোকের দুঃখেও লিপ্ত হয়েন না।"

রামমোহনের গদ্যে ঋজুতা আছে, সাবলীলতা আছে। কিন্তু হৃদয় ব্যঞ্জনার খুবই অভাব। তিনি বাঙলা গদ্যকে যতই তীক্ষ্ণ এবং ধারাল করে গড়ে তুলুন না কেন তাঁকে বাঙলা সাহিত্যের শিল্পী বলা যায় না।

বাঙলা গদ্য সাহিত্যের নবজাগরণের যুগের তিনজন রচনাকার অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-৯৪)।

অক্ষয়কুমারের গদ্য রচনা দেখেই দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে 'তত্ত্ববোধিনীর' সম্পাদনা ভার অর্পণ করেছিলেন। অক্ষয়কুমার সে দায়িত্ব পালনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। অক্ষয়কুমার পণ্ডিত ব্যক্তি। সারাজীবন সারস্বত সাধনায় অতিবাহিত করেছেন। পত্রিকা সম্পাদনা, পাঠ্যপুস্তক রচনা, বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চাকে জীবনের ব্রত রূপে দেখতেন অক্ষয়কুমার। বাঙলা দেশের সাহিত্য এবং সংস্কৃতিতে অক্ষয়কুমারের দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। নবযুগের উদ্বোধনে তিনি ঋত্বিকের ভূমিকা নিয়েছিলেন। আর পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনার ধারা তিনিই প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়—"পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জ্ঞানবিজ্ঞান অনুশীলন বাঙ্গলা দেশে তিনিই প্রথম শুরু করেন···।" (বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস-দ্বিতীয় খণ্ড।)

'জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের' জন্য তিন যে বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন ও অনুবাদ করেছিলেন যেগুলি হচ্ছে—'ভূগোল' (১৮৪১), 'চারুপাঠ' (তিনখণ্ডে রচিত ১৮৫২-৫৯)। 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬)। এগুলি প্রধানত ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ। কিন্তু অক্ষয়কুমারের এমন দু'একটি গ্রন্থ আছে যেখানে তাঁর দার্শনিক মনীষার পরিচয় প্রাধান্য লাভ করেছে। তাঁর 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (১৮৫১, ১৮৫৩) কুম্বের 'The Constitution of Man' (১৮২৮) অবলম্বনে রচিত। তাঁর 'ধর্মনীতি' (১৮৫৬) গ্রন্থটি কুম্বের Moral Philosophy, এবং 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (১৮৮৩) উইলসনের 'The Religious Sect of the Hindoos' অবলম্বনে রচিত। এছাড়া তিনি 'পদার্থ-বিদ্যা' (১৮৫৬) রচনা করেন। প্রাচীন ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেন। '—সম্বন্ধ বিচার' গ্রন্থটিতে মানব প্রকৃতির বুদ্ধি বৃত্তির সংগে শারীর বৃত্তির সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। 'ধর্মনীতি' জড়জীবন ও ঈশ্বর তত্ত্বের সমন্বয়। '—উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থটিও কিছু কিছু মৌলিকতার দাবী করে। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের বিস্তৃত বর্ণনা এতে স্থান পেয়েছে। অক্ষয়কুমারের রচনারীতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যেতে পারে :

(১) তাঁর তত্ত্বগ্রন্থের ভাষা সরল। তবে নীরস গুরুভার গদ্যও সুলভ।

(২) তাঁর অনুবাদ সাহিত্যকর্ম হয়ে উঠেছে।

(৩) দর্শন-বিজ্ঞানের উপযোগী পরিভাষা তৈরী করেছেন।

(৪) সংস্কৃত অনেক শব্দ এনে ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

(৫) সরস বচনাবীতি শেষের দিকে তাঁর অধিকৃত ছিল।

অক্ষয়কুমারের ভাষা এবং গদ্য সর্বত্র সুষম নয় একথা স্পষ্ট করে বলা চলে। কিন্তু বিদ্যাসাগর-পূর্ব বাঙলা সাহিত্যের গদ্যশিল্পী হিসেবে অক্ষয়কুমারের প্রয়াস যথেষ্ট সম্মান লাভের যোগ্য। ডঃ সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা গদ্যের সংশোধনে বিদ্যাসাগরের প্রধান সহযোগী অক্ষয়কুমারের গদ্যরীতিকে—'সহজ সরল পরিমিত এবং প্রকাশমান' বলে উল্লেখ করেছেন।

বাঙলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব একটি শুভ সংকেত। বাঙলা গদ্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিদ্যাসাগর। কর্মী বিদ্যাসাগর শিল্পী হয়ে উঠলেন ক্রমান্বয়ে। সমাজ-প্রয়োজনে হাতে কলম তুলে নিলেন। একদিকে সংস্কার আরেকদিকে সৃষ্টি, যুগপৎ বিদ্যাসাগরের এগিয়ে চল্‌ল। বিদ্যাসাগরও 'সব্যসাচী'। ডঃ সেন মন্তব্য করেছেন—"বিদ্যাসাগরের বই প্রায় সবই পাঠ্যপুস্তক জাতীয়।" কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও বিদ্যাসাগরের আর একটি পরিচয় আছে। তাঁর প্রথম পুস্তক—'বাসুদেবচরিত' সম্বন্ধে নানা সংশয় ও সমস্যা রয়েছে। সম্ভবত গ্রন্থটি তাঁর পুরোপুরি নিজের রচনা নয়। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) গ্রন্থটি পাঠ্যপুস্তক হিসেবেই রচিত। এর পরে লেখা গ্রন্থগুলি অধিক উল্লেখের দাবী রাখে। এগুলির অধিকাংশই অনুবাদ। 'শকুন্তলা' (১৮৫৪) কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌', 'সীতার বনবাস' (১৮৬০) বাল্মীকি রামায়ণের উত্তর কাণ্ড এবং ভবভূতির 'উত্তর চরিত', 'ভ্রান্তিবিলাস' (১৮৬৯), সেক্‌স্‌পীয়রের Comedy of Errors, 'বাঙলার ইতিহাস,' (১৮৪৮) মার্শম্যানের 'History of Bengal' 'জীবনচরিত' (১৮৪৯), ও' বোধোদয়' (১৮৫১) চেম্বার্সের Biographies ও Rudiments of knowledge, এবং কথামালা (১৮৫৬) ঈশপের ফেবল্‌স্‌ অবলম্বনে রচিত। কিন্তু অনুবাদ হলেও বিদ্যাসাগর সাহিত্য-সৃষ্টিতেই এসব স্থলেও স্বীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। মূলের পরিবর্তন, পরিবর্জন করে বাঙলা সাহিত্য ও ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে গ্রন্থগুলিকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনাগুলিকে পৃথক করে দেখিয়েছেন ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এ শ্রেণীতে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় যে গ্রন্থগুলি স্থান দিয়েছেন সেগুলি হচ্ছে—

(ক) 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩),
(খ) 'বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫ ২ খণ্ড),
(গ) 'বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭১, ৭৩),
(ঘ) 'বিদ্যাসাগর-চরিত' (১৮৯১), ও
(ঙ) প্রভাবতী সম্ভাষণ (১৮৬৩ সম্ভবত)।

প্রথম তিনটি গ্রন্থে—বিদ্যাসাগর মনন-প্রধান গদ্যরীতি অবলম্বন করেছেন। তীক্ষ্ণ তর্কের জটিল জাল, বিচারবিশ্লেষণ এখানকার প্রধান কথা। ভাষাও তথ্যভিত্তিক। কিন্তু পরের গ্রন্থদুটিতে বিদ্যাসাগরের রসিকমনের পরিচয় মেলে। হাস্য-পরিহাস, রঙ্গ-রসিকতা বিদ্যাসাগর জীবনচরিতের দুর্লভ সম্পদ। উদ্দেশ্যবিমুক্ত বিদ্যাসাগরের কলম কিভাবে কথার পর কথার ফুল ফোটাতে পারে তার পরিচয় আলোচ্য গ্রন্থটিতে। ভঙ্গী-এখানে বিশ্লেষণের উপলবন্ধুর পথ পরিত্যাগ করেছে। মনখুলে এখানে বিদ্যাসাগর কথা বলেছেন। রচনারীতিতে সেই প্রসন্ন মেজাজ মুদ্রিত। 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'—একটি করুণ মৃত্যু—এর রচনার প্রেরণা। প্রাজ্ঞ বিদ্যাসাগরের অন্তরালে তাঁর স্নেহকাতর প্রাণটি আপনাকে উৎসারিত করে দিয়েছে এ রচনায়। এসব রচনায় বিদ্যাসাগর প্রকৃত শিল্পী। শিল্পীর ব্যক্তিত্বকে এসব জায়গা থেকে সহজে উদ্ধার করা যায়।

করিয়া তুলিয়া ছিলেন। বঙ্কিমকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্গদর্শন গোষ্ঠীতে যে প্রাবন্ধিকদলের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল তাঁহারা রবীন্দ্র পূর্বযুগের যথার্থ প্রতিভূ।

বঙ্গদর্শন গোষ্ঠীতে প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ রায়, রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি সুলেখকগণ ছিলেন। প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায় পুরাতাত্ত্বিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী পর্যালোচনা করিতেন। রামদাস সেন ইতিহাস চর্চায় পারদর্শী ছিলেন। ইঁহাদের রচনা ছিল বিষয়গৌরবে সমৃদ্ধ। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও প্রধানতঃ এই পথের পথিক ছিলেন। কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র সরকার সমাজসমালোচনা, সনাতনী, রূপকরহস্য, গগনপট্টয়া প্রভৃতি প্রবন্ধে তথ্যবহুলতার মধ্যে ব্যক্তিত্বের স্পর্শে রসসঞ্চার করিয়া রচনাকে সুখপাঠ্য করিয়াছিলেন। বঙ্কিমোত্তর যুগে চন্দ্রনাথ বসু ত্রিধারা প্রবন্ধ পুস্তকে এবং চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' নামক গদ্যকাব্যে যুক্তি ও তথ্যকে অকিঞ্চিৎকর করিয়া অনুভূতি রসকেই প্রধান উপজীব্য করিয়াছিলেন। জ্ঞানমূলক প্রবন্ধকে রসমূলক রচনা করিয়া তুলিবার একটি প্রয়াস রবীন্দ্র-পূর্ব যুগেই সূচিত হইয়াছিল।

ঢাকার 'বান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রাবন্ধিক রূপে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। প্রভাত চিন্তা, নিশীথ চিন্তা, নিভৃত চিন্তা প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে তিনি আবেগ ও উচ্ছ্বাসময় অথচ মননশীল প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। তবে চিন্তামূলকতা ও তথ্যসমৃদ্ধিকেই এই যুগে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ গুণ মনে করা হইত। লেখকেরা রচনা-রস-সম্ভোগ অপেক্ষা বিষয়বস্তুর গৌরব দ্বারাই প্রবন্ধ সাহিত্যের বিশিষ্টতা সম্পাদন করিতেন। রাজেশ্বর পাঁড়ের লেখা মানব তত্ত্ব ও ধর্মবিজ্ঞান, পূর্ণচন্দ্র বসুর লেখা সাহিত্যচিন্তা, কাব্যচিন্তা, সমাজতত্ত্ব, সৃষ্টিবিজ্ঞান প্রভৃতি, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা তত্ত্ববিদ্যা, নানাচিন্তা, প্রবন্ধমালা প্রভৃতি রচনা এবং কেশবচন্দ্র সেনের ও স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম ও সমাজচিন্তামূলক প্রচুর প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী বাঙালী মনীষার উৎকৃষ্ট পরিচয় এবং রচনাশিল্পের দিক হইতেও সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

প্রবন্ধ রচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেরূপ প্রকাশকলা-নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, যে-ভাবে রচনাকে কাব্যশ্রীমণ্ডিত করিয়াছেন তাহা একমাত্র রবীন্দ্রনাথেরই বিশেষত্ব। প্রাক্ রবীন্দ্রযুগে এই জাতীয় রচনার সুষমা ও সৌন্দর্য অন্য কোন প্রাবন্ধিকের রচনায় পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই।

প্রশ্ন ১৭। বাঙলা উপন্যাসের সূচনা ও কালান্তর নিয়ে একটি তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধ রচনা কর।

বাঙলা উপন্যাসের সূচনা প্যারী চাঁদ মিত্র (ছদ্মনাম টেকচাঁদ ঠাকুর) রচিত 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) থেকে। তার পূর্বে হ্যানা ক্যাথারিন ম্যুলেন্স রচিত 'করুণা ও ফুলমণি' ইতিহাসের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। 'আলালের ঘরের দুলালে' ডঃ সুকুমার সেনের ভাষায় 'প্যারীচাঁদের রসদৃষ্টির পরিচয় আছে।' শিল্পরীতিগত ত্রুটির জন্য কেউ

একে 'চিত্রোপন্যাস' বল্‌তে চেয়েছেন। কেউ খুঁজে বের করেছেন আরও অনেক ত্রুটি। যেমন—(ক) এর প্লট খাপছাড়া (খ) মূলকাহিনী অবান্তর ঘটনায় আচ্ছন্ন (গ) চরিত্রগুলি অপরিণত এবং কখনও অবহেলিত (ঘ) প্রণয় রসের একান্তই অভাব। পূর্ণাঙ্গতার অভাব সত্ত্বেও প্যারীচাঁদের উপন্যাস এক সময়ে বাঙালীর রসপিপাসা চরিতার্থ করেছিল। উপন্যাসের নায়ক মতিলালের সুমতিভ্রষ্টতা এবং সৎপথে ফিরে আসার কাহিনীই উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন। মতিলাল খুব জীবন্ত নয়। কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলালের' ঠকচাচার নাম কে না জানে? ঠকচাচা জীবন্ত মানুষ এবং জীবন্ত চরিত্র। এটর্নি বাট্‌লর, বাঞ্ছারাম্ মাষ্টার এবং বক্রেশ্বর বাবুর চরিত্রও হৃদয়গ্রাহী। কাহিনী অবিচ্ছিন্নতা ছাড়াও এ উপন্যাসে লেখকের জীবনদর্শনের স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেনি। উপন্যাসের যাত্রাপথে প্যারীচাঁদের নাম শ্রদ্ধার সংগে স্মরণীয়। Dr. S. K. Dey বলেছেন যে বাঙালীকে কথাসাহিত্যের রসাস্বাদ দিয়েছিলেন— 'deriving his stories from the actual life of people' :—যারা স্বরূপত বাঙালী।

প্যারীচাঁদের অব্যবহিত পরের উপন্যাসকার ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭—৯৫)। ভূদেব তাঁর 'সফল স্বপ্ন' এবং 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' রচনা করে ঔপন্যাসিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' উপন্যাসে ভূদেবের ইতিহাস-প্রীতি এবং ইতিহাসকে উপন্যাসের পরিসরে আনার প্রচেষ্টা একই সংগে উদাহৃত হয়েছে। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ের' নায়ক শিবাজী। হৃদয় দ্বন্দ্বের পরিচয় স্থানে স্থানে আছে। কাহিনী বিচ্ছিন্নতা একেবারে নেই এ উপন্যাসে, তা বলা যায় না। তাছাড়া উপন্যাসের বিশিষ্ট রীতিও ভূদেবের সম্পূর্ণ অধিকারে ছিল না। এসকল কারণে ভূদেব সফলতার স্পষ্ট চিহ্ন রেখে যেতে পারেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্র

বাঙলা কথাসাহিত্যের উন্মুক্ত উদার প্রাঙ্গণে বঙ্কিমের আবির্ভাব যথার্থ স্রষ্টার স্বরূপে বঙ্কিম-কথাসাহিত্যের অনন্য সাধারণতা তাঁর উচ্চ-মননে, সচেতন শিল্প-প্রজ্ঞায় এবং নানা সারস্বত অনুশীলনে। তাই বঙ্কিমের উপন্যাস অদ্যাবধি যে কোন শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিকের রচনার সংগে তুলনীয়। বঙ্কিমের ইংরেজীতে লেখা 'Rajmohan's wife' খুব উল্লেখ্য নয়। কিন্তু দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯) প্রথমে রচিত ত্রয়ী হলেও এদের স্বতন্ত্র ভূমিকা আছে। উপন্যাসত্রয়ের প্রধান ত্রুটি দ্বন্দ্বহীনতা। প্রেমের ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ কোন সমস্যাই এখানে দেখান হয় নি। বরং প্রেমের গতি একরোখা। 'দুর্গেশনন্দিনীতে' 'তিলোত্তমা' অস্ফুটবাক্ অনতিরূঢ় যৌবনা-ডঃ সুকুমার সেনের ভাষায়—বাঙ্গালী 'তরুণী নায়িকার প্রতিনিধি।' 'কপালকুণ্ডলায়', দুর্গেশনন্দিনীর মতো রোমান্সপ্রাধান্য। কপালকুণ্ডলা দ্বন্দ্বহীন। বরং মতিবিবির চরিত্র অধিক জীবন্ত। 'মৃণালিনী' সংহতিবিহীন খণ্ডচিত্র উপন্যাস। গঠনের দিক থেকে এ উপন্যাস পরিপাটিবর্জিত—রচনা ভঙ্গীতে শিথিল।

১৮৭২ সাল বাঙলা উপন্যাসের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায়। এখান থেকেই বাঙলা উপন্যাসের যুগান্তরের পথযাত্রা। বঙ্কিমচন্দ্র পরিণত সাহিত্য শিল্পী। বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প-অভিজ্ঞান 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭২-৭৩) প্রকাশিত হল। 'বিষবৃক্ষের' প্রধান কথা 'বৃত্তি-নিচয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলন'। তার অভাবে অশান্তি। বঙ্কিম ত্রি-কোটিক প্রেম সমস্যার ভিতর দিয়ে প্রবৃত্তি প্রভাবের বিষময় ফল দেখালেন। উপন্যাসটি আকারে তন্বী। সংহত, সংযত, লেখকের জীবনদর্শনে উদ্ভাসিত। 'বিষবৃক্ষ'কে উপন্যাসের পরিণত শিল্পাঙ্গিকে প্রায়শঃ ত্রুটিবিমুক্ত মনে হবে। নগেন্দ্র সূর্যমুখী জীবন্ত নয়—যেমন জীবন্ত কুন্দনন্দিনী। উপন্যাসের সমস্ত ট্র্যাজিক পরিণামের রমণীয়তা তাকে নিয়ে। পার্শ্বচরিত্র হিসেবে দেবেন্দ্র স্পষ্টোজ্জ্বল। হীরা বঙ্কিম সাহিত্যের অন্যত্র প্রায় দুর্লভ। উপন্যাসকার এখানে পরিপক্ক শিল্পী। তাঁর তুলির টানে দ্রঢিষ্ঠতা। বঙ্কিমচন্দ্রের এ শ্রেণীর আর একখানি উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) বিষবৃক্ষের মত অত পরিণত শিল্পাঙ্গিকের নয়। কিন্তু 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' একই শ্রেণীতে স্থানলাভের যোগ্য। কৃষ্ণকান্তের উইলই কাহিনীর বীজ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু বঙ্কিমের দৃষ্টি মানবজীবনের বিষামৃত মাধবীর রূপায়ণের দিকে। রোহিণীর জীবনের পরিণতিতে তা দেখান হয়েছে। প্রেমের দ্বন্দ্ব এসেছে এখানে অভিমান থেকে। নায়ক গোবিন্দলাল মোটামুটি ব্যক্তিত্ব-বর্জিত নয়। ভ্রমর চরিত্র মধুর। বিধবার অবৈধ প্রণয়লিপ্সার অকল্যাণকর পরিণতি দেখান হয়েছে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'। কিন্তু বঙ্কিম এখানে নীতিবাদী নন। মানবজীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণই এখানকার প্রধান কথা। 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উভয়ই মানবজীবনের গভীর ট্র্যাজেডী।

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসপ্রীতি এবং কলাকুশলতার পরিচয় তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসেও। এই শ্রেণীর তাঁর তিনখানি উপন্যাস—'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), 'রাজসিংহ' (১৮৭৮) এবং সীতারাম' (১৮৮৭)। 'চন্দ্রশেখরের' কাহিনীবিন্যাস মীরকাশিম ও ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় পরিকল্পিত। কিন্তু মূল কাহিনী একেবারেই কল্পিত। শৈবলিনী-প্রতাপ এবং চন্দ্রশেখর এই তিন প্রত্যন্ত বিন্দুর মধ্যে নায়ক চন্দ্রশেখর অপেক্ষা প্রতাপ ও শৈবলিনী অধিক জীবন্ত। ইতিহাসের অপ্রাধান্য এবং রোমান্স-সুলভতা চন্দ্রশেখর উপন্যাসে কাহিনীর প্রধান ত্রুটি।

বঙ্কিম-রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ পরিচয় 'রাজসিংহ'। উপন্যাস এবং ইতিহাসকে পরস্পর সাপেক্ষ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে। কিন্তু ইতিহাসের মানুষ এখানে চিরন্তন পৃথিবীর মানুষ হয়ে দেখা দিয়েছে। আরংজেব ইতিহাসের লোক থেকে চিরন্তন মানবলোকে জন্ম পরিগ্রহ করেছেন। জেবুন্নিসা সম্রাটনন্দিনী। ব্যর্থ প্রণয়ে পরিশেষে ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়েছেন।

এ উপন্যাসের কাহিনীভাগে প্রচণ্ড গতির কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। সমালোচকদের মতে 'রাজসিংহ' বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ইতিহাসের চেয়ে নিত্য সচল মানবজীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতই উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন। উপন্যাসে বঙ্কিম ইতিহাস-রসের সঞ্চার করে আমাদের 'চিত্ত বিস্ফারক দূরত্ব' সৃষ্টি করেছেন সুদূর অতীতের সঙ্গে। সেকস-

পীয়রের মতোই (Boas কথিত) to select and fabricate পন্থা অবলম্বন করে মৃত অতীতের বুকে জীবন সঞ্চার করেছেন। মানবজীবনের চিরন্তন কথা হয়েছে এর প্রধান অবলম্বন। 'সীতারাম' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের দীপ্তি ম্লান। রূপমোহে ব্যক্তিচরিত্রের পতনের কাহিনী 'সীতারামের' মূল উপজীব্য। বঙ্কিম এ উপন্যাসে অনুশীলন তত্ত্বকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' (১৮৮৪) এবং 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৫) উপন্যাসদ্বয়কে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'তত্ত্ব এবং দেশাত্মবোধক' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমোক্ত উপন্যাসটিকে 'দেশাত্মবোধের মহাকাব্য' বলেছেন। 'আনন্দ-মঠের' শিল্পকলাগত ত্রুটি কম নয়। কাহিনীতে সংযম নেই। শান্তি, ভবানন্দ ভিন্ন প্রায় চরিত্রই অপরিস্ফুট। 'দেবী চৌধুরাণী'র কাহিনী-বয়নে এ ধরনের দুর্বলতা নেই। কিন্তু চরিত্র-সৃষ্টিতে বঙ্কিম বৃহত্তর আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ করতে গিয়ে নানা ক্ষেত্রে কিছু কিছু দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছেন। আলোচ্য উপন্যাসেও অনুশীলন তত্ত্বের প্রাধান্য। এজন্য চরিত্রে মাঝে মাঝে অসংগতি ধরা পড়েছে। শিল্প হিসেবে দুটি উপন্যাসের কোনটিই বঙ্কিম প্রতিভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নয়। অথচ দেশাত্মবোধের উপন্যাস হিসেবে এদের তুলনা বিরল।

রমেশচন্দ্র দত্ত

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক কৃতী ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)। বঙ্কিমের অনুপ্রেরণাতেই রমেশচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের সূত্রপাত। রমেশচন্দ্রের উপন্যাস দু'ভাগে বিভক্ত—ঐতিহাসিক এবং সামাজিক ও গার্হস্থ্য উপন্যাস। ঐতিহাসিক উপন্যাস 'মাধবীকঙ্কণ' (১৮৭৭), 'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪), 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' (১৮৭৮), ও 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' (১৮৮৯)। প্রথম দুখানিতে রোমান্সের প্রাধান্য। এর ভেতর—প্রথম উপন্যাসখানিতে মানবজীবনের করুণ পরিণতি সম্পর্কে লেখক সজাগ হয়েছেন।

'জীবনপ্রভাত' এবং 'জীবনসন্ধ্যা'ই ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে শ্রেষ্ঠ। ইতিহাসের তথ্যগত দিক থেকে এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়েও লেখক বেশী সচেতন। ইতিহাসের জগতের যুদ্ধ সংঘর্ষ, ঘাত-প্রতিঘাত, ষড়যন্ত্র, ক্রূরতা, নিষ্ঠুরতা প্রাধান্য পেয়েছে এই উপন্যাস দুখানিতে। কিন্তু ইতিহাসের বস্তুগত সত্যকে উপন্যাসের বিশেষ রসের সংগে মিলিয়ে নিতে পেরেছেন রমেশচন্দ্র। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক হিসেবেই রমেশচন্দ্র প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর মর্যাদা লাভ করেছেন।

রমেশচন্দ্রের দুখানি গার্হস্থ্য উপন্যাস—'সংসার' (১৮৮৬) এবং 'সমাজ' (১৮৯৪) অত্যন্ত সাধারণ শ্রেণীর উপন্যাস। চরিত্র-চিত্রণে কিংবা কাহিনী-বিন্যাসে কোন স্বাতন্ত্র্য নেই, তবে সমাজ সম্বন্ধে প্রগতিমূলক মনোভাবের পরিচয় আছে।

বঙ্কিমযুগের ঔপন্যাসিক

এ যুগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য উপন্যাসকার সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-'৮৯)। সঞ্জীবচন্দ্রের প্রধান রচনা 'পালামৌ' (১২৮৭-'৮৯)। অন্যান্য রচনার মধ্যে 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' (১৮৭৭), 'কণ্ঠমালা' (১৮৭৭) এবং 'মাধবীলতা' (১৮৮৫)। 'পালামৌ' ভ্রমণ কাহিনী হিসেবে অনবদ্য। কবিত্ব, দার্শনিকতা, মননশীলতা সঞ্জীবের ছিল। কিন্তু তাঁর প্রধান ত্রুটি উপন্যাসের ভিতর মাঝে মাঝে প্রবন্ধের রীতি উপন্যাসের শিল্পগুণের হানি ঘটিয়েছে। অতিরিক্ত কবিত্ব চরিত্র-বিশ্লেষণের পথ থেকে সঞ্জীবকে দূরে রেখেছে। অন্যান্য উপন্যাসগুলিও অনুরূপ কারণে সফল রচনা নয়। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সঞ্জীবের প্রতিভার কথা বলেছেন এবং রাজৈশ্বর্যের অধিকারী সঞ্জীবের বাংলা সাহিত্যকে মুষ্টিভিক্ষা দানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। এ যুগের আর দু'জন ঔপন্যাসিক—প্রতাপচন্দ্র ঘোষ এবং তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১)। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ রচনা করেন—'বঙ্গাধিপ পরাজয়' (১৮৬৯ ও ১৮৮৪)। এই ঐতিহাসিক উপন্যাসখানি প্রতাপাদিত্যের জীবনচিত্র অবলম্বনে রচিত। 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪) তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের গার্হস্থ্য উপন্যাস। স্বর্ণলতার শিল্পকৌশল পরিণত নয়। কাহিনী বা চরিত্রে কোন নতুনত্ব নেই।

রবীন্দ্রনাথ

বাংলা কথা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব স্বতন্ত্র শিল্পচেতনা নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ এজন্য একাই একটি পৃথক যুগ। প্রথম জীবনের দুখানি উপন্যাস—'বউঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩) এবং 'রাজর্ষি' (১৮৮৭) ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব জীবনদৃষ্টি এতে স্থানলাভ করেনি। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর অনুসরণে বলা যায় রবীন্দ্রনাথ এ পর্বে বঙ্কিমের ক্ষেত্রে ফসল ফলিয়েছেন। ইতিহাসের ক্ষেত্র রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব নয়।

রবীন্দ্রনাথের দ্বন্দ্বমূলক উপন্যাস 'চোখের বালি' (১৯০৩)। 'চোখের বালি'-তেই রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্যাসের নতুনত্বের ইংগিত দিলেন। সে ইংগিত হল চরিত্র-প্রাধান্যে। রবীন্দ্রনাথ বললেন—উপন্যাস রচনার উদ্দেশ্য ঘটনা-পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়—বিশ্লেষণ করে চরিত্রের আঁতের কথা বের করে দেখানো। 'চোখের বালি'তে সেই রীতিই আত্মপ্রকাশ করল। চরিত্রের অস্তিত্বের সমস্যা প্রধান হয়ে ধরা পড়ল। বিহারী-মহেন্দ্র বিনোদিনী-আশাকে নিয়ে সেই সমস্যা। বিনোদিনী চোখের বালি। র[illegible]াথের পরিণত শিল্প-সন্দর্শনের এখান থেকেই সূচনা। 'চোখের বালি'র পরে 'নৌকা[illegible]বি', (১৯০৬) রচনা করে রবীন্দ্রনাথ একটু পিছিয়ে পড়লেন। ঘটনা ও চরিত্র সবই এখানে তরল বিন্যাস, বর্ণনাভঙ্গিও শিথিল। নৌকাডুবি'র প্রব্রের উপন্যাস মহা[illegible]ব্যোপম 'গোরা' (১৯১০)। গোরা সমসাময়িক আন্দোলন নিয়ে রচিত কিন্তু [illegible]প্রতিভার পরিপক্ব ফসল এ নয়।

'ঘরে বাইরে' (১৯১৫) এবং 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) রবীন্দ্র শিল্প রীতির অন্য অভিজ্ঞান বহন করে এনেছে। বিমলা নিখিলেশ সন্দীপকে অবলম্বন করে নিবৃত্তি এবং প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বের কথা বলা হয়েছে। নিবৃত্তি সত্ত্বেও নিখিলেশ নির্জীব নয়—তার প্রাণের উত্তাপ অনুভব করা যায়। 'চতুরঙ্গে' যুদ্ধোত্তর কালের আদর্শসন্ধানী যুবক শচীশ 'শ্রাবণ মেঘের' ভিতরের 'দামিনীর' প্রেম প্রত্যাখ্যান করে অগ্রসর হয়েছে। একের পর এক ছক ভেঙে শচীন এগিয়েছে। জীবনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার আবর্ত-সংকুল পথ সোপানের পর সোপান অতিক্রম করতে হয়েছে শচীশকে। দামিনীও জীবন দিয়ে জীবন লাভ করেছে। এ উপন্যাস রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বের সেরা ঔপন্যাসিকদের পাশে স্থান করে দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' (১৯২৯), 'শেষের কবিতা' ১৯২৯), 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) পরপর আত্মপ্রকাশ করে। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে নববিত্তশালী মধুসূদনের সংগে পুরনো বিত্ত এবং আভিজাত্যের প্রতিনিধি বিপ্রদাসের দ্বন্দ্ব। কুমুর কোমল প্রেম ক্ষতবিক্ষত হয়েছে এই প্রত্যাঘাতে। শেষের কবিতায় সীমিত প্রেম এবং উদার বিশ্বলোকে প্রতিফলিত প্রেমের কথা। অমিত রায় লাবণ্য এবং কেতকীকে অবলম্বন করে এই তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। 'চার অধ্যায়ের' গঠন-কৌশলের সংগে 'চতুরঙ্গে'র গঠন-কৌশল তুলনীয়। উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাসের প্রচলিত রীতি লঙ্ঘিত হয়েছে উভয় ক্ষেত্রে। কিন্তু চতুরঙ্গের কাহিনীতে যে সংযম সংহতি আছে—তার একান্ত অভাব চার অধ্যায়ের কাহিনী ও উপকাহিনীতে। 'চার অধ্যায়ে' এলা-অতীনের ব্যর্থ প্রেম অগ্নিরেখায় মুখব্যাদান করে আছে। রবীন্দ্রনাথের শেষ দুখানি উপন্যাস 'দুই বোন' (১৯৩৩) এবং 'মালঞ্চ' (১৯৩৪)। নারীর জননী এবং প্রিয়ারূপ প্রথম উপন্যাসের উপজীব্য। দ্বিতীয়খানিতে নারজা-সরলা-আদিত্য সংঘাতমুখর প্রেম পরিশেষে মহৎ ট্র্যাজেডির পর্যায়ে পৌঁছেছে। পরিবেশ কি করে চরিত্রকে বদলে দেয়—চরিত্রের অবচেতনার রহস্যপর্বতগাত্রে শিলালেখে উৎকীর্ণ করে রবীন্দ্রনাথ তা দেখিয়েছেন। ঔপন্যাসিক হিসেবে দুর্লভ সিদ্ধির অধিকারী হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। নিজেকে স্থাপন করেছেন ডস্টয়ভস্কি, উল্ফ এবং জেম্স্ জয়েসের পাশাপাশি।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)। প্রভাতকুমারের উপন্যাস সংখ্যা চতুর্দশ। এদের ভিতর প্রধান কয়েকখানি 'রমাসুন্দরী' (১৯০৮), 'নবীন সন্ন্যাসী' (১৯১২), 'রত্নদীপ' (১৯১৫), 'জীবনের মূল্য' (১৯১৭) এবং 'সিঁদুর কৌটা' (১৯১৯)। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে "তিনি প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক নহেন।" প্রভাতকুমার জীবনের উপরিতলের কথাই বলেছেন। 'রমাসুন্দরী'তে রমাসুন্দরী পুরুষসুলভ। নবগোপাল প্রায় নিষ্প্রভ। উপন্যাসের রস হারিয়ে গেছে বাইরের বর্ণনায়। 'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসখানি—চিত্তাকর্ষক এবং সুখপাঠ্য। গদাই পাল প্রধান আকর্ষণ। নানা শ্রেণীর শঠ প্রবঞ্চক চরিত্র এসেছে এ উপন্যাসে। তাদের ভূমিকাও কৌতুককর। অথচ প্রভাতকুমারের অন্যান্য উপন্যাসে এ ধরনের চরিত্রও একমুখী। সাধারণ ভাবে ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য করা যায়—

(ক) গভীর তত্ত্বালোচনা এবং বিশ্লেষণ প্রভাতকুমারের উপন্যাসে দুর্লভ।
(খ) ঘটনার প্রাধান্য—চরিত্র গৌণ।
(গ) উপন্যাসের গভীরতা ও চিন্তার সূক্ষ্মতার অভাব।
(ঘ) চরিত্র প্রাণস্পন্দনহীন—আদর্শ অভিমুখী।
(ঙ) প্রণয়চিত্রে আবেগ গভীরতা বা আবিলতা নেই।
(চ) হৃদয়ের গহন তলদেশমথিত অমৃত বা বিষ নেই।
(ছ) খল চরিত্রও অবিমিশ্র দুষ্ট নয়।

প্রভাতকুমার ঔপন্যাসিক হিসেবে যতখানি জনপ্রিয়, শিল্পপ্রত্যয় তত গভীর নয়। এখানেই প্রভাতকুমারের ঔপন্যাসিক প্রতিভার পরিসীমা।

বাঙলা উপন্যাসে আর একজন কৃতী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)। শরৎচন্দ্র নতুন 'আলো' পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' থেকে। 'চোখের বালির' প্রকাশরীতি এবং ভাবভঙ্গী শরৎচন্দ্রের সামনে বিস্ময়ের দ্বার খুলে দিয়েছিল। শরৎচন্দ্র বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক। সাধারণ মানুষের কথা তাঁর উপন্যাসেই প্রথম সার্থক রূপ পরিগ্রহ করল। এমিল জোলা প্রমুখ ঔপন্যাসিকদের মতো সমাজের প্রচলিত বাঁধা পথের বন্ধন তিনি কাটালেন। মানুষের প্রেম ভালোবাসার ক্ষেত্রে নতুন যুগের জীবনদৃষ্টির উদ্বোধন ঘটালেন।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিবৃত করেছেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তার ভিতর প্রধান কয়েকটি বিভাগ—

(১) পারিবারিক প্রেম সমন্বিত হাল্কা রোমান্স—'দত্তা' 'দেনাপাওনা' (১৯২৩)।
(২) জটিল সমস্যামূলক সমাজ বিধিবহির্ভূত প্রেমের উপন্যাস—'গৃহদাহ' (১৯২০)। 'চরিত্রহীন' (১৯১৭)।
(৩) ভ্রমণ কাহিনী এবং আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস—'শ্রীকান্ত' (১৯১৭, '১৮, '২৭, '৩৩)।
(৪) দেশপ্রেম ও উদ্দীপনামূলক উপন্যাস—'পথের দাবী'।
(৫) গভীর দার্শনিকতত্ত্বসমন্বিত উপন্যাস—'শেষপ্রশ্ন' (১৯৩১)।
(৬) সমাজসমস্যামূলক উপন্যাস—'অরক্ষণীয়া', 'পল্লীসমাজ'।

'দত্তা' এবং 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে জীবনের কোন গভীর তত্ত্ব প্রকাশিত হয়নি। প্রেমসমস্যাও তীব্র ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়নি। সুলভ মিলনে কাহিনী পরিণতি লাভ করেছে। শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে 'শ্রীকান্তে'র নাম কেউ কেউ করেছেন। চারখণ্ডে সমাপ্ত উপন্যাসের বিপুল কাহিনীপরিসরে শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর প্রণয় বিভিন্ন বিরুদ্ধ প্রতিবেশের সম্মুখীন হয়েছে। অজস্র কাহিনী যেমন সুষম বিন্যস্ত তেমনি চরিত্রও ভিড়ে হারিয়ে যায়নি।

'গৃহদাহ' এবং 'চরিত্রহীন' উপন্যাসদ্বয়ে শরৎচন্দ্র মানব জীবনের গভীর দার্শনিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। 'গৃহদাহ' উপন্যাসে মহিম এবং সুরেশের দুইকেন্দ্রে অচলার আকর্ষণ—

মানব-চরিত্রের আলো-আঁধারি রহস্য শরৎচন্দ্র প্রতিফলিত করেছেন। চরিত্রেরা প্রাণবন্ত। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে প্রথাপ্রধান সমাজের সামনে শরৎচন্দ্রের প্রশ্ন—চরিত্রহীন কে ?

প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার রীতিনীতিতে প্রেমের নৈষ্ঠিকতা বিচার করা যায় না—একথা স্পষ্ট প্রতিভাত 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে। সতীশ সাবিত্রীর প্রণয় সঞ্চারে শরৎচন্দ্র যুগান্তের কুসংস্কার ভাঙ্‌তে চেয়েছেন। 'পথেরদাবী'তে অপূর্ব-ভারতীর প্রেম—রাজনৈতিক নানা উত্তেজিত আবহাওয়ার ভিতর নরনারীর সুখদুঃখ বিরহ-মিলনের প্রসংগ অভিব্যক্ত। শেষপ্রশ্নের কমলের তীব্র তীক্ষ্ণ মন্তব্যগুলি প্রচলিত দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে সংশয় জাগিয়েছে। সব কথা মনে রেখেও একথা বলা যায়—শরৎচন্দ্র সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। কিন্তু একমাত্র জনপ্রিয়তাই কোন শিল্পীর শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাপক নয়। তাই আধুনিককালে শরৎচন্দ্রের নানামুখী শিল্প-সমালোচনা মুখর হয়ে উঠেছে।

এর পরবর্তী ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা আধুনিক ঔপন্যাসিক। তারাশঙ্করের 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'ধাত্রীদেবতা', 'কবি', 'আরোগ্য নিকেতন' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'দেবযান'—এর ভেতর প্রথম দুখানি নতুন ধরণের উপন্যাস। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', 'দিবারাত্রির কাব্য' প্রভৃতি উপন্যাস অভিনব। এঁদের পরবর্তী ঔপন্যাসিক অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। আধুনিক জীবনের নানা সমস্যা এঁদের উপন্যাসে রূপলাভ করেছে। প্রমথনাথ বিশী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—এঁরা এ যুগের খ্যাতিমান কথাশিল্পী। প্রমথনাথ বিশীর 'লালকেল্লা', 'জোড়াদিঘীর চৌধুরী পরিবার' এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বারোঘর এক উঠোন', 'অমাবস্যার গান' উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। মোটামুটি আধুনিক যুগে কথা-সাহিত্যের জয় জয়কার। নানা ধরণের সমস্যা এবং তাদের রূপায়ণে বাংলা উপন্যাসের প্রশস্ত ক্ষেত্র এখন থেকে ক্রম বিস্তৃত হতে থাকবে।

প্রশ্ন ১৮। বঙ্কিমযুগের (১৮৬৫-৯৪) মুখ্য ঔপন্যাসিকদের সাহিত্য-কৃতীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (ক. বি. ১৯৬০)

উত্তর। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক কালে কয়েকজন ঔপন্যাসিক মুখ্যতঃ সাহিত্যিক প্রেরণায় উদ্বোধিত হয়ে উপন্যাস সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সকলের রচনা শিল্পগুণে উচ্চমানের পরিচয় না দিলেও সাহিত্যভাণ্ডারে মূল্যবান সম্পদ বলেই গণ্য। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৫ সালে প্রথম উপন্যাস রচনা করেন। তার-পর জীবনের প্রায় শেষ পর্যায় পর্যন্ত উপন্যাস রচনা শিল্পেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৮৯৪ সালে বঙ্কিমের দেহান্ত ঘটে। তাঁর সমকালে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে সম্রাটের মত একাধিপত্য করেছিলেন। তাই তাঁর লেখনী পরিচালনার একটানা ত্রিশ বৎসর কাল 'বঙ্কিমযুগ' নামে অভিহিত করা যায়। বঙ্কিম তাঁর জীবৎকালে প্রথম ১২ বছর প্রধানতঃ উপন্যাস রচনা করেন। শেষ জীবনের সাহিত্যসাধনায় শাস্ত্রচর্চা ও ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয়

আলোচনাই প্রধান স্থান অধিকার করে। তাঁর শেষের দিকের উপন্যাস আনন্দমঠ (১৮৮৪), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) এবং সীতারাম (১৮৮৭) ধর্মতত্ত্ব দ্বারাই প্রভাবিত কাহিনী।

বঙ্কিমযুগে অর্থাৎ ১৮৬৫ থেকে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কালসীমায় শক্তিশালী কয়েকজন ঔপন্যাসিকের অভ্যুদয় ঘটেছিল। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য **রমেশচন্দ্র দত্ত** (১৮৪৮-১৯০৯)। পাণ্ডিত্যে এবং ইতিহাসজ্ঞানে রমেশচন্দ্র ছিলেন অনন্যসাধারণ। তিনি ছয়খানি উপন্যাস রচনা করেন। বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪) এবং মাধবীকঙ্কণ (১৮৭৭) রোমান্সধর্মী রচনা। ইতিহাসের স্বপ্নালোকিত পরিবেশে প্রেম ও সৌন্দর্যের রহস্যসন্ধানে কাহিনী রোমান্সরসে নিষিক্ত হয়েছে। মোগল শাসনে টোডর মলের সময়ে বাংলার ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষায় ইন্দ্রনাথ ও বিমলার প্রণয় কাহিনী নিয়ে 'বঙ্গবিজেতা' লেখা হয়েছে। মাধবীকঙ্কণের কাহিনীকাল অসুস্থ শাহজাহানের পুত্রগণের মধ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে কলহ। তার মধ্যেই ফুটে উঠেছে নরেন্দ্র, হেমলতা ও শ্রীশের প্রেমজীবনের শোকাবহ পরিণাম। রমেশচন্দ্রের যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস 'মহারাষ্ট্র' জীবনপ্রভাত (১৮৭৮) এবং 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' (১৮৮৯)। ইতিহাসের যথাযথ পটভূমিতে স্বদেশ-প্রেমের অনুভূতিকে ব্যঞ্জিত করায় উপন্যাস দুইখানি যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল। সমাজজীবন অবলম্বনেও রমেশচন্দ্র উপন্যাস লেখেন কিন্তু গভীর জীবনবোধ বা সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পরিচয় দেন নি। সংসারে (১৮৮৬) এবং সমাজে (১৮৯৪) উপন্যাসে প্রগতিমূলক মনোভাব আছে, বিধবা ও অসবর্ণ বিবাহের সমর্থন আছে কিন্তু জীবনের মর্মমূলে গভীরতর দৃষ্টির পরিচয় নেই। তথাপি রমেশচন্দ্র বঙ্কিমযুগে একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ **সঞ্জীবচন্দ্র** এবং কনিষ্ঠ **পূর্ণচন্দ্র** বঙ্কিমযুগের মুখ্য ঔপন্যাসিকদের অন্যতম। সঞ্জীব প্রতিভাবান কথাশিল্পী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভায় গৃহিনীপনার অভাব দেখেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা 'পালামৌ' ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে তিনি জাল প্রতাপচাঁদ (১৮৮৩) উপন্যাস লিখেছিলেন। বর্ধমানের রাজবাড়ীর সত্যঘটনাকে তিনি উপন্যাসকথার মত আকর্ষণীয় করেছিলেন। 'মাধবীলতা' (১৮৮৫) এবং তার উপসংহার 'কণ্ঠমালা' উপন্যাস শিথিলবিন্যস্ত কাহিনী ও রূপকথার মত রহস্যময়। জীবনধর্মী উপন্যাসের লক্ষণ কম। বরং রামেশ্বরের অদৃষ্ট (১৮৭৭) কাহিনীকৌতূহলের দিক থেকে উপভোগ্য। নিজের প্রতিভা সম্বন্ধে অবহিত না থাকায় সঞ্জীবচন্দ্র সাহিত্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারেন নি। উপন্যাস রচয়িতা-রূপে পূর্ণচন্দ্রের খ্যাতিও খুব উল্লেখযোগ্য ছিল না।

বঙ্কিমযুগে গার্হস্থ্য উপন্যাস রচনায় অসাধারণ খ্যাতিলাভ করেছিলেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১)। বাংলার গ্রামজীবনে যৌথপরিবারে ভ্রাতৃকলহের কুফল দেখিয়ে তিনি স্বর্ণলতা (১৮৭৪) নামে বাস্তবধর্মী উপন্যাস লেখেন। এর নাট্যরূপ 'সরলা' অসাধারণ মঞ্চসাফল্য অর্জন করেছিল। রোমান্টিকতা-জাত বাস্তবরসেরবি

পরিবেষণে তারকনাথের কৃতিত্ব। তাঁর লেখা 'ললিত ও সৌদামিনী' (১৮৮২), 'হরিষে বিষাদ' (১৮৮৭), তিনটি গল্প (১৮৮৯), বিধিলিপি (১৮৯১) এবং অদৃষ্ট (১৮৯২) বিশেষ কোন প্রশংসা অর্জন করেনি।

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী বঙ্কিমযুগের একজন প্রধান লেখিকা। ঐতিহাসিক রোমান্স এবং সামাজিক উপন্যাস উভয়ক্ষেত্রেই তিনি সমান পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। বঙ্কিমের মত পাণ্ডিত্য ও দার্শনিকতায় সমৃদ্ধ না হলেও অনুভূতি রসে ও রচনা-শিল্পে স্বর্ণকুমারী সাহিত্যসংসারে একটি স্থায়ী আসনের অধিকারিণী। ১৮৭৬ সালে 'দীপনির্বাণ' নামক উপন্যাসে পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তার ঐতিহাসিক কাহিনীকে তিনি যথার্থ শিল্প করে তুলেছিলেন। মিবার রাজ, বিদ্রোহ, ফুলের মালা প্রভৃতি উপন্যাসে মুসলমান শাসন আমলের ইতিহাসের মধ্যে জীবনরসের সন্ধান। কোরকে কীট, ছিন্নমুকুল, স্নেহলতা, মালতী প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি প্রতিদিনের পারিবারিক জীবনের মধ্যে মানবচিত্তের সুকুমার বৃত্তিগুলির লীলা দেখিয়েছেন, জীবনের কারুণ্য ও বেদনাকে মর্মরিত করে তুলেছেন।

বঙ্কিমযুগে খুব জমকালো ধরণে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছিলেন প্রতাপচন্দ্র ঘোষ। যশোরের প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস নিয়ে ১৮৬৯ সালে 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' নামে বৃহৎ উপন্যাস লিখেছেন। এরই দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হয়। ঘটনার আধিক্য ও ইতিহাসের অত্যধিক আনুগত্যে লেখক উচ্চ-কল্পনার পরিচয় দিতে পারেন নি। ফলে এই সুবৃহৎ উপন্যাসখানি মহৎ সাহিত্য হয়ে ওঠে নি।

আরও কয়েকজন সুলেখক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমযুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ ডিটেকটিভ বা রোমান্টিক কাহিনীরস পরিবেষণ করেছেন, কেউ বা সমাজ-সংস্কার প্রেরণায় সামাজিক চিত্রে রং ফলিয়ে ব্যঙ্গোপন্যাস রচনা করেছেন। বঙ্কিমের আত্মীয় দামোদর মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমের উপন্যাসের পরিশিষ্ট লেখেন অর্থাৎ দুর্গেশনন্দিনীর গল্পটিকে টেনে নিয়ে আয়েষাকে নায়িকা করে 'নবাবনন্দিনী' লিখলেন এবং গঙ্গাগর্ভ থেকে কপালকুণ্ডলাকে তুলে এনে 'মৃন্ময়ী' উপন্যাস লেখেন। কাহিনী-কৌতূহল অথবা শিল্প-কৌশল—দু'দিক থেকেই ব্যর্থ রচনা। তবে ইনি বিমলা, দুইভগিনী, জয়চাঁদের চিঠি, সোনার ফসল প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্যাসে ডিটেকটিভ কাহিনীর রস সৃষ্টি করেছেন। তাঁর লেখা কমলকুমারী Bride of Lamermoor এবং শুক্লবসনা সুন্দরী Woman in White ইংরাজী উপন্যাসের অনুবাদমূলক এবং উপভোগ্য কাহিনী।

হিন্দুসমাজে খ্রীষ্টয়ানী ও ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করবার জন্য বঙ্গবাসী পত্রিকা গোষ্ঠীর লেখকগণ বঙ্কিমযুগের ঐতিহাসিক বলে গণ্য। এরা সাহিত্যিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন কি না সন্দেহ। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কল্পতরু', যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'মডেল ভগিনী', 'চিনিবাস চরিতামৃত', 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী', কাঁলাচাদ প্রভৃতি ব্যঙ্গোপন্যাস সমাজে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই উপন্যাসগুলি ছিল আক্রমণাত্মক বিদ্রূপ। নির্মল কৌতুকের উপন্যাস লিখেছিলেন ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়। বঙ্কিমযুগে উপন্যাস সাহিত্যের এই ধারাটি বেশ উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছিল। সামাজিক উপন্যাসের ধারাকে

রক্ষা করেছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী এবং শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে এঁরা স্বর্ণাসন লাভ করেন নি, কিন্তু সামাজিক পরিবেশে পারিবারিক জীবনরস পরিবেষণে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন।

প্রশ্ন ১৯। "বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' এবং রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' প্রকাশের দ্বারা বাংলা উপন্যাসসাহিত্যে দুটি সম্পূর্ণ নূতন পর্ব সূচিত হয়।"—দুই পর্বের প্রধান ঔপন্যাসিকদের সাহিত্যকৃতির তুলনা করিয়া উক্তির সার্থকতা নিরূপণ কর। (ক. বি. ১৯৬৫)

অথবা, **বঙ্কিমসম্পাদিত বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ উপন্যাসের প্রকাশারম্ভ থেকে রবীন্দ্রসম্পাদিত বঙ্গদর্শনে চোখের বালি প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত যে কাল (১৮৭২-১৯০০) তাকে বলা যায় বাংলা উপন্যাসের দ্বিতীয় যুগ। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের তুলনায় এই যুগের উপন্যাস সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।**

(ক. বি. ১৯৬১)

অথবা, **"রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি'তে (১৯০৩) বাংলা উপন্যাসের যে নূতন গতিপথ নির্দেশ করেন, পরবর্তীকালের অর্ধশতাব্দী ধরিয়া অধিকাংশ প্রতিষ্ঠাবান্ ঔপন্যাসিক সেই পথ ধরিয়া চলিয়াছেন।"—এই সূত্র অবলম্বন করিয়া 'চোখের বালি'র পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের প্রকৃতি নির্ধারণ কর।** (ক. বি. ১৯৬১)

উত্তর। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাস খুব অল্পদিনের হলেও সেই ইতিহাসে অতি দ্রুত বিস্ময়কর বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছিল। এই ইতিহাস পাশ্চাত্ত্য ভঙ্গিতে রোমান্স নিয়ে আরম্ভ করে নভেলে এসে যথার্থ পথ খুঁজে পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ থেকে নভেল পর্বের সূচনা। এই যুগকে ঐতিহাসিকেরা উপন্যাস সাহিত্যের দ্বিতীয় পর্ব বলে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে বিষবৃক্ষেই প্রথম কাহিনী এসে আখ্যানে পরিণত হয়, পারিবারিক জীবনের সংকট-সমস্যা উপন্যাসের উপজীব্য হয়ে ওঠে। বিষবৃক্ষে (১৮৭৩) বঙ্কিম যে আদর্শের সূচনা করলেন তার প্রতিষ্ঠা হল রবীন্দ্রনাথের চোখের বালিতে (১৯০৩)। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রতিষ্ঠা। ঐ পত্রিকায় বিষবৃক্ষ প্রকাশিত হতে থাকলে শিক্ষিত বাঙালী পাঠকদের মধ্যে চমক সৃষ্টি হয়। বঙ্কিমের অভাবে বঙ্গদর্শন বন্ধ হয়। তারপর রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব। ঐ পত্রিকার পৃষ্ঠায় চোখের বালির আবির্ভাব পাঠক সম্প্রদায়কে নূতন সম্ভাবনায় সচকিত করে তোলে। উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে তাই এই দুই চন্দ্রসূর্যের দুখানি সামাজিক উপন্যাস দিগদর্শনী হয়ে বিরাজ করছে।

বঙ্কিম-পূর্ববর্তী এবং বঙ্কিম-পরবর্তী উপন্যাসসাহিত্যের আকৃতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দুইটি স্বতন্ত্র পর্বের সন্ধান পাওয়া যায় এবং বিষবৃক্ষ ও চোখের বালি উপন্যাস যে কি বিস্ময়কর বিবর্তন এনেছিল তা অনুধাবন করা যায়। প্রাক্ বঙ্কিমযুগে সমাজ নিয়ে উপন্যাসের খসড়া রচিত হয়েছিল। 'নববাবু বিলাস', 'ফুলমণি ও করুণা' এবং 'আলালের ঘরের দুলাল'কে যথার্থ উপন্যাস বলা হয় না। ভূদেবের 'সফল স্বপ্ন' এবং 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' থেকেই ঐতিহাসিক রোমান্সের সূচনা। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, প্রতাপ ঘোষ, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতি সকলেই ঐ পথ ধরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও 'রাজর্ষি' ও 'বৌঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসে ইতিহাসের রেখাঙ্কিত পথেই যাত্রা করেছিলেন। এই সময় সামাজিক উপন্যাস নানাপ্রকার সমাজ-সমস্যা ও পারিবারিক জীবন চিত্র নিয়ে রচিত হলেও ব্যক্তিমনের দ্বন্দ্ব-সমস্যাকে উপন্যাসের বিষয়ীভূত করা হয়নি। বিধবাবিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, প্রেমের স্বাধীনতা স্বীকার করে কিঞ্চিৎ প্রগতিমূলক মনোভাবের পরিচয় কেউ কেউ দিয়েছেন; কিন্তু ব্যক্তিমানুষের জীবনের গভীরতম প্রদেশে কেউ অবতরণ করেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম যথার্থ সামাজিক উপন্যাসে সমাজ-সাপেক্ষ ব্যক্তিত্বের প্রথম উদ্বোধন বাণী প্রকাশ করলেন। চোখের বালিতে রবীন্দ্রনাথ সমাজনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্বের পূর্ণ উদ্বোধন ঘটিয়েছেন বিনোদিনী চরিত্রে। এখান থেকেই আধুনিক উপন্যাসের জয়যাত্রার পথ রেখাঙ্কিত হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষ উপন্যাসে ব্যক্তি-মানুষের গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘটনা সন্নিবেশের নিপুণতার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যেও ব্যক্তিচরিত্রের স্বাতন্ত্র্যের দ্বন্দ্ব। কিন্তু শৈবলিনী, রোহিণী, কুন্দ, গোবিন্দলাল নগেন্দ্রনাথ প্রভৃতি চরিত্র লেখকের সমাজ-সাপেক্ষ মনোভাবের ফলে কঠোর দণ্ডের সম্মুখীন হয়েছে। সমাজনীতি, ধর্মনীতি ও ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষে বঙ্কিম নীতিনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন। ঘরে ঘরে অমৃত ফল ফলাবার স্পষ্ট অভিপ্রায় নিয়ে তিনি 'বিষবৃক্ষ' লিখেছেন। তবু 'বিষবৃক্ষ' থেকেই উপন্যাস সাহিত্যের দ্বিতীয় পর্ব সূচিত হল।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে উপন্যাস সাহিত্যের দ্বিতীয় পর্ব বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীমুখে সূচিত হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিমের অনুকরণ করেই উপন্যাসে নানা সমস্যা, সমাজ-সমস্যা, ব্যক্তিমনের দ্বন্দ্ব প্রভৃতি পাঠকমনে কৌতূহল নিবৃত্ত করেছে। নূতন পর্বের সূচনা করলেন রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর শুভ সূচনায়। বঙ্কিম-প্রতিষ্ঠিত বঙ্গদর্শন সূচনা করেছিল একটা নূতন যুগ। রবীন্দ্রনাথ-পরিচালিত নব-পর্যায় বঙ্গদর্শন সূচনা করল আর একটা নূতনতর যুগ। বঙ্কিমের বিষবৃক্ষ এবং রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে দুটি নূতন পর্বের সূচনা করল। তারপর প্রাগ আধুনিক কাল পর্যন্ত চোখের বালির গতিপথ ধরেই প্রতিভাবান সাহিত্যিকেরা বিস্ময়কর সৃষ্টির ঐশ্বর্যে উপন্যাস সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি' লিখেছিলেন ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে। বিনোদিনী নামে একটি বিধবার মধ্যে তীব্র নারীচেতনা সঞ্চার করে তিনি মানুষের আঁতের কথাকে উপন্যাসের বিষয় করে তুললেন। সমাজ ও ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বে ব্যক্তিত্ব যে কোন অংশে কম

নয়—এই নূতন চিন্তা পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে। বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনী, রোহিণী, কুন্দ, লবঙ্গলতার মধ্যে ব্যক্তিত্বের ইঙ্গিত ফুটিয়ে তুললেন। রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর মধ্যে এবং পরে চারুলতার মধ্যে সেই ব্যক্তিত্বের অভিনব বিকাশ দেখালেন। শরৎচন্দ্রের রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী, অভয়া প্রভৃতি চরিত্রে ব্যক্তিত্বের বিস্ময়কর দীপ্তি প্রকাশ পেয়েছিল। সুতরাং চোখের বালির বিনোদিনী নারীচরিত্রের নূতন তাৎপর্য নিরূপণে দিগদর্শনের কাজ করেছে। বিনোদিনী নীতিশাসিত চরিত্র নয়, উপন্যাসের সমস্যাও নীতিনির্দেশ করে না। এইভাবে সমাজনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ববিকাশকে অবলম্বন করে বিংশ শতাব্দীর উপন্যাসের যাত্রাপথ চোখের বালি থেকেই সূচিত হয়। শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে প্রথাসর্বস্ব প্রাণহীন সমাজের কঠোর সমালোচনা করেছেন, সমাজশাসনের বিরুদ্ধতাও করেছেন। মানুষের বিচিত্র মন এবং প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব নিয়ে ব্যক্তি-সমস্যাকে প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের উপন্যাসগুলিতে। উপন্যাস-সাহিত্যের এই ধারাই পরবর্তীকালে প্রধানতঃ অনুসৃত হয়। চোখের বালির পরবর্তী বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে নূতনত্ব চোখে পড়ে, জীবনবোধের নবমূল্যায়ণ উপলব্ধি করা যায়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদেই শরৎচন্দ্র মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের জীবনবোধ ও হৃদয় রহস্য নিয়ে উপন্যাস রচনায় ব্রতী হলেন। মানবহৃদয়ের বিপুল রহস্যের মধ্যে অবগাহন করে তিনি মনুষ্যপ্রকৃতির মূল স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন। তাঁর উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্র সমাজের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে সমাজের পরিচিত পরিবেশের প্রেক্ষাপটের উপরেই শুধু মানুষের প্রতিফলন হয় না। মানুষের যথার্থ পরিচয় পেতে হলে প্রাণের সহজ সংস্কার দ্বারা প্রাচীন সমাজবিধি ও ধর্মসংস্কারের পুনর্বিচার আবশ্যক।

চোখের বালির পরবর্তীযুগে উপন্যাস সাহিত্যের বিকাশে চোখের বালিরই পরোক্ষ প্রভাব ছিল। 'ভারতী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রানুসারী একদল ঔপন্যাসিক সমাজ সাপেক্ষতার মধ্যেও সমাজনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্বের অনুসন্ধান করেছিলেন। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, মণীন্দ্রলাল বসু এবং চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাস লিখে জীবনবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন। মণীন্দ্রলাল বসুর রমলা ও সহযাত্রিনী উপন্যাসে নারী-ব্যক্তিত্বের একটি দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। এই সময়ে যে মহিলা ঔপন্যাসিকেরা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তারা সমাজনিরপেক্ষতা দেখান নি বটে, কিন্তু পারিবারিক পরিবেশে ব্যক্তিমনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে প্রভূত সহানুভূতি নিয়েই চিত্রায়িত করেছিলেন। অনুরূপা দেবী, নিরুপমা এবং ইন্দিরা দেবী এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তী কালে সবুজপত্র, কালিকলম ও কল্লোল পত্রিকাগোষ্ঠীর লেখক সম্প্রদায় উপন্যাস অপেক্ষা ছোটগল্প রচনার দিকেই বেশি মনোনিবেশ করেন। তাঁদের মধ্যে যারা উপন্যাস লিখতেন তারাও রবীন্দ্রনাথ প্রদর্শিত এবং শরৎচন্দ্র কর্তৃক অবলম্বিত পথেরই উৎসাহী যাত্রী হয়েছিলেন। উপন্যাস সাহিত্যের যাত্রাপথে বঙ্কিমের বিষবৃক্ষ এবং রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি যেন পথনির্দেশক দুটি আলোকস্তম্ভ। ত্রিশ বৎসর ব্যবধান কালের মধ্যে

লেখা এই দুইখানি উপন্যাস বাংলা উপন্যাস সাহিত্যকে রহস্য কাহিনীর স্তর থেকে উন্নীত করে যথার্থ জীবনালেখ্য স্তরে তুলে দিয়েছিল।

প্রশ্ন-২৩। রমেশচন্দ্র এবং সঞ্জীবচন্দ্রের ঔপন্যাসিক রচনা প্রথম শ্রেণীর গৌরব হইতে কেন বঞ্চিত হইয়াছে তাহা বিশদভাবে আলোচনা কর। (ক. বি. ১৯৬৪)

উত্তর: রমেশচন্দ্র দত্ত এবং সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উভয়েই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সমকালীন ঔপন্যাসিক। তাঁরা প্রথম শ্রেণীর গৌরব অর্জন করতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার তুলনায় এঁদের প্রতিভা কিঞ্চিৎ ম্লান ছিল এবং এঁরা অনন্যমনা হয়ে শিল্পসাধনা করেন নি। এঁদের কৃতিত্ব কোন অংশেই উপেক্ষণীয় ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের বিস্ময়কর খ্যাতির সম্মুখেও এঁরা নির্ভয়ে সাহিত্যরচনা করেছেন এবং বঙ্কিমের পাশাপাশি আসনও পেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যখন সাহিত্যাকাশে একাধিপত্য বিস্তার করে জ্যোৎস্নার লাবণ্যে পৃথিবী উদ্ভাসিত করেছিলেন তখন অন্য জ্যোতিষ্কের পক্ষে প্রথম শ্রেণীর গৌরব অর্জন সহজসাধ্য ছিল না। তদুপরি এই দুই প্রখ্যাত শিল্পীর রচনার মর্মস্থলে কিছু কিছু আভ্যন্তরীণ ত্রুটিও ছিল।

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন চারখানি এবং দুখানি পরস্পর-সংবদ্ধ সামাজিক উপন্যাস লিখেছেন। প্রথম দুখানি উপন্যাসে ইতিহাস পরিবেশ অপেক্ষা রোমান্সের রসই বেশী, প্রেমের কাহিনীতে বাস্তবতা ও জীবনবোধের গভীরতার অভাব। বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪) উপন্যাসে তিনি টোডরমল্লের সমসাময়িক বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পরিবেশে ইন্দ্রনাথ ও বিমলার এক বিস্ময়কর প্রেমের কাহিনী বলেছেন। কিন্তু শিল্পগুণের অভাবে ঐতিহাসিকতা বা কাল্পনিকতা কোনটাই সার্থক হয়নি। মাধবীকঙ্কণের (১৮৭৭) ঐতিহাসিক পরিবেশ সাজাহানের মৃত্যুশয্যায় পুত্রগণের কলহের পটভূমি। সেখানে টেনিসনের Enoch Arden গল্পের অনুসরণে নরেন্দ্র, হেমলতা ও শ্রীশের প্রেমস্বপ্নের শোকাবহ পরিণাম প্রদর্শন করেছেন। ইতিহাসরস বা জীবনরস কোনটাই উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠেনি। তিনি রাজপুত জীবনসন্ধ্যা (১৮৮৯) এবং মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত (১৮৭৮) রচনা করে জাতীয়তাবোধ ও ইতিহাস নিষ্ঠার গভীর পরিচয় দিয়েছিলেন কিন্তু তাতে প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের জীবনবোধের গভীরতা ছিল না। ইনি দুখানি সামাজিক উপন্যাস লেখেন সংসার (১৮৮৬) এবং সমাজ (১৮৯৪) নামে। এই উপন্যাসদ্বয়ে তিনি যুগধর্মানুরূপ প্রগতিমূলক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু রচনা শিল্পসম্মত হয়নি। কাহিনীটি নিষ্প্রাণ বিবৃতিমূলক, গল্পের বাঁধুনি শিথিল, চরিত্রগুলি স্পষ্ট রেখাঙ্কিত নয়। প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর কাছে যে প্রত্যাশা রমেশচন্দ্র সে প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারেন নি।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সহোদর। ইনি রামেশ্বরের অদৃষ্ট (১৮৭৭) নামে একখানি সামাজিক উপন্যাস লিখেছিলেন। পালামৌ নামে ভ্রমণ

কাহিনী লিখে সঞ্জীব খুব খ্যাতিলাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবের প্রতিভার উজ্জ্বলতার প্রশংসা করেছেন কিন্তু গৃহিণীপনার অভাব দেখেছেন। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেও সঞ্জীব গৃহিণীপনার অভাব দেখিয়েছেন। 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' উপন্যাসের গল্পকৌতূহল চমৎকার কিন্তু রচনাশিল্পে মুন্সীয়ানা নেই। জাল প্রতাপচাঁদ (১৮৮৩) একখানি সত্যঘটনামূলক বিখ্যাত উপন্যাস। বর্ধমানের রাজবাড়ীর ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে ইনি যেমন সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি উপন্যাসসুলভ কাহিনী কৌতূহলও সৃষ্টি করেছেন। তথাপি রচনাটি প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদালাভ করতে পারেনি। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মাধবীলতা নামে উপন্যাস লেখেন। এরই পরিশিষ্টরূপে কাহিনীর জের টেনে 'কণ্ঠমালা' নামে উপন্যাস লেখা হয়। কেন্দ্রীয় চরিত্রশৈল বড় বেশি অবাস্তব হওয়ায় গোটা উপন্যাসটাই যেন অবাস্তব রহস্যে মণ্ডিত হয়েছে। উপন্যাসের কাহিনী-কৌতূহল যতই তীব্র হোক, যদি সে কাহিনী রূপকথার মত অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য মনে হয় তাহলে শিল্পরূপে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে না। সঞ্জীবচন্দ্র খুব প্রতিভাবান ছিলেন কিন্তু বড় খেয়ালী এবং উদাসীন। প্রতিভার যোগ্য অনুশীলন ও প্রয়োগ করতে না পারায় তিনি প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর গৌরবলাভ করতে পারেন নি।

প্রশ্ন ২১। উপন্যাস-সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও রীতির অভিনবত্ব স্বর্ণকুমারী দেবী, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের রচনায় কিরূপ ভাবে উদাহৃত হইয়াছে তাহা আলোচনা কর। (ক. বি. ১৯৬৭)

উত্তর। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস শিল্পের সরণি প্রস্তুত করে দেবার পর সে পথে রাজরথ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর শুভ প্রত্যূষে। কিন্তু তার পূর্বেও অনেক গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি ঐ পথ পরিক্রমা করেছিলেন। তাঁদের গতিপ্রকৃতি স্বতন্ত্র ছিল, বিষয়বস্তু ও রীতির কিঞ্চিৎ অভিনবত্ব ছিল। প্রতিভার বিদ্যুদ্দীপ্তি তাঁদের রচনায় বিস্ময়কর সৌন্দর্যে প্রকটিত না হলেও বাংলা সাহিত্যে তাঁদের দান নিতান্ত উপেক্ষণীয় ছিল না। স্বর্ণকুমারী, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় উপন্যাস ক্ষেত্রে স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে স্থায়ী কীর্তি রেখে গেছেন।

স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী। ইনি সুসাহিত্যিকা ছিলেন। ঐতিহাসিক ও সামাজিক উভয়বিধ উপন্যাস রচনায়ই তিনি সমধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রথমতঃ ঐতিহাসিক রোমান্স রচনায় মন দিলেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু স্বাধীনতার সমাপ্তির ইঙ্গিত দিয়ে দীপনির্বাণ নামক উপন্যাস লিখলেন। পৃথ্বীরাজ ও সংযুক্তার প্রণয় কাহিনীর মধ্য দিয়ে হিন্দু সাম্রাজ্যের পতনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কল্পনাশক্তি ও স্বদেশপ্রেমের সমন্বয়ে দীপনির্বাণ তৎকালে প্রশংসা অর্জন করেছিল। মিবার রাজ, ফুলের মালা এবং বিদ্রোহ উপন্যাসেও পরিবেশ রচনার কাজে

ইনি ইতিহাসকথাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইতিহাসে ও উপন্যাসে সার্থক মিলনের ফলে মৃত ইতিহাস জীবন্ত হয়ে ওঠে নি। স্বর্ণকুমারী নারীর হৃদয়বৃত্তি নিয়ে যে পারিবারিক উপন্যাসগুলি লিখেছিলেন তার আবেদন ছিল প্রাণস্পর্শী। 'কোরকে কীট' নামক উপন্যাসে বহু বিবাহেব কুফল দেখিয়েছেন। 'স্নেহলতা' উপন্যাসে পরিবারিক শান্তির মূল্য দেখাতে গিয়ে অশান্তির চিত্রটিকে করুণতম করে উপস্থিত করেছেন। উগ্র প্রগতিবাদ নারী সমাজে প্রবেশ করলে পারিবারিক জীবন কিরূপ বিপর্যস্ত হয় তার পরিচয় ফুটেছে 'স্নেহলতা' উপন্যাসে। 'ছিন্নলতা', 'মুকুল' প্রভৃতি উপন্যাসে নারীজীবনের কমনীয়তার সঙ্গে রোমন্স-রস মিশ্রিত হওয়ায় রচনায় অভিনবত্ব দেখা দিয়েছে। স্বর্ণকুমারী বিষয়বস্তু ও রীতিতে পূর্বতন পথেই যৎকিঞ্চিৎ বিশেষত্ব প্রদর্শন করেছেন।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসের বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করেছিলেন গার্হস্থ্য জীবন এবং রীতি অবলম্বন করেছিলেন বাস্তবধর্মিতা। ১৮৩৩ সালে এই ঔপন্যাসিকেব জন্ম এবং ১৮৯১ সালে তাঁর মৃত্যু। ইনি চিকিৎসকরূপে জীবিকা অর্জন কবতেন। ডাক্তারী তাঁর পেশা হলেও নেশা ছিল সাহিত্য। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্স এবং জীবনবোধেব গভীরতা পরিহার করে গ্রাম্যজীবনেব পরিবাব কেন্দ্রিক লৌকিক সমস্যাকেই উপন্যাসের বিষয়বস্তু করেছিলেন। স্বর্ণলতা (১৮৭৪) উপন্যাসখানি তঁ'র অবিস্মরণীয় কীর্তি। উপন্যাসখানির নাট্যরূপ 'সবলা' নামে অদ্ভুত অভিনয়-সাফল্য লাভ করেছিল। স্বর্ণলতার কাহিনী বড় করুণ। একান্নবর্তী পরিবাবে উপার্জনশীল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শশিভূষণ পত্নীর প্ররোচনায় সঙ্গীতপ্রিয় ভালমানুস কনিষ্ঠভ্রাতা বিধুভূষণেব প্রতি নির্মম অবিচার করায় একটা পরিবাব চরম দুর্দশায় নিপতিত হয়েছিল। স্বর্ণলতাব মত বাস্তবধর্মী পারিবারিক উপন্যাস সে যুগে আর ছিল না। তারকনাথ যথার্থ জীবন শিল্পী ছিলেন না। তিনি ছিলেন জীবনালেখ্য নির্মাতা। ফটোগ্রাফারের মত তিনি প্রত্যক্ষ জীবনেব চিত্ররূপ এঁকেছেন, শিল্পরূপেব সন্ধান দেন নি। তাঁব অন্যান্য উপন্যাসও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। 'ললিত ও সৌদামিনী (১৮৮২), হরিষে বিষাদ (১৮৮৭), তিনটি গল্প (১৮৮৯), বিধিলিপি (১৮৯২) প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি গার্হস্থ্য বিষয়বস্তুকে উপজীব্য করেছিলেন কিন্তু কোন অভিনবত্ব সৃষ্টি করতে পারেন নি। তবে 'স্বর্ণলতা'র সুখ্যাতি তাঁকে উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসন দান করেছে।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়—(১৮৪৭-১৯১৯) বাংলা উপন্যাসে অভিনব বিষয়বস্তু, অভিনব রীতি এবং অভিনব স্বাদবৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছিলেন। জটিল জীবনের গভীর সমস্যা অথবা ইতিহাসের স্বপ্নালোকিত জীবনের রহস্য অবলম্বনে উপন্যাস রচনার পথ ছেড়ে ব্যঙ্গকৌতুকে চলমান জীবনচিত্র এঁকেছিলেন দুজন কথাশিল্পী—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। ত্রৈলোক্যনাথের কল্পনাশক্তি, রসবুদ্ধি ও স্নিগ্ধ কৌতুকপ্রিয়তা তৎকালীন বাংলা কথাসাহিত্যে পরম বিস্ময়ের বিষয় হয়েছিল। ইনি সামান্য পুলিশী চাকরী থেকে আরম্ভ করে সমুচ্চ সরকারী

কর্মচারীপদে উন্নীত হয়েছিলেন এবং সরকারী কাজে বিদেশভ্রমণ করেছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং মানবচরিত্র ও সমাজ সম্বন্ধে তিনি ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। উপন্যাস ও গল্পসাহিত্যে তিনি তাঁর ভূয়োদর্শনের পরিচয় রেখে গেছেন।

ত্রৈলোক্যনাথের প্রথম উপন্যাস কঙ্কাবতী (১৮৯২) প্রকৃত পক্ষে একটি উপকথার উপন্যাস। রূপকথার কঙ্কাবতীকে ইনি বাস্তবপরিবেশে এনেছেন এবং লুই ক্যারলের লেখা এলিস ইন্ ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড নামক বিখ্যাত গ্রন্থের অনুসরণে এক অদ্ভুত গল্প লিখেছেন। সে গল্পে মানুষ-পশু-ভূত-প্রেত সব একাকার হয়ে এক অসম্ভবের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে। তাঁর লেখা অন্যান্য কাহিনীগুলিতেও অদ্ভুত ও অসম্ভবের অভিনব আয়োজন। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "তাঁহার কঙ্কাবতী বাঙ্গলাসাহিত্যের এমন একটা দিক খুলিয়া দিল যেদিকে আমাদের সাহিত্যরথীদের গতিবিধি কখনো ছিল না।" তাঁর ফোক্‌লা দিগম্বর (১৯০১) হাস্যরসের অফুরন্ত ভাণ্ডার। দিগম্বরের বিয়ে-পাগলামি এবং তৎপত্নী দিগম্বরীর প্রচণ্ড পতিভক্তি কৌতুকের ফোয়ারা রচনা করেছে। 'মুক্তামালা' (১৯০১) কতকগুলি গল্পের সমষ্টি আরব্যোপন্যাসের মতই চমকপ্রদ। 'ময়না কোথায়' (১৯০৪) নামক "উপন্যাসে বধূনির্যাতনের ও শুচিবায়ুর বীভৎস পরিণাম প্রদর্শিত।" ত্রৈলোক্যনাথের উপন্যাস বঙ্গবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হত। পরে অনেকগুলি গল্প জন্মভূমি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'টয়লার্স অব দি সী' গল্পের আদর্শে তিনি 'বাঙ্গাল নিবিরাম' গল্প লেখেন। 'ভূত ও মানুষ' (১৯০১) একটা চমৎকার গল্পসংকলন। মজার গল্প (১৯০৫ সংকলনের অনেক গল্পই ইংরাজী গল্পের অনুসরণে লেখা —তথাপি মৌলিক রচনা। ডমরু চরিত (১৯২৩) ত্রৈলোক্যনাথের শেষ উপন্যাস তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের নায়ক ডমরুধর সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "অতিশয়োক্তির আশঙ্কা স্বীকার করিয়া বলিতেছি, সেরভান্তের ডন কুইক্‌সোট, কোনান ডয়েলের শার্লক্ হোমস্ এবং আর্নেস্ট ব্রামার কাই লুংর মত ত্রৈলোক্যনাথের ডমরুধরও নিখিল সাহিত্যলোকে অমরত্বপ্রাপ্ত।" নিজস্ব ভঙ্গীতে বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব পরিবেশণ করে ইনি কথাসাহিত্যে নূতন স্বাদের আমদানী করেছিলেন।

প্রশ্ন ৩২। আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব ও তাঁহার বিশিষ্ট দানের পরিচয় দাও। **(ক. বি. ১৯৬৮)**

উত্তর। ছোটগল্প নামক কথাসাহিত্যের আঙ্গিকপ্রকরণ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাসাহিত্যে দেখা দেয়। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাবেই এই জাতীয় ছোটগল্পের সৃষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্র যুগলাঙ্গুরীয়, ইন্দিরা, রাধারাণী প্রভৃতি উপন্যাসে ছোটগল্পের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের সূচনা করেছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথই শিল্পসুন্দর সার্থক ছোট গল্পের আদি স্রষ্টা। ছোটগল্প আকারে ছোট, জীবনের খণ্ডাংশের বর্ণনা এবং একমুখী নিটোল গঠন প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়। তাতেই উপন্যাসের সঙ্গে ছোটগল্পের পার্থক্য। ছোটগল্পের

বিশেষত্ব সম্বন্ধে কবি-সমালোচক মোহিতলাল বলেছেন, "উহা একধরণের কথাশিল্প যাহাতে নাটক, উপন্যাস বা মহাকাব্যের পটবিস্তার, কালবিস্তার, বা দীর্ঘ ঘটনাজাল নাই ; বরং তাহারই একটা খণ্ড রূপকে কোনো একটি বিশেষ সংস্থানে বিশেষ ঘটনায়, বিশেষ চরিত্রে এমন ইঙ্গিতময় করিয়া তোলে যে, তাহাতেই একপ্রকার রসোপলব্ধি হয় ; যেন জীবনের বিরাট প্রাঙ্গণে যে সকল স্বপ্নালোকিত, অনাবিষ্কৃত, অবজ্ঞাত কোণ রহিয়াছে, সেইগুলার উপরে তীব্র ও চকিত আলোকপাত করে ; কোথাও কৌতুক, কোথাও বিস্ময়, কোথাও বা আমাদের হৃদয়ের একটা সুপ্ততন্ত্রীতে আঘাত করিয়া ক্ষণিক ভাববিহ্বলতা সৃষ্টি করে।" ছোটগল্প অভিনব আঙ্গিকবৈশিষ্ট্য নিয়ে বাংলাসাহিত্য রবীন্দ্রনাথের হাতেই প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব ও দানের পরিমাণ অপরিসীম। সোনার তরী কাব্যের 'বর্ষাযাপন' শীর্ষক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প-রচনার প্রেরণার কথা বলেছিলেন এবং ছন্দিত ভাষায় ছোটগল্পের স্বরূপলক্ষণ নির্দেশ করেছিলেন। কবি বলেছেন,

ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ-কথা,
নিতান্তই সহজ-সরল,
সহস্র বিস্মৃতি-রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।

ছোটগল্পের মর্মকথা এবং আঙ্গিকবৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত কবির এই সহজ উক্তির মধ্যে চমৎকার অভিব্যক্ত হয়েছে।

১৮৭৭ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'ভিখারিণী' নামক গল্প প্রকাশিত হয়। এটি প্রথম গল্প, কিন্তু সার্থক সুন্দর গল্প। 'দেনা-পাওনা' প্রকাশিত হয় 'হিতবাদী' পত্রিকায় ১৮৯১ সালে। তারপর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রচুর গল্প-প্রকাশিত হতে থাকে। আশ্চর্য সুন্দর গল্পগুলির মধ্যে রবীন্দ্রমানসিকতার বিস্ময়কর দিকগুলি ক্রমশঃ উদ্‌ঘাটিত হতে থাকে। তাঁর দানে বাংলাসাহিত্যের এই ভাণ্ডারটি পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রোত্তর যুগে প্রচুর ছোটগল্প লেখা হয়েছে, বাংলাসাহিত্যের ছোটগল্প বিশ্বসাহিত্যের ছোটগল্পের প্রতিস্পর্ধী হয়েছে, শিল্পাঙ্গিকের দিক থেকে এবং রসব্যঞ্জনায় অতুলনীয় মর্যাদার অধিকারী হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই গৌরবের প্রতিষ্ঠাতা তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ছোটগল্পের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দানের পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর গল্পগুলির বহু সংকলন আছে। তার মধ্যে বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত তিন খণ্ড গল্পগুচ্ছই বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বিষয়বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তাঁর প্রখ্যাত গল্পগুলিকে

প্রধানতঃ চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমতঃ সামাজিক জীবনে মানুষে মানুষে সম্পর্ক-বৈচিত্র্য। দ্বিতীয়তঃ নরনারীর প্রেমানুভূতির বৈচিত্র্য। তৃতীয়তঃ প্রকৃতির সহিত মানবমনের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক এবং মানবচরিত্রের উপর প্রকৃতির প্রভাব। চতুর্থতঃ প্রকৃত জীবনের সঙ্গে অতিপ্রাকৃতের সংস্পর্শে রহস্যরসের সৃষ্টি।

সমাজিক-জীবনে মানবিক সম্পর্ক নিয়ে লেখা গল্পগুলিরই সংখ্যাধিক্য। রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, রাসমণির ছেলে, দান প্রতিদান, ব্যবধান, পণরক্ষা, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, সম্পত্তি সমর্পণ, হালদারগোষ্ঠী প্রভৃতি অসংখ্য-গল্পে রবীন্দ্রনাথ সমাজ সম্পর্ককে ভিত্তি করে মানুষের সূক্ষ্মানুভূতিগুলি অবস্থা-পরিবেশে ফুটিয়ে তুলেছেন। কয়েকটি গল্পে সমাজ-পরিবেশ ছাড়িয়েও বৃহত্তর মানবতাবোধ এবং দেশকালাতীত একটি চিরন্তন ভাবব্যঞ্জনার মাধুর্য প্রকাশ পেয়েছে। খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, পোষ্টমাস্টার, কাবুলিওয়ালা, মেঘ ও রৌদ্র প্রভৃতি গল্পে পরিবেশ তুচ্ছ হয়ে গিয়ে নিত্যকালের বেদনামাধুরী গল্পরস সৃষ্টি করেছে। কয়েকটি গল্পে সমাজ-সমালোচনা ও প্রথাবদ্ধ জীবনের বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। হৈমন্তী, ভাইফোঁটা, স্ত্রীর পত্র, নামঞ্জুর, পয়লানম্বর প্রভৃতি গল্পে সমসাময়িক সমাজব্যবস্থার প্রতি কটাক্ষ আছে। সমাজবোধ ও মানবিকতার অনুভূতির সমন্বয়ে এই গল্পগুলির বিষয়বিন্যাস ও রসবিকাশ ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গল্পগুলি কাব্যধর্মী ব্যঞ্জনায় ও সূক্ষ্মমনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে অপূর্বতা লাভ করেছে। বিশ্বসাহিত্যের দরবারেও গল্পগুলি শ্রদ্ধাসন পাবার যোগ্য। একরাত্রি, মহামায়া, মধ্যবর্তিনী, মাল্যদান, মানভঞ্জন, অধ্যাপক, দৃষ্টিদান, নষ্টনীড়, দুরাশা প্রভৃতি গল্প পরিস্থিতি রচনায়, ভাষার সৌন্দর্যে এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে অপূর্ব। শেষ জীবনে 'তিনসঙ্গী'-সংকলনে রবীন্দ্রনাথ প্রেমচেতনায় নারী-ব্যক্তিত্বের বিশিষ্টতা যে কি বিস্ময়কর পরিণতি পেতে পারে তা দেখিয়েছেন। রবিবার, শেষকথা এবং ল্যাবরেটরি গল্পের মত গল্প বোধ হয় বাংলাসাহিত্যে কখনই হয়নি। প্রেমের রোমান্স রচনা করেছেন দালিয়া এবং জয়পরাজয় গল্পে। নষ্টনীড়ে নারীমনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মসুকুমার পরিচয়। স্ত্রীর পত্র নামক গল্পটিতে নিপীড়িত নারীত্বের মর্মান্তিক জ্বালা তীব্র অভিযোগের ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। প্রেমের গল্পের বহুবিধ বৈচিত্র্যে এবং বহু বিচিত্র পরিস্থিতি রচনায় রবীন্দ্রনাথের তুল্য শিল্পী আর নেই বললেও চলে।

প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের সম্পর্ক দেখিয়ে যে গল্পগুলি লেখা হয়েছে তাতে কাহিনী-রস অপেক্ষা কাব্যরসেরই উজ্জ্বলতা বেশি। রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মই এই গল্পগুলির মধ্যে জয়ী হয়েছে। শুভা, অতিথি, আপদ এই জাতীয় গল্প। পোস্টমাস্টার গল্পটিকেও প্রকৃতিচেতনার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। শুভাকে রবীন্দ্রনাথ বোবা-প্রকৃতির মূর্ত বিগ্রহরূপে উপস্থিত করেছেন। অতিথি গল্পের তারাপদ প্রকৃতির প্রাণচাঞ্চল্যের প্রতীক। রহস্যময়ী প্রকৃতির সন্ধানে সে অজানা সুদূরের যাত্রী হয়েছে। প্রেমের গল্পই হোক আর অতিপ্রাকৃতের কাহিনীই হোক রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মধ্যে প্রাণ-চৈতন্য সঞ্চার করে মানবমনের সঙ্গে প্রকৃতির অনিবার্য এবং অবিচ্ছিন্ন সংযোগ সাধন করেছেন। এই জাতীয় সিদ্ধি ছোটগল্পের ক্ষেত্রে খুবই দুর্লভ।

অতিপ্রাকৃত গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রোমান্টিক মনের পূর্ণ পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন। রহস্যময় রোমাঞ্চকর পরিবেশ রচনা দ্বারা মানুষের মনের অবচেতনলোকের ভাবরাজি উদ্বোধনে এক আশ্চর্য রসসংবেদন জাগে। রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি প্রখ্যাত গল্পে সেই রস সৃষ্টি করেছেন। ক্ষুধিত পাষাণ, নিশীথে, কঙ্কাল, মণিহারা, জীবিত ও মৃত প্রভৃতি গল্পে অতিপ্রাকৃত পরিবেশে অলৌকিকতার ব্যঞ্জনায় গল্পগুলি নিবিড় হয়ে উঠেছে। নাট্যরস-সমৃদ্ধ শিল্পকুশল বর্ণাঢ্য এই জাতীয় গল্প বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডারে স্থান পাবার যোগ্য।

ছোটগল্পের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একাধিপতি সম্রাট। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—"প্রস্তাবনা, উপস্থাপনা, পরিণতি ও উপসংহার কলা-কৌশলের দিক দিয়াও যেমন, বিষয় ও রসস্ফুরণের দিক দিয়াও সেইরূপ বিচিত্র। এই রচনারীতির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ বাংলাসাহিত্যে যে নূতন ধারা প্রবর্তন করিলেন তাহার অনুশীলন সম্প্রসারণের দ্বারাই আধুনিক বাংলাসাহিত্যিক রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের সার্থক উত্তরাধিকারিরূপে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।"

প্রশ্ন ৩। প্রবন্ধ সাহিত্যের বিবর্তনে এবং বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাসে বিভিন্ন লেখকদের দানের পরিমাণ নির্দেশ কর।

উত্তর। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা গদ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, শ্রীরামপুর মিশন, ভার্নাকুলার লিটারারি সোসাইটি এবং বিভিন্ন পত্রিকা গোষ্ঠীকে অবলম্বন করিয়া বাংলা গদ্য শতধারায় উৎসারিত হইয়া উঠে। এই উৎসধারায় প্রতিভাবান বহু লেখকের উল্লেখযোগ্য দান আছে। নিম্নে কয়েকজন প্রখ্যাত লেখকের সাহিত্যকৃতির বিবরণ ও কৃতিত্বের পরিচয় লিপিবদ্ধ হইল।

অক্ষয় কুমার দত্ত (ক. বি ১৯৬৪, '৬৭; '৬৯)

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার বর্ধমানের চুপী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতায় ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে শিক্ষালাভ করেন, পরে শিক্ষকতাও করেন। বাল্যে জেফয় নামক একজন জার্মান শিক্ষকের কাছে ইনি গণিত, বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনায় বিশ্বাস করিতেন না এবং বেদকে 'অপৌরুষেয়' বলিয়া মনে করিতেন না। প্রখর যুক্তিবাদ ছিল অক্ষয়কুমারের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মহর্ষি প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকতা গ্রহণ করেন। চিন্তার স্বাধীনতা, যুক্তির সারবত্তা এবং ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের পর্যালোচনায় অক্ষয়কুমার তরুণ সমাজের কাছে উজ্জ্বলতম আদর্শ স্থাপন করেন।

অক্ষয়কুমারের সাহিত্যকৃতি প্রধানতঃ শিক্ষামূলক এবং জ্ঞান বিস্তারের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত ছিল। ১৮৪১ সালে তিনি প্রথম 'ভূগোল' গ্রন্থ লেখেন। বিস্ময়ের বিষয় যে প্রথম তারুণ্যে তিনি 'অনঙ্গমোহন' নামে এক আদিরসাত্মক অশ্লীল কাব্য লিখিয়া পরে লজ্জিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে তিনখণ্ডে প্রকাশিত 'চারুপাঠ'

গ্রন্থে, পদার্থ-বিদ্যা এবং কিছু অনুবাদমূলক গ্রন্থে। কুম্বের Constitution of Man এবং Moral Philosophy অবলম্বনে যথাক্রমে 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' এবং 'ধর্মনীতি' গ্রন্থ লেখেন। উইলসনের Religious sects of the Hindus গ্রন্থানুসারে 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' লেখা। মূল গ্রন্থে ৪৫টি ধর্মসম্প্রদায়ের বিবরণ আছে। অক্ষয়কুমার প্রভৃত গবেষণায় তাঁহার গ্রন্থে ১৮২টি সম্প্রদায়ের সাধন পদ্ধতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়াছেন। 'প্রাচীন হিন্দুদের নৌযাত্রা' গ্রন্থেও তাঁহার গবেষণা যোগ্যতার সম্যক পরিচয় আছে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় এই জ্ঞান-তপস্বীর অসাধারণ মণীষার বিস্ময়কর পরিচয় ছড়াইয়া আছে।

অক্ষয়কুমারের গদ্যরীতি খুব জনপ্রিয় ছিল না। তাঁহার জ্ঞানের পরিমাপও হয় নাই। অক্ষয়কুমারের ভাষায় সরলতা ও লালিত্যের অভাব ছিল এবং সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকদের মধ্যে সারবান সাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহের অভাব ছিল। তীক্ষ্ণ যুক্তিনিষ্ঠতার জন্য অক্ষয়-কুমারের ভাষায় রসস্নিগ্ধতা ছিল না। তিনি বড় বেশি সমাসবদ্ধ পদ, সমস্ত পদ এবং জটিলবাক্য প্রয়োগ করিতেন। অক্ষয়কুমার বাংলা গদ্যে উচ্চচিন্তা প্রকাশের উপযোগী শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাষাশিল্পে কোন সুষমা ও মাধুর্য সঞ্চার করিতে পারেন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

(ক. বি. ১৯৬৩, ৬০)

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগরের জন্ম। তাঁহার পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজে পাঠাভ্যাসের সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান, কালক্রমে সমগ্র বাংলাদেশের উজ্জ্বলতম রত্নে পরিণত হন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই মহাপ্রাণ মনস্বী বাঙ্গালী জাতি ও বাংলা ভাষার সেবায় অক্লান্ত নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারমূলক ও জনহিতকর বহু কর্ম সম্পাদন করিয়া দয়ার সাগর হইয়াছিলেন। তিনি বহু প্রগতিমূলক আন্দোলনে সংস্কারমুক্ত উদার মনের পরিচয় দেন। কিন্তু তাঁহার দানের মূল্য সাহিত্যক্ষেত্রে যেমন সুদূরপ্রসারী হইয়াছে এইরূপ আর কিছুতে হয় নাই। বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগর 'জনক' খ্যাতি পাইয়াছিলেন, অথচ তিনি যথার্থ সাহিত্যসেবী ছিলেন না। সমাজ-সংস্কার প্রেরণায় এবং শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তরের মধু এবং অকপট সারল্যে তাঁহার রচিত গদ্য মধুস্রাবী এবং প্রাঞ্জল হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গদ্যরীতি সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে বিদ্যাসাগর সুবিভক্ত ও সুবিন্যস্ত করিয়া ভাষাভঙ্গিতে যথেষ্ট সুষমা সঞ্চার করিয়াছিলেন। গদ্যরীতিতে ছেদপ্রয়োগে ছন্দোময় মাধুর্য প্রদান এবং রস রচনার উপযোগী প্রাঞ্জল ভাষা সৃষ্টি বিদ্যাসাগরের প্রধান কৃতিত্ব।

বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকৃতির প্রধান পরিচয় তাঁহার অনুবাদমূলক রচনায়। সংস্কৃত ভাগবত অনুসরণে 'বাসুদেব চরিত', হিন্দী 'বৈতাল পচ্চীসী' অবলম্বনে 'বেতাল

পঞ্চবিংশতি', কালিদাসের 'শকুন্তলা নাটক অনুসরণে 'শকুন্তলা' গদ্যগ্রন্থ, ভবভূতির 'উত্তর রামচরিত' নাটক অনুসরণে 'সীতার বনবাস' সেক্সপীয়ারের Comedy of Errors অবলম্বনে 'ভ্রান্তিবিলাস' নিবন্ধ বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনা রীতির চমৎকার নিদর্শন। শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যেও তিনি অনুবাদমূলকতার আশ্রয় নিয়াছিলেন। মার্শম্যানের অনুসরণে 'বাংলার ইতিহাস', চেম্বার্সের অনুসরণে 'জীবনচরিত' এবং 'বোধোদয়', ঈশপের দৃষ্টান্তে 'কথামালা'—প্রভৃতি সমস্তই অনুকরণ জাত বিষয়, মৌলিক নয়। শিশু যেমন অনুকরণ দ্বারাই আত্মবিকাশের শক্তি অর্জন করে বাংলা গদ্যের শৈশবেও তেমনি অনুকরণের পথ প্রশস্ত মনে হইত। কিন্তু প্রকাশের জন্য বাংলা গদ্যের ব্যবহারে বিদ্যাসাগর ভাষাশিল্প জ্ঞানের মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার মৌলিক রচনা বিতর্কমূলক কয়েকটি নিজ নামের ও ছদ্মনামের প্রবন্ধ এবং 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' ও 'আত্মচরিত'। বাংলাগদ্যের শক্তি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির যথার্থ সহায়তা করিয়া বিদ্যাসাগর জনকের মতই গদ্যভাষাকে লালনপালন করিয়াছিলেন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (ক. বি. ১৯৬৫, ৬৬, ৬৭)

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে ভূদেবের জন্ম। ইনি মধুসূদন দত্তের সহপাঠী ছিলেন। হিন্দু কলেজের সেরা ছাত্র ছিলেন কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সংস্পর্শে তৎকালীন 'ইয়ং বেঙ্গল'দের মত উন্মার্গগামী হন নাই। যাহা কিছু ভারতীয় তাহাকে ঘৃণা না করিয়া তিনি ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির আদর্শকেই মানুষের পক্ষে মহত্তম মনে করিতেন। তাঁহার বাংলা সাহিত্যসেবা এই উদ্দেশ্যেই উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।

ভূদেবচন্দ্র বিশুদ্ধ সাহিত্যিক প্রেরণায় লেখনী ধরেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার দানে বাংলা গদ্য সাহিত্য প্রভূত সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। আবেগহীন যুক্তি, নির্ভুল তথ্য এবং সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়া তিনি যথার্থ প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রবর্তয়িতার গৌরব দাবী করিতে পারেন। আবার রোমান্টিক রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়া বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের পথও প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। মননশীলতার গভীরতা এবং রসবুদ্ধির জাগরণ এই দুই দিক হইতেই ভূদেবচন্দ্রের দান বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস চিরকাল স্মরণে রাখিবে।

ভূদেবচন্দ্রের রচনা পাঠ্যসংক্রান্ত, সমাজকল্যাণমূলক প্রবন্ধ, সাহিত্যসমালোচনা এবং কল্পনামূলক। তৎকালীন গদ্যাঙ্গিকের সব রকম পদ্ধতিই তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন। ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থরূপে ভূদেবের কৃতিত্ব—শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, পুরাবৃত্তসার ক্ষেত্রতত্ত্ব, বাংলা, রোম, এবং ইংলণ্ডের ইতিহাস প্রভৃতি। মনীষীর মননশীলতা ও যুক্তিনিষ্ঠার অদ্ভুত দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার বিচারমূলক প্রবন্ধগ্রন্থগুলিতে। 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ' এবং 'আচার প্রবন্ধ'—এই তিনখানি পুস্তকে ভূদেবের চিন্তার স্বচ্ছতা এবং ভাষাভঙ্গির ঋজুতা বিস্ময়কর। 'বিবিধ প্রবন্ধে'র দুইটি খণ্ডে ভূদেব সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনায়, জীবনদর্শনের ব্যাখ্যানে যে রসজ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও বিশ্লেষণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। রোমান্টিক কাহিনী রচনার

দক্ষতাও তাঁহার কম ছিল না। তরুণ বয়সেই তিনি কন্টারের লেখা Romance of History গ্রন্থ অবলম্বনে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উহাতে 'সফল স্বপ্ন' এবং 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামে দুইটি কাহিনী আছে। 'সফল স্বপ্ন' একটি প্রবাদমূলক রোমান্টিক আখ্যান এবং 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' ঔরঙ্গজীবের কন্যা রোসিনারার সহিত শিবাজীর প্রেম ও পরস্পরের আংটি বদলের ইতিহাস। কাহিনীটি ইতিহাসভিত্তিক ও রোমান্টিক ট্রাজেডি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশ নন্দিনী' এই গ্রন্থদ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত বলিয়া মনে হয়। ভূদেবের 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' নামক একখানি কল্পনামূলক গ্রন্থে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে মারাঠা শক্তি জয়ী হইলে ভারতের ইতিহাস কিরূপ হইত তাহা কল্পনা করা হইয়াছে। ভূদেব 'পুষ্পাঞ্জলি' নামে একখানি গল্প পুস্তকও লিখিয়াছিলেন। কিন্তু আসল কথা, ভূদেব কল্পনা প্রবণ রোমান্টিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন না, 'বাজেকথার ফুলের চাষ' জানিতেন না। আজীবন কাজের কথার ফলের চাষ করিয়া গিয়াছেন।

রাজনারায়ণ বসু (ক. বি. ১৯৬৫, ৬৯)

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে বোড়াল গ্রামে রাজনারায়ণের জন্ম। ইনি মধুসূদনের সহাধ্যায়ী ছিলেন, হিন্দুকলেজের কৃতী ছাত্র ছিলেন, ইংরাজী সাহিত্যে কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতাও রামমোহনের অনুবর্তী ছিলেন। আজীবন ব্রাহ্মধর্মের নেতৃত্ব করেন এবং শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম ও সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ জাতীয়ভাবে উদ্বোধিত ছিলেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর সর্বপ্রকার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। মেদিনীপুরের সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে দায়িত্ব পালন করিয়াও তিনি জাতীয়ভাবের উদ্বোধক ও সাহিত্য সমালোচনমূলক প্রবন্ধ রচনায় লেখনী পরিচালনা করিয়াছিলেন।

রাজনারায়ণ আত্মনিষ্ঠ রসরচনায় এবং মননশীল প্রবন্ধ রচনায় সমান দক্ষ ছিলেন। গদ্যরীতি সম্বন্ধে তাঁহার শিল্পবোধ অত্যন্ত প্রখর ছিল। তাঁহার গদ্যরীতি তাঁহার ব্যক্তিত্বের স্পর্শে সমুজ্জ্বল। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' নামে তিনি একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখেন। বিষয় বিন্যাসে, যুক্তিনিষ্ঠায় এবং ভাষাসারল্যে প্রবন্ধটি অনবদ্য। 'আত্মীয় সভার বিবরণ', 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা, তাঁহার রসবুদ্ধির পরিচায়ক। 'গ্রাম্য উপাখ্যান' নামে একটি ছদ্মনামা রচনায় তিনি তাঁহার গ্রাম ও পরিবারের একটি রসচিত্র রচনা করিয়াছিলেন। পরে ইহার মর্মকথা 'আত্মচরিত' গ্রন্থে স্থান পায়। এই গ্রন্থখানি লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হইয়াছিল। ভাষার লালিত্যে ও রস-ব্যঞ্জনার মাধুর্যে রাজনারায়ণ 'সেকাল আর একাল' নামক গ্রন্থে তাঁহার সমকালীন যুগের যে চিত্র আঁকিয়াছেন এবং যে ঐতিহ্যপ্রীতির পরিচয় দিয়াছেন তাহার তুলনা হয় না। শেষ জীবনে 'জ্যাঠামি' এবং 'জীবনপ্রান্তোপনীতের জীবন' নামে দুইটি প্রবন্ধে তিনি

বাণীশিল্পের যে ভঙ্গী অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাকে রসরচনার প্রাথমিক সূচনা বলা যায়। নির্মল রসিকতার সঙ্গে জীবনদৃষ্টির গভীরতার সার্থক সমন্বয় তাহার রচনায় প্রকাশ পাইয়াছে।

ব্রাহ্মধর্মের একজন উপদেষ্টারূপেই সকলে রাজনারায়ণকে জানেন। 'বিবিধ প্রবন্ধ' নামক গ্রন্থে ব্রাহ্মধর্মসম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতাবলী সংকলিত হইয়াছিল। রাজনারায়ণের সাহিত্যিক পরিচয় তাঁহার অন্তরঙ্গরাই জানিতেন। মধুসূদন সাহিত্য বিচারে রাজ-নারায়ণের অভিমতকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। রাজনারায়ণের অন্তঃপ্রকৃতিতে প্রতিভাবান সাহিত্যিকের সর্বপ্রকার গুণের সমাবেশ ছিল।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

(ক বি. ১৯৬৩, ৬৭)

কালীপ্রসন্ন সিংহ মধুসূদনের সমসাময়িক ব্যক্তি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এমন সুবিখ্যাত ব্যক্তিত্ব খুবই দুর্লভ। বাংলা, ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ এই ব্যক্তিটি অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর কলিকাতার সিংহ বাগানে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ছদ্মনামে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে 'হুতুম প্যাঁচার নক্সা' লিখিয়াছিলেন। কেউ কেউ অনুমান করেন ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে তাঁহার কোন অনুগৃহীত পণ্ডিত ব্যক্তি হুতুম প্যাঁচা রচনা করিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বহু পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। পণ্ডিত-দের সহায়তায় তিনি বাংলা সাহিত্যে বহু উন্নতিমূলক কার্য করেন। ইনি কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের অনুবাদ করেন। ব্যাসকৃত মূল মহাভারতের অনুবাদ করেন। ভবভূতির 'মালতী মাধব' নাটকের যথার্থ নাট্যানুবাদ করিয়াছিলেন। 'সাবিত্রী সত্যবান' নামে একখানি মৌলিক পুরাণাশ্রয়ী নাটক রচনা করেন। কালীপ্রসন্ন সং সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। 'হুতুম প্যাঁচা' ও 'বাবু' নাটক তাঁহার ব্যঙ্গাত্মক রচনা। কিন্তু ব্যক্তিগত আচরণে ও সাহিত্যানুরাগে তিনি যথেষ্ট গাম্ভীর্যের পরিচয় দিতেন। মেঘনাদবধ কাব্যের যখন নিন্দা রটনা হইতে থাকে তখন ইনিই ঘটা করিয়া বিদ্যোৎসাহিনী সভার মাধ্যমে মধুসূদনকে রৌপ্যাধারে মানপত্র এবং রূপার দোয়াত কলম উপহার দিয়াছিলেন। ইনি মধুসূদন দত্তকে দিয়া নীলদর্পণের বেনামা অনুবাদ করান এবং পাদরী লঙ্ সাহেবের জরিমানা হইবে আশঙ্কায় বিচারের দিন প্রচুর রৌপ্য মুদ্রা লইয়া আদালত প্রাঙ্গণে হাজির হইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ অল্প বয়সেই বুদ্ধির প্রাখর্য, বৈষয়িক চাতুর্য্য ও পাণ্ডিত্যের গাম্ভীর্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মাত্র ৪০ বছর বয়সে এই বিরাট লোকটির মৃত্যু ঘটে।

কালী প্রসন্ন ঘোষ

(ক বি. ১৯৬৭)

ইনি ঢাকা ভাওয়াল ষ্টেটের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিনি রায়বাহাদুর ও সি. আই. ই. উপাধি পাইয়াছিলেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্য খ্যাতির জন্য তাঁহাকে পূর্ব বঙ্গের

বিদ্যাসাগর বলা হয়। তিনি আরবী, পার্শী, সংস্কৃত ও ইংরাজী—এই চারটি ভাষাতেই অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। ঢাকায় তিনি 'বান্ধব' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদর্শন প্রতিষ্ঠার দুই বৎসর পরে। পত্রিকা পরিচালনার আদর্শে তিনি বঙ্কিমের অনুবর্তী ছিলেন। সাহিত্য রচনার আদর্শে রবীন্দ্র-বিরোধী হইয়াছিলেন। 'ভারতী' ও 'সাধনা' পত্রিকার বিরুদ্ধে তিনি বিষোদ্গার করিতেন।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ গদ্য-নিবন্ধ রচয়িতা রূপে উনবিংশ শতাব্দীর খ্যাতিমান পুরুষ। তিনি আবেগচঞ্চল পাণ্ডিত্য পূর্ণ ভাষায় বিদ্যাসাগরী গদ্যরীতিতে চিন্তাশীল প্রবন্ধ রচনা করিতেন। তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধ পুস্তকগুলির নাম 'প্রভাত চিন্তা', 'নিভৃত চিন্তা' ও 'নিশীথ চিন্তা'। তথ্য ও যুক্তিমূলক প্রবন্ধ রচনায় তাঁহার কৃতিত্ব ছিল। নারী জাতি বিষয়ক প্রস্তাব, মা না মহাশক্তি, ভক্তির জয়, জানকীর অগ্নিপরীক্ষা, 'ছায়া দর্শন'—এই সকল প্রবন্ধে কালীপ্রসন্নের পাণ্ডিত্য, বিচারবুদ্ধি ও ভাষা-শিল্পের দক্ষতার পরিচয় আছে। তিনি কতগুলি আধ্যাত্মিক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। 'সঙ্গীত মঞ্জরী' নামে সেই গানগুলি সংকলিত হইয়াছিল। তিনি অবসর সময়ে কিছু কিছু শিশু-পাঠ্য কবিতাও লিখিয়াছিলেন। উহার একটি সঙ্কলন প্রকাশিত হয় 'কোমল কবিতা' শিরোনামায়। উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে কীর্তিমান সাহিত্যিক রূপে কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন।

বীরবল=প্রমথ চৌধুরী

ক. বি. ১৯৬৫, ৬৮)

মোগল সম্রাট আকবরের একজন সভা-কবি ছিলেন বীরবল নামে। জাতিতে ইনি রাজপুত, সাহসে ও বীর্যবত্তায় অনন্যসাধারণ। তাঁহার সবচাইতে বড় বিশেষত্ব ছিল স্নিগ্ধ কৌতুকের মধ্য দিয়া তত্ত্ব কথা সম্মিত উপদেশ প্রদানে। সম্রাট আকবর এই বিদগ্ধ পণ্ডিত ও হাস্যরসিক ব্যক্তিকে খুব সম্মান করিতেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা, ইন্দিরা দেবীর স্বামী, পাবনার হরিপুরের জমিদার ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ চৌধুরী বীরবল ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া তাঁহার সম্পাদিত সবুজ পত্রে বৈদগ্ধপূর্ণ হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধ লিখিতেন। বীরবল নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি নিজের পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে তিনি বাঙ্গালী জাতির বিদূষক। বাংলা সাহিত্যে ভাষা রীতির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ, চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রে নূতন জিজ্ঞাসার উদ্বোধে ইনি এমন কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষতঃ গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন।

প্রমথ চৌধুরী অর্থাৎ বীরবল কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ রচনায় যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়াছেন। তবে প্রাবন্ধিক রূপেই তাঁহার স্থায়ী প্রতিষ্ঠা। তিনি 'সনেট পঞ্চাশৎ' ও পদচারণা নামে কাব্য লিখিয়াছিলেন। 'চার-ইয়ারী কথা', 'নীল লোহিত', 'বড় বাবুর বড়দিন', 'ফার্স্ট ক্লাস ভূত', 'আহুতি' প্রভৃতি তাঁহার উৎকৃষ্ট ছোট গল্প। 'মন্ত্রশক্তি' তাঁহার একটি বিখ্যাত গল্প। তিনি প্রচুর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রথম প্রবন্ধসংকলনের নাম তেল-নুন-লকড়ী। ইহা ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত

হয়। তারপর ক্রমান্বয়ে বীরবলের হালখাতা, নানাকথা, নানা চর্চা ইত্যাদি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বীরবলের প্রবন্ধগুলি যুক্তিনিষ্ঠ ও সংস্কার মুক্ত। বিশুদ্ধ বিচার-বুদ্ধি এবং শাণিত ব্যঙ্গ প্রমথ চৌধুরীর রচনার অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তাঁহার রচনারীতিতে বড় অনাবশ্যক মার-প্যাচ, কালোয়াতী কৌশল, তির্যক ভাষণ এবং অতিরিক্ত প্রসঙ্গান্তর। চলিত ভাষায় লিখিলেও তাঁহার রচনার ভাষা ছিল কৃত্রিম। বিদগ্ধ ব্যক্তি ছাড়া সাধারণ পাঠকের কাছে প্রমথ চৌধুরীর রচনা সহজ-বোধ্য অথবা হৃদ্য ছিল না।

প্যারীচাঁদ মিত্র

(ক. বি. ১৯৬৩, ৬৮)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সুবিখ্যাত প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন টেকচাঁদ ঠাকুর। ইনি হিন্দুকলেজের ডিরোজিওর শিষ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ কৃতী ছাত্র ছিলেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি গদ্যশিল্পীরূপে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন। লোক ব্যবহার্য গদ্যভাষাকে সাহিত্যের অঙ্গনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার গৌরব তাঁরই প্রাপ্য। 'আলালের ঘরের দুলালে' এই গদ্যরীতির প্রবর্তন ক'রে, তিনি যে গদ্যরীতির পথ উন্মুক্ত করে দিলেন, ইতিহাসে 'আলালী রীতি' নামে তা সুপ্রচলিত হয়েছে।

প্যারীচাঁদ তাঁর বন্ধু রাধানাথ সিকদারের সহযোগিতায় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে 'মাসিক পত্রিকা' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করলেন। সাধুছাঁদের মধ্যেও চলিত বুলি প্রকাশের ইঙ্গিত এই পত্রিকার ভাষায় ছিল। এই পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যায় লেখা থাকত—"এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষত: স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে। যে-ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাবসকল. রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন ; কিন্তু তাহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।" এই পত্রিকাতেই তিনি তাঁর অমর গ্রন্থ 'আলালের ঘরের দুলাল' ক্রমশ: প্রকাশ করেন। পরে ১৮৫৭ সালে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়। চলিত গদ্যের প্রকাশ শক্তি এবং পারিবারিক জীবনের সাহিত্য-মূল্য এই গ্রন্থখানির প্রকাশের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীচাঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, "তিনিই (প্যারীচাঁদ) প্রথম দেখাইলেন যে যেমন জীবনে তেমনিই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর হয় না। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি আলালের ঘরের দুলাল।" বঙ্কিমচন্দ্র আলালী রীতিকে সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ বলেন নি বটে, কিন্তু এই রীতির উপযোগিতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় ছিলেন। তিনি বলেছেন, "প্যারীচাঁদ মিত্র আদর্শ বাংলা গদ্যের সৃষ্টিকর্তা নহেন, কিন্তু বাংলা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে। প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্তি।"

প্যারীচাঁদ আরও কয়েকখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন ; কিন্তু সে গ্রন্থগুলি কালজয়ী হয়নি। যৎকিঞ্চিৎ (১৮৬৫) এবং অভেদী (১৮৭১) গ্রন্থে বিষয়বস্তুও যৎকিঞ্চিৎ এবং ভাষা-ভঙ্গির মধ্যেও অভিনবত্বের অভাব। নীতিমূলকতা তাঁর রচনার অন্যতম বিশেষত্ব ছিল।

সেকালে অধিকাংশ লেখকই সমাজ সংস্কারের মনোভাব নিয়ে রচনাকে নীতিমূলক অথচ সৌন্দর্যময় করতে চেষ্টা করতেন। 'আধ্যাত্মিকা' 'রামারঞ্জিকা গ্রন্থে' জীবনবোধের গভীরতা অপেক্ষা নীতিপ্রবণতাই বেশি। 'মদ খাওয়া বড় দায় জাতরাখার কি উপায়' গ্রন্থখানি প্রহসনাত্মক ভঙ্গিতে লেখা হাস্যরসাত্মক রচনা। মদ্য পানের কুফল প্রদর্শনই গ্রন্থখানির লক্ষ্য। প্যারীচাঁদ 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের অন্তর্ভুক্ত থেকেই সমাজে কুশিক্ষার ফল প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেই জন্য তাঁর রচনা শিল্পগুণে প্রশংসনীয় হলেও উদ্দেশ্যমূলক হয়েছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ

(ক. বি. ১৯৬১, ৬৩)

নরেন্দ্রনাথ দত্ত ডাফ কলেজের প্রতিভাবান্ ছাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ নামে তিনি বিশ্ববিশ্রুত ধর্মনেতার গৌরব লাভ করেন। বাংলা গদ্যসাহিত্যে স্বামীজির দানও অতুলনীয়। ধর্মনেতা না হয়ে তিনি যদি জীবনব্যাপী সাহিত্য সাধনা করতেন তাহলে তিনি অবলীলাক্রমেই সে যুগে সাহিত্যের নেতৃপদ লাভ করতেন।

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২—১৯০২) বিশুদ্ধ সাহিত্যিক প্রেরণায় লেখনী ধারণ করেন নি, কিন্তু তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতাবলী এবং প্রবন্ধসমূহ উৎকৃষ্ট সাহিত্যপদবাচ্য হয়েছে। সর্বাপেক্ষা সুন্দর হয়েছে তাঁর পত্রাবলী। ভাষার লাবণ্যে প্রকাশের ঋজুতায় এবং অনুভূতির গাঢ়তায় শিষ্য এবং গুরুভাইদের কাছে লিখিত পত্রাবলী প্রতিভাদীপ্ত লেখনী থেকেই নিঃসৃত হয়েছে। স্বামীজির অধিকাংশ লেখাই ইংরাজীতে। ইয়োরোপে এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি ইংরাজী ভাষায় ভাষণ দিতেন। তাঁর গুরুভাইদের মধ্যে কোন কোন বিদগ্ধ সন্ন্যাসী তার বঙ্গানুবাদ করে রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তাঁর রচিত কিছু ইংরাজী বাংলা কবিতাও আছে।

ভাষাশিল্পে এবং সাহিত্যিক সৌষ্ঠবে স্বামীজির প্রধান কীর্তি তাঁর 'ভাববার কথা', 'বর্তমান ভারত', 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'পত্রাবলী'। তিনি সাধারণতঃ চলিত রীতির পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি প্রায় সবই চলিত রীতিতে লেখা। 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থখানি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। এই গ্রন্থে বিবেকানন্দ প্রভূত ঐতিহাসিক জ্ঞান এবং বিশ্লেষণ শক্তি নিয়ে ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের ধারা নির্দেশ করেছেন এবং বিশ্বসভ্যতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। ইয়োরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে বাঙ্গালী জাতির কর্মে ও মানসিকতায় যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হয়েছে তার ফলাফল আলোচনা করে জাতির সম্মুখে উন্নতির পথটি তুলে ধরেছেন। গম্ভীর ভঙ্গিতে সংযত ভাষার মহিমায় সমগ্র প্রবন্ধটি দীপ্যমান। 'ভাববার কথা' কথ্য সংলাপের চলিত রীতিতে লেখা। যে-যুগে চলিত রীতির ব্যাপক প্রচলন ছিল না, গুরুগম্ভীর বিষয়ের পক্ষে চলিত রীতি অব্যবহার্য বলে গণ্য হত, সে-যুগে স্বামীজি চলিত রীতির প্রকাশ-শক্তির সুন্দর পরিচয় দিয়েছিলেন। একখানি গ্রন্থে ইয়োরোপীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণে লিখেছেন, "রাজনীতির নামে যে চোরের দল দেশের লোকের রক্তচুষে সমস্ত

ইউরোপী দেশ খাচ্ছে, মোটা তাজা হচ্ছে সে দলও আমাদের দেশে নেই। * * *. যাদের হাতে টাকা তারা রাজ্যশাসন নিজেদের মুঠোর ভেতর রেখেছে, প্রজাদের লুঠ্‌ছে, শুষ্‌ছে, তারপর সেপাই করে দেশদেশান্তরে মরতে পাঠাচ্ছে। জিত হলে তাদের ঘরে ধনধান্য আসবে। প্রজাগুলো তো সেখানে মারা গেল, হে রাম, চমকে যেওনা, ভাঁওতায় ভুলো না।" চলতিভাষার সাবলীলতা ও প্রকাশক্ষমতায় স্বামীজি ভাষা শিল্পের একজন পথিকৃৎরূপে গণ্য হবার যোগ্য।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (ক. বি. ১৯৬৩, ৬৫, ৬৮)

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর (১৮৬৪-১৯১৯) পূর্বপুরুষ ছিলেন অবাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। মুর্শিদাবাদ জিলায় এঁরা উপনিবিষ্ট হয়েছিলেন। রমেন্দ্রসুন্দরের পিতা গোবিন্দসুন্দর নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রামেন্দ্রসুন্দরের জন্ম। অসাধারণ প্রতিভাধর রামেন্দ্রসুন্দর তরুণ বয়সেই পাশ্চাত্ত্য দর্শন বিজ্ঞানে, প্রাচ্য শাস্ত্রাদিতে সুপণ্ডিত হয়েছিলেন। সাহিত্যবোধ ও ইতিহাস জ্ঞানে তাঁর তুল্য ব্যক্তি তৎকালে খুবই দুর্লভ ছিল। এম. এ. পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মত সর্বশাস্ত্রবিদ্ প্রগতিবাদী পণ্ডিত কদাচিৎ দেখা যায়।

নূতন যুগের জীবনদর্শন, বিজ্ঞানতত্ত্ব এবং ধর্মজিজ্ঞাসা অবলম্বনে মননশীল প্রবন্ধ রচনায় রামেন্দ্রসুন্দর তৎকালে শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থাবলী অপূর্ব মনীষার সাক্ষ্য দেয়। প্রকৃতি, জিজ্ঞাসা, কর্মকথা, চরিত্রকথা, নানাকথা, ব্রতকথা প্রভৃতি গ্রন্থে দার্শনিক তত্ত্ব, বিজ্ঞানরহস্য, জীবনবোধ ও সাহিত্যরুচির এমন সুন্দর সমন্বয় হয়েছে যে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে এই প্রতিভাবান্ মনীষী বিস্ময় উৎপাদন করেছিলেন। দুরূহ তত্ত্বকে তিনি ভাষা সৌন্দর্যে, সরস রসিকতায় এমন সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতেন যে তত্ত্বের কাঠিন্য বিষয়বস্তুকে নীরস জ্ঞানের বিষয় করে রাখেনি। নানা উদাহরণ দিয়ে কৌতূহলোদ্দীপক চতুর প্রশ্ন ভঙ্গিতে নানা জটিল প্রশ্নের তিনি সহজসুন্দর মীমাংসা করতেন। বাণীশিল্পের এই বৈশিষ্ট্য অন্য কোন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধলেখকের ছিল না। তাঁর রচনা প্রসাদগুণে এবং স্মিত কৌতুকের স্নিগ্ধচ্ছটায় অপূর্ব হয়ে উঠ্‌ত।

রামেন্দ্রসুন্দর মুখ্যতঃ প্রাবন্ধিক ছিলেন। কিন্তু শুধু দর্শন ও বিজ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায়ই তাঁর প্রবন্ধগুলি পর্যবসিত নয়। সাহিত্য সমালোচনায়ও তিনি রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। 'ব্রতকথা' গ্রন্থে বাংলাদেশের প্রাচীন সমাজের স্বাচ্ছন্দ্য চিত্রটি অনিন্দ্যসুন্দর হয়েছে। 'নানাকথা'য় সাহিত্য-সমালোচনার বিদগ্ধতা এবং সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় আছে। তিনি বেদ-উপনিষদ্ এবং প্রাচীন ভারতীয় যজ্ঞানুষ্ঠান সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাসমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন। জ্ঞানবিজ্ঞানের এমন দিক ছিল না যেদিকে এই মনীষীর লেখনী পরিচালিত না হয়েছে। সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম পরিচালকরূপে প্রাচীন বাংলাসাহিত্য সম্বন্ধীয় গবেষণায় তিনি প্রভূত সহায়তা করেছেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধসমূহের গঠনশিল্পে কিঞ্চিৎ ত্রুটি ছিল। তাঁর প্রবন্ধগুলি আয়তনে বড় দীর্ঘ হত এবং প্রসঙ্গান্তরের সম্ভাবনা দেখা দিত। যুক্তি ও বিচারের দিকে তিনি বেশী মনোযোগী ছিলেন এবং দৃষ্টান্তগুলিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রচনাকে কেন্দ্রচ্যুত করতেন। দর্শন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে বিজ্ঞানতত্ত্বের অনুপ্রবেশ ঘটত এবং সামাজিক ইতিহাসের প্রসঙ্গে দার্শনিক সূত্রগুলি ব্যাখ্যার প্রাধান্য দেখা যেত। এইজন্য সাধারণ পাঠকের কাছে সহজবোধ্য এবং হৃদ্য হয়নি। তথাপি বঙ্কিমোত্তর প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে রামেন্দ্রসুন্দর উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক।

প্রশ্ন ২৪। বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রথমপর্বের (১৮৫২-৭২) ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত কর এবং নাট্যকার হিসাবে দীনবন্ধু মিত্রের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ কর। (ক বি. ১৯৬১)

উত্তর। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস ইংরেজী সভ্যতা প্রসারের ফলেই গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশের প্রাচীনকালের যাত্রা, পাচালী, কথকতার সঙ্গে নাট্যসাহিত্যের কোন নাড়ীর যোগ ছিল না। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের অনুবাদ দ্বারা প্রথম পর্বের নাট্যসাহিত্য কিঞ্চিৎ পরিপুষ্ট হলেও সংস্কৃত নাট্যশিল্পের অনুকৃতির ফলেও বাংলা নাটকের সৃষ্টি হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী সংস্কৃতির উজ্জীবনে ইংরেজী সাহিত্য ও সভ্যতার প্রভাবের ফলে সেক্সপীরীয় নাট্যশিল্পের প্রত্যক্ষ অনুকৃতির জন্যই বাংলা নাট্যসাহিত্য ক্রমশঃ গৌরবের পথে পদক্ষেপ করেছিল। ১৮৫২ থেকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা এবং নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের অভ্যুদয়ের পূর্বকাল পর্যন্ত বাংলা নাটকে একমাত্র দীনবন্ধু ছাড়া অন্য সকল নাট্যকারের রচনায় সংস্কৃত নাটকের যৎকিঞ্চিৎ প্রভাব দেখা যায়। জে. সি. গুপ্ত, তারাচরণ সিকদার, রামনারায়ণ, উমেশচন্দ্র, মধুসূদন প্রভৃতি সমস্ত নাট্যকারেরাই কমবেশি সংস্কৃত নাটকগুলির রীতিপদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন।

প্রথম বাংলা নাটক রচনার গৌরব পেতে পারেন যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত। ১৮৫২ সালে ইনি কীর্তিবিলাস নামে একখানি নাটক রচনা করেন। বাংলাসাহিত্যে গ্রন্থখানিকে প্রথম নাটক এবং প্রথম ট্র্যাজেডি বলা চলে। সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে তিনি নান্দী ও প্রস্তাবনা দিয়ে নাট্যারম্ভ করেছেন কিন্তু নাট্যবস্তুতে হ্যামলেট নাটকের প্রভাব আছে। বিমাতার বিদ্বেষে কীর্তিবিলাসের লাঞ্ছনা অনেকটা রূপকথার মত এবং পরিণামে তার পত্নীর ও তার নিজের মৃত্যু মেলো-ড্রামার মত অতিনাটিক। রচনাশিল্প সার্থক না হলেও যথার্থ নাটক রচনার প্রথম প্রয়াসরূপে 'কীর্তিবিলাস' প্রশংসনীয়। ভূমিকায় নাট্যকার সেক্সপীয়রের প্রভাব স্পষ্টই স্বীকার করেছেন।

তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' নাটকখানি 'কীর্তিবিলাস' প্রকাশের সমকালেই ১৮৫২ সালে প্রকাশিত হয়। মহাভারতের আদি পর্বের সুভদ্রাহরণ বৃত্তান্ত অবলম্বনে রোমান্টিক প্রেমের কাহিনীকে নাট্যকার তাঁর বিষয়বস্তু করেছিলেন। তিনি সংস্কৃত

নাটকের নান্দী-প্রস্তাবনা প্রভৃতি বর্জন করেছিলেন। ইংরাজী Act ও Scene-এর মত 'অঙ্ক', এবং 'সংযোগস্থল' শব্দ ব্যবহার করেছেন। ভূমিকায় লিখেছেন, "এই নাটকং ক্রিয়াদি এবং ঘটনাস্থাপনের নির্ণয়বিষয়ে ইউরোপীয় নাটক-প্রায় হইয়াছে।" নাটকখানিতে নাটকীয় বাস্তবতার বড় অভাব। অধিকাংশ সংলাপ পদ্যছন্দে। বলরাম চরিত্র ছাড়া অন্যান্য চরিত্রগুলি খুবই নির্জীব। ভক্তিভাব বর্জিত রোমান্টিক প্রেমের পৌরাণিক নাটকরচনার রীতি পরবর্তী কালে আর ছিল না। উৎকৃষ্ট নাট্যগুণ এবং অভিনয় সাফল্যের সম্ভাবনা নাটকখানিতে-খুবই কম। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে কীর্তিবিলাস ও ভদ্রার্জুন কখনও মঞ্চস্থ করা হয়নি।

বাংলানাটকের প্রথম পর্বে নাট্যসাহিত্যকে অনুবাদে সমৃদ্ধ করেছিলেন হরচন্দ্র ঘোষ (১৮১৭-১৮৮৫), কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) এবং রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-.৮৮৬)।

হরচন্দ্র ঘোষ সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্য সুপণ্ডিত উচ্চশিক্ষিত পদস্থ সরকারী কর্মচারী ছিলেন কিন্তু প্রতিভাবান্ নাট্যকার ছিলেন না। নাট্যামোদী ও নাট্যরসিকরূপে তিনি কয়েকখানি প্রসিদ্ধ নাটকের অনুবাদ করেন। তাঁর প্রয়াস প্রশংসনীয়, কিন্তু সাফল্য অর্জন করেন নি। Merchant of Venice অনুসরণে 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস' লেখা হয়। Portia হয়েছে ভানুমতী এবং Basanio হয়েছে চিত্তবিলাস; কিন্তু সেক্সপীয়রের প্রতিভাচিহ্ন নিশ্চিহ্ন হয়েছে। Romeo-Juliet নাটকের অনুবাদের নাম 'চারুমুখচিত্তহরা'। তিনি কাশীদাসী মহাভারতের আখ্যান নিয়ে কৌরব বিয়োগ (১৮৫৮) নাটক লেখেন এবং ব্রহ্মদেশীয় একটি উপাখ্যান অবলম্বনে 'রজতগিরি-নন্দিনী' নামক নাটক লেখেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর কোন নাটকই কালজয়ী হয়নি, শুধু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে।

কালীপ্রসন্ন সিংহের অসাধারণ খ্যাতি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র জন্য। কিন্তু তিনি বড় নাট্যামোদী এবং রঙ্গমঞ্চের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নাটকরচনা এবং অভিনয়ের জন্য তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করতেন। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণের ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ বেশ উল্লেখযোগ্য ইতিহাস হয়ে রয়েছে। "বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার" (১৮৫৬) নামে একটি রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করে ইনি নিজেই নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। প্রথমে 'বাবু' নামে একখানি নাটক লেখেন। কালিদাসের অনুবাদ 'বিক্রমোর্বশী' এবং ভবভূতির অনুবাদ 'মালতী মাধব' নাটক তাঁর অনুবাদমূলক রচনা এবং মৌলিক পুরাণ-কাহিনীর নাটক 'সাবিত্রী-সত্যবান্' তাঁরই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহের নাটক নাট্যসাহিত্যের ধারাকে প্রবাহমান রেখেছিল কিন্তু ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করেনি।

রামনারায়ণ তর্করত্ন নাট্যসাহিত্যের স্থায়ী খ্যাতি অর্জন করে 'নাটুকে রামনারাণ' নামে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত একটানা নাট্যসাহিত্যের সেবা

করেছেন এবং কিছু কীর্তিও রেখেছেন। তাঁর অনূদিত নাটকগুলি তেমন প্রশংসা পায়নি। ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার', শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী', কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা', ভবভূতির 'মালতীমাধব' নাটক অনুবাদ করে সুধীসমাজে প্রশংসিত হন। ইনি কয়েকখানি পৌরাণিক নাটক রচনা করেন। রুক্মিণীহরণ (১৮৭১), কংসবধ (১৮৭৫), ধর্মবিজয় (১৮৭৫). উল্লেখযোগ্য। তবে সামাজিক নাটক রচনাদ্বারাই রামনারায়ণ বাংলা নাট্যসাহিত্যের তোরণদ্বার উন্মোচন করার গৌরবে গৌরবান্বিত। ১৮৫৪ সালে তাঁর প্রথম নাটক 'কুলীনকুল সর্বস্ব' প্রকাশিত হয়। কৌলীন্যপ্রথার দোষ দেখিয়ে এই নাটকখানি লিখে তিনি পুরস্কার পেয়েছিলেন। এই নাটকে উৎকৃষ্ট নাট্যগুণ ছিল না। কৌতুকপূর্ণ দৃশ্য পরম্পরায় কয়েকটি কৃত্রিম চরিত্রের আনাগোনা ও কৃত্রিম সংলাপ কখনই শিল্পসম্মত হয় না। পাত্রপাত্রীদের নামকরণও অবাস্তব। অনৃতাচার্য, বিবাহবণিক, বিবাহবাতুল, অভব্যচন্দ্র প্রভৃতি ব্যক্তির নাম নয়, ব্যক্তির বিশেষণ বটে। উদ্দেশ্য অত্যধিক প্রকট বলে রচনা রসোত্তীর্ণ হয়নি। এত দোষ থাকা সত্ত্বেও প্রথম সামাজিক নাটক রচয়িতারূপে রামনারায়ণ কৃতী পুরুষ। গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে পারিতোষিক দিয়ে বহুবিবাহের দোষদর্শক 'নবনাটক' (১৮৬৬) লিখিয়েছিলেন। রামনারায়ণের অনুকরণে উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ নাটক', উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিধবোদ্বাহ', রাধামাধব মিত্রের 'বিধবা-মনোরঞ্জন' এবং অম্বিকাচরণ বসুর 'কুলীন কায়স্থ নাটক' লেখা হয়। নাট্যগুণের অভাব থাকা সত্ত্বেও এই নাটকগুলি ইতিহাসের ধারা রক্ষা করেছে। 'যেমন কর্ম তেমনি ফল', 'চক্ষুদান' এবং 'উভয়সংকট' নামক প্রহসন লিখে নাট্যসাহিত্যের আর একটি লঘু অথচ সার্থক দিক রামনারায়ণ উন্মোচন করেছিলেন।

মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন বিস্ময়কর প্রতিভার বিদ্যুৎ-দীপ্তি ছড়িয়ে দিয়ে। "মধুসূদনের করস্পর্শে পুরাণ প্রাণ-বন্ত হইয়া উঠিল, ইতিহাস সঞ্জীবিত হইল, সামাজিক জীবন নবজীবন লাভ করিল।" নাট্যশৈলীতে, ভাবে ও ভাষায় পূর্বতন নাটকের যে শৈথিল্যগুলি ছিল মধুসূদন সে সমস্ত অপনোদন করে যথার্থ নাটক সৃষ্টি করলেন। তাঁর প্রথম নাটক শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯) পুরাণ কাহিনীকে নাটকীয় দ্বন্দ্বে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। যযাতিকে কেন্দ্র করে শর্মিষ্ঠা ও দেবযানী চরিত্রে নারীত্বের দুটি দিক উদ্ভাসিত হল এবং নাটকের গঠনেও পাশ্চাত্ত্য রীতি অনুক্রমিত হল। দ্বিতীয় নাটক পদ্মাবতীতে (১৮৬০) গ্রীক পুরাণ কাহিনীর নবরূপায়ণ। কাহিনীর মধ্যে চমৎকার নাটকীয় সংঘাত এবং সংলাপের ভাষা অভিনয়োপযোগী। তারপর মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ নাটক কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১) ঐতিহাসিক ট্রাজেডি রচনার প্রথম সূত্রপাতরূপে ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করে রেখেছে। গ্রীক ও ইংরাজী নাটকের ঠিক প্রতিস্পর্ধী না হলেও কৃষ্ণকুমারী ঘটনায়, চরিত্রে এবং নাটকীয় সংবেদনে প্রথম শ্রেণীর নাটক। মধুসূদনের 'মায়াকানন' (১৮৭৪) এবং অসম্পূর্ণ নাটক 'বিষ না ধনুর্গুণ' তেমন উল্লেখযোগ্যই নয়। কিন্তু দুখানি প্রহসন

রচনায় তিনি অমর কীর্তি রেখে গেছেন। নব্যবঙ্গদের ব্যঙ্গ করে লিখেছেন 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) এবং প্রাচীন ধর্মধ্বজীদের কৌতুকচিত্র এঁকেছেন 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামক প্রহসনে। সংলাপে এবং নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টিতে আজও প্রহসন দুখানি অনতিক্রমণীয় হয়ে আছে।

প্রথম পর্বের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার হলেন **দীনবন্ধু মিত্র**। ইনি যথার্থ নাট্যপ্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বেই দীনবন্ধু নীলদর্পণ (১৮৬০) প্রকাশিত হয়। সে এক বিস্ময়কর আলোড়ন। নীলদর্পণই বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক সামাজিক নাটক। যথার্থ সামাজিক পটভূমিতে তিনি বাস্তব মানুষগুলি নিয়ে ব্যথিত মানবাত্মার চিরন্তন বেদনাকে মর্মরিত করে তুলেছিলেন। ভদ্রেতর চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি নাটকীয় দক্ষতার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর তোরাপ, আদুরি, ক্ষেত্রমণি, পদীময়রাণী সাহিত্যের ইতিহাসে অনন্যসাধারণ চরিত্র। মৃত্যুদৃশ্যগুলির বর্ণনায় যে অপূর্ব নাটকীয়তা তা প্রথম শ্রেণীর নাট্যকারের পরিচয় দেয়। বস্তুতঃ দীনবন্ধুই সর্বপ্রথম বাংলা নাট্য সাহিত্যকে একটা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেছিলেন। দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটক—নবীন তপস্বিনী (১৮৬৩), বিয়েপাগলা বুড়ো (১৮৬৬), সধবার একাদশী (১৮৬৬) লীলাবতী (১৮৬৭), জামাই-বারিক (১৮৭২) এবং কমলে কামিনী (১৮৭৩)। নীলদর্পণ এবং সধবার একাদশী নাট্যগুণে এতই সমৃদ্ধ যে আজও এদের নাট্যগুণ অতিক্রান্ত হয় নি। সামাজিক নাটকে গিরিশচন্দ্রের মঞ্চসাফল্য দীনবন্ধুর অনুকরণের ফলেই সম্ভব হয়েছিল। বাংলা নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধুর দান সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত হয়ে থাকবে সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন ২৫। বাঙলা নাটকের চরমোন্নতির যুগের (১৮৭২-১৯১২) কয়েকজন কৃতী নাট্যকার সম্বন্ধে আলোচনা কর।

উত্তর। ১৮৭২ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত চল্লিশ বৎসরে বাঙলা নাটক চূড়ান্ত উন্নতির সুযোগ লাভ করেছিল। আঙ্গিক, সংলাপ, ভাষা—সর্বক্ষেত্রেই এ অগ্রগতির লক্ষণ স্পষ্ট। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ থেকে ক্ষীরোদ প্রসাদ পর্যন্ত এ যুগ প্রসারিত। ঐতিহাসিক নাটক, ট্রাজেডী, প্রহসন—সর্বশ্রেণীর নাট্যরূপায়ণে এযুগ বাঙলা নাটকের 'স্বর্ণযুগ'।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতা জোড়াসাঁকোয় মধুসূদন সান্যালের বাড়ীতে প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় বা পাবলিক ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপিত হয়ে বাংলা নাট্যসাহিত্য দ্বিতীয় যুগের আবির্ভাব সূচিত করল। এ যুগের প্রথম উল্লেখযোগ্য নাট্যকার **জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর**। পাথুরিয়া ঘাটা ঠাকুরবাড়ীর মত জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারও বাংলা নাটক রচনার ও নাট্যাভিনয়ের যথেষ্ট পোষকতা করেছিল। এই পোষকতায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাত যথেষ্ট ছিল। জোড়াসাঁকো থিয়েটারে নব নাটকের নটীর ভূমিকা নিয়ে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম সম্পর্ক। কিছু

কাল পরে তিনি নিজেই নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিছু কিছু রোমান্টিক ও ঐতিহাসিক নাটক এবং প্রহসন রচনা করে গিরিশচন্দ্রের অব্যবহিত পূর্বে বাংলা নাট্যসাহিত্য এবং সৌখীন অভিনেতৃ সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। মাইকেল 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে রাণা ভীম সিংহের উক্তিতে দেশপ্রেমের স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই পন্থা অনুসরণ করে ঐতিহাসিক নাটকে দেশপ্রেমের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কন করলেন। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি ইতিহাস ও নাটক কোনটারই মর্যাদা রক্ষা করতে পারে নি। অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথই ঐতিহাসিক নাটকে স্বাদেশিক চেতনার প্রাধান্য স্থাপন করেন। ঠাকুর বাড়ীর স্বাদেশিক আদর্শের মধ্যে বর্ধিত হয়ে এবং নবগোপাল প্রবর্তিত 'হিন্দু মেলা'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বাদেশিক চেতনাকে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসেরই মত সহজভাবে গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৭৪ সালে পুরুবিক্রম, ১৮৭৫ সালে "সরোজিনী", ১৮৭৯ সালে 'অশ্রুমতী' এবং ১৮৮২ সালে 'স্বপ্নময়ী' নাটক। ইতিহাসাশ্রিত রোমান্টিক নাটকগুলি রচিত হলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাট্যকাররূপে সংবর্ধিত হলেন। 'পুরুবিক্রমে' আলেকজাণ্ডার ও পুরুর সংঘর্ষের পটভূমিকায় রোমান্টিক প্রেমের আখ্যান অনুসৃত হয়েছে এবং তাই প্রাধান্য পেয়েছে। 'সরোজিনী' নাটক আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণের পটভূমিকায়, 'অশ্রুমতী'র কাহিনী প্রতাপ ও মানসিংহের বিরোধের পটভূমিকায় এবং স্বপ্নময়ী নাটক বাংলা দেশে শোভা সিং এর উত্থানের পরিবেশে রচিত হয়েছে।

এদের প্রত্যেকটিতে স্বদেশ প্রেমের আদর্শ বহমান কিন্তু এদের কোনটিতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইতিহাস, স্বাদেশিকতা ও নাটকত্ব কোনটারই মর্যাদা রক্ষা করতে পারেন নি। মাঝে মাঝে তিনি নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু অতিনাটকীয়-তাব প্রাবল্যে ইতিহাস ও নাট্যধর্ম ব্যাহত হয়েছে। অতঃপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অভিনয়-যোগ্য কতকগুলি প্রহসন রচনা করে সে যুগের নাট্য সম্প্রদায়কে সহায়তা করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে 'কিঞ্চিৎ জলযোগ', 'হিতে বিপরীত', 'হঠাৎ নবাব' (ফরাসী নাট্যকার মলিয়রের অবলম্বনে) 'এমন কর্ম আর করব না' (অলীকবাবু নামে পরে প্রকাশিত) প্রহসনগুলি উল্লেখযোগ্য। 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নব্যপন্থী ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে ব্যঙ্গ করে লেখা। 'কিঞ্চিৎ জলযোগে' কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি কটাক্ষ আছে। কিন্তু তাতে ব্যক্তিগত বিদ্বেষের জ্বালা নেই। প্রহসনে চারিত্রিক অসঙ্গতি অপেক্ষা ঘটনা-সংস্থাপনের বৈচিত্র্যই কৌতুকরস সৃষ্টি করেছে।

'অলীক বাবু'তে নায়কঅলীক প্রকাশ মিথ্যা ভাষণকে আর্টরূপে অনুশীলন করেছে। আর নায়িকা হেমাঙ্গিনী বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' পড়ে মনে মনে আপনাকে উপন্যাসের নায়িকা গড়েছেন। বিশুদ্ধ কৌতুকরসবহ এই প্রহসনটিতে কোন ব্যক্তির বা সমাজের বিরুদ্ধে বিরাগ বা বিদ্বেষের কটাক্ষ নেই। বিরল আয়োজনে স্বল্প কথায় কৌতুকরস ঘনীভূত হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'পুনর্বসন্ত', 'বসন্তলীলা' ও 'ধ্যানভঙ্গ' এই তিনটি গীতিনাট্য সঙ্গীত সমাজে অভিনয়ার্থে রচনা করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনেকগুলি প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'অভিজ্ঞান শকুন্তল', 'মালবিকাগ্নিমিত্র', 'উত্তরচরিত', 'বিক্রমোর্বশী' প্রভৃতি। অবশ্য অনুবাদগুলি আদৌ সুখপাঠ্য হয়নি, অভিনয়ের দিক থেকেও সার্থক হতে পারেনি। তিনি দুটি ইংরেজী নাটকেরও অনুবাদ করেছিলেন—একটি সেক্‌স্‌পীয়রের 'জুলিয়াস সিজার' অপরটি 'রজতগিরি'।

বাংলা দেশের সর্বাপেক্ষা যশস্বী নাট্যকার **গিরিশচন্দ্র ঘোষ** (১৮৪৪-১৯১২) সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠাতাদের দলে ছিলেন। নটখ্যাতি বিস্তৃত হবার বেশ কিছু পরে ইনি রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা-মৃণালিনীর নাট্যরূপদান। এগুলি বিশেষ করে রঙ্গমঞ্চে ব্যবহার করার জন্যই লেখা হয়েছিল বলে সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় নি। গিরিশচন্দ্রের প্রথম দুই গীতিনাট্য 'আগমনী' ও 'অকালবোধন' নিতান্ত ক্ষুদ্র রচনা। এরপর গিরিশচন্দ্র 'দোললীলা', 'মায়াতরু', 'মোহিনী প্রতিমা' গীতিনাট্য লেখেন। এই গীতিনাট্যগুলি দর্শকদের মনোরঞ্জন করলেও সাহিত্যগুণ বর্জিত বলে পরবর্তী কালে বড় একটা অভিনীত হয় নি। গিরিশচন্দ্র প্রধানতঃ পৌরাণিক নাট্যকার রূপেই সমগ্র বাংলা দেশে অদ্ভুত গৌরব লাভ করেছেন। ইতিপূর্বেই মনোমোহন বসু যাত্রার ঢঙে কয়েকখানি পৌরাণিক নাটক লিখে বাঙালি দর্শকদের ভক্তিরসাপ্লুত চিত্তে আনন্দদান করতে সমর্থ হয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র সেই আদর্শটি নিজ ভাবনা চিন্তার অনুকূল করে প্রধানতঃ বাংলা রামায়ণ ও মহাভারত থেকে আখ্যান গ্রহণ করে অনেকগুলি মঞ্চসফল পৌরাণিক নাটক রচনা করলেন। তাঁর 'অভিমন্যু বধ', 'জনা' (১৮৯৪) এবং 'পাণ্ডব গৌরব' একদা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। উনবিংশ শতকের অষ্টম দশকের দিকে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রতি বাঙালার আস্থা ফিরে এসেছিল। 'ইয়ংবেঙ্গল' দল, রামমোহন পন্থী ও ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব খানিকটা খর্ব হলে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর শিষ্যসম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আবির্ভাবের ফলে ভারতীয় পৌরাণিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ফিরে আসতে লাগল। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকে তারই সূচনা। সেযুগে গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তার 'জনা' একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। জনা বীর পুত্রের জননী। এই গৌরব তাঁকে বীর মাতায় পরিণত করেছে। নাট্যকার কিছু নাটকীয় অতিরেক সত্ত্বেও জনাকে বাংলা রঙ্গমঞ্চের একটি বিখ্যাত চরিত্রে পরিণত করেছিলেন। গিরিশচন্দ্রের ভক্তিরসের নাটকগুলি (বিল্বমঙ্গল ১৮৮৮, চৈতন্যলীলা) তরল ভক্তিরসের অবারিত প্রাচুর্যে সে যুগের নাট্যমঞ্চ প্লাবিত করেছিল। এই আবেগোন্নত নাটকগুলি যাত্রার ঢঙে রচিত হলেও এতে নাট্যকারের অকপট হৃদয়ের পবিত্র আনন্দ-বেদনার কথাটি এমন স্নিগ্ধতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, নাটক হিসাবে এদের মূল্য যাই থাক না কেন—এ যুগের বাঙালির মানস বুঝতে হলে এই সমস্ত পৌরাণিক ও ভক্তিভাবের নাটকের সাহায্য নিতে হবে।

বিংশ শতাব্দীর সূচনায় 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলন নিয়ে বাংলা দেশে রাজনৈতিক উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়েছিল। গিরিশও এই আন্দোলনের উত্তাপে পৌরাণিক নাটক নিয়ে আর সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। দেশপ্রেমমূলক কয়েকখানি ঐতিহাসিক নাটক তাঁর সময়ের সৃষ্টি (সিরাজদ্দৌল্লা ১৯০৬, মীরকাশিম ১৯০৬, ছত্রপতি শিবাজী)। শোনা যায়, তিনি নাকি ইতিহাসের একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন অথচ দেখা যাচ্ছে, তিনি অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের গ্রন্থ থেকেই 'সিরাজদ্দৌল্লা' ও 'মিরকাশিমের' আখ্যান সংগ্রহ করেছেন। অন্য কোন উৎসের সন্ধান করেন নি। অহেতুক স্বাদেশিক উচ্ছ্বাস, স্থানকাল পাত্রের কালানৌচিত্য দোষ, নাটকায় বাস্তব ঘটনাকে মেলোড্রামার কাছে সমর্পণ এবং বিশ্বাস-অবিশ্বাস, স্বাভাবিক-অস্বাভাবিকের সীমাকে অবহেলা ভরে লঙ্ঘন করে যাওয়ার অনুচিত ঝোঁক গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকগুলিকে আধুনিক পাঠক ও দর্শকের রুচির প্রতিকূল করে তুলেছে। সুলভ উচ্ছ্বাস, অতি-নাটকীয়তা, অস্বাভাবিকতা ইত্যাদি মারাত্মক ত্রুটি না থাকলে এবং ঘটনা, চরিত্র ও সংলাপ সংযত হলে তাঁর 'সিরাজদ্দৌল্লা' সার্থক ঐতিহাসিক নাটকে পরিণত হতে পারত। তিনি যুগের দাবী মিটাতে গিয়ে ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন, কিন্তু নাট্যসাহিত্যের দাবী মিটাতে পারেন নি।

তদানীন্তন সমাজ ও পরিবারের সমস্যাসঙ্কুল উৎপীড়িত রূপকে ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯), 'হারানিধি', 'বলিদান', 'শাস্তি কি শান্তি', 'মায়াবসান' প্রভৃতি গার্হস্থ্য ধর্মী সামাজিক নাটক রচনা করেন। এই সকল নাটকে পারিবারিক বিরোধ, ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, কুমারীকন্যার বিবাহ সমস্যা, বৈধব্য সমস্যা, লাম্পট্য, মাতলামি, জুয়াচুরি, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি কলকাতার দৈনিক জীবনের হুবহু চিত্র ফুটে উঠেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে অর্থনৈতিক কারণেই বাঙালির একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন ধরেছিল, গিরিশচন্দ্র সে মর্মন্তুদ ভাঙনের ইতিহাস অনেকগুলি নাটকে খুলে দেখিয়েছেন। অবশ্য তাঁর সামাজিক নাটকগুলিতে তিনি অধিকাংশস্থলে বিশেষ কোন উৎকট সমাজসমস্যার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ করেননি এবং উক্ত করুণরসাত্মক নাটকগুলির পশ্চাতে সক্রিয় কোন শক্তিশালী অপ্রতিরোধ্য সমাজশক্তির অমোঘ তাড়নাও নেই। তন্মধ্যে 'প্রফুল্ল' নাটক বাংলা শ্রেষ্ঠ পারিবারিক ট্র্যাজেডী বলে বিখ্যাত হয়েছে। দোষেগুণে এটি গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। যোগেশের সামান্য চারিত্রিক দুর্বলতা থেকে কেমন করে তার 'সাজানবাগান শুকিয়ে' গেল সেই মর্মন্তুদ ঘটনা এখানে অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। তবে নাট্যকলা, কাহিনী ও চরিত্র বিচার করলে একে ততটা প্রশংসনীয় মনে হবে না। অতি-নাটকীয়তা, খুনজখম, মাতলামি প্রভৃতি ব্যাপারের এরূপ বাড়াবাড়ি হয়েছে যে, এর নাট্যরস ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সুতরাং প্রফুল্ল ট্র্যাজেডী হিসাবে আদৌ সার্থক হতে পারেনি।

নাট্যরচনার সংখ্যাধিক্যে গিরিশচন্দ্র বাংলাসাহিত্যে আজও সকলের ঊর্ধ্বে। বৈচিত্র্যহীনতার জন্য এই সংখ্যাধিক্যের মূল্য বেশী নয়। গিরিশচন্দ্রের অধিকাংশ নাটক অভিনয়ে উত্তীর্ণ হলেও নাটক হিসাবে বিশেষ গৌরবময় ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে পারেনি।

গিরিশচন্দ্রের নাটকে যে একনিষ্ঠ সরলতা লক্ষ্য করা যায় তা প্রশংসার যোগ্য হলেও, তাঁর নাটকের সাহিত্যগুণ ও রচনা কৌশল উন্নত নয়। সে যাই হোক, গিরিশচন্দ্র বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চ গড়ে তুলেছেন এজন্য বাংলা নাট্য সাহিত্যে তিনি চিরদিন, শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

গিরিশচন্দ্র যেমন নাটকে নতুনত্বের প্রবর্তন করেছিলেন **অমৃতলাল বসু** (১৮৫৩-১৯২৯) তেমনি প্রহসনে এবং বিদ্রূপাত্মক নক্‌শায় বৈচিত্র্য এনেছেন। অমৃতলাল কয়েকখানি নাটক রচনা করেছিলেন বটে, কিন্তু প্রহসন নকশার উপরই তাঁর যশের প্রতিষ্ঠা। ভাঁড়ামির ও ইতরতার আবর্জনা থেকে সমসাময়িক প্রহসনকে উদ্ধার করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাতে যে বিশুদ্ধ সরস কৌতুকের ধারা প্রবাহিত করেছিলেন অমৃতলালের রচনায় তা খানিকটা পুষ্টিলাভ করে। অমৃতলালের প্রথম রচনা 'হীরকচূর্ণ', বা গায়কোয়াড় নাটক। অমৃতলালের অপর নাটক হচ্ছে—'তরুবালা', 'বিমাতা', বা 'বিজয়-বসন্ত', 'হরিশচন্দ্র', 'আদর্শবন্ধু', 'নবযৌবন', 'যাজ্ঞসেনী' প্রভৃতি। কিন্তু নাটক হিসাবে এগুলির প্রায় কোনটিই সার্থক হতে পারেনি। তবে 'নবযৌবন' একখানি রোমান্টিক কমেডি। বাংলা সাহিত্যে ও রঙ্গমঞ্চে সুরুচি সঙ্গত স্বাভাবিক কমেডির একান্ত অভাব। সেদিক দিয়ে এ নাটকটি বিশেষ প্রশংসনীয়, স্নিগ্ধ এবং নির্মল হাস্যরসে আকণ্ঠমগ্ন। অমৃতলালের 'বিবাহ-বিভ্রাট', 'রাজাবাহাদুর', 'খাসদখল' এগুলিও হাস্যোদ্দীপক সামাজিক কমেডি। ঈষৎ বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও 'খাসদখল' ও 'রাজাবাহাদুর' একযুগে অতিশয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

অমৃতলাল সামাজিক অনাচার ও ব্যাধির বিরুদ্ধে বিদ্রূপ চাবুক হাতে নিয়ে প্রহসনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণসমাজ ইঙ্গবঙ্গী সম্প্রদায়, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ, স্ত্রী স্বাধীনতার বাড়াবাড়ি, মিউনিসিপ্যালিটির ভোটরঙ্গ ইত্যাদি নানা রঙ্গরসের ব্যাপার তাঁর প্রহসনের প্রধান অবলম্বন। 'একাকার', 'কালাপানি', 'অবতার', 'বাবু', 'বাহবা বাতিক' ইত্যাদি প্রহসনে বাঙালীসমাজের অসঙ্গতির দিকটিকে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে বিপর্যস্ত করা হয়েছে। অমৃতলাল সমাজসংস্কার ও রাজনৈতিক আন্দোলনে ঈষৎ প্রাচীনপন্থী ছিলেন। ফলে এই সমস্ত প্রহসনে তিনি কিছু কিছু প্রতিক্রিয়াশীল, পশ্চাদগামী মনোভাবের প্রশ্রয় দিয়েছেন। কিন্তু এরূপ তীক্ষ্ণ তীব্র বিদ্যুৎ-কশাঘাত, বাক্‌ভঙ্গীর এরূপ অট্টরোল মাঝে মাঝে নাটকীয় সংস্থানের এরূপ নিপুণ কৌশল বাংলা নাটকে কচিৎ দেখা গেছে। তাঁর 'চাটুজ্যে বাডুজ্যে', 'কৃপণের ধন', প্রহসনদ্বয়ে আক্রমণের উগ্রতা নেই, তাই অনেক বেশী উপভোগ্য হয়েছে। অবশ্য দুখানি প্রহসনই পাশ্চাত্ত্য নাটকের অনুকরণে লেখা।

বাংলাসাহিত্যে পরবর্তী যুগের উল্লেখযোগ্য নাট্যকার **দ্বিজেন্দ্রলাল রায়** (১৮৬৩-১৯১৩)। তিনি প্রথম জীবনে প্রধানতঃ ব্যঙ্গ-রঙ্গ ও প্রহসনধর্মী নাটক নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। 'কল্কি অবতার', 'বিরহ', 'ত্র্যহস্পর্শ', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'পুনর্জন্ম', প্রভৃতি প্রহসনগুলি একদা প্রশংসার সঙ্গে অভিনীত হলেও প্রহসন হিসাবে বিশেষ সার্থক হয়নি। দ্বিজেন্দ্রলাল তিনখানি পৌরাণিক নাটকে (পাষাণী, সীতা, ভীষ্ম) পুরাতন

কাহিনীকে নূতনরূপে উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর পাশ্চাত্ত্য ভাবরস-মুগ্ধ চিত্ত তাঁকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছিল। এই নাটক ত্রয়ের কাহিনীর উপস্থাপনে ও চরিত্রের তির্যকতা সৃষ্টিতে তিনি মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, কিন্তু নাট্যরস খুব গাঢ় হয়নি বলে এগুলি অভিনয়ে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নি।

দ্বিজেন্দ্রলাল গিরিশচন্দ্রের আদর্শে 'পরপারে' ও 'বঙ্গনারী' রচনা করেছিলেন। বলাই বাহুল্য সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রে তিনি কোনরূপ প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নি। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার খ্যাতি নির্ভর করছে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলির উপর। ইতিপূর্বে প্রায় সকল নাট্যকার ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন। গিরিশচন্দ্রও স্বাদেশিক আন্দোলনের আবেগতপ্ত পরিবেশে ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন; কিন্তু তিনিও ইতিহাসকে যথাযথ ভাবে নাটকে ব্যবহার করতে পারেন নি। অলৌকিকতা, অবাস্তবতা ও অনৈতিহাসিকতা তাঁর নাটকগুলিকে নষ্ট করে দিয়েছে। সেইদিক দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকের ঘটনা মুঘলযুগের রক্তরঞ্জিত, ষড়যন্ত্রমুখর, ভ্রাতৃঘাতী ও পিতৃ-দ্রোহের উল্লাসে উচ্চকিত। তাতে ঘটনাবেগের উদ্দামতা আছে বলে দ্বিজেন্দ্রলাল মুঘলযুগ ও রাজপুত বীরত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রচনা করেন 'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫), 'দুর্গাদাস' (১৯০৫), 'নূরজাহান' (১৯০৮), 'মেবার পতন' (১৯০৮), 'সাজাহান' (১৯০৯)। হিন্দুযুগ অবলম্বনে রচিত হয় 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১), ও 'সিংহল বিজয়' (১৯১৫)। তন্মধ্যে 'সিংহল বিজয়' দুর্বলতম রচনা। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে 'সাজাহান', 'নূরজাহান', ও 'চন্দ্রগুপ্ত' একদা বাংলার রঙ্গমঞ্চ মাতিয়ে তুলেছিল। 'সাজাহানে' পিতৃ হৃদয়ের ও সম্রাট-সত্তার দ্বন্দ্ব এবং 'নূরজাহানে' নারীপ্রকৃতির সঙ্গে ক্ষমতা লিপ্সার সংঘর্ষ সুন্দরভাবে ফুটেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল যে পাশ্চাত্ত্যরীতিকে সাক্ষাৎভাবে অনুসরণ করেছিলেন তার প্রমাণ এই নাটকগুলি। জীবনের এমন বিপুল গতিবেগ, স্বাদেশিকতার এমন বলিষ্ঠতা, এবং মহত্ত্বর আদর্শের এরূপ বিচিত্র সমাবেশ বাংলা নাটকে কদাচিৎ দেখা গিয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাস-সত্য প্রায়শই লঙ্ঘিত হয়নি। একমাত্র 'সিংহল বিজয়ে' ঐতিহাসিক উপাদানের অভাবের জন্য তাঁকে কিংবদন্তীর আশ্রয় নিতে হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটকে তিনি স্বেচ্ছায় কাহিনীকে বিকৃত করেন নি। ইতিহাসের তথ্য ও ঘটনাপঞ্জী যে কিরূপ জীবনরসে ভরে উঠতে পারে তা দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের মধ্যে উপলব্ধি করা যাবে।

অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের নানা-গুণ-সত্ত্বেও কতকগুলি মারাত্মক ত্রুটি আছে। অতি নাটকীয়তা ও গুরু-গম্ভীর আলঙ্কারিক ভাষা তাঁর নাটকের নাটকত্ব অনেকটা নষ্ট করে দিয়েছে। সংলাপ নাটকের প্রধান অঙ্গ। তাতে তিনি অতিরিক্ত কবিত্ব সঞ্চার করতে গিয়ে চরিত্রের ব্যক্তিত্বকে সেই পরিমাণ সুস্পষ্ট করতে পারেন নি। ভাষার এই কৃত্রিমতা তাঁর অধিকাংশ নাটকের স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ন করেছে। সে যাই হোক, জনপ্রিয়তার দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল অন্য প্রায় সকল নাট্যকারকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন তা স্বীকার করতে হবে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৪—১৯২৭) একদা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে অসাধারণ প্রভাব এবং দর্শক মহলে অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁর 'আলিবাবা', 'কিন্নরী', 'আলমগীর', 'রঘুবীর', 'রঞ্জাবতী', 'প্রতাপাদিত্য' বোধ হয় এখনও জনপ্রিয়তা হারায় নি। ক্ষীরোদপ্রসাদ নিজে উচ্চশিক্ষিত হয়েও জনপ্রিয়তার দাবী মেনে নিয়ে প্রয়োজন স্থলে কিছু কিছু নিম্ন গ্রামে সুর বাঁধতে দ্বিধা বোধ করেন নি। অবশ্য তাঁর মনটি অতিশয় উদার ছিল; দ্বিজেন্দ্রলালের মত পবিত্রতার শুচি-বাতিক ছিল না। তাঁর নাটকসমূহ ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, কাল্পনিক প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হতে পারে। ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে 'নন্দকুমার', 'প্রতাপাদিত্য', 'আলমগীর' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'প্রতাপাদিত্য বঙ্গের স্বাদেশিক আন্দোলনের পটভূমিকার রচিত। কাজেই অনৈতিহাসিক চরিত্র, ঘটনা ও স্বাদেশিক আবেগ ও উচ্ছ্বাস এতে অধিকতর প্রাধান্য লাভ করেছে। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীর' নাটকে ঔরংজেবের বিচিত্র চরিত্র দ্বন্দ্ব, আচায শিশিরকুমারের অভিনয়দক্ষতার গুণে অদ্যাপি খ্যাতি বজায় রেখেছে। তাঁর পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'বভ্রুবাহন', 'সাবিত্রী', 'ভীষ্ম', 'নরনারায়ণ', উল্লেখ করা যায়। তাঁর পৌরাণিক নাটকের বড় বৈশিষ্ট্য এতে গিরিশচন্দ্রের ভক্তিরসের প্লাবনের অল্পতা বা অভাব। গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটকের চারিদিকে এমন একটা ভক্তি ও করুণ রসের আবরণ টেনে দিয়েছিলেন যে, পুরাণের দেশ ও কাল বহুস্থানে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ যথাসম্ভব পুরাণকে অনুসরণ করেছেন এবং তারই মধ্যে চরিত্রগুলিকে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের দ্বারা আন্দোলিত করে, নাট্যরস জমাতে চেষ্টা করেছেন। নর-নারায়ণে কর্ণের অন্তর্দ্বন্দ্বে এবং 'ভীষ্মে'র অম্বার প্রতিহিংসাময়ী নারী চরিত্রের অভিনবত্বে এ যুগের দর্শকগণ মুগ্ধ হয়েছিলেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদের হালকাচালের কাল্পনিক নাটকগুলি সত্যই প্রশংসার দাবী রাখে। 'আলিবাবা'র (১৮৯৭) মত জনপ্রিয় গীতিমধুর নাটক বাংলাদেশে দুর্লভ। এই একখানি নাটক লিখেই তিনি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়েন। 'কিন্নরী'র অতি রোমান্টিক কল্পনা সে যুগের দর্শকদের মাতিয়ে তুলেছিল। কৌতুকরসে ক্ষীরোদপ্রসাদের বেশ অধিকার ছিল। তিনি ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকে কৌতুকরস প্রয়োগ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন বটে কিন্তু 'আলিবাবা'র মত তরল নাটকে সঙ্গীত—আধিক্যের প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহৃত কৌতুকরস পরম উপভোগ্য হয়েছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ দ্বিজেন্দ্রলালের মত উচ্চশ্রেণীর নাটক লিখবেন বলে পণ করে আসরে নামেন নি, পেশাদার নাট্যকার হিসাবেই তিনি নাটক রচনায় অগ্রসর হন। সেদিক দিয়ে তিনি সার্থক। কিন্তু তাঁর অধিকাংশ নাটক সাহিত্য হিসাবে যে ব্যর্থ হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন ১৬। বাংলা নাট্য-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান সম্বন্ধে একটি অনতিদীর্ঘ নিবন্ধ রচনা কর। (ক. বি. ১৯৬৫)

রবীন্দ্রপ্রতিভার স্পর্শে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের যে বিচিত্র বিকাশ ঘটিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (ক. বি., ১৯৬৩)

উত্তর। রবীন্দ্রনাথ প্রখ্যাত গীতিকবি। তাঁর প্রতিভা গীতিকবিতার মধ্যেই অমৃতময় স্পর্শ রেখে গিয়েছে। কিন্তু নাট্যসাহিত্যেও তাঁর দান নিতান্ত সামান্য নয়। তবে একথা সত্য যে তাঁর নাটকগুলিতে দৃশ্যত্ব-লক্ষণ অপেক্ষা কাব্যত্ব-লক্ষণই বেশি। তাঁর নাটকগুলি 'কবিমনেরই সুরভিত প্রকাশ।' টমসন বলেছেন, "His dramatic work is the venicle of ideas rather than the expression of action". রবীন্দ্রনাথও স্বয়ং এই সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। কোন কোন নাটককে তিনি নিজেই 'লিরিকের জলাভূমি' বলেছেন। তাঁর আরও দুই একটি উক্তি তাৎপর্যপূর্ণ। "চিত্রপটে প্রয়োজন নেই, আমার দরকার চিত্তপট। সেখানে শুধু সুরের তুলি বুলিয়ে ছবি জাগাব।" "এই সকল নাটক বাঁশির মতো, বোঝবার জন্যে নয়, বাজবার জন্যে।" এই সব উক্তি থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্য প্রচলিত নাট্যসাহিত্যের ব্যতিক্রম। তিনি নূতন ধরনে অভিনব আঙ্গিকে নাটকে বস্তুধর্মের স্থলে ভাবধর্মের সঞ্চার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যের প্রধান দুটি শ্রেণী। প্রথম জীবনে তিনি প্রচলিত প্রথানুসারে সাধারণ ঘটনা ধর্মী বা চরিত্রধর্মী নাটক লিখেছেন; পরবর্তী কালে নাটক হয়েছে স্বতন্ত্র শ্রেণীর। এগুলি প্রধানতঃ তত্ত্বাশ্রয়ী ভাবধর্মী নাটক। এই নাটকগুলিতে রূপক সঙ্কেতের সাহায্যে অমূর্ত ভাবরাজিকে প্রমূর্ত করবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই দুই শ্রেণীর নাটকেই রবীন্দ্রপ্রতিভা বিস্ময়কর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথানুগ নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজা ও রাণী (১৮৮৯), বিসর্জন (১৮৯০), মালিনী (১৮৯৬), প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯), গৃহপ্রবেশ (১৯২৫), শোধবোধ (১৯২৬) এবং রাজা ও রাণীর নবসংস্করণ তপতী (১৯২৯)। এই সব নাটকে তিনি মুখ্যতঃ সেক্সপীয়রীয় নাট্যরীতির অনুসরণ করলেও বস্তুনিষ্ঠা অপেক্ষা ভাবব্যঞ্জনাকে অধিকতর মূল্য দিয়েছেন। রাজা ও রাণী পঞ্চাঙ্ক ট্র্যাজেডি নাটক। দাম্পত্য সম্পর্কের ভাবদ্বন্দ্বই নাটকখানির প্রাণবস্তু। বিক্রম কর্তব্যবিমুখ হয়ে উদগ্র কামক্ষুধায় রাণী সুমিত্রাকে চায়, রাণী চায় রাজমহিষীর গৌরব, লোকমাতার ভূমিকা। শক্তিমত্তা ও কল্যাণ-বোধের দ্বন্দ্বে শক্তির ব্যর্থতায় নাটকের পর্যবসান। কুমার সেন ও ইলার প্রেমের একটি শাখা কাহিনী নাটকের ভাবরসকে গাঢ় করেছে। তবে নাটকখানি ভাবাতিশয্যে অনেকখানি মেলোড্রামা পর্যায়ে এসে গেছে। এই নাট্যকাহিনীর নব নাট্যরূপায়ণ তপতী। তপনের সেবিকা তপতী রইলেন রাজহংসীর মত। বিক্রমের তরঙ্গিত কামনাসাগরে তাঁর পাখা সিক্ত হল না; ট্র্যাজেডি হল অনিবার্য। রবীন্দ্রনাথ তপতী নাটকটিকে কিছুটা রূপকধর্মী তত্ত্ব নাটকে পরিণত করেছেন। বিসর্জন নাটকও পঞ্চাঙ্ক ট্র্যাজেডি। কাহিনীতে কিছুটা ইতিহাস-ভিত্তিও আছে। তবু সাধারণ নাটকের মত বস্তুধর্মের প্রাধান্য নেই। প্রেম ও প্রতাপের দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত জয়সিংহের প্রেমের কাছে রঘুপতির প্রতাপ-

শক্তির পরাজয় ঘটল। বিসর্জন ভাবধর্মী হলেও উন্নততর নাট্যসৃষ্টি। এই ভাবটি মালিনী নাটকেও সঞ্চারিত হয়েছে। ধর্মীয় প্রথা ও হৃদয়ধর্মের দ্বন্দ্বের কাহিনী এই নাটকের বৌদ্ধ কাহিনীটির বিশেষত্ব। চরম বেদনার মধ্য দিয়েই মালিনীকে সত্যধর্মের সন্ধান পেতে হল। গ্রীক ট্রাজেডির মত এই নাটকখানি ঘটনার দ্রুততায়, সংহতিতে এবং কাব্যধর্মে রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যে বিশিষ্ট হয়ে রয়েছে।

রাজর্ষি উপন্যাসের কাহিনীর ভিত্তি নিয়ে যেমন বিসর্জন নাটক, তেমনি বৌঠাকুরাণীর হাট উপন্যাসের বিষয় নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত নাটকের ঘটনা-সংস্থান। চরিত্রের ব্যক্তিত্ব বা ঘটনার সংঘাত এই নাটকে বেশি নেই। মহৎ আদর্শের জন্য দুঃখ ভোগের কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, তাহলেই শক্তিমদমত্ততার পাপ স্খালিত হয়। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে কৃষক-নেতা ধনঞ্জয়ের চরিত্র কল্পনা করা হয়েছে। নাটকখানিকে আরও ভাবধর্মী করে রবীন্দ্রনাথ 'পরিত্রাণ' নামে রূপান্তরিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক নাটককেই ভাবধর্মী ও ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ সংক্ষিপ্ত রূপ প্রদানের জন্য নূতন করে নূতন নামে পুনর্বার লিখেছিলেন।

পারিবারিক জীবন নিয়ে লেখা নাটক গৃহপ্রবেশ এবং শোধবোধ। শেষের রাত্রি নামক একটি গল্পকে ভিত্তি করে গৃহপ্রবেশ লেখা হয়। ভাবপ্রবণ গৃহস্বামী যথাসর্বস্ব ব্যয় করে প্রিয়তমার জন্য গৃহনির্মাণ করেছিল কিন্তু প্রিয়ার প্রেম পায় নি। নূতন গৃহে প্রবেশের পূর্বেই যক্ষ্মারোগে তার জীবনান্ত ঘটে। কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে পত্নীর অন্তর্গৃহে প্রবেশ করেছিল। কাজেই নাটকখানির ট্রাজিক পরিকল্পনার মধ্যে একটু সূক্ষ্ম সাংকেতিকতা লক্ষিত হয়। শোধবোধ কর্মফল নামক গল্পের নাট্যরূপ এবং সাধারণ নাটকের মতই বাস্তবধর্মী ঘটনাভিত্তিক এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। কিন্তু নাট্যকলার সুকুমার বৈশিষ্ট্য এ নাটকে নেই।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্যায়ের নাটক তত্ত্বপ্রধান, রূপকাশ্রয়ী এবং ব্যঞ্জনাধর্মী। দুই বস্তুর মধ্যে অভেদ কল্পনাই রূপক। এই জাতীয় নাটকে উপমেয় বিষয়ের প্রাধান্য থাকে না, উপমানটিই প্রধান হয়। একটি তত্ত্ব প্রতিপাদনের জন্য একটি কাহিনী উদ্ভাবন করতে হয়, অথচ কাহিনীটির একটি তত্ত্ব-নিরপেক্ষ পৃথক গল্পমূল্য থাকে। কোন সামাজিক, নৈতিক বা ধর্মীয় তত্ত্বকে পরিস্ফুট করবার জন্য কাহিনীর রূপক গ্রহণ করা হয়। সাংকেতিক নাটকে আভাস-ইংগিতের সাহায্যে ব্যাখ্যার অযোগ্য এক অরূপ রহস্যকে বলবার চেষ্টা থাকে। অতীন্দ্রিয় রহস্যরসকে ঘনীভূত করবার জন্য কোন একটা কাহিনী, চরিত্র বা প্রতীকের সাহায্য গ্রহণ করা হয়, অথচ সে কাহিনী বা চরিত্র তত্ত্বনিরপেক্ষভাবে পৃথক মূল্য বহন করে না। রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য নাট্যকার মেটারলিংক, ইয়েট্স্‌, স্ট্রিণ্ডবার্গ, ও'নীল প্রভৃতি কবি-শিল্পীদের অনুরূপ রূপক ও সংকেতের সহায়তায় তাত্ত্বিক নাটক লিখেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটক প্রায়ই অবিমিশ্র রূপক বা অবিমিশ্র সাংকেতিক নয়; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রূপক-সংকেত মিলেমিশে আছে।

তত্ত্বপ্রধান নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য শারদোৎসব (১৯০৮), রাজা (১৯১০), অচলায়তন, ডাকঘর (১৯১২), ফাল্গুনী (১৯১৬), মুক্তধারা (১৯২৪), রক্তকরবী

মধ্যে পাওয়া যাবে। প্রশ্নের ভাষায় প্রশ্নকর্তার অভিপ্রায় বোঝা যায়। তাঁর প্রত্যাশার দিকে লক্ষ্য রেখে ভূমিকা এবং উপসংহার রচনা করতে হবে। ২৫ নং প্রশ্নোত্তরে তথ্যের ও মন্তব্যের অভাব নেই।]

প্রশ্ন ৩৪। গ্রন্থ, গ্রন্থকার ও পত্র পত্রিকাগুলির সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

উত্তর। [নমুনা স্বরূপ পর্যায়ক্রমে কয়েকটি টীকা লিখে দেওয়া হল।]

অঙ্গুরীয় বিনিময়ঃ অঙ্গুরীয় বিনিময় বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইংরাজী গল্পের অনুকরণে এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছিলেন। কণ্টারের লেখা Romance of History নামে এক গ্রন্থ এক সময় শিক্ষিত বাঙ্গালীদের কৌতূহল উদ্রেক করিত। ঐ গ্রন্থানুসারে ভূদেবচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস নামে একখানি গ্রন্থ লেখেন। ঐ গ্রন্থের ২টি ভাগ। একটির নাম সফল স্বপ্ন, অপরটির নাম অঙ্গুরীয় বিনিময়। দুর্গেশনন্দিনী রচনার তিন বছর আগে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়।

অঙ্গুরীয় বিনিময় পুরাপুরি একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। কণ্টারের 'Romance of History গ্রন্থে 'The Marhatta Chief' নামে যে গল্পটি আছে ভূদেব সে গল্পটিকে নিজের কল্পনার রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া অঙ্গুরীয় বিনিময় নামে প্রথম ঐতিহাসিক Romance লেখেন। এই গ্রন্থখানি বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনীকে প্রভাবিত করিয়াছিল। ঔরঙ্গজীব ও শিবাজীর বিবাদের সময় মোগল রাজকন্যা রোসিনারা শিবাজীর হাতে বন্দিনী হয়। সেই অবস্থায় পরস্পরের প্রতি অনুরক্তি জন্মে এবং প্রেম-স্বীকৃতির চিহ্ন স্বরূপ আংটি বদল করা হয়। পরে সন্ধির সর্তানুসারে রোসিনারা পিত্রালয়ে যায়। ঔরঙ্গজীব ছলনার দ্বারা শিবাজীকে বন্দী করে, শিবাজী ততোধিক ছলনার দ্বারা মুক্ত হয় এবং রোসিনারাকে নিয়ে পলায়নের সুব্যবস্থা করে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে শিবাজীর ও রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য রোসিনারা শিবাজীকে পতিত্বে বরণ করিয়াও সহচারিণী হইতে চায় নাই। ভূদেব ঐতিহাসিক ঘটনাকে যথাযথ রাখিয়া কাহিনীকে Romantic প্রণয়কথার মতই উপভোগ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাষা সাবলীল না হওয়ায় এবং ঘটনা বর্ণনা অতি দ্রুত হওয়ায় নায়ক নায়িকার চরিত্রের সূক্ষ্ম সুকুমার বৃত্তিগুলির উন্মেষ না ঘটায় উপন্যাস-শিল্পরূপে অঙ্গুরীয় বিনিময় যথেষ্ট মর্যাদা লাভ করে নাই।

উদাসিনী কাব্যঃ উনবিংশ শতাব্দীতে আখ্যানমূলক কাব্যকথা রচনার রীতি প্রবর্তিত হয় এবং বহু কবি প্রণয়মূলক কাহিনী, বিষাদান্ত ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে আখ্যান কাব্য লিখিতেন। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহপাঠী ইংরাজী সাহিত্যের এম. এ. অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে উদাসিনী নামে এক রোমান্টিক আখ্যানকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কাব্যখানির কায়া গঠনে ও কাহিনী-বিন্যাসে ইংরাজী কবি পার্নেলের লেখা 'The Hermit' নামক কাব্যখানির সুস্পষ্ট প্রভাব

আছে। ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত এই কবির লেখা কাব্যখানির বহু জায়গায় বায়রণ এবং সেক্সপীয়ারের বহু বিখ্যাত উক্তি প্রতিফলিত দেখা যায়। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'উদাসিনী' কাব্যের প্রশংসামূলক সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

উদাসিনী কাব্য ৭টি সর্গে বিভক্ত। 'সরলা নাম একটি বালিকার আত্মকথা কাব্যখানির বিষয়বস্তু। প্রথম সর্গটি ভূমিকাস্বরূপ লিখিত। পথহারা এক পথিক গভীর অরণ্যে বনদেবীর সাক্ষাৎ পাইলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিলেন যে একটি মেয়ে অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জন করিতে যাইতেছে। পথিক সরলাকে নিবৃত্ত করিল। তারপর সরলা তাহার আত্মকথা বলিয়াছে। কাব্যখানির বাকী অংশ সরলার বিবৃতি। বিদর্ভের রাজা বিজয়ের কন্যা সরলা সুরেন্দ্র নামক একটি যুবককে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু ভাগ্য-বিপর্যয়ে সুরেন্দ্রের সঙ্গ-বিচ্যুত হইয়া পড়ে। তারপর বহু দুর্বিপাকের পর সন্ন্যাসী বেশী সুরেন্দ্রের সংগে বনদেবীর অনুগ্রহে সরলার মিলন ঘটিয়াছিল। এই কাব্য-কাহিনী অক্ষয় চৌধুরী স্বনামে প্রকাশ করেন নাই। পরবর্তী ইতিহাসে রোমান্টিক প্রেমের আখ্যানকাব্যরূপে যথেষ্ট স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

ডমরু চরিত : 'ডমরু চরিত' ব্যঙ্গ রচনা হইলেও বিশুদ্ধ কৌতুক ও রঙ্গের গ্রন্থ। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'ডমরু চরিত' গ্রন্থখানি বাংলা কৌতুক সাহিত্যের ইতিহাসে অনন্যসাধারণ। জন্মভূমি নামক পত্রিকায় ডমরু চরিতের গল্পগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে লেখকের মৃতুর পর ১৩৩০ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশ লাভ করে। অথচ গল্পগুলি লেখা হইয়াছিল ১২৯৮-১৩০২ সালের মধ্যে।

ডমরু চরিত কয়েকটি গল্পের সমষ্টি; কিন্তু সব গল্পগুলির নায়ক ডমরু ধর নামক এক অদ্ভুতকর্মা উদ্ভট চরিত্রের লোক। সেভাস্তের ডন্ কুইকসট এবং কোনান ডয়েলের শার্লক হোম্স্ এর মতই ডমরু ধর অদ্ভুত ধরনের ব্যক্তিত্ব এবং সাহিত্যের ইতিহাসে অমর। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়া ত্রৈলোক্যনাথ ডমরু ধরের ছদ্মবেশে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নানা রঙ্গ-চিত্র দেখিয়াছেন এবং সরল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। কল্পনার সঙ্গে কাল্পনিকতা মিশাইয়া নির্মল কৌতুকের যে একটি অফুরন্ত ফোয়ারা খুলিয়া দেওয়া যায়, ত্রৈলোক্যনাথের কৌতুক গল্প বিশেষতঃ ডমরু চরিত তাহার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে একমাত্র পরশুরামই ত্রৈলোক্যনাথের সার্থক উত্তরাধিকারী।

প্রবোধচন্দ্রিকা : ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা গদ্যের উন্মেষ ও বিকাশের যুগে 'প্রবোধচন্দ্রিকা' মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের একটি প্রতিভাদীপ্ত রচনা। মৃত্যুঞ্জয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন। প্রাচ্য বিভাগের অধ্যক্ষ কেরী সাহেবের নির্দেশে তিনি ৪ খানি বাংলা গদ্য গ্রন্থ লেখেন। তাঁহার এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছিল মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর অনেক পর ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। এই গ্রন্থখানি ভাষারীতির উৎকৃষ্ট নিদর্শনরূপে দীর্ঘকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

'প্রবোধচন্দ্রিকা' অসংস্কৃতজ্ঞদের সাহিত্য স্বাদ দিবার জন্য লিখিত গ্রন্থ। ভূমিকায় লেখক গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনায় বলিয়াছিলেন যে সংস্কৃতের মত সর্বোত্তমা ভাষা আর নাই এবং গৌড় দেশীয় ভাষা সংস্কৃত ভাষার যথার্থ অনুসারী। সুতরাং গৌড় দেশীয় ভাষায় গ্রন্থখানি রচনা করিয়া তিনি সংস্কৃত ভাষার স্বাদ বৈচিত্র্য দেখাইতে চাহিয়াছেন। 'প্রবোধচন্দ্রিকায়' অনেকগুলি লৌকিক গল্প আছে। কোন কোন গল্প বেশ কৌতুক-পূর্ণ এবং সরল ভাষায় লেখা। সংস্কৃতানুযায়ী গল্পগুলি তৎসম শব্দবহুল, সাধু ভাষায় রচিত। মেয়েলী গল্পগুলি সরল ভাষায় লেখা এবং কৌতুক গল্পগুলির স্থানে স্থানে মৃত্যুঞ্জয় চলিত রীতিরও প্রয়োগ করিয়াছেন। কাজেই এই গ্রন্থখানি বাংলা গদ্য রীতির এক অপূর্ব নিদর্শন হইয়া রহিয়াছে। মৃত্যুঞ্জয় যে পণ্ডিত ব্যক্তি, সাহিত্য-শিল্পী এবং রসিক ছিলেন 'প্রবোধচন্দ্রিকার' মধ্যে তাহার প্রচুর নিদর্শন রহিয়াছে।

প্রজাপতির নির্বন্ধ : রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসধর্ম ও কৌমার্য ব্রতের সমর্থক ছিলেন না। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে কৌমার্য ব্রহ্মচারী বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হইবার আগ্রহ ইংরাজী শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে দেখা দিয়াছিল। সেই সময়ে 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা সরলা দেবীর তাগিদে রবীন্দ্রনাথ চিরকুমার সভা নামে একটি কৌতুক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। ১৩০৭ সালের ভারতী পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। কৌমার্য ব্রতধারীদের মধ্যে নারীর সমাগম কি হাস্যকর উপায়ে ব্রতভঙ্গ করিয়া থাকে তাহারই কৌতুককর কাহিনী লেখা হইয়াছিল। ১৩১১ সালে হিতোবাদী সংস্করণ নামে যখন রবীন্দ্রগ্রন্থাবলী প্রকাশ করা হয় তখন 'চিরকুমার সভা' নামেই উপন্যাসখানি গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। ১৩১৪ সালে রবীন্দ্রগ্রন্থাবলীর পুনর্মুদ্রণ কালে যখন এই গল্পটি অষ্টম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তখন রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের নাম পরিবর্তন করিয়া 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' নাম দিলেন।

হিন্দু মতে বিবাহের দেবতার নাম প্রজাপতি, তাহার নির্বন্ধ অর্থাৎ অমোঘ নির্দেশে সংকল্পিত কৌমার্যের অবসান ঘটায়। এই তাৎপর্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্য নূতন নামকরণ হইয়াছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে সংলাপমূলক উপন্যাস কাহিনীটিকে নাট্যদৃশ্যে রূপান্তরিত করা সহজসাধ্য ছিল না। তাই ১৩৩২ সালে বৈশাখ মাসে শান্তিনিকেতনে অভিনয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথ কাহিনীর কোন কোন অংশ বাদ দিয়া প্রজাপতির নির্বন্ধের যে নাট্যরূপ দান করিলেন তাহার নামকরণ হইল পূর্বের সেই নামে 'চিরকুমার সভা'।

প্রজাপতির নির্বন্ধ ১৬টি পরিচ্ছেদে লিখিত সামাজিক জীবনচিত্রমূলক একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। আগাগোড়া ঘটনাগত কৌতূহল উপন্যাসখানিকে উপভোগ্য করিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং রাজনারায়ণ বসুর আদর্শে চন্দ্রমাধব বাবুর চরিত্রটি পরিকল্পিত। শ্রীশ, পূর্ণ ও বিপিন এই তিনটি তরুণকে নিয়া চন্দ্রবাবু চিরকুমার সভার সভাপতি। অক্ষয়কুমার শ্যালিকাদের বিবাহ নিয়া বিব্রত। বিধবা শ্যালিকা শৈলবালা পুরুষের ছদ্মবেশে তরুণ দলের সংগে মিশিয়া অবলাকান্তবাবু রূপে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাইল

যে অক্ষয়কুমারের শ্যালিকা বিবাহের সমস্যার সহজ সমাধান হইল। সৃষ্টি রক্ষার জন্য প্রজাপতি বিবাহ সংঘটন করান মনুসংহিতা হইতে প্রজাপতি-বন্দনার একটি শ্লোককে উপসংহারে উল্লেখ করিয়া উপন্যাস কাহিনীটি সমাপ্ত করা হইয়াছে। গার্হস্থ্য ধর্মের মহিমা ও মর্য্যাদা প্রকাশ উপন্যাসখানির মর্মগত তাৎপর্য।

ফুলমণি ও করুণা : খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ক্রিশ্চিয়ান ট্র্যাক্ট এ্যাণ্ড বুক সোসাইটি পুস্তকাদি প্রকাশ করিত। তাহাদের চেষ্টায় একটি বিদেশিনী মহিলা একখানি উপন্যাসকাহিনী রচনা করেন। লেখিকার নাম হ্যানা ক্যাথারিন মুলেন্স। ইনি উত্তম রূপে বাংলা ভাষা শিখিয়া একটি দেশী খ্রীষ্টান পরিবারের জীবনকথাবলম্বনে 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'—এই নামে একখানি গ্রন্থ লেখেন। গ্রন্থখানি ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশের ছয় বৎসর পূর্বে পারিবারিক জীবনচিত্র লইয়া গদ্য ভাষায় কাহিনী লেখা হইয়াছিল। তাই ফুলমণি ও করুণার বিবরণকে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের প্রথম বীজরূপে উল্লেখ করা যায়। ইংরাজীতে একখানি গ্রন্থ ছিল The last day of the week নামে। একটি ইংরাজ পরিবারের সাপ্তাহিক জীবনের শেষ দিনে যেরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল সেইরূপ ঘটনা ফুলমণি ও করুণার বিষয়। লেখিকা পাত্র পাত্রীর বাঙালী নাম দিয়া ঐ ইংরাজী আখ্যানটির ছায়াবলম্বনে বাংলা উপন্যাসখানি লিখিয়াছিলেন।

একটি বিদেশিনীর পক্ষে সরল বাংলা ভাষায় পারিবারিক জীবনের ছবি অঙ্কন করা বিশেষ প্রশংসার বিষয়। এই উপন্যাসখানিতে ঘটনা-সংঘাত বা চারিত্রিক বিবর্তন নাই, কাহিনীও পূর্ণবৃত্ত নয়। শুধু একটি পরিবারের ঘর-কন্নার স্থূল বিবৃতি মাত্র। উপন্যাসের শিল্পগুণ রচনাটিতে নাই। কিন্তু ভাষার সরলতা ও চিন্তার পরিচ্ছন্নতা পুস্তকখানির উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব। খ্রীষ্টান গোড়ামী থাকায় ও হিন্দুয়ানীর প্রতি দ্বেষ প্রকাশ পাওয়ায় বাঙালী পাঠকসমাজে গ্রন্থখানি আদৃত ও প্রচারিত হয় নাই। কিন্তু দেশীয় খ্রীষ্টানদের জন্য পরিচালিত স্কুল-সমূহে দীর্ঘকাল এই গ্রন্থ-খানি পাঠ্য-পুস্তকের তালিকায় স্থান পাইয়াছিল। গ্রন্থখানির ভাষা সারল্যের একটু নিদর্শন উল্লেখ করা যাইতে পারে—"তখন আমি এই কথা শুনিয়া বলিলাম, করুণা, তুমি যদি একটি পয়সার অভাবে প্রযুক্ত পরিষ্কার কাপড় পরিতে পাও না, তবে আমি সে পয়সাটি তোমাকে দেই। তুমি ধোপার নিকট গিয়া দৌত শাড়ী পড়িয়া শীঘ্র গীর্জায় যাও।" এই গ্রন্থখানি সুদীর্ঘ কাল অনাদৃত ছিল। সাম্প্রতিক কালে পুর্নমুদ্রিত হইয়াছে।

মডেল ভগিনী : 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা গোষ্ঠীর সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু স্ত্রী-স্বাধীনতা, ধর্মীয় উদারতা ও প্রগতিবাদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ উপন্যাস রচনা করিতেন। সেই উপন্যাস সমূহের মধ্যে মডেল ভগিনী অন্যতম। স্ত্রীলোকের ইংরাজী শিক্ষার ও স্বাধীনতা-প্রিয়তার কুৎসিত পরিণাম দেখাইবার জন্য মডেল ভগিনী নামক এক উপন্যাস লেখা হয়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গবাসী পত্রিকায় মডেল ভগিনীর প্রকাশ ঘটে এবং গ্রন্থখানি অবিলম্বে সর্বাধিক প্রচার লাভ করিয়াছিল। কমলিনী নামক একটি শিক্ষিতা মেয়ে শাস্ত্রজ্ঞ সদাচারী নিরীহ স্বামীটিকে ছাড়িয়া তাহার অধ্যাপক এবং সহপাঠীদের

সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যমূলকতা রচনায় প্রাধান্য পাওয়ায় এত বড় প্রতিভাধর লেখকও সৃজনশীল জীবনধর্মী সাহিত্য রচনায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই।

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিখ্যাত কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি খুব বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও আবেগপ্রবণ তরুণ ছিলেন। কাব্য রচনায় খুবই উৎসাহী ছিলেন এবং 'যোগেশ' নামক একখানি আখ্যানকাব্য রচনা করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। 'চিত্ত মুকুর', 'বাসন্তী' ও 'চিন্তা' নামে কাব্য গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। 'সুধাময়ী' নামে একটি উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন কিন্তু রচনাটি অসমাপ্ত থাকে। তাঁহার রচনাগুলি প্রধানতঃ ভূদেব প্রকাশিত 'এডুকেশন গেজেট' এবং কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'বান্ধব' পত্রিকায় মুদ্রিত হইত। বঙ্গদর্শন ও ভারতীতেও 'চিন্তা' কাব্যের কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। ঈশানচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আখ্যান কাব্যের নাম 'যোগেশ'। পাশ্চাত্ত্য Narrative Poem-এর আদর্শে 'যোগেশ' কাব্য লেখা। শিক্ষিত ভদ্র যুবক যোগেশ জননী, ভগ্নী, পত্নী, পুত্র, ভ্রাতার সঙ্গে স্বাভাবিক জীবন যাপন করিতেছিল। কিন্তু মন্দাকিনী নামে একটি বিবাহিতা মেয়েকে ভালবাসিয়া সে যেন পাগল হইয়া গেল। বিবাহিতা এই মন্দাকিনীর প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ ত্যাগ করিতে না পারিয়া এবং মন্দাকিনী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া যোগেশ গৃহত্যাগ করিয়া আত্মহত্যা করে। কৌতূহলের বিষয় এই যে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও পাড়ার একটি গৃহবধূর প্রণয়ে ব্যর্থ হতাশায় ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন হাস্য রসের রাজা। নির্মল কৌতুকের অপূর্বসুন্দর কৌতূহল রচনায় তাঁহার মত দক্ষ শিল্পী সে যুগে আর কেউ ছিলেন না। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু। তিনি তাঁহার নিজস্ব রচনা রীতিতে লেখ্য ভাষা ও কথ্য ভাষা মিশাইয়া এমন উন্নততর স্তরের গল্প রচনা করিয়াছিলেন যাহার তুলনা বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় না। রূপ কথার ছাঁচে বিশুদ্ধ সাহিত্য রসের সৃষ্টি ত্রৈলোক্যনাথের সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব। কঙ্কাবতী নামে তিনি এক রূপকথার কাহিনীকে লুই ক্যারলের লেখা অ্যালিস্ ইন্ ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড গ্রন্থের আদর্শে রচনা করিয়াছিলেন। কঙ্কাবতী স্বপ্নে এক-ঠ্যাঙো মল্লুকে গিয়াছিল। সেখানে শ্রীমান্ ঘ্যাঁঘোভূত এবং তস্য পত্নী শ্রীমতী নাকেশ্বরীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইতে দেখে। ত্রৈলোক্যনাথ এই গ্রন্থে এমন কৌতুক সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে কোন ব্যঙ্গের হুল বা বিদ্রূপের জ্বালা নাই। ভূত প্রেতের

রাজ্য-কল্পনায় ত্রৈলোক্য নাথের জুড়ি আর নাই। ভুষুণ্ডির মাঠের লেখক পরশুরাম তাঁহার যোগ্য উত্তরাধিকারী।

ত্রৈলোক্যনাথের দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম ভূত ও মানুষ। জন্মভূমি পত্রিকায় তাঁহার গল্পগুলি প্রকাশিত হইত। উগোর লেখা 'টয়লার্স অফ্ দি সি' গল্পের অনুসরণে 'বাঙ্গাল নিধিরাম' গল্পটি লেখা। বীরবালা, লুল্লু এবং নয়নচাঁদের ব্যবসা এই তিনটি গল্পের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ অপূর্ব। হাসির বই তিনি অনেক লিখিয়াছেন। 'মুক্তামালা' বাংলার নব আরব্য উপন্যাস। 'ময়না কোথায়' বধূ নির্য্যাতন ও শুচিবায়ুর অপূর্ব কাহিনী। 'মজার গল্প', 'বিদ্যাধরীর অরুচি', 'এক ঠেঙ্গো ছকু' ও 'পাপের পরিণাম' হাসির ফোয়ারা সৃষ্টি করিয়াছে। ত্রৈলোক্যনাথের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য হইয়াছে 'ফোক্লা দিগম্বর' গল্পে এবং 'ডমরু চরিত' রচনায়। ফোক্লা দিগম্বর এক বিয়ে পাগলা বুড়ার কাহিনী। 'ডমরু চরিত' বাংলা সাহিত্যে এক অসাধারণ অনন্য গ্রন্থ। এই কাব্যের নায়ক ডমরুধর ডন্ কুইকসট্, শার্লকহোমস্ এবং কাই লুঙের মত অমর চরিত্র। সাহিত্যের ইতিহাসে এই গ্রন্থখানি চিরস্থায়ী মর্যাদার অধিকার লাভ করিয়াছে।

দামোদর মুখোপাধ্যায় : দামোদর মুখোপাধ্যায় বঙ্কিম চন্দ্রের এক ভ্রাতুষ্পুত্রের শ্বশুর ছিলেন। তিনি বঙ্কিমের তুলনায় বয়োকনিষ্ঠ। ১৮৫৩ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। সাহিত্য সেবাকে তিনি জীবনে অবসর বিনোদনের প্রধান কর্ম বলিয়া মনে করিতেন। রোমাঞ্চকর ঘটনা ও খুন জখম লইয়া গল্প রচনা করিতে বড় উৎসাহী ছিলেন। তাঁহার এ জাতীয় কয়েকখানি উপন্যাস ১২৮১ সালের মাঘ মাস হইতে জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বিমলা, জয়দেবের চিঠি, দুই ভগিনী, সোনার কমল এইরূপ অনেকগুলি উপন্যাস ইনি লেখেন। দুইখানি বিখ্যাত ইংরাজী উপন্যাসের বাংলা রূপান্তর করিয়াছিলেন। স্কটের 'দি ব্রাইড্ অফ্ ল্যামার মুর' উপন্যাসের অনুবাদ হইয়াছিল 'কমলকুমারী নামে'। কলিন্সের The Woman in White উপন্যাসের অনুবাদ হয় শুক্লবসনা সুন্দরী নামে। দামোদর মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে খ্যাতিমান হইয়াছিলেন একটি কুকীর্ত্তির দ্বারা। বঙ্কিমের দুখানি উপন্যাসের পরিশিষ্ট রূপে তিনি যে দুইখানি উপন্যাস লেখেন সমালোচকেরা তাহার নিন্দা করিয়াছেন এবং বঙ্কিম প্রতিভার প্রতি অপমান করার অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে উপস্থিত করিয়াছেন। তথাপি কপালকুণ্ডলার উপসংহার 'মৃন্ময়ী' উপন্যাস অভাবনীয় সমাদর লাভ করিয়াছিল। দুর্গেশনন্দিনীর পরিশিষ্ট রূপে 'নবাব নন্দিনী' বা 'আয়েষা' নামে তিনি যে উপন্যাসখানি লেখেন সেইখানি তত সমাদৃত হয় নাই। দামোদর বাংলা সাহিত্যে চমক দিয়াছিলেন কিন্তু স্থায়ী কীর্তি রাখিয়া যান নাই।

পরশুরাম ঃ বেঙ্গল ক্যামিকেলের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী বৈজ্ঞানিক রাজশেখর বসু স্বভাব-গম্ভীর স্বল্প-ভাষী ব্যক্তি ছিলেন। পরশুরাম ছদ্মনামে তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে কুঠার হস্তে আবির্ভূত হইয়া বাঙ্গালী পাঠককে চমক দিয়াছিলেন। তবে ভাগ্যের কথা সেই কুঠার ইস্পাতের তৈরী নয়, প্রাণপ্রদ জলদেবতার দাক্ষিণ্যে প্রাপ্ত স্বর্ণ কুঠার।

পরশুরামের রচনা রঙ্গ-ব্যঙ্গের ব্যাপার, বাঙ্গালী চরিত্রের দুর্বলতার প্রতি আঘাত। কিন্তু সেই আঘাত কখনও মর্মান্তিক হয় নাই। নির্মম কৌতুকের স্নিগ্ধ পরিবেশ রচনায় ত্রৈলোক্য নাথের পর একমাত্র পরশুরামই বাংলা সাহিত্যে অনন্যসাধারণ হইয়া আছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে রাজশেখরের জন্ম। তিনি রসায়ন শাস্ত্রে উচ্চতম উপাধি পাইয়াছিলেন। তাঁহার ভাই বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানবিদ্ গিরীন্দ্রশেখর বসু। কলিকাতায় পার্শী বাগানে ইঁহাদের পৈতৃক বাসস্থান। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ব্যঙ্গ চিত্র আঁকিয়া দিতেন এবং চলিত ভাষায় রাজশেখর কৌতুক গল্প লিখিতেন। এইভাবে ১৯২৪ সালে পরশুরাম বিরচিত নারদ বিচিত্রিত, 'গড্ডলিকা' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থের কচি সংসদ, ভুষুণ্ডীর মাঠ, চিকিৎসা সংকট প্রভৃতি গল্প এমন উচ্চস্তরের কৌতুক সৃষ্টি করিয়াছিল যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসু হইয়া এই লেখক সম্বন্ধে অদম্য কৌতূহল প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরশুরামের এই জাতীয় গ্রন্থ কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন ও গল্প সংগ্রহ। পরশুরাম গম্ভীর রচনায়ও কম সিদ্ধহস্ত ছিলেন না। 'পুরাণ প্রবেশ' নামে গবেষণামূলক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছিলেন সরস চলিত গদ্যে। তিনি পরিভাষা রচনা ও বাংলা বানান সমস্যা সমাধানে প্রভূত চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার আর একটি কৃতিত্ব 'চলন্তিকা' নামে একখানি অভিধান রচনা। এই অভিধানখানি তরুণ সাহিত্যিক ও শিক্ষার্থীদের নিত্য ব্যবহারের হ্যাণ্ড বুকের মত। কয়েক বৎসর পূর্বে রাজশেখর বসুর মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে।

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ ঃ ইনি বঙ্কিমের প্রায় সমসাময়িক ব্যক্তি। বঙ্কিম ঐতিহাসিক রোমান্সের যে পথ করিয়া দিলেন সেই পথে সরল পদক্ষেপ করিয়াছিলেন প্রতাপচন্দ্র ঘোষ। ইনি নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব লইয়া নানা আলোচনাও করিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র সাহিত্যিক কৃতিত্ব 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' নামক সুবৃহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে Calcutta Review পত্রিকায় উপন্যাসখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং এই ধরনের বিলাতী উপন্যাসগুলির সমকক্ষতার দাবী করেন। উপন্যাসখানি দুইটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ কাল ১৮৮৪

খ্রীষ্টাব্দ। উপন্যাসকাহিনীর নায়ক বংলার বীর রাজা প্রতাপাদিত্য। ইনি মোগল বাহিনীর সঙ্গে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ করিয়া পরাজিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন। পরে তাহাকে লাঞ্ছিত মৃত্যু বরণ করিতে হয়। প্রতাপচন্দ্র সুদীর্ঘ বর্ণনামূলক কাহিনীর মধ্য দিয়া প্রতাপাদিত্যের বিস্ময়কর জীবনকথা ব্যাপকভাবে বলিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে উপন্যাসখানির সমাদর হয় নাই। ভাষা বড়ই নীরস ও অমসৃণ, কাহিনীগুলি অতিরিক্ত দীর্ঘ, পরস্পর বিশ্লিষ্ট এবং স্পষ্টত: পরিণামমুখী নয়। ইতিহাসের যথাযথ অনুকরণ করিতে গিয়া লেখক প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন, কিন্তু কল্পনার স্বর্ণসূত্রে ঘটনাগুলিকে গ্রন্থন করিতে না পারার জন্য রচনাটি ব্যর্থ হইয়াছে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় : ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি হিন্দু কলেজে মধুসূদনের সহপাঠীরূপে বিদ্যার্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা শিক্ষা তাঁহাকে সাহেবিয়ানায় অনুপ্রাণিত করে নাই। তিনি মনে প্রাণে ও আচার আচরণে বরাবরই বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের আদর্শ অনুসরণ করিতেন। জীবনে তিনি শিক্ষাব্রতীরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সরকারী শিক্ষাবিভাগে উচ্চপদের অধিকারী ছিলেন।

ভূদেবচন্দ্র সৃজনশীল সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন নাই। তিনি শিক্ষামূলক জাতি গঠনের আদর্শ গ্রহণ করিয়া সাহিত্য সেবা করেন। তাঁহার সাহিত্য জীবনের সূচনা হইতেই তিনি গদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রথমে তিনি স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস নামে একখানি কৌতুকমিশ্র রূপক রচনা করেন। পরে কণ্টারের লেখা 'রোমান্স অফ হিষ্ট্রি' গ্রন্থের ইণ্ডিয়া নামক অংশ অনুসরণে 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামে ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখেন, কাজেই উপন্যাস রচনায় তিনি বঙ্কিমেরও অগ্রজ। ভূদেবচন্দ্র পরিণত বয়সে সদাচার ও গৃহধর্মের শিক্ষাত্মক আদর্শ প্রচারের জন্য পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ ও আচার প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। ইংরাজী শিক্ষার গভীরতার সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির উদার সম্মেলন দ্বারা ভূদেবের চরিত্র গঠিত হইয়াছিল। তাঁহার সাহিত্যে ইহারই প্রতিফলন দেখা যায়। হিন্দু কলেজের তিনজন কৃতী পুরুষ হইলেন— বিপ্লবপন্থী মধুসূদন, সংস্কারপন্থী রাজনারায়ণ এবং সংস্থানপন্থী খাঁটি ভারতীয় ভূদেবচন্দ্র। উনবিংশ শতাব্দীর প্রখর মধ্যাহ্নে বাংলা সাহিত্যগগনে এই ত্রি-সূর্যের উদয় হইয়াছিল। ইনি দীর্ঘজীবী ছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ভূদেবের মৃত্যু ঘটে।

যোগীন্দ্রনাথ বসু : যোগীন্দ্রনাথ বসু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মাইকেলের Boswell নামে খ্যাত। যোগীন্দ্রনাথ বসুর প্রধান কৃতিত্ব মহাকবি মধুসূদনের প্রথম সার্থক মূল্যায়ণ। ইনি মধুসূদনের জীবনী লিখিয়াছিলেন। কিন্তু সে জীবনী শুধু

জীবনের ঘটনা বিবৃতি মাত্র নয় একটি বিরাট কবি-জীবনের আভ্যন্তরীণ তাৎপর্যের উদ্ঘাটন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন দত্তের একটি প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থে মধুসূদনের ব্যক্তিগত পত্রাবলীর বিশদ উল্লেখ করিয়া রোমান্টিক বিদ্রোহী কবি মধুসূদনের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং মধুসূদনের সব রকম রচনাবলীর প্রণালীবদ্ধ আলোচনা দ্বারা ঐ কাব্যে অনুপ্রবেশের পথ সুগম করিয়াছিলেন।

যোগীন্দ্রনাথ বসু নিজেও কাব্য রচনা করিতেন। তিনি দুইখানি মহাকাব্য রচনার চেষ্টাও করিয়াছেন। বাংলা ১৩২২ সালে ভারতে প্রথম মুসলমান আক্রমণের কাহিনী অবলম্বনে 'পৃথ্বীরাজ' নামে এক বিরাট মহাকাব্য লেখেন। তিন বৎসর পর তিনি মহারাষ্ট্রের বীর নায়ক শিবাজীর জীবনকথা অবলম্বনে 'শিবাজী' নামেও একটি মহাকাব্য লেখেন। তবে দুঃখের বিষয় এই যে মহাকাব্য রচনার প্রতিভা যোগীন্দ্রনাথের ছিল না। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার এই মহাকাব্য দুইখানি তুচ্ছ রচনা রূপে অবহেলিত হইয়াছে।

নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শন: বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবর্তিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা শেষ পর্যন্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদকতায় বন্ধ হইয়া যায়। কিছুকাল পরে বঙ্গদর্শনের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা হয়। তখন শ্রীশচন্দ্রের ভ্রাতা শৈলেশচন্দ্র সম্পাদনার কাজ করিতেন। রবীন্দ্রনাথকে সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইলে অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে কবি ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। তিনি লিখিয়াছিলেন "বঙ্গদর্শনের সম্পাদকী লইবার জন্য বন্দুকের দুই চোঙভরা অনুরোধ আমার মস্তকে বর্ষিত হইয়াছে কিন্তু ধরাশায়ী হই নাই।" শ্রীশচন্দ্র মজুমদার রবীন্দ্রনাথকে রাজী করাইলেন এবং বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন বন্ধ হইবার আঠারো বছর পরে নূতন করিয়া বঙ্গদর্শন প্রকাশের ব্যবস্থা হইল। শ্রীশচন্দ্র লিখিলেন "বঙ্গদর্শন পুনর্জ্জীবিত হওয়ায় আমার চিরন্তন ক্ষোভ দূর হইল। বঙ্গের প্রধান সাময়িক পত্র আমার হস্তে লোপ পাইয়াছিল; ইহাতে আমি বড় লজ্জিত ছিলাম। সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গদর্শনের সম্পাদন ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হওয়ায় আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি।" এই সময় নূতন পত্রিকার নাম রাখা হইল 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন'। ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। রবীন্দ্রনাথ পরে লিখিয়াছিলেন "বঙ্গদর্শনের নবপর্য্যায়ে আমার নাম যোজনা করা হল। তাতে আমার প্রসন্ন মনের সমর্থন ছিল না। কোন পূর্বতন খ্যাতির উত্তরাধিকার গ্রহণ করা সংকটের অবস্থা, আমার মনে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সংকোচ ছিল।"

রবীন্দ্রনাথ নবপর্যায় বিশেষণ দ্বারা পত্রিকাটিকে বঙ্কিম হইতে বিশিষ্ট করিয়া স্বতন্ত্র

করিয়া নিলেন। তিনি উৎসাহের সঙ্গে ভারতীয় আদর্শ এবং বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মের পক্ষাবলম্বন করিয়া বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন। এই কার্যে তাঁহার সহকারী হইয়াছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং জগদীশচন্দ্র বসু। ব্রহ্মবান্ধব 'হিন্দুজাতির একনিষ্ঠা' নামক প্রবন্ধ লেখেন। রামেন্দ্রসুন্দর লেখেন 'বিংশ শতাব্দীর যুগধর্ম' এবং 'সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার'। রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আদর্শ, স্বদেশ, ভারতবর্ষ প্রভৃতি বহু প্রবন্ধ নবপর্যায়ে লিখিয়াছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ তত্ত্ব এবং জীববিজ্ঞান লইয়া রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ নবপর্যায়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত 'চোখের বালি' নামক উপন্যাসখানি নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। কিন্তু পত্রিকা সম্পাদনা এবং পত্রিকা পরিচালনা এক জিনিষ নয়। রবীন্দ্রনাথ পত্রিকাখানিকে প্রবন্ধে, উপন্যাসে এবং সাহিত্যালোচনায় সমৃদ্ধ করা সত্ত্বেও পত্রিকাটি স্বাবলম্বী হয় নাই, এবং অর্থাভাবে অল্পদিনের মধ্যেই এই পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হইয়া গেল। দেড় বছরেরও বেশী এই নবপর্যায় বঙ্গদর্শন পত্রিকাটি বাঁচিয়াছিল।

বান্ধব : কালীপ্রসন্ন ঘোষ পূর্ববঙ্গের বিদ্যাসাগর নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গদর্শন পত্রিকার সুযোগ্য সহায়করূপে জ্ঞান বিতরণ ও মননশীল প্রবন্ধ রচনার কাজে ঢাকা শহরে ১২৮১ সালে অর্থাৎ ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বান্ধব নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকা প্রকাশে তিনি মুখ্যতঃ বঙ্গদর্শন পত্রিকার সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুবর্তী ছিলেন।

বান্ধব পত্রিকায় যে সাহিত্যাদর্শ অবলম্বিত হইয়াছিল তাহাতে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কাব্য রচনার তীব্র বিরোধিতা করা হয়। বান্ধব পত্রিকা সাহিত্যে আনন্দবাদের সমর্থক ছিল না, হিতবাদের সমর্থক ছিল। চিন্তাশীল প্রবন্ধ রচনা দ্বারা জাতির মানসসংস্কৃতির উন্নয়ন এবং নীতিশিক্ষা প্রদানই পত্রিকাটির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। বোধ হয় এই কারণেই দীর্ঘদিন পত্রিকাটি রসিক মহলে প্রীতি উৎপাদন করে নাই। কালীপ্রসন্নের লেখনী স্তিমিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দশ বছরের মধ্যে পত্রিকাটির জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয়।

বান্ধব পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন স্বয়ং কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চন্দ্রনাথ বসু এবং ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী। কালীপ্রসন্ন ঘোষ নারী জাতি বিষয়ক প্রস্তাব, প্রভাত চিন্তা, নিশীথ চিন্তা, নিভৃত চিন্তা ও ভ্রান্তিবিনোদ নামক রচনা পত্রিকাখানিতে প্রকাশ করেন। চন্দ্রনাথ বসু 'শকুন্তলা তত্ত্ব' লিখিয়াছিলেন। তাঁহার 'ত্রিধারা' গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বান্ধব পত্রিকা প্রকাশের শেষ বৎসরে

ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিরোধিতা করিয়া 'কুঞ্জ' নামে একটি নূতন ধরণের উপন্যাস এই পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

বান্ধব পত্রিকায় একটি সমালোচনা বিভাগ ছিল। এই বিভাগে মীরমসারফ হোসেনের লেখা নাটক 'জমিদার দর্পণ', প্রহসন 'এর উপায় কি' এবং গদ্য কাব্য 'বিষাদ সিন্ধুর'-র সুবিস্তৃত প্রশংসামূলক সমালোচনা করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার বিরূপ সমালোচনা করা হইত। ভারতী পত্রিকার বিরুদ্ধাচরণ করাই বান্ধব পত্রিকার অন্যতম বিশেষত্ব ছিল। বান্ধব পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্র বিরোধী 'নীরব কবিত্ব' নামক প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধগুলি রচনা করেন সেগুলি পরবর্তীকালে সাহিত্য নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কালীপ্রসন্নের জীবদ্দশায় বাংলা সাহিত্যের জগতে বান্ধব একটি শক্তিশালী সাময়িক পত্ররূপে গণ্য হইয়াছিল।

বিবিধার্থ সংগ্রহ : ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদকরূপে বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পত্রিকাটিতে জ্ঞান, বিজ্ঞান বিষয়ক নানা প্রবন্ধ, কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গবেষণার নানা বিষয় প্রকাশিত ও আলোচিত হইত। বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে পত্রিকাটির দান অনন্যসাধারণ। এই পত্রিকার সূত্রেই জানা যায় যে রাজা রামমোহন রায় গীতার পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। মধুসূদনের মেঘনাদ বধের সমালোচনা এবং শর্মিষ্ঠা নাটকের অভিনয় বিবরণ এই পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্পাদক রূপে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের রচনায় বক্তব্য বিষয়উপযোগী ভাষা ভঙ্গী ব্যবহৃত হওয়ায় বাংলা গদ্যের বিকাশে এই পত্রিকাখানির দান মূল্যবান বলিয়া পরি[illegible]ত হইয়াছে।

ভারতী : জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী থেকে একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ পত্রিকাটির নামকরণ করতে চেয়েছিলেন 'সুপ্রভাত'। কিন্তু সর্ববাদিসম্মতিক্রমে নাম রাখা হল 'ভারতী' এবং সম্পাদক নিযুক্ত হলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে অর্থাৎ ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ভারতীর জন্ম। দ্বিজেন্দ্রনাথের বহুপ্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

'ভারতী'র জন্মকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রিকাটির নিবিড় সম্বন্ধ। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গৃহশিক্ষকের উৎসাহে ম্যাকবেথ নাটকের অনুবাদ করে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখান। ঐ অনুবাদের অংশ-বিশেষ বিশেষতঃ ডাকিনীদের প্রসঙ্গ ১২৮৭ সালের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তার পূর্বেও ১২৮৪ সালে কিশোর রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদ কাব্যের যে বিরূপ সমালোচনা লেখেন তাও ছমাস ধরে ভারতীতে প্রকাশিত হয়। 'ভারতী'র প্রথম দুটি সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম ছোটগল্প 'ভিখারিণী' মুদ্রিত হয়। এই

পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ 'করুণা' নামে প্রথম একখানি উপন্যাস লিখেছিলেন। গ্রন্থখানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি।

১২৯০ সাল পর্যন্ত 'ভারতী'র সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। পত্রিকা-প্রকাশে প্রবল উৎসাহী ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তাঁদের অন্যতম পত্রিকা বালক ভারতীর সঙ্গে এক হল ১২৯৩ সালে। বিভিন্ন ব্যক্তির অস্থায়ী সম্পাদনার পর ১৩০৫ সালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং রাজনৈতিক চেতনা, প্রজাবিদ্রোহ, রাজদ্রোহ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তীক্ষ্ণ আলোচনার সূত্রপাত করেন। সেইজন্য 'প্রসঙ্গ কথা' নামে একটি বিভাগ খোলা হল। তাতে সাহিত্য-সমালোচনাও ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আষাঢ়' কাব্য, দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' সম্বন্ধে সমালোচনা করা হয়। গ্রাম্য সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করে লোকসাহিত্যের দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

রবীন্দ্রনাথ কাজের চাপে সম্পাদকত্ব ত্যাগ করতে বাধ্য হল। তাঁর ভগ্নি সরলাদেবী সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় ১৩০৭ সালে চিরকুমার সভা নামে রবীন্দ্রনাথ একখানি হাস্যরসাত্মক উপন্যাস লেখেন এবং রচনাটি ভারতীতে প্রকাশিত হয়। এই রচনাটিই পরে 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাস এবং 'চিরকুমার সভা' নামে প্রহসন হয়। ভারতী পত্রিকা ক্রমে বন্ধ হয়ে যায়; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের উন্মেষলগ্নে 'ভঃ' অর্থাৎ ভানুসিংহ ছদ্মনামে তিনি রচনা প্রকাশ করে পত্রিকাটিকে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ করে রেখেছেন।

সবুজ পত্র : ১৩২৩ সালে প্রমথ চৌধুরী বীরবল ছদ্মনামে সবুজ পত্র নামক মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন। পত্রিকাখানির তিনিই প্রতিষ্ঠাতা, তিনিই সম্পাদক। মননশীল সাহিত্য রচনার মহৎ আদর্শ সৃষ্টির জন্য পত্রিকাখানি প্রকাশ করা হইয়াছিল। চলিত গদ্যেও যে জ্ঞান-বিজ্ঞান-মূলক উচ্চতম স্তরের আলোচনা সম্ভব সবুজ পত্র তাহা প্রতিপাদন করিয়াছে। প্রমথ চৌধুরীর উৎসাহদাতা ও সহায়ক লেখক ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তরুণ লেখক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আর অতুলচন্দ্র গুপ্ত। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা উদ্বোধন করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ 'সবুজের অভিযান' নামক একটি বিখ্যাত কবিতায়। যে কবিতাটি শেষে "বলাকা" কাব্যের প্রথম কবিতার সম্মান পাইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা ও সমাজচিন্তা সম্বন্ধীয় কিছু কিছু প্রবন্ধ সবুজ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কালান্তর গ্রন্থে বাতায়নিকের পত্র নামে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা ভাষা-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রথম বাংলা প্রবন্ধটি সবুজপত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে এই প্রবন্ধটি বাংলাভাষা তত্ত্বের ভূমিকা গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ হইয়াছে। অতুল গুপ্তের 'কাব্য জিজ্ঞাসা' নামক গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি সবুজপত্রেই প্রকাশিত হইয়াছিল। সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী, কিরণচন্দ্র রায় প্রভৃতি চিন্তাশীল বিদগ্ধ লেখকেরা সবুজপত্র গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মননশীলতা, প্রকাশভঙ্গীর বক্রতা এবং বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিয়া সবুজপত্র কিছুদিন চলিয়াছিল। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র পাল এবং

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সবুজ পত্রের বিরোধী গোষ্ঠী। তাঁহারা নবতর আদর্শের অনুসরণ করিয়া 'নারায়ণ' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সবুজপত্রের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল না। তবে সমাজের উচ্চস্তরের চিন্তাবিদ মহলে প্রশংসিত হইত।

সমাচার দর্পণঃ বাংলার সংবাদ পত্রের ইতিহাসে 'সমাচার দর্পণ' খুবই উল্লেখযোগ্য পত্রিকা। কারণ এ পত্রিকাখানিকে বাংলা ভাষায় লিখিত প্রথম সাময়িক সংবাদ পত্র রূপে উল্লেখ করা হয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের পাদরীরা 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে বাঙালী পাঠকেরা প্রথম খবরের কাগজের রসাস্বাদন করিলেন এবং বাংলা গদ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইল। সমাচার দর্পণের সমকালেই 'দিকদর্শন' নামে একটি মাসিক পত্রিকার প্রকাশ হয়। 'সমাচার দর্পণ' সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল এবং পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন জন্ ক্লার্ক মার্শম্যান। কেহ কেহ বলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের 'বাঙ্গাল গেজেট' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকাই প্রথম সাময়িক পত্র। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়াছে যে গঙ্গাকিশোরের পত্রিকা ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে প্রকাশিত হয়, আর 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হইয়াছিল ঐ সালেরই মে মাসে। সুতরাং সমাচার দর্পণকেই আদি সাময়িক পত্রের সম্মান দেওয়া যায়।

সমাচার দর্পণে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার করা হইত, স্থানীয় সংবাদ পরিবেশন করা হইত এবং ভারতীয় পুরাণকাহিনীর কিছু বঙ্গানুবাদও প্রকাশ করা হইত। সমাচার দর্পণের প্রধান কাজই ছিল হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিকে গালাগালি করা। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উৎকট উদ্দেশ্য সাধিত না হইলেও এই পত্রিকাখানির মাধ্যমে বাংলা গদ্য ভাষায় আত্মপ্রকাশের চেষ্টা ফলবতী হইয়াছিল। রামমোহন, ভবানীচরণ, নীলরত্ন হালদার প্রভৃতি প্রাবন্ধিকেরা সমাচার দর্পণের প্রতিবাদে মুখর হইয়া বাংলা গদ্যের ভিত্তি পত্তন করেন। বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে সমাচার দর্পণের দান এই কারণেই উল্লেখযোগ্য হইয়া আছে।

সংবাদ প্রভাকরঃ সংবাদ প্রভাকর কবি ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত একটি বাংলা পত্রিকা। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে পত্রিকাটির প্রকাশ। এই পত্রিকা ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইয়া কিছুদিনের মধ্যেই ১৮৩৯ সালে ১৪ই জুন দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার সাপ্তাহিক, দ্বিসাপ্তাহিক, মাসিক এবং দৈনিক সংস্করণ ছিল। সংবাদ প্রভাকরই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা। সংবাদ পরিবেশন, রাজনৈতিক মন্তব্য, ইংরাজ শাসনের সমালোচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। রঙ্গলাল, দ্বারকানাথ অধিকারী, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই পত্রিকাতেই প্রথম সাহিত্যিক হাতেখড়ি লাভ করিয়াছিলেন। এই পত্রিকার সবচেয়ে বড় বিশিষ্টতা এই যে, ঈশ্বরগুপ্ত বহু প্রাচীন সাহিত্যের সংকলন ও সমালোচনা দ্বারা সাহিত্যের ইতিহাসের উপকরণ আহরণ করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদের কালী-কীর্তন সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। কবিওয়ালাদের জীবনী লেখেন। ভারতচন্দ্র

রায়ের জীবনবৃত্তান্ত লেখেন এবং তাঁহার বহু অপ্রকাশিত রচনাকে উদ্ধার করিয়া মুদ্রিত করিয়াছিলেন। বাংলা গদ্য ও পদ্য রচনার ইতিহাসে সংবাদ প্রভাকরের দান যৎসামান্য নহে।

সাধনা : ১২৯৮ সালে সাধনা পত্রিকার প্রতিষ্ঠা। ঐ বছর অগ্রহায়ণ মাসে দ্বিজেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রিকাখানির সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু সাধনার প্রাণস্বরূপ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথম সংখ্যা হইতেই ছোট গল্প, প্রবন্ধ, বৈজ্ঞানিক সংবাদ ও সাহিত্যালোচনায় পত্রিকাখানিকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা তিনি করিয়াছেন। তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিলাইদহে থাকিতেন। কাগজখানিকে মাসিক পত্রের :আদর্শস্থানীয় করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। প্রথম সংখ্যা হইতেই ইউরোপ-যাত্রীর ডায়েরী ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। হিন্দু সমাজ ও ব্রাহ্ম সমাজের বহু কলহ ও বিতর্কের বিবরণ সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময়ে চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সাহিত্য পত্রিকায় চন্দ্রনাথ বসু 'আহার তত্ত্ব' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাধনার একটি সংখ্যায় তার প্রত্যুত্তর দেন। চন্দ্রনাথ বসু হিন্দু ধর্মের সমর্থন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মানব ধর্মের দোহাই দিয়াছিলেন। পরে এই আহার তত্ত্বের জবাব দিয়াছিলেন ব্যঙ্গচ্ছলে একটি রস রচনায়। তার নাম 'কর্মের উমেদার'। অনেকের ধারণা হিং টিং ছটে তত্ত্বানুসন্ধানীদের প্রতি যে ব্যঙ্গ আছে তাহার সূচনা হইয়াছিল সাধনা পত্রিকায়। সাহিত্যের ইতিহাসে এই পত্রিকাখানির অন্যতম মূল্য এই যে রবীন্দ্রনাথের 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' এবং 'দালিয়া' নামক ছোট গল্পটি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাহা ছাড়া কলকারখানায় স্ত্রী-মজুর নিয়োগ সম্বন্ধে একটি সমস্যামূলক আলোচনা সাধনা পত্রিকার একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। স্ত্রী মজুর সমস্যা লইয়া বাংলা সাহিত্যে এইটিকেই প্রথম প্রবন্ধ বলা যাইতে পারে। সাধনা পত্রিকার আয়ুষ্কাল অল্প। দুই বছরের মধ্যেই পত্রিকা খানির বিলুপ্তি ঘটে। সাধনার অন্যতম লেখক ছিলেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। তাঁহার লেখা 'কৃতজ্ঞতা' নামক একটি উপন্যাস সাধনায় প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় পত্র

(প্রথমাংশ)

পালি সাহিত্য

সুভাসিত

Text 32—Subhāsita

বুদ্ধবাণীর সংকলন গ্রন্থের নাম ধর্মপদ। ২৬টি বর্গে বিভক্ত উপদেশাবলীর বিভিন্ন বর্গ থেকে গৃহীত শ্লোকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। নিম্নে শ্লোকগুলি বঙ্গানুবাদসহ প্রদত্ত হল এবং মূলগ্রন্থের শ্লোক সংখ্যাও নির্দেশিত হল। সুভাষিত শব্দের অর্থ সদুপদেশ, সদুক্তি, ইংরেজীতে যাকে wise saying বলে।

মূলপাঠ ১। Appamatto pamattesu suttesu bahujāgaro
Abalassaṃ va sighasso hitvā jāti sumedaso.

অপ্পমত্তো পমত্তেসু সুত্তেসু বহুজাগরো
অবলস্সং ব সীঘস্সো হিত্বা যাতি সুমেধসো। (ধম্মপদ-২১)

অনুবাদ—মেধাবী ব্যক্তি অন্যকে অতিক্রম করে যায়—যেমন যায় প্রমত্তদের মধ্যে অপ্রমত্ত, ঘুমন্তদের মধ্যে বহুজাগ্রত এবং দুর্বল অশ্বের তুলনায় দ্রুতগামী অশ্ব।

টীকা—পমত্তেসু—প্রমত্তেষু। শব্দের আদিতে যুক্তাক্ষর থাকে না। পালিতে শুধু 'স' ব্যবহার। অবলসসং—অবল+অশ্বং। সীঘস্সো—শীঘ্র+অশ্বঃ। হিত্বা—হা+ক্তাচ্।

২। Dunnigahassa Lahuno yatthakāmanipātino
Cittassa damatho sādhu cittaṃ dantaṃ sukhāvahaṃ.

দুন্নিগ্গহস্স লহুনো যত্থকামনিপাতিনো
চিত্তস্স দমথো সাধু চিত্তং দন্তং সুখাবহং। (৩৫)

যাকে সহজে নিগ্রহ করা যায় না, লঘু এবং যেখানে বাসনার বিষয় সেখানে ছুটে যায় এমন চিত্তকে ভালভাবে দমন করবে। কারণ চিত্ত সংযত হলেই সুখাবহ হয়।

দুন্নিগ্গহস্স—দুর্নিগ্রহস্য। লহুনো—লঘুনঃ। যত্থ—যত্র। দমথো—দম্ধাতু মধ্যম পুরুষে থস্ বিভক্তি। সাধু—ক্রিয়া বিশেষণ।

৩/। Na paresaṃ vilomāni na paresaṃ katākataṃ
Attano'va avekkheyya katāni akatāni ca.

ন পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কতাকতং
অত্তনো ব অবেক্‌খেয্য কতানি অকতানি চ। (৫০)

অপরের দোষত্রুটি এবং অপরের কৃতাকৃত দেখা উচিত নয়। নিজের কৃত কাজ এবং অকৃত কাজই অবলোকন করা কর্তব্য।

পরেসং—পরেষাং। বিলোমানি—দোষত্রুটিসমূহ। কতাকতং—কৃত+অকৃতং। অত্তনো—আত্মনঃ। অবেক্‌খেয্য—অব+ঈক্ষ ধাতু+বিধিলিঙ্ এয্য।

৪। Yathāhi puppharāsimhā kayirā māl guṇe bahū
Evam jātena maccena kattabbaṃ kusalaṃ bahum.

যথাহি পুপ্‌ফরাসিম্হা কযিরা মালাগুণে বহূ
এবং জাতেন মচ্চেন কত্তব্বং কুসলং বহুং। (৫৩)

যেরূপ পুষ্পরাশি থেকে বহু মালা তৈরী হয়, সেরূপে মর্ত্যভূমিতে জাত মানুষের বহু কুশল কর্ম অর্থাৎ ভাল কাজ করা কর্তব্য।

পুপ্‌ফরাসিম্হা—পুষ্পরাশিস্মাৎ। অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ, উষ্ম-নাসিক্যের বিপর্যাস ও নাসিক্যের হ-কারে পরিণতি। কযিরা—কুর্যাৎ। কৃ ধাতু পালিতে কর্ ধাতু। বিপর্যয় ও স্বরভক্তির ফলে কযিরা। মচ্চেন মর্ত্যেন। অন্যোন্য সমীভবনে ত্য=চ্চ।

Puttā m'atthi dhanaṃ m'atthi iti bālo vihaññati
Attā hi attano n'atthi kuto putto kuto dhanaṃ.

পুত্তা মত্থি ধনং মত্থি ইতি বালো বিহঞ্ঞতি।
অত্তা হি অত্তনো নত্থি কুতো পুত্তো কুতো ধনং। (৬২)

আমার পুত্র আছে, আমার ধন আছে—একথা ভেবে মূর্খই মারা পড়ে। আমি নিজেই নিজের নই। কোথায় বা পুত্র, কোথায় বা ধন।

মত্থি—মে+অস্তি। বালো—বালঃ=মূর্খ। বিহঞ্ঞতি—বিহন্যতে। ন্য=ঞ্ঞ।

৬। Selo yathā ekaghano vātena na samīrati
Evaṃ nindā-pasaṃsāsu na samiñjanti paṇḍitā.

সেলো যথা একঘনো বাতেন ন সমীরতি
এবং নিন্দা পসংসাসু ন সমিঞ্জন্তি পণ্ডিতা। (৮১)

শৈল যেরূপ গাঢ়বদ্ধ, বাতাসে নড়ে না—তদ্রূপ পণ্ডিত ব্যক্তিরা নিন্দা-প্রশংসায় বিচলিত হন না।

সেলো—শৈলঃ। সমীরতি—সম্+ঈর ধাতু লট্ তি। সমিঞ্জন্তি—সম্ পূর্বক ইঙ্গ ধাতু+লট্ অন্তি।।

৭। Yo sahassaṃ sahassena saṃgāme mānuse jine
Ekaṃ ca jeyyamattānaṃ sa ve saṃgāmaj'uttamo.

যো সহস্‌সং সহস্‌সেন সংগামে মানুসে জিনে
একং চ জেয্যমত্তানং স বে সংগামজুত্তমো। (১০৩)

যিনি সহস্র সংগ্রামে সহস্র মানুষের সঙ্গে যুদ্ধে জিতেছেন তার চেয়ে যিনি নিজের আত্মাকে জয় করেছেন তিনিই কিন্তু উত্তম সংগ্রামজিৎ।

জিনে—জিনেৎ। জেয্যং—জেয়ং। য-এর দ্বিত্ব ছন্দানুরোধে। সংগ্রামজুত্তমো—সংগ্রামজিৎ+উত্তমঃ। অন্ত্য ব্যঞ্জন লোপ এবং সন্ধিতে 'ই'-কার লোপ।

৮। Sabbe tasanti daṇḍassa sabbe bhāyanti maccuno
Attānaṃ upamaṃ katvā na haneyya na ghātaye.

সব্‌বে তসন্তি দণ্ডস্‌স সব্‌বে ভায়ন্তি মচ্চুনো
অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে। (১২৯)

সকলেই দণ্ডভয়ে ত্রস্ত হয়, সকলেই মৃত্যুকে ভয় পায়। সকলকে নিজের উপমাস্বরূপ মনে করে হত্যা করবে না, হত্যা করাবে না।

তসন্তি—ত্রসন্তি। দণ্ডস্‌স—দণ্ডস্য। কর্মে ষষ্ঠী। মচ্চুনো—মৃত্যোঃ। হনেয্য—হন্‌ধাতু বিধিলিঙ্। ঘাতয়ে—ঘাতয়েৎ। হন ধাতু ণিচ্ বিধিলিঙ্।

৯। Sabbe tasanti daṇḍassa sabbesaṃ jībitaṃ piyaṃ
Attānaṃ upamaṃ katvā na haneyya na ghātaye.

সব্বে তসন্তি দণ্ডস্‌স সব্বেসং জীবিতং পিয়ং
অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে। (১৩০)

সকলেই দণ্ডের ভয় পায়, সকলের কাছেই জীবন বড় প্রিয়। নিজের সঙ্গে তুলনা করে কাউকে মারবে না বা ঘায়েল করাবে না।

১০। Passa cittakataṃ bimbaṃ arukāyaṃ samussitaṃ
Āturaṃ bahusaṅkappaṃ yassa natthi dhuvaṃ ṭhiti.

পস্‌স চিত্তকতং বিম্বং অরুকায়ং সমুস্‌সিতং
আতুরং বহুসঙ্কপ্‌পং যস্‌স নত্থি ধুবং ঠিতি। (১৪৭)

এই ছবির মত চিত্রকরা বহু ক্ষতপূর্ণ সমুন্নত রোগজীর্ণ বহু কামনা জর্জরিত দেহটাকে দেখ। এই দেহের কোন ধ্রুব স্থিতি নেই।

চিত্তকতং—চিত্রকৃতং। অরুকায়ং—অরুস্কায়ং। অরুঃ+কায়ং; ক্ষতযুক্ত দেহ। সমুস্সিতং—সমুচ্ছ্রিতং। সম্+উৎ+শ্রিতং। ঠিতি—স্থিতি। মূর্ধন্যীভবন।

১১। Appassutā'yam puriso balivaddo va jīvati
Mamsāni tassa vaddhanati paññā tassa na vaddhati.

অপ্পস্সুতায়ং পুরিসো বলিবদ্দো ব জীবতি
মংসানি তস্স বড্‌ঢন্তি পঞ্‌ঞা তস্স ন বড্‌ঢতি। (১৫২)

অল্পজ্ঞানসম্পন্ন লোকটি বলীবর্দ অর্থাৎ ষাঁড়ের মত বেঁচে থাকে। তার গায়ের মাংস বাড়ে কিন্তু প্রজ্ঞাবুদ্ধি বাড়ে না।

অপ্পস্সুতায়ং—অল্পশ্রুতঃ+অয়ং। পুরিসো—পুরুষঃ। শৌরসেনী প্রাকৃতের প্রভাবে মধ্যস্বরের বিকৃতি। পঞ্‌ঞা—প্রজ্ঞা। জ+ঞ=ঞ্‌ঞ সমীভবন।

১২। Acaritvā brahmacriyam aladdhā yobbane dhanam
Jinna koñca'va jhāyanti khīna macche'va pallale.

অচরিত্বা ব্রহ্মচরিয়ং অলদ্ধা যোব্বনে ধনং
জিন্ন কোঞ্‌চাব ঝায়ন্তি খীন-মচ্ছেব পল্ললে। (১৫৫)

যারা যৌবনকালে ব্রহ্মচর্য পালন না করে অথবা ধনোপার্জন না করে তারা মাছশূন্য ডোবার ধারে বসে বৃদ্ধ বকের মত ধ্যান করে।

অলদ্ধা—অ—লভ্‌+ক্তাচ্‌। যোব্বনে—যৌবনে। প্রাকৃতের অনুকরণে মধ্য ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব। জিন্ন—জীর্ণ। কোঞ্চাব—ক্রৌঞ্চাঃ+ইব। খীণমচ্ছেব—ক্ষীণ-মৎস্য+এব।

১৩। Attā hi attano nātho kohi nātho paro siya
Attanāva sudantena nātham labhati dullavam.

অত্তাহি অত্তনো নাথো কোহি নাথো পরো সিয়া
অত্তনাব সুদন্তেন নাথং লভতি দুল্লভং। (১৫৬)

নিজেই নিজের প্রভু, অপর কে আর প্রভু হতে পারে? নিজেকে সুসংযত করলেই সে দুর্লভ প্রভু লাভ করে।

অত্তা—আত্মা। সিয়া—স্যাৎ। অসধাতু বিধিলিঙ্‌। অন্ত্যস্বর লোপ এবং স্বরভক্তি। অত্তনা'ব—আত্মনা+এব। সুদন্তেন—সু+দম্‌+তৃতীয়া। 'আত্মনা'র বিশেষণ।

১৪। Uttiṭṭhe nappamajjeyya dhammaṃ sucaritaṃ care
Dhammacārī sukhaṃ seti asmiṃ loke paramhi ca

উত্তিট্‌ঠে নপ্‌পমজ্জেয্য ধম্মং সুচরিতং চরে।
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্‌হি চ। (১৬৮)

ওঠ, ভুল করো না, সদাচরণের ধর্ম পালন কর। ধর্মাচরণকারী ইহলোকে এবং পরলোকে সুখে থাকেন।

উত্তিট্‌ঠে—উৎ+স্থা+বিধিলিঙ্। নপ্পমজ্জেয্য—ন প্রমাদ্যেত। ন+প্র+মদ্ ধাতু বিধিলিঙ্ এয্য। 'ন' এখানে উপসর্গের মত। জ্য=জ্জ। সেতি—শেতে। পরম্‌হি—পরস্মিন। স্মি=ম্‌হি বিপর্যয় এবং উষ্মধ্বনির মহাপ্রাণতা। যেমন প্রশ্ন—পন্‌হ, উষ্ণ—উণ্‌হ।

Na kahāpaṇa vassena titti kāmesu vijjati
Appassādā dukkhā kāmā iti viññāya paṇḍito.

ন কহাপণ বস্‌সেন তিত্তি কামেসু বিজ্জতি
অপ্‌পস্‌সাদা দুক্‌খা কামা ইতি বিঞ্‌ঞায় পণ্ডিতো। (১৮৬)

কার্ষাপণ অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রার বৃষ্টি করলেও বাসনার তৃপ্তি আসে না। কামনার স্বাদ অল্পকাল স্থায়ী এবং পরিণামে দুঃখকর জানলেই পণ্ডিত হওয়া যায়।

কহাপণ—কার্ষাপণ। ইরানীয় 'কর্ষ'=স্বর্ণমুদ্রা। তিত্তি—তৃপ্তি। বিজ্জতি—বিদ্যতে। অপ্পস্সাদা—অল্পস্বাদাঃ। বিঞ্‌ঞায়—বি+জ্ঞা+ল্যপ্।

১৬। Jayaṃ veraṃ pasavati dukkhaṃ seti parājito
Upasanto sukhaṃ seti hitvā jayaparājayaṃ.

জয়ং বেরং পসবতি দুক্‌খং সেতি পরাজিতো
উপসন্তো সুখং সেতি হিত্বা জয় পরাজয়ং। (২০১)

জয়লাভ শত্রুতার সৃষ্টি করে, পরাজিত ব্যক্তি দুঃখে অবস্থান করে। যিনি প্রশান্তচিত্ত তিনি জয়পরাজয় পরিহার করে সুখে থাকেন।

বেরং—বৈরং। উপসন্তো—উপশান্তঃ। হিত্বা—হা+ক্ত্বাচ্।

১৭। Ārogga paramā lābhā santuṭṭhi paramaṃ dhanaṃ
Bissāsa paramā ñāti nibbanaṃ paramaṃ sukhaṃ.

আরোগ্‌গ পরমা লাভা সন্তুট্‌ঠি পরমং ধনং
বিশ্বাস পরমা ঞাতি নিব্বাণং পরমং সুখং। (২০৪)

আরোগ্য পরম লাভ, সন্তুষ্টি পরম ধন, বিশ্বাস শ্রেষ্ঠ আত্মীয় এবং নির্বাণ পরম সুখ।

আরোগ্‌গ—আরোগ্য। বিস্‌সাস—বিশ্বাস। ঞাতি—জ্ঞাতি। জ্ঞ=ঞ্‌ঞ। শব্দের আদিতে যুক্তাক্ষর থাকে না।

১৮। Mā piyehi samāgañchi appiyehi kudācanaṃ
Piyānaṃ adassanaṃ dukkhaṃ appiyānañca dassanaṃ.

মা পিয়েহি সমাগঞ্ছি অপ্‌পিয়েহি কুদাচন
পিয়ানং অদস্‌সনং দুক্‌খং অপ্‌পিয়ানঞ্চ দস্‌সনং। (২১০)

প্রিয়ের সংস্রব করবে না, অপ্রিয়ের সংস্রবও কখন করবে না। প্রিয়কে না দেখলে দুঃখ হয়, অপ্রিয়কে দেখলেও ভাল লাগে না।

সমাগঞ্ছি—সম্+আ+গম্+লুঙ্। হওয়া উচিত সমাগচ্ছি। কুদাচন—কদাচন। আদ্যস্বরের বিকার ঘটেছে।

১৯। Akkodhena jine kodhaṃ asādhuṃ sādhunā jine
Jine kadariyaṃ dānena saccena alīkavādinaṃ

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেন অলীকবাদিনং। (২২৩)

ক্রোধহীনতার দ্বারা ক্রোধকে এবং সাধুতার দ্বারা অসাধুতাকে জয় করবে। কদর্য অর্থাৎ কৃপণ ব্যক্তিকে জয় করতে হবে দানের দ্বারা এবং মিথ্যাবাদীকে সত্য দ্বারা।

জিনে—জিনেৎ। কদরিয়ং—কদর্যং; বিপ্রকর্ষ শব্দটির মৌলিক অর্থ নয়কৃৎ কৃপণ। সচ্চেন—সত্যেন।

২০। Na tena paṇḍito hoti yāvatā bahu bhāsati
Khemī averī abhayo paṇḍito ti pavuccati.

ন তেন পণ্ডিতো হোতি যাবতা বহু ভাসতি
খেমী অবেরী অভয়ো পণ্ডিতোতি পবুচ্চতি। (২৫৮)

বড় বড় কথা বললেই কেউ পণ্ডিত হয় না। যিনি সহিষ্ণু, যার কোন শত্রু নেই, যিনি নির্ভীক তিনিই পণ্ডিত বলে কথিত হন।

হোতি—ভবতি। খেমী—ক্ষেমী। অবেরী—অবৈরী। পবুচ্চতি—প্র+বচ্+কর্মবাচ্যে লট—প্রোচ্যতে। পণ্ডিতোতি—পণ্ডিতঃ+ইতি।

২১। Dūre santo pakāsenti himavanto'va pabbato
Asantettha na dissanti rattikhittā yathā sarā.

দূরে সন্তো পকাসেন্তি হিমবন্তো'ব পব্বতো
অসন্তেত্থ ন দিস্‌সন্তি রত্তিখিত্তা যথা সরা। (৩০৪)

সংব্যক্তি বরফঢাকা পর্বতের মত দূর থেকেও প্রকাশিত হন। যারা অসৎ ব্যক্তি রাত্রিতে নিক্ষিপ্ত বাণের মত তাদের দেখা যায় না।

পকাসেন্তি—প্রকাশয়ন্তে। অসন্তেত্থ—অসন্ত+এত্থ। রত্তিখিত্তা—রাত্রিক্ষিপ্তা। সরা—শরাঃ।

২২। Sukhā matteyyatā loke atho petteyyatā sukhā
Sukhā sāmaññatā loke atho brahmaññatā sukhā.

সুখা মত্তেয্যতা লোকে অথো পেত্তেয্যতা সুখা
সুখা সামঞ্ঞতা লোকে অথো ব্রহ্মঞ্ঞতা সুখা। (৩৩২)

ইহলোকে মাতার আনুগত্য সুখের, তথা পিতার আনুগত্যও সুখের। এখানে শ্রমণের আনুগত্য এবং ব্রাহ্মণের আনুগত্যও সুখ দেয়।

মত্তেয্যতা—মাত্রেয়তা। পিত্তেয্যতা—পৈত্রেয়তা। সামঞ্ঞতা—শ্রামণ্যতা। ব্রহ্মঞ্ঞতা—ব্রাহ্মণ্যতা।

২৩ Cakkhuna samvaro sadhu sādhu sotena samvaro
Ghānena samvaro sadhu sadhu jivhāya samvaro.

চক্খুনা সংবরো সাধু সাধু সোতেন সংবরো
ঘাণেন সংবরো সাধু সাধু জিব্‌হায় সংবরো। (৩৬০)

চক্ষুসংযম ভাল, শ্রোত্র অর্থাৎ কানের সংযমও ভাল। ঘ্রাণের সংবরণ ভাল এবং জিহ্বাকে সংযত করাও ভাল।

চক্খুনা—চক্ষুঃ শব্দের তৃতীয়া। সোতেন—শ্রোত্রেণ। ঘাণেন—ঘ্রাণেন। জিব্‌হায়—জিহ্বয়া। সাধু—ক্রিয়াবিশেষণরূপে ব্যবহৃত। বিশেষণও হয়।

২৪ Kayena samvaro sādhu sadhu vacāya samvaro
Manasa samvaro sādhu sādhu sabbattha samvaro.

কায়েন সংবরো সাধু সাধু বাচায় সংবরো
মনসা সংবরো সাধু সাধু সব্বত্থ সংবরো। (৩৬১)

দেহের সংযম ভাল, ভাল বাক্যের সংযমও। মনের সংযম ভাল, সর্বার্থের সংযমই চমৎকার।

কায়েন, বাচায়, মনসা—সংস্কৃতের মত। সব্বত্থ—সর্বত্র বা সর্বার্থ।

২৫। Yassa kāyena vācāya manasā natthi dukkataṃ
Saṃvutaṃ tihi ṭhānehi taṃ ahaṃ brumi
brahmaṇam.

যস্স কায়েন বাচায় মনসা নত্থি দুক্কতং
সংবুতং তীহি ঠানেহি তং অহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং। (৩৯৮)

যার দেহদ্বারা, কথাদ্বারা বা মনদ্বারা কোন অন্যায় কাজ করা হয়নি, যিনি তিনটি স্থানেই সংযত তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

দুক্কতং—দুষ্কৃতং। সংবুতং—সংবৃতং। তীহি—ত্রীভিঃ। প্রাকৃতের প্রভাবে ভ হ। ব্রুমি—সংস্কৃত ব্রবীমি (ব্রু+লট্ মি)।

২৬। Na jatāhi na gottehi na jaccā hoti brāhmaṇo
Yamhi saccaṃ ca dhammo ca so sucī so ca brāhmaṇo.

ন জটাহি ন গোত্তেহি ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো
যম্হি সচ্চং চ ধম্মো চ সো সুচী সো চ ব্রাহ্মণো। (৩৯৩)

জটা দ্বারা নয়, গোত্রের দ্বারা নয়, জাতির জন্য ও জন্মসূত্রে কেউ ব্রাহ্মণ হয় না। যাঁর মধ্যে সত্য এবং ধর্ম আছে, তিনিই শুচি, তিনিই ব্রাহ্মণ।

জটাহি—জটাভিঃ। গোত্তেহি—গোত্রেভিঃ। জচ্চা—জাত্যা। হোতি—ভবতি। সুচী—শুচিঃ। ছন্দের জন্য বা বিসর্গ লোপের ক্ষতিপূরণে ঈ-কার।

২৭। Dhammaṃ care sucaritaṃ na taṃ duccaritaṃ care
Dhammacārī sukhaṃ seti asmiṃ loke paramhi ca.

ধম্মং চরে সুচরিতং ন তং দুচ্চরিতং চরে
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্হি চ। (১৬৯)

সদাচরণের ধর্ম-পালন করবে। সেই অসদাচারের সেবা করবে না। ধর্মচারী ইহলোকে এবং পরলোকে সুখেই থাকেন।

দুচ্চরিতং—দুশ্চরিতং। চরে—চরেৎ।

২৮। Yathā bubbulakaṃ passe yathā passe marīcikaṃ
Evaṃ lokaṃ avekkhantaṃ maccurājā na passanti.

যথা বুব্বুলকং পস্সে যথা পস্সে মরীচিকং
এবং লোকং অবেক্খন্তং মচ্চুরাজা ন পস্সন্তি। (১৭০)

যেমন দেখা উচিত বুদ্বুদকে, যেমন দেখা উচিত মরীচিকাকে তেমনি ইহলোককে যাঁরা দেখেন মৃত্যুরাজ তাঁদের দেখেন না।

বুব্বুলকং—বুদ্বুদকং। দ-স্থানে ল হয়েছে। র-ও হয়। পস্‌সে—পশ্যেৎ। অবেক্‌খন্তং—অব+ঈক্ষ্‌+শতৃ। মচ্চু—মৃত্যু।

২৯। Etha passath'imam lokam cittam rājarathūpamam
Yattha bālā visīdanti nathi sango vijānatam.

এথ পস্‌সথিমং লোকং চিত্তং রাজরথূপমং
যথ বালা বিসীদন্তি নত্থি সঙ্‌গো বিজানতম্। (১৭১)

এস, রাজরথের সঙ্গে তুলনীয় চিত্রের মত ইহলোককে দেখ, যেখানে মূর্খেরা বিষাদগ্রস্ত হয়, জ্ঞানীদের কোন আসক্তি থাকে না।

এথ—ই-ধাতু অনুজ্ঞা বহুবচন। পস্‌সথিমং—পস্‌সথ+ইমং। দৃশ্‌ ধাতু অনুজ্ঞা বহুবচন। চিত্তং—চিত্রং। রাজরথূপমং—রাজরথ+উপমং। বিসীদন্তি—বি+সিদ্‌+লট অন্তি। বিজানতং—বিজানতাং। ষষ্ঠীর বহুবচন।

৩০। Yassa pāpam katam kammam kusalena pithīyati
So imam lokam pabhāseti abbhā mutto'va candimā.

যস্‌স পাপং কতং কম্মং কুসলেন পিথীয়তি
সো ইমং লোকং পভাসেতি অব্‌ভা মুত্তো'ব চন্দিমা। (১৭৩)

যার কৃত পাপ কাজ কুশল কর্মদ্বারা ঢাকা পড়ে তিনি মেঘমুক্ত চন্দ্রের মত ইহলোককে আলোকিত করেন।

পিথীয়তি—অপিধীয়তে। অপধীভবন। পৈশাচী প্রাকৃতের প্রভাবে ধী=থী। পভাসেতি—প্রভাসয়তি। অব্‌ভা—অভ্রাৎ। মুত্তো'ব—মুক্ত+ইব। চন্দিমা—চন্দ্রমা। মধ্যস্বরের বিকার।

৩১। Andhabhūto ayam loko tanukettha vipassati
Sakunto jāla mutto'va appo saggāya gacchati.

অন্ধভূতো অয়ং লোকো তনুকেত্থ বিপস্‌সতি
সকুন্তো জালমুত্তো'ব অপ্পো সগ্‌গায় গচ্ছতি। (১৭৪)

ইহলোক অন্ধ হয়ে গেছে। অতি অল্প সংখ্যক লোকই এখানে দেখতে পায়; পাখীদের মধ্যে সামান্যই যেমন জালমুক্ত হয়, তেমনি অল্প লোকই স্বর্গে যায়।

তনুকেত্থ—তনুকো+অত্র। সকুন্তো—শকুন্তঃ। জালমুত্তো'ব—জালমুক্তঃ+ইব। সগ্‌গায়—স্বর্গায়। উদ্দেশ্যে চতুর্থী।

৩২। Ekam dhammam atītassa musāvādissa jantuno
Vitinna-paralokassa natthi pāpam akāriyam.

একং ধম্মং অতীতস্স মুসাবাদিস্স জন্তুনো
বিতিণ্ণ পরলোকস্স নত্থি পাপং অকারিয়ং। (১৭৬)

একমাত্র ধর্মের অতিক্রমকারী, মিথ্যাবাদী, পরলোকে অবিশ্বাসী জীবের পক্ষে অকরণীয় কোন পাপই নেই।

অতীতস্স—অতি+ইত। অতিক্রমকারী। জন্তুনো শব্দের বিশেষণ। মুসাবাদিস্স—মৃষাবাদিন:। ইন্-ভাগান্ত হলেও অ-কারান্তের মত শব্দরূপ। বিতিণ্ণ—বিতীর্ণ। অকারিয়ং—অকার্যং। স্বরভক্তি।

৩৩। Na ve kadariya devalokaṃ vajanti
Bālā ha ve nappasaṃsanti dānaṃ
Dhiro ca dānaṃ anumodamano
Teneva so hoti sukhī paratthā.

ন বে কদরিয়া দেবলোকং বজন্তি
বালা হ বে নপ্পসংসন্তি দানং
ধীরো চ দানং অনুমোদমানো
তেনেব সো হোতি সুখী পরত্থ। (১৭৭)

কদর্য কৃপণেরা কখনই দেবলোকে গমন করে না। মূর্খেরাও কিন্তু দানের প্রশংসা করে না। যিনি ধীর ব্যক্তি তিনি দানে আনন্দলাভ করেন এবং তা দ্বারাই তিনি পরলোকে সুখী হন।

বে—বৈ। অব্যয়। কদরিয়া—কদর্যা:। বজন্তি—ব্রজন্তি। হ—অব্যয়। অনুমোদমানো—অনু+মুদ্+শানচ্। তেনেব—তেন+এব। পরত্থ—পরত্র।

৩৪। Pathavya ekarajjena saggassa gamanena va
Sabbalokadhipaccena sotapatti phalaṃ Varaṃ.

পথব্যা একরজ্জেন সগ্গস্স গমনেন বা
সব্বলোকাধিপচ্চেন সোতাপত্তি ফলং বরং।

পৃথিবীতে এক রাজত্ব অথবা স্বর্গে গমন দ্বারা, এমন কি সবলোকের আধিপত্য দ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, তার চেয়েও স্রোতাপত্তি ফল শ্রেষ্ঠ।

পথব্যা—পৃথিব্যা:। লক্ষণীয় যে সমীভবন হয়নি, 'ব্যা' আছে। সোতাপত্তি—স্রোতাপত্তি—Falling into the stream of sanctification, বৌদ্ধসাধনার প্রথম স্তর। দ্বিতীয় স্তর—সকদাগমী—সকৃৎ আগমী; তৃতীয় স্তর অনাগমী; চতুর্থ স্তর অর্হা—অর্হৎ।

Text 33 Dhaniya-Sutta

ধনিয়-সুত্ত

পালি-গ্রন্থ সুত্তনিপাত থেকে অংশটি উৎকলিত হয়েছে। বুদ্ধদেবের সঙ্গে একটি ধনী কৃষকের আলোচনায় জাগতিক ঐশ্বর্য যে আধ্যাত্মিকতার তুলনায় কত তুচ্ছ তাই দেখান হয়েছে।

১। (Dhaniyo gopo) Pakkodano duddhakhīro'haṃ asmi
Anutīre mahiyā samānavāso
Channā kuṭi āhito gini
Atha ce pathayasī pavassa deva.

(ধনিয়ো গোপো) পক্কোদনো দুদ্ধখীরোহং অস্মি অনুতীরে মহিয়া সমানো বাসো
ছন্না কুটি আহিতো গিনি অথ চে পথয়সী পবস্‌স দেব।

ধন্য গোপ—আমার অন্ন রন্ধন করা হয়েছে, দুগ্ধ দোহন করা হয়েছে। মহীনদীর তীরে সমতল ভূমিতে (সম্মানের সঙ্গে দীর্ঘকাল) আমি বাস করি। আমার কুটীর আচ্ছাদিত, অগ্নিও সংগৃহীত। অতএব হে দেবতা, ইচ্ছা হলে প্রবল বর্ষণ কর।

পক্কোদনো—পক্ক + ওদনঃ। দুদ্ধখীরো—দুগ্ধক্ষীরঃ। অহং-এর বিশেষণ।

সমানবাসো—মানেন সহ বর্তমান = সমান। অথবা অস্ ধাতু + শানচ্। ছন্না—ছদ্ + ক্ত। আহিতো—আহিতঃ = প্রজ্বলিত অথবা আহৃতঃ = সংগৃহীত। গিনি—অগ্নি। আদ্যস্বরলোপ ও স্বরভক্তি। পথয়সী—প্রার্থয়সি। ছন্দের জন্য সি = সী।

২। (Bhagavā) Akkodhano vigatakhilo'haṃ asmi
Anutīre mahiy'ekarattivāso
Vivaṭā kuṭi nibbuto gini
Atha ce............

(ভগবা) অক্কোধনো বিগতখিলোহং অস্মি অনুতীরে মহিয়েকরত্তিবাসো
বিবটা কুটি নিব্বুতো গিনি অথ চে.........।

ভগবান্ বুদ্ধ—আমি ক্রোধহীন, আমার বন্ধন দূর হয়েছে। মহিয়া নদীর তীরে এক-রাত্রি মাত্র আমার বাস। আমার কুটির উন্মুক্ত, (বাসনার) অগ্নি নির্বাপিত। অতএব হে দেবতা...। (ভগবান বুদ্ধের উক্তিতে গোপের উক্তির অনুকারিতা লক্ষণীয়।)

বিগতখিলো—বিগত + খিল। কীল (বন্ধন)। আদ্য ব্যঞ্জনের মহাপ্রাণতা। যেমন পলিত = ফলিত। নিব্বুতো—নির্বৃতঃ।

৩। (Dhaniyo Gopo) Andhaka-makasā na vijjare
Kacche rūḷhatiṇe caranti gāvo
Vuṭṭhiṃ pi saheyyuṃ āgataṃ
Atha ce·········

(ধনিয়ো গোপো) অন্ধকমকসা ন বিজ্জরে কচ্ছে রূঢ়তিণে চরন্তি গাবো
বুটিঠং পি সহেয্যুং আগতং অথ চে·········।

ধন্য গোপ—মাছিমশা কিছু নেই। কাছেই নবোদ্গত তৃণভূমিতে গরুগুলি চরে বেড়াচ্ছে। বৃষ্টি এলেও সহ্য করতে পারে। অতএব হে দেবতা······

মকসা—মশকা। বর্ণবিপর্যয়। বিজ্জরে—বিদ্যন্তে। লট্ বহুবচনের বিভক্তি অশোকের অনুশাসনে 'অরে'। বিভক্তিটি বৈদিক। যেমন, লভন্তে=লভরে, শোচন্তে= সোচরে। কচ্ছে—কক্ষে। মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে ক্ষ=চ্ছ। রূল—রূঢ়। মূর্ধন্য ল বৈদিক। সংস্কৃত-বাংলায় ড় বা ঢ়। বুটিঠং—বৃষ্টিং। সহেয্যুং—সহধাতু+বিধিলিঙ্ বহুবচন।

৪। (Bhagavā) Baddhā hi bhisī susaṃkhatā
Tiṇṇo pāragato vineyya oghaṃ
Atho bhisiyā na vijjati
Atha ce············

(ভগবা) বদ্ধাহি ভিসী সুসংখতা তিন্নো পারগতো বিনেয্য ওঘং
অথো ভিসিয়া ন বিজ্জতি অথ চে······ ···।

ভগবান্ বুদ্ধ—আমার ভেলা বাঁধা আছে, সুন্দরভাবে তৈরী করা। আমি (বাসনার) স্রোতকে পরাভূত করে পরপারে উত্তীর্ণ হয়েছি। ভেলার আর প্রয়োজন নেই। অতএব···।

ভিসী—বৃষী। বৃক্ষাদিনির্মিত পারাপারের তরণী। সুসংখতা—সুসংস্কৃতা। তিন্নো—তীর্ণঃ। বিনেষ্য—বি—নী+ল্যপ্। ওঘং—তৎসম শব্দ জলস্রোত অর্থে। ভিসিয়া—ভিসী শব্দের তৃতীয়া। বিজ্জতি—বিদ্যতে।

৫। (Dhaniyo Gopo) Gopī mama assavā alolā
Dīgharattaṃ saṃvāsiyā manāpā
Tassā na suṇāmi kiñci pāpaṃ
Atha ce................

(ধনিয়ো গোপো) গোপী মম অস্সবা অলোলা দীঘরত্তং সংবাসিয়া মনাপা
তস্সা ন সুণামি কিঞ্চি পাপং অথ চে............

ধন্য গোপ—আমার গোপী বিশ্বস্তা এবং লোলচর্মা নয়। দীর্ঘকাল বাসযোগ্যা মনোহারিণী। তার কোন পাপের কথা আমি কখনও শুনিনি। অতএব···।

অস্সবা—আশ্রবা (অনুগতা)। অলোলা—অচঞ্চলা বা অস্তরা। সংবাসিয়া—সম্বাস্যা—সম্যক বাসযোগ্যা। মনাপা—মনঃপ্রাপ্তা, মনোজ্ঞা।

৬। (Bhagavā) Cittaṃ mama assavaṃ vimuttaṃ
Dīgharattaṃ paribhāvitaṃ sudantaṃ
Papaṃ pana me na vijjati
Atha ce................

(ভগবা) চিত্তং মম অস্সবং বিমুত্তং দীঘরত্তং পরিভাবিতং সুদন্তং
পাপং পন মে ন বিজ্জতি অথ চে............।

ভগবান বুদ্ধ—আমার চিত্ত বিশ্বস্ত ও বাসনামুক্ত, সুদীর্ঘকাল অনুশীলন দ্বারা সুসংযত। আমার মধ্যে কোন পাপ নেই। অতএব হে দেবতা···।

অস্সবং—আশ্রবং। পন—পুনঃ। অব্যয় বাক্যালংকার।

৭। (Dhaniyo Gopo) Attavetanabhato'haṃ asmi
Puttā ca me samāniyā arogā
Tesaṃ na suṇāmi kiñci pāpaṃ
Atha ce············

(ধনিয়ো গোপো) অত্তবেত্তনভতোঽহম্ অস্মি পুত্তা চ মে সমানিয়া অরোগা
তেসং ন সুণ'মি কিঞ্চি পাপং অথ চে··········।

ধন্য গোপ—আমি নিজের ভরণপোষণ নিজেই করি। আমার পুত্রেরা সম্ভ্রান্ত এবং নীরোগ। তাদের সম্বন্ধে কোন পাপের কথা কখনও শুনিনি। অতএব·········

অত্তবেত্তনভতো—আত্মবেতনভৃতঃ। সমানিয়া—সমান্যাঃ। তেসং—তেষাং। কিঞ্চি—কিঞ্চিং।

৮। (Bhagavā) Nāhaṃ bhatako asmi kassaci
Nibbitthena carāmi sabbaloke
Attho bhatiyā na vijjati
Atha ce ·········

(ভগবা) নাহং ভতকো অস্মি কস্সচি নিব্বিট্ঠেণ চরামি সব্ব'লোকে
অত্থো ভতিয়া ন বিজ্জতি অথ চে............।

ভগবান বুদ্ধ—আমি কারো ভৃতক নই, কেউ আমাকে পোষণ করে না। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আমি সর্বত্র ঘুরে বেড়াই। আমার ভৃতি অর্থাৎ বেতনের কোন প্রয়োজন নেই। অতএব·········

ভত্তকো—ভৃতকঃ। কস্সচি—কস্যচিৎ। নিব্বিটেঠন—নির্বিষ্টেন (নির্বিষ্ট্যা)। প্রকৃত্যাদি ৩য়া। নির্+বিষ্+ক্তি=নির্বিষ্টি (বেকার) অ-কারান্ত শব্দরূপ। ভতিয়া—ভৃত্যা। স্বরভক্তি।

৯। (Dhaniyo Gopo) Atthi vasā atthi dhenupā
Godharaṇiyo paveṇiyopi atthi
Usabhopi gavampati ca atthi
Atha ce.........

(ধনিয়ো গোপো) অত্থি বসা অত্থি ধেনুপা গোধরণীয়ো পবেণিয়োপি অত্থি
উসভোপি গবম্পতি চ, অত্থি অথ চে........ ।

ধন্য গোপ—আমার বৎসহীনা, সবৎসা দুগ্ধবতী, গর্ভবতী এবং বন্ধ্যা-দুগ্ধবতী গাভী আছে। গবাম্পতি বৃষও আমার আছে। অতএব ....

বসা—বশা। বৎসহীনা বকনা বাছুর। ধেনুপা—সবৎসা। প্রসূতা গাভী। গোধরণিয়ো—গোধরণী—গর্ভবতী। পবেণিযো—প্রবেণী। বন্ধ্যা অথচ দুগ্ধবতী—কামধেনু। উসভো—ঋষভঃ। গবম্পতি—গবাংপতি। অলুক ষষ্ঠীতৎপুরুষ।

১০। (Bhagavā) Natthi vasā natthi dhenupā
Godharaṇiyo paveṇiyopi natthi
Usabho pi gavampatīdha natthi
Atha ce.................

(ভগবা) নত্থি বসা নত্থি ধেনুপা গোধরণিয়ো পবেণিয়োপি নত্থি
উসভোপি গবম্পতীধ নত্থি অথ চে.............

১১। (Dhaniyo Gopo) Khīlā nikhātā asampavedhī
Dāmā munjamayā navā susaṇṭhanā
Nahi sakkhinti dhenupāpi chettuṃ
Atha ce.................

(ধনিয়ো গোপো) খীলা নিখাতা অসম্পবেধী দামা মুঞ্জময়া নবা সুসণ্ঠনা
নহি সক্খিন্তি ধেনুপাপি ছেত্তুং অথ চে ...... ।

ধন্যগোপ—খুঁটিগুলি পোতা এমন যে একটুও নড়ে না। মুঞ্জাঘাসের দড়িগুলি নূতন এবং সযত্নে তৈরী। দুগ্ধবতী গাভীও তা ছিঁড়তে পারে না। অতএব......

খীলা—কীলাঃ। ক-এর মহাপ্রাণতা। অসসম্পবেধী—অসম্প্রব্যধিন্। সুসণ্ঠনা—সুসংস্থানা। মূর্ধন্যীভবন। সক্খিন্তি—শক্ষ্যন্তি। শক্ ধাতু। ছেত্তুং—ছিদ্+তুম্।

১২। (Bhagavā) Usabhoriva chetvā bandhanāni
Nāgo pūtilataṃ va dālayitvā
Nāhaṃ puna upessaṃ gabbhaseyyaṃ
Atha ce................

(ভগবা) উসভোরিব ছেত্বা বন্ধনানি নাগো পুত্তিলতং ব দালয়িত্বা
নাহং পুন উপেস্‌সং গব্‌ভসেয্যং অথ চে.... ... ।

ভগবান বুদ্ধ—বৃষের মত বন্ধন ছেদন করে হাতীর মত পুঁইলতা দলন করে আমি পুনরায় গর্ভশয্যায় যাব না (পুনর্জন্ম হবে না)। অতএব...।

উসভোরিব— উসভো + ইব। সন্ধিতে র-আগম। নাগো—নাগঃ—হাতী। উপেস্‌সং—উপ + ই ধাতু ভবিষ্যৎকাল উত্তমপুরুষ। সংস্কৃতে উপেষ্যামি। গব্‌ভসেয্যং —গর্ভশয্যাং। প্রাকৃতে শয্যা = সেজ্জা।

১৩। Ninnañca thalañca pūrayanto
Mahāmegho pāvassi tāvadeva.
Sutvā devassa vassato
Imaṃ atthaṃ Dhaniyo abhāsatha.

নিন্নঞ্চ থলঞ্চ পূরয়ন্তো মহামেঘো পাবস্‌সি তাবদেব
সুত্বা দেবস্‌স বস্‌সতো ইমং অত্থং ধনিয়ো অভাসথ।

নিম্নস্থান উচ্চস্থল পূর্ণ করে প্রচণ্ড মেঘ তখন প্রবল বর্ষণ করতে লাগল। বর্ষণমুখর দেবতার কথা শুনে ধন্য গোপ এই কথাগুলি বলেছিল।

নিন্ন—নিম্ন। বস্‌সতো—বৃষ্‌ ধাতু শতৃ, ষষ্ঠী, দেবস্‌স শব্দের বিশেষণ।

১৪। Lābhā vata no anappakā
ye mayaṃ Bhagavantaṃ addasāma.
Saraṇaṃ taṃ upema cakkhuma
satthā no hohi tuvaṃ mahāmuni.

লাভা বত নো অনপ্‌পকা যে ময়ং ভগবন্তং অদ্দসাম
সরণং তং উপেম চক্‌খুম সত্থা নো হোহি তুবং মহামুনি।

লাভ আমাদের নিতান্ত অল্প নয় যে আমরা ভগবানের দর্শন পেলাম। হে চক্ষুষ্মান্ আমরা আপনার শরণ নিলাম। হে মহামুনি আপনি আমাদের শাস্তা উপদেষ্টা হোন্।

বত—অবধারণে অব্যয়। নো—নঃ (অস্মাকং)। অনপ্পকা—ন + অল্পকা। ময়ং —অহং। বিপর্যয় এবং মহাপ্রাণলোপ। অদ্দসাম—দৃশ ধাতু লুঙ্‌ (aorist) উপেম—উপ + ই + লট্ উত্তমপুরুষ বহুবচন। চক্‌খুম্—চক্ষুষ্মন্। সত্থা—শাস্তা। হোহি —ভূ ধাতু লোট্ হি। তুবং—ত্বং সম্প্রসারণে।

১৫। Gopī ca ahañca assavā
brahmacariyaṃ sugate carāmase
Jātimaraṇassa pāragā
dukkhassantakarā bhavāmase.

গোপী চ অহঞ্চ অসসবা ব্রহ্মচরিয়ং সুগতে চরামসে
জাতি-মরণস্‌স পারগা দুক্‌খস্‌সন্তকরা ভবামসে।

গোপী এবং আমি উভয়ে অনুগত থেকে সুষ্ঠুভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করব। জন্মমৃত্যু পার হয়ে দুঃখের অন্তকালে উপনীত হব।

চরামসে—চর্‌ ধাতু লোট উত্তমপুরুষের বহুবচনে আমসে বিভক্তি। ভূ ধাতু থেকে ভবামসে। দুক্‌খস্‌সন্তকরা—দুক্‌খস্‌স + অন্তকরা। সন্ধিতে স্বরলোপ।

১৬। (Māro papimā) Nandati puttehi puttimā
Gomiko gohi tatheva nandati
upadhīhi narassa nandanā
Nahi nandati yo nirūpadhi.

(মারো পাপিমা) নন্দতি পুত্তেহি পুত্তিমা গোমিকো গোহি তথেব নন্দতি।
উপধীহি নরস্‌স নন্দনা নহি নন্দতি যো নিরূপধি।

মার পাপী। বৌদ্ধকাহিনীতে এর অপর নাম নমুচি। হিন্দুশাস্ত্রে কামদেব, বাসনা-কামনা ও ভোগের দেবতা। খৃষ্টধর্মে একেই বলে শয়তান। এর প্রভাবে মানুষ সত্যপথ ছেড়ে ভোগে মত্ত হয়। সেই মার ধন্য গোপকে সংসার সুখের লোভ দেখিয়ে বলল—

পুত্রবান্‌ পুত্রগণের দ্বারা আনন্দ লাভ করে। গোমিকও সেরূপ তার গরুগুলির জন্য আনন্দিত হয়। ধনসম্পত্তিই মানুষের আনন্দের কারণ। যার কিছু নেই তার আনন্দও নেই।

পাপিমা—পাপিমন্‌ শব্দ। পুত্রবান্‌ থেকে হয়েছে পুত্তিমা। পুত্তেহি—পুত্রেভিঃ। উপধী—উপাধি=ধনসম্পদ। বহুত্বে অথবা ছন্দহেতু ধি=ধী। তথেব—তথা + এব।

১৭। (Bhagavā) Socati puttehi puttimā
Gomiko gohi tatheva socati
Upadhīhi narassa socanā
Nahi so socati yo nirūpadhi.

(ভগবা) সোচতি পুত্তেহি পুত্তিমা গোমিকো গোহি তথেব সোচতি।
উপধীহি নরস্‌স সোচনা নহি সো সোচতি যো নিরূপধি।

ভগবান বুদ্ধ বললেন—পুত্রবান পুত্রদের জন্য দুঃখ পায়, গাভীদের জন্য দুঃখ পায় গোমিক। সম্পত্তিই মানুষের দুঃখ হেতু। যে নিঃস্ব তার দুঃখই নেই।

Text 36 Anopamā (Therigāthā)

অনোপমা

বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র ত্রিপিটকের মধ্যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীদের কাহিনী আছে। এঁদের বলা হত থেরী (স্থবিরা=প্রবীণা)। ৭৩ জন থেরীর জীবন কাহিনী নিয়ে থেরী গাথা গ্রন্থ। সাকেতনগরের মধ্য নামক এক ধনী বণিকের রূপলাবণ্যবতী কন্যার নাম ছিল অনুপমা। সে তার বৌদ্ধধর্মাবলম্বনের কথা নিজেই বলেছে।

১। Ucce kule aham jātā bahuvitte mahaddhane
Bannarūpena sampannā dhīta Mjjhassa attajā.

উচ্চে কুলে অহং জাতা বহুবিত্তে মহদ্ধনে
বণ্ণরূপেন সম্পন্না ধীতা মজ্ঝস্স অত্তজা।

প্রচুর বিত্ত এবং অতুল ধনসম্পন্ন এক উচ্চ বংশে আমার জন্ম। বর্ণ ও রূপসম্পন্না আমি মধ্যের আত্মজাত কন্যা।

ধীতা—দুহিতা। দ এবং হ মিলে ধ হয়েছে এবং আদ্য খাসাঘাতে দীর্ঘস্বর। মজ্ঝস্স—মধ্যস্য। অত্তজা—আত্মজা।

২। Patthitā rājaputtehi setthiputtehi gijjhitā
Pitu me pesayi dūtam detha mayham Anopamam.

পত্থিতা রাজপুত্তেহি সেট্‌ঠিপুত্তেহি গিজ্ঝিতা
পিতু মে পেসয়ি দূতং দেথ মযহং অনোপমং।

আমি রাজপুত্রদের দ্বারা প্রার্থিতা হয়েছিলাম, শ্রেষ্ঠী পুত্রেরা আমার প্রতি লুব্ধ হয়েছিল। তারা আমার পিতাকে দূত পাঠিয়ে বলত, "আমার কাছে অনুপমাকে দান করুন।"

গিজ্ঝিতা—লোভ করা অর্থে গৃধ্ ধাতু থেকে শব্দটি উৎপন্ন। সম্ভাব্যপদ গৃধিতা > গিজ্ঝিতা। পেসয়ি—প্র+ইষ্ ধাতু লুঙ্ (aorist) ই বিভক্তি। দেথ—দা ধাতু লোট। মযহং—মহ্যং। বিপর্যয়। অনোপমং—অনুপমাং। মধ্যস্বরের বিকার।

৩। Yattakam tulitā esā tuyham dhitā Anopamā
Tato atthagunam dassam hiraññam ratanāni ca.

যত্তকং তুলিতা এসা তুযহং ধিতা অনোপমা
ততো অট্‌ঠগুণং দস্সং হিরঞ্ঞং রতনানি চ।

আপনার কন্যা অনুপমা দেহের ওজনে যতটা হয় তার আটগুণ স্বর্ণ এবং রত্নাদি আপনাকে দেব।"

যত্তকং—যত্রকং। তুষ্হং—তুভ্যং—তুহ্যং। বিপর্যয়। দস্সং—দাস্যামি। হিরঞ্ঞং—হিরণ্যং।

৪। Sāhaṃ disvāna sāmbudhaṃ lokajeṭṭhaṃ anuttaraṃ
Tassa pādāni banditvā ekamantaṃ upāvisiṃ.

সাহং দিস্বান সম্বুদ্ধং লোকজেট্‌ঠং অনুত্তরং
তস্স পাদানি বন্দিত্বা একমন্তং উপাবিসিং।

সেই আমি জনসাধারণের মধ্যে প্রধান অতুলনীয় বুদ্ধদেবকে দেখে তাঁর পাদবন্দনা করে এক প্রান্তে উপবেশন করলাম।

সাহং—সা+অহং। দিস্বান্+দৃশ+বৈদিক প্রত্যয় ত্বান। একমন্তং—একং+অন্তং। উপাবিসিং—উপ+বিশ্ ধাতু উত্তম পুরুষ, একবচন।

৫। So me dhammaṃ adesesi anukampāya Gotamo
Nisinnā āsane tasmiṃ phusayiṃ tatiyaṃ phalaṃ.

সো মে ধম্মং অদেসেসি অনুকম্পায় গোতমো
নিসিন্না আসনে তস্মিং ফুসয়িং ততিয়ং ফলং।

সেই গৌতম অনুকম্পা বশে আমাকে ধর্মোপদেশ দান করলেন। সেই আসনে বসেই আমি তৃতীয় ফলটি স্পর্শ করতে পারলাম।

অদেসেসি—দিশ্ ধাতু লুঙ প্রথম পুরুষ একবচন। নিসিন্না—নিষণ্ণা। মধ্যস্বরের বিকার। ফুসয়িং—স্পৃশ্ ধাতু লুঙ্ উত্তমপুরুষ একবচন। স্পৃশ্ ধাতু পালিতে ফুস্ হয়। ততিয়ং—তৃতীয়ং। বৌদ্ধ সাধনায় তৃতীয় ফল অনাগামী স্তর। (সুভাষিত অংশের ৩৪নং শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

৬। Tato kesāni chetvāna pabbajjiṃ anāgāriyaṃ
Sājja me sattamī ratti yato taṇhā visositā.

ততো কেসানি ছেত্বান পব্বজ্জিং অনাগারিয়ং
সাজ্জ মে সত্তমী রত্তি যেতো তণ্হা বিসোসিতা।

তারপর মাথার চুল কেটে ফেলে আমি গৃহাগার ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলাম; সেই থেকে আজ সাত রাত্রি কাটল যাতে আমার বিষয়তৃষ্ণা দূর হয়ে গেছে।

ছেত্বান—ছিদ ধাতু বৈদিক ত্বান প্রত্যয়। পব্বজ্জিং—প্র+ব্রজ্ ধাতু লুঙ্ (aorist) উত্তমপুরুষ একবচন। অনাগারিয়ং—অনাগারীয়ং। সাজ্জ—সা+অজ্জ। তণ্হা—তৃষ্ণা। বিপর্যয় এবং উষ্মধ্বনির মহাপ্রাণতা। বিসোসিতা—বিশোষিতা। শুষ্ ধাতু ক্তান্ত বিশেষণ।

Text 41 Milinda-pañha (Nāgasena and Milinda)

মিলিন্দ-পঞ্‌হ

আলেকজান্দারের বিজয়াভিযানের পর উত্তর ভারতে কিছুদিন গ্রীক রাজত্ব ছিল। একজন রাজা ছিলেন মিনান্দর (Menander) নামে। তাঁর সঙ্গে নাগসেন নামক একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর দার্শনিক আলোচনা হত। সেই আলোচনাকে কয়েকটি বর্গে বিভক্ত করে, 'মিলিন্দ প্রশ্ন' নামক গ্রন্থ সংকলন হয়। ঐ গ্রন্থের পঞ্চম বর্গের অংশ-বিশেষ আলোচ্য পাঠক্রম। Menander হয়েছে মিলিন্দ এবং প্রশ্ন পালিতে হয়েছে পঞ্‌হ, প্রাকৃতে পণ্‌হ।

মূলপাঠ—Rājā āha—Bhante Nāgasena kena kāraṇena manussā na sabbe samakā aññe appayukā aññe dighāyukā aññe bavhālābha aññe appābādhā aññe dubbaṇṇā aññe vaṇṇavanto aññe appesakkhā aññe mahesakkhā aññe appabhogā aññe mahābhogā aññe nīcakulīnā aññe mahākulīnā aññe duppaññā aññe paññāvantoti.

রাজা আহ—ভন্তে নাগসেন কেন কারণেন মনুস্‌সা ন সব্বে সমকা অঞ্‌ঞে অপ্‌পায়ুকা অঞ্‌ঞে দীঘায়ুকা অঞ্‌ঞে বব্‌হালাভা অঞ্‌ঞে অপ্‌পাবাধা অঞ্‌ঞে দুব্বণ্ণা অঞ্‌ঞে বণ্ণবন্তো অঞ্‌ঞে অপ্‌পেসক্‌খা অঞ্‌ঞে মহেসক্‌খা অঞ্‌ঞে অপ্‌পভোগা অঞ্‌ঞে মহাভোগা অঞ্‌ঞে নীচকুলীনা অঞ্‌ঞে মহাকুলীনা অঞ্‌ঞে দুপ্‌পঞ্‌ঞা অঞ্‌ঞে পঞ্‌ঞাবন্তোতি।

অনুবাদ—রাজা বললেন—আচার্য নাগসেন, কোন কারণের জন্য মানুষ সকলে সমান নয়? কেউ অল্পায়ু কেউ দীর্ঘজীবী। কেউ বেশী পীড়িত, কেউ অল্প পীড়াযুক্ত, কেউ দুর্বর্ণ কেউ বা বর্ণবান, কেউ অল্পখ্যাত কেউ বহুখ্যাত, কেউ অল্পভোগী, কেউ বহুভোগী, কেউ নীচ বংশজাত কেউ বড় কুলীন, কেউ প্রজ্ঞাহীন কেউ প্রজ্ঞাবান্।

টীকা—ভন্তে—সংস্কৃত ভবন্ত পালিতে ভদন্ত, ভন্তে। মান্যব্যক্তিকে সম্বোধন। বব্‌হালাভা—বহ্বী অলাভা। বহু পীড়াযুক্ত অর্থে অপ্রচলিত শব্দ। অপ্পাবাধা—অল্প আবাধা। অল্প পীড়াযুক্ত। অপ্পেসকখা—অল্পে শাখ্যাঃ। দুপ্পঞ্‌ঞা—দুষ্প্রজ্ঞা।

মূলপাঠ—Thero āha—Kissa pana mahārāja rukkhā na sabbe samakā aññe ambilā aññe lavaṇā aññe tittakā aññe kaṭukā aññe kasāvā aññe madhurāti.

maññāmi bhante bījānaṃ nānākāraṇenāti.

থেরো আহ—কিস্‌স পন মহারাজ রুক্‌খা ন সব্বে সমকা অঞ্‌ঞে অম্বিলা অঞ্‌ঞে লবণা অঞ্‌ঞে তিত্তকা অঞ্‌ঞে কটুকা অঞ্‌ঞে কসাবা অঞ্‌ঞে মধুরাতি।

মঞ্‌ঞামি ভন্তে বীজানং নানাকারণেনাতি।

অনুবাদ—সন্ন্যাসী বললেন—কিসের জন্য মহারাজ গাছগুলি সব সমান নয়? কোন গাছের ফল অম্ল, কোনটা লোণা, কোনটা তিক্ত, অন্যটা কষায়, কোনটা বা মধুর।

মনে হয় আচার্য, বীজের রকমারির জন্য।

টীকা—কিস্‌স—সম্ভবত: কস্য থেকে। রুক্‌খা—বৃক্ষা:। অম্বিলা—অম্লা। বক্রুতি ও বিপ্রকর্ষ। কসাবা—কষায়া:। ব-শ্রুতি। মঞ্‌ঞামি—মন্যামি। শুদ্ধপ্রয়োগ মন্যে।

মূলপাঠ—Evameva kho mahārāja kammānam nānākāraṇena manussā na sabbe samakā.

এবমেব খো মহারাজ কম্মানং নানাকারণেন মনুস্‌সা ন সব্বে সমকা।

অনুবাদ—এরূপেই কিন্তু মহারাজ কর্মের নানাপ্রকার কারণে মানুষ সব সমান হয় না।

[এর পর রাজার প্রথম প্রশ্নে মানুষে মানুষে যে বিভিন্নতার কথা বলা হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।]

মূলপাঠ—Bhāsitam-p'etam mahāraja Bhagavatā :—Kammassakā mānava sattā kammadāyādā Kammayonī Kammabandhū kammapaṭisaraṇā. Kammam satte vibhajati yad idam hīnappaṇitatāyāti

ভাসিতং পেতং মহারাজ ভগবতা :—কম্মস্‌সকা মানবা সত্তা কম্মদায়াদা কম্মযোনী কম্মবন্ধু কম্মপটিসরণা। কম্মং সত্তে বিভজতি যদিদং হীনপ্‌পণিতত্তায়াতি।

অনুবাদ—মহারাজ, ভগবান্ বুদ্ধ কর্তৃকও অনুরূপ বলা হয়েছে মানব সত্তা নিজের কর্মের সঙ্গে যুক্ত, কর্মেরই জ্ঞাতবংশ আত্মীয়, কর্ম থেকেই উৎপন্ন, কর্মের দ্বারাই আবদ্ধ এবং কর্মই তার শেষ আশ্রয়। এই যে ছোট বড় ভেদ তাও কর্মের জন্য।

টীকা—পেতং—পি+এতং। কম্মস্‌সকা—কর্মস্বকা:। কম্মদায়াদা—দায়াদ শব্দে আত্মীয় বুঝায়। কম্মযোনী—কর্ম যাহার যোনি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থল। বহুবচনের জন্য স্বরের দীর্ঘতা। কম্মবন্ধু—কর্মের সঙ্গে আবদ্ধ অচ্ছেদ্যভাবে। তুলনীয়—অত্যাগসহনো

বন্ধুঃ। পটিসরণা—প্রতিশরণা। হীন-প্পণিততায়—হীন-প্রণিততা+তৃতীয়া। ছোট বড় দ্বারা।

মূলপাঠ—Kallosi bhante Nāgasenāti

Rāja āha—Bhante Nāgasena tumhe bhanatha kinti imam dukkhaṃ nirujjheyya aññañca dukkhaṃ na uppajjeyyāti.

Etadatthā mahārāja amhākaṃ pabbajjāti

কল্লোসি ভন্তে নাগসেনাতি।

রাজা আহ—ভন্তে নাগসেন তুম্হে ভনথ কিন্তি ইমং দুক্খং নিরুজ্ঝেয্য অঞ্ঞঞ্চ দুক্খং ন উপ্পজ্জেয্যাতি।

এতদত্থা মহারাজ অম্হাকং পব্বজ্জাতি।

অনুবাদ—আচার্য নাগ সেন, আপনি বড় যোগ্য ব্যক্তি।

রাজা বললেন—আচার্য নাগসেন, আপনি বলুন তো কি ভাবে মানুষ এই দুঃখ রোধ করবে এবং অন্য কোন দুঃখ উৎপন্ন হবে না?

এই জন্যই তো মহারাজ আমাদের সন্ন্যাস-গ্রহণ।

টীকা—কল্লোসি—কল্লো (কল্যঃ)+অসি। কল্ ধাতু গণনায় যোগ্যতায়। মান্যগণ্য অর্থে। তুম্হে—বৈদিক তুস্মে। নিরুজ্ঝেয্য—নি+রুধ্+বিধিলিঙ্। উপজ্জেয্য—উৎ+পদ+বিধিলিঙ। এতদত্থা—এতৎ+অর্থাৎ। অম্হাকং—অস্মাকং। পব্বজ্জাতি—পব্বজ্জা (প্রব্রজ্যা)+ইতি।

মূলপাঠ—Kim paṭigacceva vāyamitena nanu sampatte kāle vāyamitabbanti.

Thero āha—sampatte kāle mahārāja vāyāmo akiccakaro bhavati paṭigacceva vāyāmo kiccākaro bhavati.

Opammaṃ karohīti.

কিং পটিগচ্চেব বায়মিতেন নন্ু সম্পত্তে কালে বায়মিতব্বন্তি।

থেরো আহ—সম্পত্তে কালে মহারাজ বায়ামো অকিচ্চকরো ভবতি পটিগচ্চেব বায়ামো কিচ্চকরো ভবতি।

ওপম্মং করোহীতি।

অনুবাদ—প্রতিকারের জন্যই কি চেষ্টা করা উচিত অথবা সময় উপস্থিত হলে চেষ্টা করা হবে?

সন্ন্যাসী বললেন—মহারাজ সময় উপস্থিত হলে অর্থাৎ সংকট মুহূর্তে চেষ্টা করা অকার্যকর হতে পারে। পূর্ব থেকে প্রতিকার চেষ্টা সফল হয়।

উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

টীকা—পটিগচ্চেব—প্রতিকৃত্য+এব। প্রতি=পটি (মূর্ধন্যীভবন)। কৃত্য=কচ্চ=গচ্চ (ঘোষীভবন)। বায়মিতেন—ব্যায়ামিতেন। নন্থ—অব্যয় অথবা অর্থে। সম্পত্তে—সম্প্রাপ্তে। অকিচ্চকরো—অকৃত্যকর:। ওপম্মং—ঔপম্যং।

মূলপাঠ—Taṃ kiṃ maññāsi mahārāja yadā tvaṃ pipāsito bhaveyyāsi tadā tvaṃ udapānaṃ khanāpeyyāsi taḷākaṃ khanāpeyyāsi—pāniyaṃ pivissāmiti

Nahi bhanteti

Evameva kho mahārāja sampatte kāle vāyāmo akiccakaro bhavati paṭigacceva vāyāmo kiccakaro bhavatīti.

Bhiyyo opammaṃ karohīti.

তং কিং মঞ্ঞাসি মহারাজ যদা ত্বং পিপাসিতো ভবেয্যাসি তদা ত্বং উদপানং খনাপেয্যাসি তড়াকং খনাপেয্যাসি—পানীয়ং পিবিস্সামিতি

নহি ভন্তেতি

এবমেব খো মহারাজ সম্পত্তে কালে বায়ামো অকিচ্চকরো ভবতি পটিগচ্চেব বায়ামো কিচ্চকরো ভবতীতি।

ভিয্যো ওপম্মং করোহীতি।

অনুবাদ—আপনি কি মনে করেন মহারাজ যে যখন আপনি তৃষ্ণার্ত হবেন তখন কূপ খনন করাবেন এবং দীঘি কাটাবেন এবং বলবেন যে 'জল পান করব'?

তা নয় আচার্য।

এরূপই মহারাজ, সময় কালে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আগে থেকে প্রতিকার চেষ্টা সার্থক হয়।

আরও উপমা দিন।

টীকা—ভবেয্যাসি—ভূ ধাতু বিধিলিঙ মধ্যম পুরুষ একবচন। খনাপেয্যাসি—খন্ ধাতু ণিচ্। উদপান—কূপ। তলাকং—তড়াগং। মূর্ধন্য ল বৈদিক, পরবর্তীকালে ড় হয়েছে। অঘোষীভবনে গ হয়েছে ক। ভিয্যো—ভূয়:। আদ্যস্বরের বিকার।

মূলপাঠ—Taṃ kiṃ maññāsi mahārāja yadā tvaṃ bubhukkhito bhaveyyāsi tada khettaṃ kasāpeyyāsi sāliṃ ropāpeyyāsi dhaññaṃ atiharāpeyyāsi—bhattaṃ bhuñjissāmiti.

Nahi bhanteti

Evameva kho mahārāja sampatte kāle vāyāmo akiccakaro bhavati paṭigacceva vāyāmo kiccakaro bhavatīti.

Bhiyyo opammam karohīti.

তং কিং মঞ্ঞাসি মহারাজ যদা ত্বং বুভুক্খিতো ভবেয্যাসি তদা ত্বং খেত্তং কসাপেয্যাসি সালিং রোপাপেয্যাসি ধঞ্ঞং আতিহরাপেয্যাসি-ভত্তং ভুঞ্জিস্সামিতি।

ন হি ভন্তে

এবমেব খো মহারাজ সম্পত্তে কালে বায়ামো অকিচ্চকরো ভবতি পটিগচ্চেব বায়ামো কিচ্চকরো ভবতীতি।

ভিয্যো ওপম্মং করোহীতি।

অনুবাদ—আপনি কি মনে করেন মহারাজ যে যখন আপনি ক্ষুধার্ত হবেন তখন ক্ষেত্র কর্ষণ করাবেন। শালিধান রোপণ করাবেন। ধান্য সংগ্রহ করাবেন এবং বলবেন—'এবার আমি ভাত খাব?'

না মহোদয়।

এইভাবেই মহারাজ সময় কালে চেষ্টা কাজে লাগে না। আগে থেকে চেষ্টা করলেই ফল পাওয়া যায়।

আরও কিছু উপমা দিন।

টীকা—কসাপেয্যাসি, রোপাপেয্যাসি। অতিহরাপেয্যাসি—যথাক্রমে কৃষ রুহ্ এবং হৃ ধাতুর সঙ্গে ণিচ (causative)। পালিতে এ বা আপে দিয়ে হয়। ধঞ্ঞং—ধান্যং। ভত্তং—ভক্তং। বাংলা ভাত।

মূলপাঠ—Tam kim maññasi mahārāja yada te saṅgāmo paccupaṭṭhito bhaveyya tada tvam parikham khanāpeyyāsi pākāram kārāpeyyāsi gopuram kārāpeyyāsi aṭṭālakam kārāpeyyāsi dhaññam atiharāpeyyāsi tada tvam hatthismim sikkheyyāsi assasmim sikkheyyāsi rathasmim sikkheyyāsi dhanusmim sikkheyyāsi tharusmim sikkheyyāsiti.

Na hi bhante

Evameva kho mahārāja sampatte kāle vāyāmo akiccakaro bhavati paṭigacceva vāyāmo kiccakaro bhavati.

তং কিং মঞ্ঞসি মহারাজ যদা তে সঙ্গামো পচ্চুপট্ঠিতো ভবেয্য
তদা ত্বং পরিখং খনাপেয্যাসি পাকারং কারাপেয্যাসি গোপুরং
কারাপেয্যাসি অট্টালকং কারাপেয্যাসি ধঞ্ঞং অভিহরাপেয্যাসি
তদা ত্বং হত্থিস্মিং সিক্খেয্যাসি অস্সস্মিং সিক্খেয্যাসি রথস্মিং
সিক্খেয্যাসি ধনুস্মিং সিক্খেয্যাসি থরুস্মিং সিক্খেয্যাসীতি।

ন হি ভন্তে

এবমেব খো মহারাজ সম্পত্তে কালে বায়ামো অকিচ্চকরো ভবতি
পটিগচ্চেব বায়ামো কিচ্চকরো ভবতি।

অনুবাদ—আপনি কি মনে করেন: মহারাজ যখন আপনার রাজ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হবে তখন আপনি পরিখা খনন করাবেন। প্রাকার তৈরী করাবেন, গোপুর অর্থাৎ তোরণ নির্মাণ করাবেন, অট্টালিকা তৈরী করাবেন, ধান্য আহরণ করাবেন? তখন আপনি হাতীদের শেখাবেন, ঘোড়াদের শিক্ষা দেবেন, রথীদের প্রস্তুত করাবেন, ধনু চালনা শেখাবেন, তরবারি চালনা শেখাবেন?

না মহোদয়।

এভাবেই মহারাজ সংকট কালে চেষ্টা করলে লাভ হয় না, পূর্ব থেকেই প্রতিকারের নিমিত্ত প্রস্তুত হলে কাজ হয়।

টীকা—পচ্চুপট্ঠিতো—প্রত্যুপস্থিতঃ। থরুস্মিং—ৎসরুস্মিন্। ৎ+স=থ। মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের প্রভাবে সর্বনাম পদের সপ্তমী চিহ্ন স্মিন্=স্মিং হয়েছে।

মূলপাঠ—Bhāsitām petaṃ mahārāja Bhagabata
Paṭiacceva taṃ kayirā yaṃ jaññā hitam attano
Na sākaṭikacintāya mantā dhīro parakkame.
yathā sākaṭiko nāma samam hitva mahāpathaṃ
Visamaṃ maggaṃ āruyha akkhacchinno va jhāyati
Evaṃ dhammā apakkamma adhammaṃ anuvattiya
Mano maccumukhaṃ patto akkhacchinno va socatīti.
Kallosi bhante Nāgasenāti

ভাসিতং পেতং মহারাজ ভগবতা—
পটিগচ্চেব তং কয়িরা যং জঞ্ঞা হিতং অত্তনো
ন সাকটিকচিন্তায় মন্তা ধীরো পরক্কমে।

যথা সাকটিকো নাম সমং হিত্বা মহাপথং
বিসমং মগ্গং আরুষ্হ অক্খচ্ছিন্নো ব ঝায়তি।
এবং ধম্মা অপক্কম্ম অধম্মং অনুবত্তিয়
মনো মচ্চুমুখং পত্তো অক্খচ্ছিন্নো ব সোচতীতি।
কল্লোসি ভন্তে নাগসেনাতি।

অনুবাদ—মহারাজ, ভগবান বুদ্ধদেবও অনুরূপ বলেছেন—

প্রতিকারের উদ্দেশ্যে ভেবে কাজ করবে যাতে নিজের মঙ্গল হয়। ধীর ব্যক্তি শকট চালকের মত না বুঝে কখনও কাজের চেষ্টা করবেন না। এক শকট চালক সমতল প্রশস্ত রাস্তা ছেড়ে অসমতল পথে উঠে গাড়ীর অক্ষদণ্ড ভেঙ্গে চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিল। সেই রকম ধর্ম পথ ছেড়ে অধর্মপথের অনুবর্তী হলে মানব মন মৃত্যু মুখে পড়ে এবং অক্ষদণ্ডহীনের মত শোক করে।

নাগসেন, আপনি খুব সুবিজ্ঞ ব্যক্তি।

টীকা—কয়িরা—কুর্যাৎ। জঞ্ঞা—জন্যাৎ। পরক্কমে—পরাক্রমেৎ। আরুষ্হ—আরুহ্য। বিপর্যয়। ঝায়তি—ধ্যায়তি। ধম্মা—ধর্মাৎ। অপক্কম্ম—অপক্রম্য। অনুবত্তিয়—অনুবর্ত্য। বিপ্রকর্ষ।

Text 42 Makhādeva Jātaka

মখাদেব জাতক

বুদ্ধদেব ৫৪১ বার জন্মগ্রহণ করবার পর বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। বিভিন্ন জন্মে তিনি বিভিন্ন রূপে জন্মান। শিষ্যদের কাছে সেই পূর্ব জন্মের বৃত্তান্ত বলেছিলেন। সেগুলি জাতক গল্প নামে সাহিত্যের ইতিহাসে খ্যাত। মখাদেব নামক রাজা হয়ে জন্মগ্রহণ করে তিনি কি অবস্থায় সংসার ত্যাগ করেছিলেন তার কাহিনী এই জাতকে বলা হয়েছে।

মূলপাঠ—Atīte Videharaṭṭhe Mithilāyaṃ Makhādeva nāma rājā ahosi dhammiko dhammarājo. So catur sītivassa sahassāni kumarakīḷaṃ tathā oparajjaṃ tathā mahārajjaṃ katvā dīghaṃ addhānaṃ khepetvā ekadivasaṃ kappakaṃ āmantesi—yadā me samma kappaka sirasmiṃ phalitaṃ passeyyāsi atha me āroceyyāsīti.

১। অতীতে বিদেহরট্ঠে মিথিলায়ং মখাদেব নাম রাজা অহোসি ধম্মিকো ধম্মরাজো। সো চতুরাসীতিবস্স সহস্সানি কুমারকীড়ং তথা ওপরজ্জং তথা মহারজ্জং কত্বা দীঘং অদ্ধানং খেপেত্বা একদিবসং কপ্পকং আমন্তেসি

—যদা মে সম্ম কপ্পক সিরস্মিং ফলিতং পস্সেয্যাসি অথ মে আরোচেয্যাসীতি।

অনুবাদ—অতীতকালে বিদেহ রাষ্ট্রে মিথিলা নগরে মখাদেব নামে একজন ধার্মিক ধর্মরাজ নরপতি ছিলেন। তিনি চুরাশি হাজার বছর ক্রমান্বয়ে বাল্যক্রীড়া পরে যুবরাজত্ব এবং পরে মহারাজত্ব করে দীর্ঘকাল যাপন করে একদিন নাপিতকে বললেন, "দেখ ভদ্র পরামাণিক, যখন আমার মাথায় পাকাচুল দেখতে পাবে আমাকে জানাবে।"

টীকা—অহোসি—ভূ ধাতু লুঙ্। কুমারকীড়ং—কুমারক্রীড়াং। ওপরজ্জং—ঔপরাজ্যং। অদ্ধানং—অধ্বানং। খেপেত্বা—ক্ষেপয়িত্বা। কপ্পক—কল্পক। কেশ প্রসাধনকারী। আমন্তেসি—আ—মন্ত্র্+লুঙ্। সম্ম—শর্মন্। মহাশয়। সিরস্মিং—শিরস্মিন্। ফলিতং—পলিতং। পাকাচুল। প-কারের মহাপ্রাণতা যেমন পনস> ফনস, কীল>খীল।

মূলপাঠ—Kappokopi dīgham addhānam khepetvā ekadivasam ranño añjanavannānam kesānam antare ekameva phalitam disvā deva ekante phalitam dissatīti ārocesi.

কপ্পকোপি দীঘং অদ্ধানং খেপেত্বা একদিবসং রঞ্ঞো অঞ্জনবণ্ণানং কেসানং অন্তরে একমেব ফলিতং দিস্বা দেব একন্তে ফলিতং দিস্সতীতি আরোচেসি

অনুবাদ—নাপিতও দীর্ঘকাল অতিবাহিত করার পর একদিন রাজার কাজলকালো চুলগুলির মধ্যে একগাছি পাকা চুল দেখে বলল, "প্রভু, আপনার এক গাছি পাকা চুল দেখা যাচ্ছে।"

টীকা—রঞ্ঞো—রাজ্ঞঃ। একমেব—একম্+এব। দিস্বা—দৃশ্+ক্তাচ্। একন্তে—একং+তে।

মূলপাঠ—Tena hi me samma tam phalitam uddharitvā pānimahi ṭhapehīti ca vutto suvanna—sandāsena uddharitvā ranño pānimhi patiṭṭhāpesi. Tadā ranño caturāsītivassasahssāni āyum avasiṭṭham hoti.

তেন হি মে সম্ম তং ফলিতং উদ্ধরিত্বা পাণিম্হি ঠপেহীতি চ বুত্তো সুবণ্ণ সণ্ডাসেন উদ্ধরিত্বা রঞ্ঞো পাণিম্হি পতিট্ঠাপেসি। তদা রঞ্ঞো চতুরাসীতিবস্স সহস্সানি আয়ুং অবসিট্ঠং হোতি।

অনুবাদ—(রাজা বললেন) "তাহলে মশাই, সেই পাকা চুলটি তুলে আমার হাতে রাখুন।' এরকম বলা হলে সোনার সাঁড়াশি দিয়ে চুলগাছা তুলে রাজার হাতে রাখল। তখনও রাজার চুরাশি হাজার বছর আয়ু অবশিষ্ট আছে।

টীকা—পাণিম্হি—পাণিস্মিন্। ঠাপেহি+ইতি। স্থা ধাতু ণিচ্ অনুজ্ঞা। বুত্তো—ব্যুক্তঃ। বি+বচ্+ক্ত। সণ্ডাসেন—সংদংশেন। অবসিট্ঠং—অবশিষ্টং। হোতি—ভবতি।

মূলপাঠ—Evaṃ sante pi phalitaṃ disvā va maccurājānaṃ āgantvā samīpe ṭhitaṃ viya attānaṃ ādittapaṇṇasālaṃ paviṭṭhaṃ viya ca maññamāno saṃvegaṃ āpajjitvā bāla makhādeva yāva phalitassa uppādā va ime kilese jahituṃ nāsakkhīti cintesi.

এবং সন্তে পি ফলিতং দিস্বা ব মচ্চুরাজানং আগন্ত্বা সমীপে ঠিতং বিয় অত্তানং আদিত্তপণ্ণশালং পবিট্ঠং বিয় চ মঞ্ঞমানো সংবেগং আপজ্জিত্বা বাল মখাদেব যাব ফলিতস্স উপ্পাদা ব ইমে কিলেসে জহিতুং নাসক্খীতি চিন্তেসি।

অনুবাদ—এরূপ হওয়া সত্ত্বেও পাকাচুল দেখেই তাঁর মনে হল যেন মৃত্যুরাজ নিকটে এসে উপস্থিত, নিজেকে মনে করলেন যেন জ্বলন্ত পর্ণকুটীরে প্রবিষ্ট। মনে আবেগ জাগল, ভাবলেন, "বোকা মখাদেব, পাকাচুল জন্মানো পর্যন্ত তুমি এই দুঃখ পরিহার করতে পারলে না?"

টীকা—সন্তে—অস্ ধাতু শতৃ ভাবে সপ্তমী। দিস্বা—দৃশ্+ক্তাচ। আগন্ত্বা—আ+গম্+ক্তাচ্। ঠিতং বিয়—স্থিতং ইব। আদিত্ত—আদীপ্ত। আপজ্জিত্বা—আ-পদ্+ক্তাচ্। পালিতে উপসর্গ পূর্বে থাকলেও ক্তাচ্ হয়। উপ্পাদা—উৎপাদাৎ। কিলেসে—ক্লেশে। জহিতুং—হা+তুম্।

মূলপাঠ—Tassevaṃ phalitapātubhāvaṃ āvajjantassa āvajjantassa āntodāho uppajji. Sarīrā seda muccimsu. Sāṭakā pīḷetvā apanetabba-kārappattā ahesuṃ. So Ajjeva mayā nikkhamitvā pabbajituṃ vaṭṭatīti kappakassa satasahassuṭṭhānaṃ gāmavaraṃ datvā jeṭṭha-puttaṃ pakkosāpetvā—tāta mama sīse phalitaṃ pātubhūtaṃ. mahallakomhi jāto. bhuttā kho pana me mānusakā kāmā. Idāni dibbak me pariyesissāmi

nekkhamma kālo mayhaṃ. Tvaṃ imaṃ rajjaṃ paṭipajja. ahaṃpana pabbajitvā Makhādevambavanuyyāne vasanto samaṇadhammaṃ karissāmīti āha.

তস্সেবং ফলিতপাতুভাবং আবজ্জন্তস্স আবজ্জন্তস্স অন্তডাহো উপ্পজ্জি। সরীরা সেদা মুচ্চিংসু। সাটকা পীড়েত্বা অপনেতব্ব-কারপ্পত্তা অহেসুং। সো অজ্জেব ময়া নিক্খমিত্বা পব্বজিতুং বট্টতীতি কপ্পকস্স সতসহস্সুট্‌ঠানং গামবরং দত্বা জেট্‌ঠপুত্তং পক্কোসাপেত্বা—তাত মম সীসে ফলিতং পাতুভূতং, মহল্লকোম্‌হি জাতো, ভুত্তা খো পন মে মানুসকা কামা; ইদানি দিব্বকামে পরিয়েসিস্সামি, নেক্খম্মকালো মযহং, ত্বং ইমং রজ্জং পটিপজ্জ, অহং পন পব্বজ্জিত্বা মখাদেবম্বনুয্যানে বসন্তো সমণধম্মং করিস্সামীতি আহ।

অনুবাদ—পাকাচুলের আবির্ভাবের কথা তাঁর মনে আওড়াতে আওড়াতে অন্তর্দাহ উপস্থিত হল। দেহে ঘাম দেখা দিল, পরিহিত বস্ত্রাদি পীড়াদায়ক এবং খুলে ফেলার যোগ্য হল। তিনি ভাবলেন—"আজ আমার গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত"। একথা ভেবে নাপিতকে শতসহস্র আয়যুক্ত একটা গ্রামশ্রেষ্ঠ দান করে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ডেকে বললেন, "বাপু, আমার মাথায় পাকা চুল দেখা দিয়েছে, আমি বৃদ্ধ হয়েছি। মানুষের যা কাম্য তা আমি ভোগ করেছি, এখন দিব্যকামনার চেষ্টা করব। এখন আমার কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের কাল। তুমি এই রাজ্য গ্রহণ কর। আমি সন্ন্যাস নিয়ে মখাদেব নামক আম্রবনের উদ্যানে বাস করতে করতে শ্রমণ ধর্ম পালন করব।

টীকা—আবজ্জন্তস্স—আ—বৃজ্+শতৃ ষষ্ঠীর একবচন। উপ্পজ্জি উৎ+পদ+লুঙ্। সেদা—স্বেদাঃ। পীড়েত্বা—পীড়য়িত্বা। মূর্ধন্য ল। অপনেতব্বকারপ্পত্তা—অপনেতব্য+আকার প্রাপ্তা। সতসহস্সুট্‌ঠানং—শতসহস্র+উত্থানং। যা থেকে শত সহস্র তোলা যায়। পক্কোসাপেত্বা—প্র+ক্রুশ্ ধাতু ণিচ ক্ত্বাচ্। সীসে—শীর্ষে। মহল্লকোম্‌হি—মহার্ঘকঃ অস্মি। র=ল। ভুত্তা—ভুক্তা। পরিয়েসিস্সামি—পরি+ইষ্ ভবিষ্যৎকাল। নেক্খম্ম—নৈষ্ক্রম্য। পটিপজ্জ—প্রতিপদ্য (প্রতিপদ্যস্ব ।

মূলপাঠ—Tamevaṃ pabbajitukāmaṃ amaccā upasaṅkamitvā: deva kiṃ tumhākaṃ pabbajjā kāraṇanti pucchiṃsu Rājā phalitaṃ hatthena gahetvā amaccānaṃ imaṃ gāthaṃ āha:—

Uttamaṅgaruhā mayhaṃ ime jātā vayoharā
Pātubhutā devadūtā pabbajjāsamayo mamāti.

নর=কিন্নর ; সং+দিটিঠ্‌=সন্দিটিঠ্‌। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হয়। যেমন—পুং+লিঙ্গ=পুল্লিঙ্গ ; সং+লাপ=সল্লাপ।

অনুস্বার সন্ধিতেও নিয়মের কড়াকড়ি নেই। পদের মধ্যে ং থাকলে লোপ পায় এবং অনুস্বার না থাকলেও ং হয়। যেমন—দেবানং+সন্তিকে=দেবানসন্তিকে ; কিং+হ=কিহ ; গন্তুং+কাম=গন্তুকাম। ং-আগমের দৃষ্টান্ত—অব+সির=অবংসির : কচ্চি+সু=কচ্চিংসু ; যাব+চ=যাবংচ, যাবঞ্চ।

সন্ধি পদ্ধতি বিচার করলে এই সন্ধি যে নিয়মানুগ অপেক্ষা উচ্চারণানুগ তা সহজেই প্রতিপন্ন হয়।

প্রশ্ন ১১। পালি শব্দরূপ ও ধাতুরূপের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর।
[ক. বি. '৬৩, ৬৪, ৬২, ৬৭]

উত্তর। শব্দরূপের বৈশিষ্ট্য (Declension system) :

লিঙ্গ, বচন এবং কারকনির্দেশক চিহ্নদ্বারা অর্থাৎ বিভক্তির যোগে বাক্যে ব্যবহারের উপযোগী পদগঠনকে বলে শব্দরূপ। পালি ভাষা সরলতা পন্থী ; সংস্কৃত শব্দরূপের বহুধা বৈচিত্র্য পালিতে নেই। সংস্কৃতে স্বরান্ত, ব্যঞ্জনান্ত, সর্বনাম ও সংখ্যাবাচক শব্দের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। স্বরান্ত শব্দের ও কত বৈচিত্র্য। অ-কারান্ত, ই-কারান্ত করে প্রত্যেকটি স্বরবর্ণের জন্য ভিন্নপ্রকার রূপের ব্যবস্থা। পালিতে এত জটিলতা নেই। পালি-ব্যাকরণের পণ্ডিতগণ বলেন, "One of the main features of declension in Pali is that it shows a tendency to replace the consonant-bases by the vowel ones and further reduce all sorts of masculine declension to the model of the a-declension." পালিতে ব্যঞ্জনান্ত শব্দ নেই। সবই স্বরান্ত এবং সব স্বরান্ত শব্দকেই দেব শব্দের মত করবার চেষ্টা দেখা যায়। দেব শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে যেমন দেবস্স হয়, তেমনি পালিতে দেবস্স, মুনিস্স, পিতুস্স, সাধুস্স, গোস্স প্রভৃতি পদ দেখা যায়। পালি একটি মিশ্রভাষা, একে compromised speech বলে। বিভিন্ন প্রাকৃতের উপাদান নিয়ে এই ভাষায় দেহগঠন করা হয়েছে। সুতরাং পালি শব্দরূপে বহু বিকল্প পদ দেখা যায়। যেমন রাজা শব্দের পঞ্চমীর বহুবচনে পাঁচটি বিকল্প পদ আছে—রঞ্ঞাহি, রাজূহি, রাজূভি, রাজেহি, রাজেভি। এতে বোঝা যায় এই ভাষায় সর্বজনগ্রাহ্য বৈশিষ্ট্য রক্ষা করবার প্রয়াস ছিল।

শব্দরূপের প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যেতে পারে।

১। পালি শব্দরূপে দ্বিবচন নেই, চতুর্থী ও ষষ্ঠীর জন্য পৃথক রূপ নেই, তৃতীয়ার বহুবচনের সঙ্গে পঞ্চমীর বহুবচন মিলে গেছে।

২। সর্বনাম শব্দের বিভক্তি নামপদেও ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয়ার বহুবচনে 'এ' ; পঞ্চমীর একবচনে স্মা, ম্হা ; সপ্তমীর একবচনে স্মিং, ম্হি প্রভৃতি বিভক্তি সর্বনাম শব্দরূপ থেকে গৃহীত।

৩। স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে তৃতীয়া থেকে সপ্তমী পর্যন্ত একবচনে একই রূপ। নদিয়া, লতায়, দোবিয়া প্রথমা-দ্বিতীয়া ছাড়া সব বিভক্তিরই একবচনে চলে।

৪। লিঙ্গপ্রয়োগে খুব বেশি কড়াকড়ি নেই। ধম্মা, ধম্মানি, সুখো, সুখং, পুত্তানি, পুত্তে—এরূপ পুং এবং ক্লীং দুই লিঙ্গেই ব্যবহার দেখা যায়।

৫। কিছু বৈদিক বিভক্তি শব্দরূপে প্রয়োগ করা হয়। যেমন প্রথমার বহুবচনে 'আসে', অকারান্ত শব্দের তৃতীয়ার একবচনে 'আ', তৃতীয়ার বহুবচনে 'এহি', 'এভি' এবং ষষ্ঠীর বহুবচনে গোনং।

নিম্নে 'রাজা' শব্দের রূপ দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রদর্শন করা হল ঃ—

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
প্রথমা—	রাজা	রাজা, রাজানো
দ্বিতীয়া—	রাজানং	রাজানো
তৃতীয়া—	রঞ্ঞা, রাজেন, রাজিনা	রঞ্ঞাহি, রাজূহি, রাজূভি, রাজেহি, রাজেভি
চতুর্থী—	রঞ্ঞো, রাজস্স, রাজিনো	রঞ্ঞং, রাজানং রাজূনং
পঞ্চমী—	রঞ্ঞা, রাজস্মা, রাজম্হা	(তৃতীয়ার অনুরূপ)
ষষ্ঠী—	(চতুর্থীর অনুরূপ)	(চতুর্থীর অনুরূপ)
সপ্তমী—	রঞ্ঞে, রাজস্মিং, রাজম্হি, রাজিনি	রাজূসু, রাজেসু
সম্বোধন—	রাজ, রাজা	রাজানো, রাজা।

ধাতুরূপের বৈশিষ্ট্য (Conjugation System)

মূল ক্রিয়াপদের সঙ্গে বিভক্তি বা প্রত্যয় যোগ করে ধাতুরূপ গঠন করা হয়। এতে ক্রিয়ার ব্যাখ্যা এবং অর্থ-তাৎপর্য বোঝা যায় বলে পালিতে বলা হয় অক্খাত (আখ্যাত)। সংস্কৃতের মত পালিতে গণবিভাগ আছে কিন্তু ঠিক দশটি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভাগ করা হয় না। তদুপরি পরস্মৈপদী ও আত্মনেপদী ধাতুর বিভাগটিও সযত্নে রক্ষা করা হয় না। সব ধাতুকেই দুরকমে ব্যবহার করা চলে। শব্দরূপের মত পালি ধাতুরূপেও দ্বিবচন নেই। কিন্তু সংস্কৃতের মত উত্তম, মধ্যম এবং প্রথম পুরুষ আছে।

পালি ধাতুর প্রয়োগে কর্তৃ, কর্ম এবং ভাববাচ্য আছে। বাচ্য গঠনের নিয়ম মুখ্যত: সংস্কৃতের অনুরূপ। সংস্কৃত কর্মবাচ্যের ক্রিয়াপদ যেমন আত্মনেপদী হয়, পালিতে কিন্তু পরস্মৈপদও হতে পারে। দারকেন চন্দং দিস্সতে বা দিস্সতি।

পালি ক্রিয়ায় মুখ্যতঃ তিনটি কাল—বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যৎ বোঝাবার জন্য বিধিলিঙ্‌ ব্যবহারও করা হয়। অতীতের জন্য লিট্, লঙ এবং লুঙ্ ব্যবহার। লিটের ব্যবহার পালিতে ক্বচিৎ। লঙ্ কিছু কিছু দেখা যায়। সব চেয়ে বেশী প্রয়োগ আছে লুঙ (aorist)। বৈয়াকরণেরা বলেছেন, "The Aorist is the

only true Past Tense which is most commonly used in Pali to express a past event." এই Aorist বা লুঙ্-বিভক্তি গঠন করার তিনটি পদ্ধতি দেখা যায়। পালি ভাষায় Aoristকে বলে অজ্জতনী। অজ্জতনীতে মূল ধাতুর সঙ্গে 'ই' যোগ করে, যেমন ভূ+লুঙ=ভবি ; অথবা মূল ধাতুর পূর্বে 'অ' বসিয়ে, যেমন অভবি ; অথবা ধাতু ও বিভক্তির মধ্যে 'স' ধ্বনির আগম দ্বারা, যেমন অহোসি। নিম্নে ভূ=ভব ধাতুর অজ্জতনী রূপ দেখান হল।

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন—	অভবি, ভবি, অহোসি, অহু	অভবি, ভবি, অহোসি, অহু	অভবিং, ভবিং, অহোসিং, অহুং, অহুবাসিং
বহুবচন—	অভবিংসু, ভবিংসু, অহেসুং	অভবিত্থ, ভবিত্থ অহোসিত্থ, অহুবত্থ	অভবিম্হা, ভবিম্হা অহোসিম্হা অহেসুম্হ অহুম্হ

পালি ধাতুরূপের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে নিয়মের কাঠিন্য যথাসম্ভব পরিহার করার চেষ্টা আছে এবং বহু বিকল্প পদের ব্যবহার করা হয়। অনুজ্ঞায় লোট বিভক্তির ব্যবহার আছে। তিনটি ভাব এবং পাঁচটি কালের ধাতুরূপ গঠন করা হয়। বর্তমান কালের প্রথম পুরুষের বহুবচনের 'অন্তে' বিভক্তির পরিবর্তে বৈদিক 'আরে' বিভক্তি প্রযুক্ত হয়।

প্রশ্ন ১২। পালি ব্যাকরণের কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা কর :—

(ক) **লিঙ্গ-বিপর্যাস** (change of gender)

পালি ভাষায় লিঙ্গ নির্ণয় প্রধানত: সংস্কৃতের অনুরূপ। বস্তু অনুসারে লিঙ্গ হয় না, শব্দের আকৃতি অনুসারে হয়। যেমন দেব পুংলিঙ্গ, দেবতা স্ত্রীলিঙ্গ ; চিত্ত ক্লীবলিঙ্গ, চিন্তা স্ত্রীলিঙ্গ। পালিতে অনেক শব্দ স্ত্রী-পুরুষ দুই-ই হয়। কুচ্ছি (কুক্ষি) শব্দ স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গেই ব্যবহার করা হয়।

পালিতে শব্দগুলিকে লিঙ্গভেদে চার ভাগে ভাগ করা হয়। (১) নিত্যলিঙ্গ— পুং—বুদ্ধ, দন্ত, লোক ; স্ত্রী—দেবতা, লতা, নদী, পূজা ; ক্লী—চিত্ত, তপ, যস। (২) দুই লিঙ্গ—পুরুষ ও স্ত্রী—অস্স—অস্সা, সমণ—সমণী। পুং ও ক্লীং—কাল—কালং, সির—সিরং। স্ত্রী ও ক্লীং—নগরী—নগরং, লোচনা—লোচনং। (৩) তিন লিঙ্গ—কলস—কলসী—কলসং, পুর—পুরী—পুরং। (৪) লিঙ্গ পরিচয়হীন অব্যয়-স্বরূপ—অধুনা, নাম, কদাচি, পন, ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গ গঠনের জন্য পালিতে কতকগুলি প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়, তার নাম ইত্থী-পচ্চয়া। আ, ঈ, নী, আনী, ইনী, ইকা, ইয়া এবং ইকিনী প্রত্যয় দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে

রূপান্তর করা হয়ে থাকে। অয্যা, দেবী, মাতুলানী, মালিনী, দারিকা, দুসিয়া, পরিব্রাজিকিনী।

(খ) **অতিশায়ন** (Comparison of adjectives) [১৯৬৬]

পালিতে সংস্কৃতের মত-তুলনামূলক বিশেষণ গঠন করা হয়। একে বলে অতিশায়ন। তর-তম নির্দেশ করবার জন্য প্রত্যয় যোগে বিশেষণ শব্দ গঠন করে বিশেষ্যের তুলনা করা। হয়। এটা একপ্রকার degree বা গুণগত উৎকর্ষনির্দেশ। ইংরাজীতে positive, comparative and superlative degree বলে। দুইএর মধ্যে তুলনায় তর, দুইএর বেশী হলে তম।

অতিশায়নের নিয়ম সংস্কৃতানুগ। প্রধানতঃ ইয় এবং ইট্‌ঠ প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়। গুরু—গরিয়—গরিট্‌ঠ। বহু—ভীয়, ভিয্যো—ভূয়িট্‌ঠ। পাপিমা—পাপিয়—পাপিট্‌ঠ। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তর ও তম প্রত্যয়ের ব্যাপক ব্যবহার। অধিক—অধিকতর—অধিকতম ; নীচ—নীচতর—নীচতম ; পিয়—পিয়তর—পিয়তম ; সন্ত—সন্ততর—সন্ততম। কোন কোন ক্ষেত্রে তর ও তম-এর পরিবর্তে শুধু 'র' ও 'ম' হয়। অব—ওর—ওম ; অধ—অধর—অধম। সংস্কৃতের মত অন্য শব্দদ্বারাও হয়। বুড্‌ঢ—জেয্য—জেট্‌ঠ। পসট্‌ঠ—সেয্য—সেট্‌ঠ। যুবা—কণীয়—কণিট্‌ঠ। দুএকটি ক্ষেত্রে দুবার অতিশায়ন হয়েছে। খিপ্প—অতিখিপ্প ; পসট্‌ঠ—সেট্‌ঠতর ; পাপী—পাপিট্‌ঠতর ইত্যাদি।

(গ) **কৃদন্ত বিশেষণ** (Participles) ['৬৩, '৬৫]

সব রকম ধাতুর উত্তর কৃৎ প্রত্যয় যোগ করে বিশেষণ গঠন করা হলে তাকে বলে কৃদন্ত বিশেষণ। যে বিশেষ্যপদের বিশেষণরূপে এদের ব্যবহার প্রত্যয় অনুসারে তাতে কালের নির্দেশও হয়। সংস্কৃতে এই প্রত্যয়গুলি পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ অনুসারে ভাগ করা ছিল। যেমন—পরস্মৈপদে শতৃ, আত্মনেপদে শানচ্। পালিতে কিন্তু এই নিয়ম কড়াকড়িভাবে পালিত হয় না। তিন রকম কাল নির্দেশকরূপে তিনশ্রেণীর কৃৎ-প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়।

বর্তমানের জন্য (ং, অন্ত) শতৃ এবং (অন, মান) শানচ্ ব্যবহার।

ং—পিবং, করং, রুদং, পচং, লভং, ইত্যাদি।

অন্ত—পিবন্ত, করোন্ত, রুদন্ত, রোদন্ত, পচন্ত, সন্ত, বসন্ত ইত্যাদি।

অন—সয়ান, কুব্বান, সমান ইত্যাদি।

মান—পিবমান, করমান, রুদমান, পচমান, বসমান ইত্যাদি।

অতীতের জন্য সংস্কৃত ক্ত ক্তবতু প্রত্যয় পালিতে হয়েছে ত, তবা এবং তাবী। কর্তৃ ও কর্ম উভয় বাচ্যেই এই প্রত্যয়গুলির ব্যবহার। তবে সাধারণতঃ কর্তৃবাচ্যে তবা এবং তাবী ব্যবহার বেশি বস্‌+তবা=বুসিতবা ; বস্‌+তাবী=বুসিতাবী। ভুজ—ভুত্তবা, ভুত্তাবী। সু—সুতবা, সুতাবী। অকর্মক ক্রিয়ায় ত-প্রত্যয় হয়। মর্‌+ত=মত, গম্‌+ত=গত, ঠা+ত=ঠিত। ত-প্রত্যয় ধাতুর সঙ্গে যোগ করলে মাঝখানে

অনেক সময় ই-কারের আগম হয়। বস্+ত=বুসিত। অনুরূপ প্রয়োগ—হাসিত, যাচিত, চরিত, ভাসিত ইত্যাদি। প্রাচীন মাগধীর প্রভাবে ত-প্রত্যয় কোন কোন ক্ষেত্রে ন-প্রত্যয়ে পরিণত হয়। যেমন দা—দিন্ন, সদ্—সন্ন, আ+সদ—আসন্ন, ছদ্—ছিন্ন, ছিদ্—ছিন্ন, আস্—আসীন।

ভবিষ্যৎ কালের জন্য তব্ব, অনীয় এবং য প্রত্যয় সাধারণতঃ কর্মবাচ্যে ব্যবহার করা হয়। দা—দাতব্ব, দানীয়, দেয্য ; ভূ—ভবিতব্ব, ভবনীয়, ভব্ব ; গম—গন্তব্ব, গমনীয়, গম্ম ; নী—নেতব্ব, নয়নীয়, নেয্য ; সী—সয়িতব্ব, সয়নীয়, সেয্য।

(ঘ) **নিমিত্তার্থক ক্রিয়া** (Infinitive Verb) ('60, '62, '64, '66, '68)

ধাতুর উত্তর তুম্ প্রত্যয় যোগ করে সংস্কৃতে নিমিত্তার্থক ক্রিয়া গঠন করা হয়। পালিতেও তাই। তুং ছাড়া বৈদিক প্রত্যয় তবে, তুয়ে এবং তায়ে প্রধানতঃ পদ্যরচনায় দেখা যায়। ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যোগের সময় 'ই' অনুপ্রবিষ্ট হয়। ধাতুর অন্ত্যস্বর ই ঈ বা উ ঊ হলে গুণ হয়ে যথাক্রমে এ বা ও হয়।

তুং—দাতুং, যাতুং, ঞাতুং, ঠাতুং, ভবিতুং, নেতুং, জেতুং, সোতুং।

তবে—দাতবে, কাতবে, গন্তবে, নেতবে, সোতবে ইত্যাদি

তুয়ে—দাতুয়ে, কাতুয়ে, মরিতুয়ে, হেতুয়ে, গণেতুয়ে।

তায়ে—খাদিতায়ে, পুচ্ছিতায়ে, দক্খিতায়ে।

আর একটি বৈদিক প্রত্যয় 'সে' ব্যবহার করা হয়েছে ই-ধাতুর সঙ্গে। পদটি হয় এতসে=যেতে বা পৌঁছাতে। থেরীগাথায় (১৫১) পদটি দেখা যায়।

(ঙ) **অসমাপিকা ক্রিয়া** (Non-finite, Gerund) 1960, 62, 69)

সংস্কৃতে ধাতুর উত্তর ক্ত্বাচ্ এবং ধাতুর পূর্বে উপসর্গ থাকিলে ল্যপ্ প্রত্যয় দ্বারা অসমাপিকা ক্রিয়া গঠন করা হয়। পালি ভাষায় এই উদ্দেশ্যে ত্বা এবং য প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়। তবে পালিভাষা সরলতার পক্ষপাতী বলে উপসর্গ থাক আর না থাক, ত্বা এবং য নির্বিচারে ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া বিশেষতঃ পদ্যরচনায় দুটি বৈদিক প্রত্যয় ত্বান এবং তূন ব্যবহার করেও কিছু অসমাপিকা ক্রিয়া গঠন করা হয়েছে।

ত্বা—দত্বা, ঞত্বা, জানিত্বা, জেত্বা, গন্ত্বা, দিস্বা, লভিত্বা, হিত্বা, জহিত্বা, আরুহিত্বা, নিব্বত্তিত্বা।

য—করিয়, গণহিয়, পস্সিয়, জানিয়, মুঞ্চিয়, আদায়, উট্ঠায়, বিনেয্য।

য (সমীভবনে চ্চ)—চিং+য=চিচ্চ, চেচ্চ ; আ+সদ+য=আসজ্জ ; উপ+ই +য=উপেচ্চ।

ত্বান—জেত্বান, সুত্বান, গন্ত্বান, দিস্বান, কত্বান, লদ্ধান।

তূন—গন্তূন, সোতূন, কাতূন, পস্সিতূন, হাতূন।

(চ) **সনন্ত-ধাতু** (Desiderative) (64, 66, 69)

ইচ্ছা প্রকাশ করবার জন্য সংস্কৃতে ধাতুর উত্তর সন্ প্রত্যয় হয়, মূলধাতু দ্বিত্ব হয়। পালিতেও প্রধানতঃ সেই নিয়ম। ধাতুকে দ্বিত্ব করা, যাকে পালিতে বলে 'অব্ভাস' তার কিছু নিয়ম আছে। (১) স-প্রত্যয় যোগ হলে ধাতুর প্রথম অক্ষর দ্বিত্ব হয়। ঘোষধ্বনি অঘোষ হয় অর্থাৎ বর্গের দ্বিতীয় চতুর্থ বর্ণ যথাক্রমে প্রথম তৃতীয় বর্ণ হয়। (২) সমীভবনে ক-বর্গের ধ্বনি চ-বর্গে পরিণত হয়, ধাতুর আদিতে হ-ধ্বনি জ হয় এবং মূল ধাতুর দ্বিত্ব করলে ম ও ক যথাক্রমে ব ও ত হয়ে যায়। মূলকথা, সংস্কৃত সনন্ত পদের ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তন দ্বারাই পালি সনন্ত পদগুলি নিষ্পন্ন হয়।

দা—দিচ্ছতি, পা—পিবাসতি, পিপাসতি, সু—সুস্সূসতি, চিং—চিকিচ্ছতি, টিকিচ্ছতি,

জি—জিগিংসতি, জিগীসতি, গুপ্—জিগুচ্ছতি, ভুজ—বুভুক্খতি।

(ছ) **যঙন্ত-ধাতু** (Frequentative or Intensive) : ('64, '69)

পুনঃ পুনঃ ক্রিয়া সম্পাদন বুঝাবার জন্য সংস্কৃতে ধাতুর উত্তর যঙ্ প্রত্যয় হয়। মূল ধাতুর দ্বিত্ব করাই এর প্রধান কথা। সংস্কৃতের মত ধাতু আত্মনেপদ হয় না। যঙন্ত পদ গঠনে সংস্কৃত পদের অনুকরণ এবং ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তনই পালিতে লক্ষণীয়। চল—চঞ্চলতি, দা—দদাতি, গম্—জঙ্গমতি, কম—চঙ্কমতি, জল—দদ্দল্লতি, লপ্—লালপ্পতি, হস্—জগ্গহতি।

(জ) **নাম ক্রিয়া**—(Denominative : ('66, '68)

সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি অনুযায়ী পালিতে বিশেষ্য বা বিশেষণ পদকে ক্রিয়া পদ করা হয়। নাম পদকে ধাতু করলেই তার নাম নামধাতু। এখন একটি পদদ্বারাই একটি বাক্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। বিশেষ্য বা বিশেষণ পদের অন্ত্য স্বরের পরিবর্তে আয়, ইয়, ঈয় অথবা এ প্রত্যয় যোগে নাম ধাতু গঠন করা হয়।

আয়—চিরায়তি, দঢ়ায়তি, ধূমায়তি, দোহড়ায়তি, দোলায়তি, পুত্তায়তি, সুখায়তি।

ইয়—বিবাদিয়তি, বিথারিয়তি। ঈয়—বলীয়তি, ছত্তীয়তি, ধনীয়তি, পুত্তীয়তি।

এ—পদাপেতি, পাপেতি, পলাপেতি, সঙ্গামেতি।

(ঝ) **ণিজন্ত ক্রিয়া** (Causative) : ('61, '68)

প্রেরণা বা প্রবর্তনা বুঝাবার জন্য সংস্কৃতে মূল ধাতুর সঙ্গে 'ণিচ' প্রত্যয় যোগ করা হত। এই ধাতুকেই ণিজন্ত বলে। ণিচ্ স্থানে 'অয়' আদেশ হয়। পালিতে বলে কারিত-পচ্চয়া। অয় বা আপয় হল কারিত প্রত্যয়। অয় ও আপয় সংকুচিত হয়ে যথাক্রমে এ এবং আপে হতে পারে। ধাতুর অন্ত্য ই-ঈ, উ-ঊ, যথাক্রমে আয়, আব

হয়। পরস্মৈপদ—আত্মনেপদের কড়াকড়ি নেই। প্রত্যয় যোগে ধাতুর সঙ্গে সমীকরণও ঘটে।

অয়—গময়তি, কারয়তি, পাচয়তি, সাবয়তি।

আপয়—গচ্ছাপয়তি, দাপয়তি, গহাপয়তি, ঞাপয়তি, ঠাপয়তি।

এ—গমেতি, কারেতি, পাচেতি, সাবেতি।

আপে—গচ্ছাপেতি, দাপেতি, গহাপেতি, ঞাপেতি, ঠাপেতি।

(ঞ) **কর্মবাচ্যের ক্রিয়া** (Passive Verb) : ['৬১, ৬২', '৬৬, '৬৯]

কর্মবাচ্য গঠনে সংস্কৃতে কর্তায় তৃতীয়া, কর্মে প্রথমা এবং কর্মের বচনানুযায়ী য-যুক্ত ক্রিয়া আত্মনেপদ করা হয়। পালিতে মূলনীতি অনুরূপ। এখানেও ধাতুর য-বিকরণ হয় ; কিন্তু আত্মনেপদ পরস্মৈপদের পার্থক্য করা হয় না।

য-প্রত্যয় যোগের একটু বৈশিষ্ট্য আছে বলে অনেক বিকল্প পদ দেখা যায়। স্বরান্তক ধাতুর অন্ত্যস্বর অ-আ-ই অনেক সময় ঈ হয়, উ-স্বর দীর্ঘ হয়। ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর সঙ্গে য-যুক্ত ঈ দেখা যায় অথবা য-ধ্বনি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে সমীভূত হয়।

দা—দীয়তে, দিয্যতি, দীয়তি, দিয্যতে। জি—জীযতি, জিয্যতি।

ঞা—ঞাযতে, ঞায়তি। নী—নীয়তি, নিয্যতি। সু—সূয়তে, সূয়তি, সূয্যতি।

হন্—হঞ্ঞতে, হঞ্ঞতি। লভ্—লব্ভতি, লব্ভতে। বচ্—বুচ্চতি, বুচ্চতে।

কর্—করীয়তি, করিয্যতি, কীয়তি, করিয়তি।

দ্বিতীয় পত্র

(PART II)

প্রাকৃত

Text—35 (Mricchakatika Act III)—মৃচ্ছকটিক (তৃতীয় অঙ্ক)

মূলপাঠ—Saṃvāhakaḥ—Hīmāṇahe kaṭṭho eśe jūdialabhāve

Ṇavabandhaṇa-mukkae via gaddahīe
hā tāḍitomhi gaddahīe
Aṅga-lāa-mukkāe via śattīe
Ghaḍukka via ghāḍidomhi śattīe.

Lekhaa-vāvada-hiaaṃ śahiaṃ daṭṭhūṇa jhatti pabbhaṭṭhe, eṇhiṃ magganivadide kaṃ ṇu kkhu śalaṇaṃ papajje. Tā jāva ede śahia-judiala aṇṇado maṃ aṇṇeśanti tava hakke vippadīvehiṃ pādehiṃ edaṃ śuṇṇa deulam paviśia devī bhaviśśaṃ.

সংবাহকঃ—হীমাণহে কট্‌ঠে এশে জুদিঅলভাবে

ণববন্ধণ-মুক্কাএ বিঅ গদ্দহীএ
হা তাড়িতোম্হি গদ্দহীএ
অঙ্গলাঅ-মুক্কাএ বিঅ শত্তীএ
ঘড়ুক্কো বিঅ ঘাদিদোম্হি শত্তীএ

লেখঅ-বাবদ-হিঅঅং শহিঅং দট্‌ঠূণ ঝত্তি পব্‌ভট্‌ঠে এণ্হিং মগ্‌গণিবদিদে. কং ণু কৃখু শলণং পপজ্জে। তা জাব এদে শহিঅ-জুদিঅলা অন্নদো মং অন্নেশন্তি তাব হক্কে বিপ্পদীবেহিং পাদেহিং এদং শুন্ন-দেউলং পবিসিঅ দেবী ভবিশ্‌শম্।

অনুবাদ—বড়ই লজ্জার কথা যে জুয়ারির অবস্থা বড় কষ্টের। নতুন বন্ধনমুক্ত গর্দ্দভীর মত হায়রে আমি তাড়িত হয়েছি। অঙ্গরাজ কর্ণের নিক্ষিপ্ত শক্তি দ্বারা আমি ঘটোৎকচের মত ঘাতিত হয়েছি।

সভিককে লেখায় ব্যাপৃত হৃদয় দেখে পালিয়েছি। এখন রাস্তায় এসে কার শরণ

নেব ? যতক্ষণ এই সভিক জুয়ারি ও অন্যস্থানে আমাকে খুঁজবে আমি ততক্ষণ উল্টো পা ফেলে এই শূন্য মন্দিরে প্রবেশ করে দেবী সেজে থাকব।

টীকা—হীমাণহে—কেউ কেউ বলেছেন "হে মানবে"। "হ্রিয়ং মন্যামহে=লজ্জার বিষয় মনে করি"—এই বাক্যটি বিকৃত উচ্চারণের ফলে 'হীমাণহে' হলে দোষ কি ? এশে=এষঃ। খেয়াল রাখতে হবে যে নাট্যসংলাপে মাগধী-ভাষার প্রচুর মিশ্রণ আছে। যূদিঅল—দ্যূতকর। গদ্দহীএ—গর্দভী+কর্তৃকারকে মাগধীতে এ-কার। ঘডুক্কো—ঘটোৎকচঃ। বিঅ—ইব লেখঅ-বাবদ-হিঅঅং—লেখক-ব্যাপৃত-হৃদয়ং। সহিঅং—সভিকং। দট্‌ঠুণ—দৃশ্‌ ধাতু+বৈদিক তৃণ প্রত্যয় অসমাপিকা। ঝত্তি—ঝটিতি। পব্‌ভট্ঠে—প্রভ্রষ্টঃ। এণহিং—ইদানীং মগ্‌গণিবদিদে—মার্গনিপতিতঃ। পপঞ্চে—প্রপঞ্চ। অণ্ণদো—অন্যতঃ। হক্কে—অহকং। বিপ্পদীবেহিং—বিপ্রতীপেভিঃ। পবিশিঅ—প্রবিশ্য। শূণ্ণ দেউলং—শূন্যদেবকুলং। ভবিশ্‌শং—ভবিষ্যামি।

মূলপাঠ—(Tataḥ praviśati Māthuro-dyūtakaraśca)

Māthuraḥ—Ale bhaṭṭā daśasuvaṇṇāha luddhu jūdakarū papalīṇu papalīṇu. Tā geṇha geṇha ciṭṭha ciṭṭha. Durā padiṭṭhosi.

Dyūtakaraḥ—Jai vajjasi pādalaṃ Indaṃ śalaṇaṃ ca sampadaṃ jāsi sahiaṃ vajjia ekkam Ruddo vi ṇa rakkhiduṃ tarai

(ততঃ প্রবিশতি মাথুরো দ্যূতকরশ্চ)

মাথুরঃ—অলে ভট্টা দশসুবণ্ণাহ লুদ্ধু জুদকরু পপলীণু পপলীণু। তা গেণ্‌হ গেণ্‌হ। চিট্‌ঠ চিট্‌ঠ। দূরা পদিট্‌ঠোসি।

দ্যূতকরঃ—জই বজ্জসি পাদালং ইন্দং শলণং চ সংপদং জাসি সহিঅং বজ্জিঅ এক্কং রুদ্দো বি ণ রক্‌খিদুং তরই।

অনুবাদ—মাথুর (সভিক) :—ওগো মহাশয়রা, দশটি স্বর্ণ মুদ্রার ঋণে আবদ্ধ জুয়ারীটা পালাচ্ছে পালাচ্ছে। ওকে ধরুন ধরুন। ওরে থাম্‌ থাম্‌। দূর থেকে তোকে দেখা যাচ্ছে।

দ্যূতকর—যদি তুই পাতালে ভ্রমণ করিস, যদি সম্প্রতি ইন্দ্রের আশ্রয়ে যাস তাহলেও সভিকের হাত থেকে স্বয়ং রুদ্র দেবতাও তোকে রক্ষা করে তরাতে পারবে না।

টীকা—দশসুবণ্ণাহ—দশসুবর্ণস্য। নিমিত্তার্থে ৪র্থী ও ষষ্ঠীর রূপ একপ্রকার। লুদ্ধু—রুদ্ধঃ। কোন কোন প্রাকৃতে ও অপভ্রংশে কর্তৃকারকে 'উ' হয়। পপলীণু—প্রপলায়িতঃ।

গেণ্হ—গৃহাণ। চিট্‌ঠ—তিষ্ঠ। স্থা+লোট। দূরা—দূরাৎ। পদিট্‌ঠোসি—প্রদৃষ্টঃ অসি। বজ্জসি—ব্রজসি। তরই—তরতি।

মূলপাঠ—M—Kahiṃ kahiṃ susahia-vippalambhaā
Palāsi le bhaa palivevidaṅgaā
Pade pade samavisamaṃ khalantaā.
Kulaṃ jasaṃ adikasaṇaṃ kalentaā

মাথুর—কহিং কহিং সুসহিঅ বিপ্পলম্ভআ
পলাসি লে ভয়-পলিবেবিদঙ্গআ
পদে পদে সমবিসমং খলন্তআ
কুলং জসং অদিকসণং কলেন্তআ।

অনুবাদ—সৎ সভিককে প্রতারণা করে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কোথায় পালাচ্ছিস রে? পদে পদে উঁচুনীচু স্থানে তোর পদস্খলন হচ্ছে। কূল ও বংশে অতি কালো কলঙ্ক লেপন করেছিস।

টীকা—কহিং—কস্মিন্। পলিবেবিদঙ্গআ—পরিব্যাপিতাঙ্গকা। স্বার্থিক 'ক' প্রত্যয় এবং তুচ্ছার্থে সম্বোধনে 'আ'। অদিকসণং—অতিকৃষ্ণং। কলেন্তআ—করন্তকা।

মূলপাঠ—D—(padaṃ vīkṣya) esa vajjadi. iam paṇaṭṭhā padavī
M—(ālokya savitarkaṃ) ale vippadīvu pādu.
Paḍimāsuṇṇu deulu. (Vicintya) dhuttu jūdakaru
vippadīvehiṃ pādehiṃ deulaṃ paviṭṭho.
D—tā aṇusaremha.
M—evvaṃ bhodu.

দ্যূতকর —(পদং বীক্ষ্য) এসো বজ্জদি। ইঅং পণট্‌ঠা পদবী।

মাথুর —(আলোক্য সবিতর্কম্) অলে বিপ্পদীবু পাদু। পডিমাসুণ্ণু দেউলু। (বিচিন্ত্য) ধুত্তু জুদকরু বিপ্পদীবেহিং পাদেহিং দেউলং পবিট্‌ঠো।

দ্যূতকর —তা অণুসরেম্হ।

মাথুর —এব্বং ভোদু।

অনুবাদ—দ্যূতকর। (পায়ের চিহ্ন দেখে) এই পথে গেছে। এখানে পায়ের চিহ্ন শেষ হয়েছে।

মাথুর। (ভাল করে দেখে পর্যালোচনার ভঙ্গিতে) ওরে এযে উল্টা রকমের পদ চিহ্ন! দেউলটাও প্রতিমাশূন্য। (চিন্তা করে) ধূর্ত জুয়ারীটা বিপরীত ভঙ্গিতে পা ফেলে এই মন্দিরেই ঢুকেছে।

দ্যূতকর। তাহলে এস আমরা অনুসরণ করি।

মাথুর—তাই হোক্।

টীকা—পণট্‌ঠা—প্রনষ্টা। বিপ্পদীবু—বিপ্রতীপ:। অণুসরেম্হ—অনুসরেম্ম। অনু+সৃ+লট ম্ম। এব্বং ভোদু—এবং ভবতু।

মূলপাঠ—D—Kadham katthamayī padimā.

M—Ale ṇahu ṇahu śailapadimā (iti śiraścālayati samjñāpya ca) evvam bhodhu. ehi jūdam kilemha.

(iti bahuvidham dyūtam krīḍati)

দ্যূতকর —কধং কট্‌ঠময়ী পডিমা।

মাথুর —অলে ণহু ণহু শইলপডিমা। (ইতি শিরশ্চালয়তি সংজ্ঞাপ্য চ) এব্বং ভোদু। এহি জুদং কিলেম্হ। (ইতি বহুবিধং দ্যূতং ক্রীড়তি)।

অনুবাদ—দ্যূতকর। এ কিরে, এযে কাঠের প্রতিমা!

মাথুর। আরে না না পাথরের প্রতিমা। (মাথা নাড়াল এবং ইসারা করল) যাক্‌গে। এস আমরা জুয়া খেলি। (তারপর নানা রকমে জুয়া খেলতে আরম্ভ করল।)

টীকা—কধং—কথং। ণহু—ন খলু। সংজ্ঞাপ্য—সম্+জ্ঞা ণিচ ল্যপ্। জুদং—দ্যূতং। কিলেম্হ—ক্রীড়্ ধাতু লট ম্ম।

মূলপাঠ—Saṃvāhakaḥ : (dyūtecchāvikāra-saṃvaraṇam bahuvidhaṃ krtvā svagatam) Ale

Kattāśadde ṇiṇṇaṇaaśśa halai haḍakaṃ manuśśaśśa.
Ḍhakkāsadde vva ṇalādhivaśśa pabbhaṭṭalajjaśśa.
Jāṇāmi ṇa kīliśśaṃ śumelu śibala-paḍaṇa
śaṇṇihaṃ jūaṃ
Tahavi hu koilamahule kattāśadde maṇam haladi.

সংবাহকঃ—(দ্যূতেচ্ছাবিকার-সংবরণং বহুবিধং কৃত্বা স্বগতম্) অলে
কত্তাশদ্দে ণিণ্ণণঅশ্শ হলই হডকং মণুশ্শশ্শ
ঢক্কাশদ্দে ব্ব ণলাধিবশ্শ পব্ভট্‌ঠ-লজ্জশ্শ

জাণামি ণ কীলিশ্শং শুমেলু-শিহল-পদণসন্নিহং জূঅং
তহবি হু কোইল মহুলে কত্তাশদ্দে মণং হলদি।

অনুবাদ—সংবাহক (জুয়া খেলার ইচ্ছার বিকার দমন করবার বহু রকমে চেষ্টা করে নিজে নিজে বলছে।) ওরে, জুয়ার গুটির শব্দে কপর্দকহীন ব্যক্তিরও মনোহরণ করে। রাজ্যভ্রষ্ট রাজার মনও ঢাকের শব্দে নেচে উঠে। জানি আমি সুমেরু শিখর থেকে পতনের মত ভয়ঙ্কর জুয়া আর খেলবনা। তবুও কোকিলের স্বরের মত মধুর গুটির শব্দ আমার মন হরণ করে

টীকা—কত্তাশদ্দে—জুয়াখেলার ঘুঁটির শব্দ। (মূল সংস্কৃত শব্দ কি ?)। নিণ্ণঅশ্শ—নির্ধনকস্য। হলই—হরতি। হডকং—হৃদয়ং (মূর্ধন্যীভবন)। ণলাধিবশ্শ—নরাধিপস্য। তহবি—তথাপি। হু—খলু। কোইলমহুলে—কোকিলমধুরঃ। মণং হলদি—মনঃ হরতি।

মূলপাঠ—D—Mama pāṭhe. Mama paṭhe.

M—Ṇa hu mama pāṭhe mama pāṭhe.

S—(anyataḥ sahasopasṛtya) ṇam mama pāṭhe.

D—Laddhe gohe.

M—(gṛhitva) Ale pedaṇḍa gahido si. Paaccha taṃ dasasuvaṇṇaṃ

S—Ajja daiśśaṃ.

M—Ahuṇā paaccha.

S—daiśśam. paśādaṃ kalehi

M—Ale ṇaṃ sampadaṃ paaccha.

S—Śilu paḍadi.

(iti bhumau patati. Ubhau bahuvidhaṃ tāḍayataḥ).

দ্যূতকরঃ। মম পাঠে, মম পাঠে।

মাথুরঃ। ণ হু, মম পাঠে, মম পাঠে।

সংবাহকঃ। (অন্যতঃ সহসোপসৃত্য) ণং মম পাঠে।

দ্যূতকরঃ। লদ্ধে গোহে।

মাথুরঃ। (গৃহীত্বা) অলে পেদণ্ডা গহীদোসি। পঅচ্ছ তং দসসুবণ্ণং।

সংবাহকঃ। অজ্জ দইশ্শং।

মাথুরঃ। অহুণা পঅচ্ছ।

সংবাহকঃ। দইশ্শং। পশাদং কলেহি।

মাথুরঃ। অলে ণং সংপদং পঅচ্ছ।

সংবাহকঃ। সিলু পডদি।

(ইতি ভূমৌ পততি। উভৌ বহুবিধং তাড়য়তঃ)

অনুবাদ—দ্যুতকর। আমার দান, আমার দান।

মাথুর। নাহে, আমার দান।

সংবাহক। (অন্যস্থান থেকে হঠাৎ কাছে এসে) দান কিন্তু আমার।

দ্যূতকর। গুয়োটাকে ধরা গেল।

মাথুর। (ধরে ফেলে) ওরে সর্তভঙ্গকারী পলাতক, তুই ধরা পড়েছিস্। সেই দশটি স্বর্ণমুদ্রা দে।

সংবাহক। আজ দেব।

মাথুর। এখনই দাও।

সংবাহক। দেব, একটু দয়া করুন।

মাথুর। আরে না, এই মুহূর্তে দাও।

সংবাহক। মাথা ঘুরছে। (একথা বলে মাটিতে পড়ল। দুজনে নানাভাবে তাড়না করল।)

টীকা—পাঠে—প্রস্থ>পট্ঠ>পাঠ। লদ্ধে গোহে—লব্ধঃ গোধঃ। গোসাপটাকে ধরেছি। চলিত—ভাষার গালগাল গুয়ো—শব্দটা এই শব্দ থেকে এসেছে মনে হয়। পেদণ্ডা—অপেত দণ্ড—যে দণ্ড এড়িয়ে পালিয়ে বেড়ায়। পঅচ্ছ—প্রযচ্ছ। অজ্জ—অস্ত। শব্দটিকে সম্বোধন ধরলে আর্য। দইশ্শং—দাস্যামি। অহুণা—অধুনা। শিলু—শিরঃ।

মূলপাঠ—M—esu tumaṃ hu jūdiara maṇḍlīe baddhosi.

S—(utthāya saviṣādaṃ) Kadhaṃ jūdiala maṇḍalīe baddhomhi, hī ese amhāṇaṃ jūdialāṇaṃ alaṇghaṇīe śamae. Tā kudo daiśśaṃ.

M—Ale gaṇḍe kulu kulu.

S—Evvaṃ kalemi (dyūtakaraṃ upaspṛśya) addhaṃ te demi addhaṃ me muñcadu.

D—Evvaṃ bhodu.

মাথুরঃ। এসু তুমং হু জূদিঅর-মণ্ডলীএ বদ্ধোসি।

সংবাহকঃ। (উত্থায় সবিষাদং) কধং জূদিঅল-মণ্ডলীএ বদ্ধোম্হি। হী এশে অম্হাণং জূদিঅলাণং অলঙ্ঘণীএ শমএ। তা কুদো দইশ্শং।

মাথুরঃ। অলে গণ্ডে কুলু কুলু।

সংবাহকঃ। এব্বং কলেমি (দ্যূতকরং উপস্পৃশ্য) অদ্ধং তে দেমি অদ্ধং মে মুঞ্চদু।

দ্যূতকরঃ। এব্বং ভোদু।

অনুবাদ—মাথুর। তুমি এই জুয়ারীদলের কাছে বাঁধা।
সংবাহক। (উঠে বিষণ্ণভাবে বলল) কিরূপে আমি জুয়ারী সমাজে বাঁধা? এই কি জুয়ারী সমাজে অলঙ্ঘনীয় নিয়ম? তা কোথা থেকে দেব?
মাথুর। ওরে চুক্তি কর, চুক্তি কর।
সংবাহক। তাই করব। (জুয়ারীর খুব কাছে গিয়ে ছুঁয়ে) অর্ধেক দিচ্ছি, বাকী অর্ধ ছেড়ে দিন।
মাথুর। বেশ তাই হোক্।

টীকা—এস্থ—মণ্ডলীএ শব্দের সর্বনামীয় বিশেষণ। হী—প্রশ্নবোধক অব্যয়। সমএ—সময়ঃ। নিয়ম। গণ্ডে—গণ্ডঃ। সর্ত, কিস্তিবন্দী চুক্তি। অনার্যমূল শব্দ। কুলু—কুরু। কৃ+লোট হি। ভোদু—ভবতু।

মূলপাঠ—S—(sabhikaṃ upagamya) addhaśśa gaṇḍe kalemi. addhaṃ pi me ajjo muñcadu.
M—Ko dosu. evvaṃ bhodu.
S—(prakāśaṃ) Ajja addhe tue mukke
M—Mukke
S—(dyūtakaraṃ prati) addhe tue vi mukke.
D—Mukke.
S—Śampadaṃ gamiśśam.
M—Paaccha taṃ dasasuvaṇṇaṃ. kahiṃ gacchasi.

সংবাহকঃ। (সভিকম্ উপগম্য) অদ্ধশ্শ গণ্ডে কলেমি। অদ্ধংপি মে অজ্জো মুঞ্চদু।

মাথুরঃ। কো দোসু। এব্বং ভোদু।

সংবাহকঃ। (প্রকাশম্) অজ্জ অদ্ধে তুএ মুক্কে।

মাথুরঃ। মুক্কে।

সংবাহকঃ। (দ্যূতকরং প্রতি) অদ্ধে তুএ বি মুক্কে।

দ্যূতকরঃ। মুক্কে।

সংবাহকঃ। শংপদং গমিশ্শং।

মাথুরঃ। পঅচ্ছ তং দসসুবণ্ণং। কহিং গচ্ছসি।

অনুবাদ—সংবাহক। (সভিকের কাছে গিয়ে) অর্ধেকের জন্য শর্ত করছি। বাকী অর্ধেক মশাই ছেড়ে দিন।

মাথুর। দোষ কি? তাই হোক্।

সংবাহক। (প্রকাশ্যে) মহাশয়, অর্ধেক আপনি মাফ করলেন?

মাথুর। মাফ করলাম।

সংবাহক। (জুয়ারীর প্রতি) আপনি অর্ধেক মাফ করলেন?

দ্যূতকর। মাফ করলাম।

সংবাহক। আচ্ছা তাহলে সম্প্রতি আমি যাচ্ছি।

মাথুর। দশটি স্বর্ণমুদ্রা দাও। কোথায় যাচ্ছ?

টীকা——অজ্জো—আর্যঃ। দোসু—দোষঃ। মুক্কে—মুক্তঃ। তুএ—ত্বয়া। কহিং—কস্মিন্।

মূলপাঠ—S—Pekkhadha pekkhadha bhaṭṭālaā. Hā śaṃpadaṃ jjeva ekkāha addhe gaṇḍe kaḍe avalāha addhe mukke. tahavi maṃ abalaṃ śaṃpadaṃ jjeva maggadi.

M—(gṛhītvā) Dhuttu Māthuru ahaṃ. ṇiuṇu. ettha tue ṇa ahaṃ dhuttijjāmi. tā paaccha taṃ pedaṇḍaā savvaṃ suvaṇṇaṃ saṃpadaṃ.

সংবাহকঃ। পেক্খধ পেক্খধ ভট্টালআ। হা শংপদংজ্জেব এক্কাহ অদ্ধে গণ্ডে কদে অবলাহ অদ্ধে মুক্কে। তহবি মং অবলং শংপদংজ্জেব মগ্গদি।

মাথুরঃ। (গৃহীত্বা) ধুত্তু, মাথুরু অহং ণিউণু। এত্থ তুএ ণ অহং ধুত্তিজ্জামি। তা পঅচ্ছ তং পেদণ্ডআ সব্বং সুবণ্ণং সংপদং।

অনুবাদ—সংবাহক। ভদ্রমহোদয়গণ, দেখুন দেখুন। হায় সম্প্রতি একজন অর্ধেকটা শর্ত করে নিয়েছেন, অপরজন অর্ধেক ছেড়ে দিয়েছেন। তথাপি অসহায় আমার কাছে এঁরা এখন চাইছেন।

মাথুর। (ধরে ফেলে) ধূর্ত, আমি মাথুর, আমি বড় নিপুণ। আমার সঙ্গে তোমার চালাকি চলবে না। ওরে প্রবঞ্চক, সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা এখনই দিয়ে দাও।

টীকা—পেক্খধ—প্র+ঈক্ষ্+লোট মধ্যমপুরুষ বহুবচন। ভট্টালআ—ভট্টারকাঃ। এক্কাহ—একস্য। কদে—কৃতঃ। অবলাহ—অপরস্য। তহবি—তথাপি। মগ্গদি—মার্গতি। ণিউণ—নিপুণঃ। ধুত্তিজ্জামি—ধূর্ত+ক্যঙ্ (নামধাতু) কর্মবাচ্যে লট মি।

মূলপাঠ—S—Kudo daiśśaṃ.

M—Pidaru vikkiṇijja paaccha.

S—Kudo me pidā.

M—Mādaru vikkinijja paaccha.

S—Kudo me mādā.

M—Appāṇaṃ īikkiṇijja paaccha.

S—Kaledha paśādaṃ. Nedha maṃ lājamaggaṃ

M—Pasaru.

সংবাহকঃ। কুদো দইশ্শম্।

মাথুরঃ। পিদরু বিক্কিণিজ্জ পঅচ্ছ।

সংবাহকঃ। কুদো মে পিদা।

মাথুরঃ। মাদরু বিক্কিণিজ্জ পঅচ্ছ।

সংবাহকঃ। কুদো মে মাদা।

মাথুরঃ। অপ্পাণং বিক্কিণিজ্জ পঅচ্ছ।

সংবাহকঃ। কলেধ পশাদং। ণেধ মং লাজমগ্গং।

মাথুরঃ। পসরু।

অনুবাদ—সংবাহক। কোথা থেকে দেব?

মাথুর। বাপকে বিক্রয় করে দাও।

সংবাহক। বাপ পাব কোথায়?

মাথুর। মাকে বিক্রয় করে দাও।

সংবাহক। মাই বা পাব কোথায়?

মাথুর। নিজেকেই বিক্রয় করে দাও।

সংবাহক। দয়া করুন। আমাকে রাজপথে নিয়ে যান।

মাথুর। চল।

টীকা—পিদরু—পিতরং। বিক্কিণিজ্জ—বি+ক্রী+ল্যপ। মাদরু—মাতরং

অপ্পাণং—আত্মানং। ণেধ—নয়ত। নী-ধাতু লোট। লাজমগ্গং—রাজমার্গং। পসর—প্রসর।· প্র+সৃ+লোট্।

মূলপাঠ S—Evvaṃ bhodu. (Parikrāmati) ajjā kkiṇīdha maṃ imaśśa śahiaśśa hatthādo daśehiṃ śuvaṇṇakehiṃ. (dṛṣṭvā ākāśe) kiṃ bhaṇādha : kiṃ kaliśśasitti. gehe de kammakale huviśśaṃ. Kadhaṃ. adaia paḍivaaṇaṃ gade. bhodu. evvaṃ imaṃ aṇṇaṃ bhaṇaiśśaṃ (punastadeva paṭhati) kadhaṃ eśe vi maṃ avadhīlia gade. tā ajja Cāludattaśśa vihave vihaḍide eśe vaddhāmi mandabhāe.

M—ṇam dehi

S—Kudo daiśśam. (iti patati. Māthuraḥ karṣati)

S—Ajja palitt adha palittāadha.

সংবাহকঃ। এব্বং ভোদু। (পরিক্রামতি) অজ্জা কিণীধ মং ইমশ্শ শহিঅশ্শ হত্থাদো দশেহিং শুবণ্ণকেহিং। (দৃষ্ট্বা আকাশে) কিং ভণাধ? কিং কলিশ্শশিত্তি? গেহে দে কম্মকলে হুবিশ্শং। কধং? অদইঅ পডিবঅণং গদে। ভোদু। এব্বং ইমং অণ্ণং ভণইশ্শং'মি। (পুনস্তদেব পঠতি) কধং? এশে বি মং অবধীলিঅ গদে। তা অজ্জ-চালুদত্তশ্শ বিহবে বিহডিদে এশে বদ্ধামি মন্দভাএ।

মাথুরঃ। ণং দেহি।

সংবাহকঃ। কুদো দইশ্শং? (ইতি পততি। মাথুরঃ কর্ষতি)

সংবাহকঃ। অজ্জ, প লত্তাঅধ, পলিত্তাঅধ।

অনুবাদ—সংবাহক। তবে তাই হোক্ (চলতে লাগল) ভদ্রগণ, এই সভিকের হাত থেকে আমাকে দশটি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে কেউ কিনে নিন। (নেপথ্যের দিকে চেয়ে) কি বলছেন? আমাকে দিয়ে কি করাবেন? আপনার বাড়ীতে আমি চাকর হয়ে থাকব। এ কিরূপ? প্রত্যুত্তর না দিয়ে চলে গেল? যাকগে। অন্য কাউকে এই রকম করে বলব। (পুনরায় সেই রকমে বলতে লাগল) এ কিরূপ? ইনিও যে আমাকে অগ্রাহ্য করে (আমার কথায় কান না দিয়ে) চলে গেলেন! হায়, আর্য চারুদত্তের ঐশ্বর্য বিপর্যস্ত হওয়ায় মন্দভাগ্য আমি এ ভাবে আবদ্ধ হলাম।

মাথুর—এখন-দাও।

সংবাহক—কোথা থেকে দেব ? (একথা বলে মাটিতে পড়ল এবং মাথুর টানতে লাগল)

সংবাহক—ভদ্রগণ, পরিত্রাণ করুন, পরিত্রাণ করুণ।

টীকা—কিণীধ—ক্রীধাতু লোট। হথাদো—হস্তাৎ। অপাদানে তস্। দশেহিং—তৃতীয়ার ভিস্। কলইশ্‌শশিত্তি—কারয়িষ্যতি ইতি। হবিশ্‌শং—ভবিষ্যামি। অদইঅ—অদত্ত্বা। পডিবঅণং—প্রতিবচনং। অবধীলিঅ—অব+ধী+ল্যপ্‌= অবধীর্য; বিহবে—বিভবে। বিহডিদে—বিঘটিতে। ভাবে সপ্তমী। এশে—এষঃ। মন্দভাএ—মন্দভাগঃ। পলিত্তাঅধ—পরি+ত্রৈ+লোট্‌ মধ্যমপুরুষ বহুবচন।

Text 56 Kalidāsa—Abhijñānaśakuntala Act VI (Praveśaka)
কালিদাস—অভিজ্ঞানশকুন্তল ষষ্ঠ অঙ্ক (প্রবেশক)

মূলপাঠ (Tataḥ praviśati nāgarakaḥ paścādbāhubandhaṃ puruṣamādāya rakṣiṇau ca)

Rakṣiṇau—(puruṣam taḍayitvā) haṇḍe kumbhīlaā kadhehi kahiṃ tae eśe mahāladaṇa-bhāśule ukkiṇṇa-ṇāmakkhale laakīe aṅgulīae śamāśādide

Dhīvarakaḥ--(bhītinātitakena) paśīdantu bhāvamiśśā. ṇa hage īdiśaśśa akayyaśśa kālake.

Ekaḥ—Kiṃ ṇu kkhu śohaṇe bamhaṇeśitti kadua laññā de paliggahe diṇṇe.

Dhī—śuṇādha dāva. hagekkhu Śakkāvadālavāśī dhīvale.

ততঃ প্রবিশতি নাগরকঃ পশ্চাদ্বাহুবন্ধং পুরুষম্ আদায় রক্ষিণৌ চ

রক্ষিণৌ—(পুরুষং তাড়য়িত্বা) হণ্ডে কুম্ভীলআ কধেহি, কহিং তএ এশে মহালদণ-ভাশুলে উক্কিন্ননামক্খলে লাঅকীএ অঙ্গুলীঅএ শমাশাদিদে ?

ধীবরকঃ—(ভীতিনাটিতকেন) পশীদন্তু ভাবমিশ্‌শা। ণ হগে ঈদিশশ্‌শ অকয্যশ্‌শ কালকে।

একঃ—কিং ণু ক্খু শোহণে বম্হণেশিত্তি কদুঅ লঞ্‌ঞা দে পলিগ্‌গহে দিন্নে ?

ধীবরঃ—শুণাধ দাব। হগে ক্খু শক্কাবদালবাশী ধীবলে।

অনুবাদ—(অতঃপর পিছমোড়া দিয়ে বাঁধা একটা লোককে নিয়ে নগরপাল এবং দুজন পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

রক্ষিদ্বয়—(লোকটাকে তাড়না করে) হারে বেটা কুমরে পোকা (সিঁদেল চোর), বল, কোথায় তুই এই মহারত্ন দ্বারা উজ্জ্বল নামাক্ষর ক্ষোদিত রাজকীয় অঙ্গুরীয়টি সংগ্রহ করেছিস্ ?

ধীবর—(ভীতিভাব দেখিয়ে) ভদ্রমহোদয়গণ, প্রসন্ন হোন্। আমি এরকম অকাজ করিনি।

একজন রক্ষী—তাহলে কি তুমি একটি শোভন ব্রাহ্মণ ভেবে রাজা তোমাকে দান করেছেন ?

ধীবর—শুনুন তবে। আমি হলাম শক্রাবতার বাসী একটি জেলে।

টীকা—হণ্ডে—সম্বোধন। শব্দটি সম্ভবতঃ অনার্যমূল। কুম্ভীলআ—কুম্ভীরকা। আ-কার তুচ্ছার্থে ও সম্বোধনে। কুমরে নামক একপ্রকার পোকা মাটিতে গর্ত করে। সেই পোকার মত যারা সিঁদ কাটে তাদের প্রতি গালাগালসুলভ উক্তি। ইতর প্রাণীর চরিত্রের সাদৃশ্যে মানুষকে সেই প্রাণীর নামে ডাকার রীতি সব ভাষায়ই আছে। ভাশুলে—ভাস্বরঃ, ভাস্বুরঃ। লাঅকীএ—রাজকীয়ঃ। ভাবমিশ্শাঃ—ভাবমিশ্রাঃ। ভদ্রগণকে সাধারণ লোকের সম্বোধন। হগে—অহকং>হকং>হগে। অকয্যশ্শ—অকার্যস্য। কালকে—কারকঃ। শোহণে—শোভনঃ। কতুঅ—কৃত্বা। লঞ্ঞা—রাজ্ঞা। দে—তে, তব। চতুর্থী। পলিগ্গহে—প্রতিগ্রহঃ। উপহার। দিণ্ণে—দত্তঃ। প্রাচ্য প্রাকৃতের রূপ।

মূলপাঠ—Dvitīyaḥ—haṇḍe pāḍaccalā kiṃ tumaṃ asmehiṃ jādiṃ vasadiṃ ca puścide.

Nāgarakaḥ—Sūaa. kadhedu savvaṃ kameṇa. mā ṇaṃ paḍibandhedha.

Ubhau—yaṃ lāutte āṇavedi. lavehi le Lavehi

Dhī—Śe hage yāla-vaḍisappahudīhiṃ maścabandha-ṇovāehiṃ kuḍumba-bhalaṇaṃ kalemi.

Nā—(prahasya) visuddho dāniṃ de ājīvo.

দ্বিতীয়ঃ— হণ্ডে পাডচ্চলা, কিং তুমং অস্মেহিং যাদিং বশদিং চ পুশ্চিদে ?

নাগরকঃ—সূঅঅ। কধেদু সব্বং কমেণ। মা ণং পডিবন্ধেধ।

উভৌ—যং লাউত্তে আণবেদি। লবেহি লে লবেহি।

ধীবরঃ—শে হগে যাল-বডিশপ্পহুদীহিং মশ্চবন্ধণো বাএহিং কুডুম্ব-ভলণং কলেমি।

নাগরকঃ—(প্রহস্য) বিসুদ্ধো দানীং দে আজীবো।

অনুবাদ—দ্বিতীয়। ওরে বেটা জুয়াচোর, তুই কি আমাদের দ্বারা জাতি-বসতি সম্বন্ধে বিজ্ঞাসিত হয়েছিস্ ?

নাগরক। সূচক, ক্রমে ক্রমে সব বলবে। ওকে বাধা দিও না।

উভয়ে। রাজপুত্র যেরূপ আজ্ঞা করেন। বল্‌রে বল্।

ধীবর। সেই আমি জাল বড়শি প্রভৃতি দিয়ে মাছ ধরার উপায় করে কুটুম্ব প্রতিপালন করি।

নাগরক। (হেসে) বড় পবিত্র তোমার জীবিকা !

টীকা—পাডচ্চলা—পাটচ্চরা। পাটয়ন্ চরতি। যাদিং—জাতিং। পুশ্চিদে—পৃষ্টঃ। প্রচ্ছ্+ক্ত। পডিবন্ধেধ—প্রতিবন্ধয়ত। লাউত্তে—রাজপুত্রঃ>রাঅ উত্তো। আণবেদি—আজ্ঞাপয়তি। লবেহি—লপ্+লোট হি। পহুদীহিং—প্রভৃতিভিঃ। মশ্চবন্ধণোবাএহিং—মৎস্যবন্ধন+উপায়েভিঃ। কুডুম্বভলণং—কুটুম্বভরণং। আজীবো—আজীবঃ। জীবিকা।

মূলপাঠ—Dhī—bhastake mā evam bhaṇa.

Śahaye kila ye vi ṇindide ṇa hu śe kamma vivayyaṇīake.

Paśumālī kaledi dāluṇam aṇukampāmidule vi śoṇike.

Nagarakaḥ—Tado tado.

ধীবরঃ—ভস্টকে মা এবং ভণ।

শহযে কিল যে বি নিন্দিদে ণ হু শে কম্ম বিবয্যণীঅকে।

পশুমালী কলেদি দালুণং অণুকম্পামিদুলে বি শোণিকে ॥

নাগরকঃ—তদো তদো।

অনুবাদ—ধীবর। প্রভু, এরকম বলবেন না। যা জাত ব্যবসা তা নিন্দনীয় হলেও সে কাজ বর্জন করা যায় না। অনুকম্পায় মৃদু যে কশাই তাকেই পশুহত্যার মত দারুণ কাজ করতে হয়।

নাগরক—তারপর, তারপর ?

টীকা—ভস্টকে—ভর্তৃকঃ। মাগধীতে র্ত=স্ট, র্থ=স্ত, চ্ছ=শ্চ, ক্ষ=স্ক। শহযে—সহজঃ। বিবয্যণীঅকে—বিবর্জনীয়কঃ। শোণিকে—শৌণিকঃ।

মূলপাঠ—Dhī—Adha ekkadiaśam mae lohidamaścake khandaśo kappide. yāva taśśa udalabbhantale edam mahāladaṇabhāśulam aṅguliaam peskāmi. paśca idha vikkastam ṇam damśaante yyeva gahide bhāvamiśśehim. ettike dāva edaśśa āgame. adhuṇā māledha vā kustedha vā.

ধীবরঃ—অধ এক্কদিঅশং মএ লোহিদমশ্চকে খণ্ডশো কপ্পিদে। যাব তশ্শ উদলব্ভন্তলে এদং মহালদণভাশুলং অঙ্গুলীঅঅং পেস্কামি। পশ্চা ইধ বিক্কঅত্তং গং দংশঅন্তে য্যেব গহীদে ভাবমিশ্শেহিং। এত্তিকে দাব এদশ্শ আগমে। অধুণা মালেধ বা কুস্টেধ বা।

অনুবাদ—ধীবর—তারপর একদিন আমাকর্তৃক একটা রুইমাছ খণ্ড খণ্ড করে কাটা হচ্ছিল। তখন তার পেটের ভিতর এই মহারত্নোজ্জ্বল অঙ্গুরীয়কটি দেখলাম। অতঃপর যখন বিক্রয়ের জন্য এখানে দেখাচ্ছি তখন মহোদয়গণের দ্বারা ধৃত হলাম। এইটাই কিন্তু আংটিটির আগমন বৃত্তান্ত। এখন মারুন বা কাটুন।

টীকা—এক্কদিঅশং—একদিবসং। প্রাকৃতে এক=এক্ক। মএ—ময়া। লোহিত-মশ্চকে—রোহিতমৎস্যকঃ। কপ্পিদে—কল্পিতঃ। পেস্কামি—প্রেক্ষামি। পশ্চা—পশ্চাৎ। বিক্কঅত্তং—বিক্রয়ার্থং। দংশঅন্তে—দর্শয়ন্। দৃশ্+শতৃ। গহীদে—গৃহীতঃ। এত্তিকে—এতাবৎকঃ। দাব—তাবৎ। মালেধ—মারয়ত। কুস্টেধ—কর্তয়ত। র্ত=স্ট, অয়=এ।

মূলপাঠ Nā—(aṅguriyakaṃ āghrāya) Jāṇua macchodara-saṃṭhidaṃti ṇatthi saṃdeho. tadhā aaṃ se vissagandho. āgamo dāṇiṃ edassa vimarisidavvo. tā edha. rāaulaṃjeva gacchamha.

Rakṣiṇau—(Dhīvaraṃ prati) gaśca le gaṇṭhiśchedaā gaśca. (iti parikrāmanti)

Nā—Sūaa idha gouraduāre appamattā paḍivāledha. maṃ jāva rāaulaṃ pavisia ṇikkamāmi.

Ubhau—paviśadu lhutte sāmippaśādastaṃ

Nā—tadhā (iti niṣkrāntaḥ)

নাগরকঃ—(অঙ্গুরীয়কং আঘ্রায়) জাণুঅ, মচ্ছোদর সংঠিদংতি ণত্থি সংদেহো। তধা অঅং সে বিস্সগন্ধো। আগমো দাণীং এদস্স বিমরিসিদব্বো। তা এধ। রাঅউলং জেব গচ্ছম্হ।

রক্ষিণৌ—(ধীবরং প্রতি) গশ্চ লে গণ্ঠিশ্চেদআ গশ্চ। (ইতি পরিক্রামন্তি)।

নাগরকঃ—সূঅঅ, ইধ গোউর দুআরে অপ্পমত্তা পড়িবালেধ। মং জাব রাঅউলং পবিসিঅ ণিক্কমামি।

উভৌ—পবিশদু লাউস্তে শামিপ্পশাদস্তং।

নাগরকঃ—তধা। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)।

অনুবাদ—নাগরক—(আংটির ঘ্রাণ নিয়ে) জানুক, এটি যে মাছের পেটে ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই ত এর মধ্যে আমিষ গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কি করে এটি মাছের পেটে এল তা ভাববার বিষয়। তাহলে এস আমরা রাজবাড়ী যাই।

রক্ষিদ্বয়। (ধীবরের প্রতি) যা রে গাঁঠকাটা যা। (এই বলে চলতে লাগল)

নাগরক। সূচক, এই তোরণদ্বারে মাথা ঠিক রেখে অপেক্ষা কর। আমি ততক্ষণ রাজবাড়ীতে গিয়ে ফিরে আসি।

দুজনে। রাজপুত্র, রাজার মনস্তুষ্টির জন্য প্রবেশ করুন।

নাগরক। তাই হোক। (এই বলে চলে গেল)

টীকা—বিস্‌সগন্ধো—বিস্রগন্ধঃ। বিমরিসিদব্ব—বি—মৃশ্‌+তব্য=বিম্রষ্টব্য। রাঅউলং—রাজকুলং। গচ্ছম্হ—গচ্ছাম। গশ্চ—গচ্ছ। গণ্ঠিশ্চেদআ—গ্রন্থিচ্ছেদকা। গোউর দুআরে—গোপুর দ্বারে। গোপুর=তোরণ। পডিবালেধ—প্রতিপালয়ত। শামিপ্পশাদস্তং—স্বামিপ্রসাদার্থং।

মূলপাঠ—Sūcakaḥ—Yānua cilāadi lāutte.

Jānukaḥ—ṇaṃ avaśalovaśappaṇīā khu lāāṇo honti.

Su—Yāṇua sphulanti me aggahastā (dhīvaraṃ nirdiśya) imaṃ ganṭhiścedaaṃ vāvādeduṃ.

Dhī—Vālīhadi bhāve akālaṇa-mālake bhaviduṃ.

Jāṇukaḥ—(Vilokya) eśe asmāṇaṃ īśale patte genhia lāaśāśaṇaṃ. (dhīvaraṃ prati) tā śaulāṇaṃ muhaṃ peskaśi adhavā giddhaśiālāṇaṃ bali bhaviśśaśi.

সূচক—যাণুঅ চিলাঅদি লাউত্তে।

জানুকঃ—ণং অবশলোবশপ্পণীআ খু লাআণো হোন্তি।

সূচকঃ—যাণুঅ স্ফুলন্তি মে অগ্‌গহস্তা (ধীবরং নির্দিশ্য) ইমং গণ্ঠিশ্চেদঅং বাবাদেদুং।

ধীবরঃ—বালিহদি ভাবে অকালণ মালকে ভবিদুং।

জানুকঃ—(বিলোক্য) এশে অস্মাণং ঈশলে পত্তে গেণ্হিঅ লাঅশাশণং, (ধীবরং প্রতি) তা শউলাণং মুহং পেস্কশি অধ বা গিদ্ধশিআলাণং বলি ভবিশ্শশি।

অনুবাদ। সূচক। জানুক, রাজপুত্র বড় বিলম্ব করছেন।

জানুক। রাজারা তাঁদের অবসর অনুসারেই কাছে যাওয়ার যোগ্য হন।

সূচক। জানুক (ধীবরকে দেখিয়ে) এই গাঁঠকাটাকে হত্যা করবার জন্য আমার হাতের ডগা নিসপিস করছে।

ধীবর—ভদ্র, অকারণ মারক হওয়া কিন্তু আপনার উচিত নয়।

জানুক—(দূরে দেখে) ঐ যে আমাদের প্রভু রাজশাসন নিয়ে পৌঁছেছেন। (ধীবরের প্রতি) তাহলে কুকুরগুলির মুখ দেখবি অথবা শকুন-শিয়ালের খাদ্য হবি।

টীকা—চিলাঅদি—চিরায়তে। অবশলোবশপ্পণীআ—অবসর+উপসর্পণীয়াঃ। লাআণো—রাজানঃ। বাবাদেদুং—ব্যাপাদয়িতুং। ণালিহদি—ন+অর্হতি। ঈশলে—ঈশ্বরঃ। পত্তে—প্রাপ্তঃ। গেণ্হিঅ—গৃহীত্বা। শউলাণং—শ্বকুলানাং। মুহং—মুখং। পেস্কশি—প্রেক্ষসে। গিদ্ধ—গৃধ্র। শিআলাণং—শৃগালানাং। ভবিশ্শশি—ভবিষ্যসি।

মূলপাঠ—Nā—(praviśya) siggham siggham edaṃ (iti ardhokte)

Dhī—hā hadesmi. (iti viṣādaṃ nāṭayati)

Nā—muñcedha re muñcedha jālovajīviṇaṃ. uvavaṇṇo se kila aṅgulīaassa āgamo amha-sāmiṇā jeva me kadhidaṃ

Sū—Yadhā āṇavedi lāutte. Yamavasadiṃ gadua padiṇiutte kkhu eśe. (iti dhīvaraṃ bandhanān mocayati)

নাগরকঃ—(প্রবিশ্য) সিগ্ঘং সিগ্ঘং এদং (ইতি অর্ধোক্তে)

ধীবরকঃ—হা হদেস্মি। (ইতি বিষাদং নাটয়তি)

নাগরকঃ—মুঞ্চেধ রে মুঞ্চেধ জালোবজীবিণং। উববণ্ণো সে কিল অঙ্গুলীঅঅস্স আগমো। অম্ম সামিণা জেব মে কধিদং।

সূচকঃ—যধা আণবেদি লাউত্তে! যমবশদিং গদুঅ পডিণিউত্তে কৃখু এশে। (ইতি ধীবরং বন্ধনান্ মোচয়তি)

অনুবাদ। নাগরক। (প্রবেশ করে) শীঘ্র শীঘ্র একে—(অর্ধেক বলে থেমে গেল)

ধীবর। হায়রে, আমি গেছি। (বিষণ্ণভাব দেখাল)

নাগরক। ছেড়ে দাও, ওরে ছেড়ে দাও এই জেলেটিকে। আংটি পাবার ব্যাপার সব জানা গেছে। আমাদের প্রভু আমায় বলেছেন।

সূচক। হুজুর যেরূপ আজ্ঞা করেন। যমের বাড়ী গিয়ে ফিরে এল লোকটা। (একথা বলে জেলের বন্ধন মোচন করল)

টীকা—হদেম্মি—হতোঽস্মি। উববণ্ণো—উপপন্নঃ। অঙ্গুলীঅঅস্‌স—অঙ্গুরীয়কস্য। আণবেদি—আজ্ঞাপয়তি। বশদিং—বসতিং। গদুঅ—গত্বা। পডিণিউত্তে—প্রতিনিবৃত্তঃ।

মূলপাঠ—Dhī—(Nāgarakaṃ praṇamya) bhastake. tava kelake mama yīvide. (iti pādayoḥ patati)

Nā—utthehi utthehi. eso bhaṭṭiṇā aṅgulīaa-mulla-sammido pāridosio de pasādīkido. tā genha edaṃ. (iti dhīvaraṃ kaṭakaṃ prayacchati)

Dhī—(saharṣaṃ pratigṛhya) aṇuggahidesmi.

Jā—eśekkhu laññā tadhā ṇāma aṇuggahide yaṃ śūlādo odālia hastiskandhaṃ śamālovide.

ধীবরঃ—(নাগরকং প্রণম্য) ভস্টকে, তব কেলকে মম যীবিদে। (ইতি পাদয়োঃ পততি)

নাগরকঃ—উত্থেহি, উত্থেহি। এসো ভট্টিণা অঙ্গুলীঅঅ-মুল্ল-সম্মিদো পারিদোসিও দে পসাদীকিদো। তা গেণ্হ এদং। (ইতি ধীবরং কটকং প্রযচ্ছতি)

ধীবর—(সহর্ষং প্রতিগৃহ্য) অণুগ্গহিদেস্মি।

জানুকঃ—এশে ক্খু লঞ্ঞা তধা ণাম অণুগ্গহিদে যং শূলাদো ওদালিঅ হস্তিস্কন্ধং শমালোবিদে।

অনুবাদ। ধীবর। (নাগরককে প্রণাম করে) প্রভু আপনার কাজের জন্যই আমার জীবনটা বাঁচল। (একথা বলে নাগরকের দুখানি পায়ে পড়ল)

নাগরক। ওঠ, ওঠ। এই যে আমাদের প্রভু আংটির মূল্যের অনুরূপ পারিতোষিক দিয়ে তোমাকে খুশি করতে চেয়েছেন। তাহলে এটি নাও। (একথা বলে ধীবরকে বাহুর অলঙ্কার সোনার বলয় দিল)

ধীবর। (আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে) আমি অনুগৃহীত হলাম।

জানুক। এটি দ্বারা রাজা লোকটাকে এমন অনুগ্রহ দেখালেন যেন শূল থেকে নামিয়ে এনে রাখা হল হাতীর পিঠে

টীকা—ভস্টকে—ভর্তৃকঃ। মাগধীতে র্ত=স্ট। কেলকে—কারকঃ। যীবিদে—জীবিতং। মাগধীতে 'জ' নেই। মূল্ল-সম্মিদো—মূল্যসম্মিতঃ। পারিদোসিও—পারিতোষিকঃ। পসাদীকিদো—প্রসাদীকৃতঃ। গেণ্হ—গৃহাণ। কটক—হস্তবেষ্টনকারী স্বর্ণালঙ্কারকে কটক বলে। লওএআ—রাজ্ঞা। শূলাদো—শূলাতঃ। পঞ্চমীর স্থলে 'তস্'। অপাদানে শূলাৎ। ওদালিঅ—অবতার্য। অব+তৃ+ল্যপ্। হস্তিস্কন্ধং—তৎসম। মাগধীতে যুক্তাক্ষরে স থাকে। শমালোবিদে—সমারোপিতঃ। সম্+আ+রোপ্ কর্মণি ক্ত।

মূলপাঠ—Sū—Lāutte pālidośie kadhedi mahāliha-ladaṇeṇa teṇa aṅguliaeṇa śāmiṇo bahumadeṇa hodavvaṃ ti.

Nā—ṇaṃ tassiṃ bhaṭṭiṇo mahāriha-radaṇaṃ ti ṇa paridoso. ettikaṃ uṇa.

Ubhau—Kiṃ ṇāma.

Nā—Takkemi tassa daṃsaṇeṇa ko vi hiaaṭṭhido jaṇo bhaṭṭiṇā sumaridotti. jado taṃ pekkhia muhuttaaṃ paidigambhīro vi pajjussuamaṇo āsi.

Sū—tośide dāṇi bhastā lautteṇa.

Jā—ṇaṃ bhaṇāmi imaśśa maścalī-śattuṇo kide tti (iti dhīvaraṃ asūyayā paśyati)

সূচকঃ—লাউত্তে, পালিদোশিএ কধেদি মহালিহ-লদণেণ তেণ অঙ্গুলীঅএণ শামিণো বহুমদেন হোদব্বংতি।

নাগরকঃ—ণং তস্সিং ভট্টিণো মহারিহ-রদণং তি ণ পরিদোসো। এত্তিকং উণ।

উভৌ—কিং ণাম।

নাগরকঃ—তক্কেমি তস্স দংসণেণ কোবি হিঅঅট্ঠিদো জণো ভট্টিণা সুমরিদোত্তি। জদো তং পেক্খিঅ মুহুত্তঅং পইদিগম্ভীরোবি পজ্জুস্সুঅমণো আসি।

সূচকঃ—তোশিদে দানি ভস্টা লাউত্তেণ

জানুকঃ—নং ভণামি ইমশশ মশ্চলী-শত্তুণো কিদেত্তি (ইতি ধীবরং অসূয়য়া পশ্যতি)

অনুবাদ। সূচক। রাজপুত্র, পুরস্কারটা প্রকাশ করছে যে মহামূল্য সমন্বিত আংটিটি প্রভুর বড় আদরের।

নাগরক। আংটিটা মহামূল্য রত্নসমন্বিত বলেই যে রাজার পরিতোষ তা নয়। এর চেয়ে কিছু বেশি।

জুজন। কি হতে পারে।

নাগরক। আমার যুক্তি যে, আংটিটা দেখার পর রাজার মনের মধ্যস্থ কোন ব্যক্তির কথা স্মরণে পড়ে। কারণ আংটিটা দেখেই স্বভাবতঃ গম্ভীর প্রকৃতির রাজা এক মুহূর্তের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

সূচক। তাহলে আমাদের রাজা হুজুরের দ্বারাই তুষ্ট হলেন।

জানুক। আমি কিন্তু বলি, এটা মাছের শত্রুটার দ্বারাই কৃত হয়েছে। (একথা বলে ধীবরের দিকে অত্যন্ত ঈর্ষাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করল)।

টীকা—কধেদি—কথয়তি। বহুমদেণ—বহুমতেন। বহুমান শব্দের অর্থ সমাদর। হোদব্বং—ভবিতব্যং। পরিদোসো—পরিতোষঃ। এত্তিকং—এতাবৎকং। উণ—ইতরবিশেষ। হিঅঅটিঠদো—হৃদয়স্থিতঃ। সুমরিদোত্তি—স্মৃতঃ ইতি। পেক্খিঅ—প্রেক্ষ্য। পইদি—প্রকৃতি। পজ্জুসুসুঅ—পর্যুৎসুক। আসি—আসীৎ। মশ্চলীশত্তুনো—মৎস্যশীশত্রুণঃ।

মূলপাঠ—Dhī—bhastakā ido addham tusmāṇampi śulāmūllam bhodu

Jā—divala mahattale śaṃpadam me piavaaśśake saṃvuttesi. Kādambatī-śaddhike kkhu paḍhamam asmāṇam śohide iściadi. tā śuṇḍikāgālaṃ yeva gaścasma. (iti niṣkrāntāḥ sarve).

ধীবরঃ—ভস্টকা, ইদো অদ্ধং তুস্মাণং পি শুলামূল্লং ভোদু।

জানুকঃ—ধীবল, মহত্তলে শংপদং মে পিঅবঅশ্শকে সংবুত্তেসি। কাদম্বলী শদ্ধিকে কখু পঢমং অস্মানং শোহিদে ইশ্চীঅদি। তা শুণ্ডিকাগালং যেব গশ্চস্ম। (ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

অনুবাদ। ধীবর। শুনুন মশাইরা, এর অর্ধেক আপনাদের মদের দাম হোক্।

জানুক। ধীবর, তুমি সম্প্রতি আমাদের মহত্তর প্রিয় বয়স্য হয়েছ। আমার ইচ্ছা যে মদ্যপানের সঙ্গেই আমাদের প্রথম বন্ধুত্ব স্থাপিত হোক্। তাহলে এস আমরা শুঁড়ির দোকানে যাই। (এই বলে সকলে প্রস্থান করল)

টীকা—ভস্টকা—ভর্তৃকাঃ। শুলামূল্লং—সুরামূল্যং। ভোদু—ভবতু। সংপদং—সাম্প্রতং। কাদম্বরী—কাদম্বরী শব্দের অর্থ মদ। শদ্ধিকে—প্রদ্ধিকং, সাদর দান। পঢ়মং—প্রথমং। শোহিদে—সৌহৃদং। ইশ্চীঅদি—ইচ্ছ্যতে। শুণ্ডিকাগালং—শৌণ্ডিকাগারং। গশ্চম্ম—গচ্ছামঃ। গম্ ধাতুর সঙ্গে উত্তম পুরুষ বহুবচনের বিভক্তি স্ম।

অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক থেকে নির্বাচিত শ্লোক

Text 57—(Abhijñāna-Śakuntalā—select verses)

মূলপাঠ—Khaṇa cumbiaī bhamarehī uaha suumāra-kesara sihaim

avaansaanti sadaam sirisa kusumāī pamadāo.

১। খণ চুম্বিআই ভমরেহিঁ উঅহ সুউমার-কেশর-সিহাইং

অবঅংসঅন্তি সদঅং সিরীস কুসুমাইঁ পমদাও।

অনুবাদ—(শকুন্তলা নাটকের প্রস্তাবনায় নটীর সঙ্গীতে গ্রীষ্ম বর্ণনা) দেখ, ভ্রমরগণের দ্বারা ক্ষণে ক্ষণ চুম্বিত সুকুমার কেশর শিখাযুক্ত শিরীষ ফুলগুলিকে প্রমদাগণ সাদরে কানের অলঙ্কার করেছে।

টীকা—খণ চুম্বিআইঁ—ক্ষণ চুম্বিতানি। ভমরেহিঁ—ভ্রমরেভিঃ। উঅহ—উহ্ + লোট্। সুউমার—সুকুমার। সিহাইং—শিখানি। অবঅংশঅন্তি—অবতংসয়ন্তি। অবতংস = ভূষণ। এখানে নামধাতুরূপে ব্যবহার। পমদাও—প্রমদাঃ।

মূলপাঠ—Tujjha ṇa āṇe hiaaṃ maına uṇa maaṇo divā a rattiṃ ca

nikkiva dāvai baliaṃ tuha hutta-maṇorahaī aṅgāiṃ

২। তুজ্ঝ ণ আণে হিঅঅং মম উণ মঅণো দিবা অ রত্তিং চ

ণিক্কিব দাবই বলিঅং তুহ হুত্ত মনোরহাইঁ অংগাইং।

অনুবাদ—(তৃতীয় অঙ্কে শকুন্তলা পদ্মপত্রে নখের আঁচড়ে কবিতায় পত্র লেখে।) তোমার হৃদয় আমি জানিনে। ওগো নিষ্ঠুর, আমার কিন্তু দিনরাত মদন তোমার প্রতি আসক্ত অঙ্গসমূহকে প্রচণ্ডভাবে তাপিত করছে।

টীকা—তুজ্‌ঝ—তুভ্যং। আণে—জানে। হিঅঅং—হৃদয়ং। মঅণো—মদনঃ ণিক্কিব—নিষ্কৃপ। সম্বোধন। দাবই—তাপয়তি। বলিঅং—বলীয়ং। তুহ—তুভ্যং। হুত্ত—ভুক্ত। মনোরহাইঁ—মনোরথানি। অংগাইং—অঙ্গানি।

মূলপাঠ—Ullalai dabbha-kavalaṃ maī pariccatta-ṇaccaṇā mori
osaria-paṇḍu-vattā muaṇti aṅgaī va laāo.

৩। **উল্ললই দব্‌ভকবলং মঈ পরিচ্চত্ত-ণচ্চণা মোরী
ওসরিঅ-পণ্ডু-বত্তা মুঅন্তি অংগাইঁ ব লআও।**

অনুবাদ—(চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময়ে বনভূমির দুঃখবর্ণনায় প্রিয়ংবদার উক্তি।) মৃগীরা ঘাসের গ্রাস ফেলে দিচ্ছে, ময়ূরীরা নাচ ছেড়ে দিয়েছে, লতাগুলি বিবর্ণ পতাগুলি ফেলে দিয়ে যেন অঙ্গপাতন করছে। [অংস্সুইং (অশ্রূণি) পাঠ সঙ্গততর। কারণ তাতে অর্থ হয়—অশ্রুমোচন করছে। রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছেন —খসিয়া পড়ে পাতা লতিকা হতে যেন সে আঁখি জলধার।

টীকা—উল্ললই—উল্ললতি। দব্‌ভ—দর্ভ। মঈ—মৃগী। পরিচ্চত্ত—পরিত্যক্ত। ণচ্চণা—নৃত্যনা। মোরী—ময়ূরী। ওসরিঅ—অপসৃত। পণ্ডুবত্তা—পাণ্ডুপত্রা। মুঅন্তি —মোচন্তি। অংগাইং—অঙ্গানি। লআও—লতাঃ।

মূলপাঠ—Puḍaiṇi-vattantariaṃ vāhario ṇaṇuvāharei piaṃ
muha-uvvuḍha-muṇlo tai detthiṃ dei cakkāo.

। **পুডইণি বত্তান্তরিঅং বাহরিও ণাণুবাহরেই পিঅং
মুহ-উব্বূঢ়-মুণালো তই দিট্‌ঠিং দেই চক্কাও।**

অনুবাদ—(চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলা যাত্রাকালে জলাশয়ের নিকটে এসে চক্রবাক-যুগলের সাময়িক অদর্শনের উৎকণ্ঠার কথা বলছে।) পদ্মপত্রের আড়ালে অবস্থিত প্রিয়কে আহ্বান করেও চক্রবাকী উত্তর পাচ্ছে না কারণ চক্রবাক মুখে একখণ্ড মৃণাল পুরে দিয়ে চেয়ে আছে।

টীকা—পুডইণি—পুটকিনী = পদ্ম। বত্তান্তরিঅং—পত্রান্তরিতং। বাহরিও—ব্যাহরিতঃ। বি + আ + হৃ + কর্মণি ক্ত। ণাণুবাহরেই—ন অনুব্যাহরয়তি। মুহ—মুখ। উব্বূঢ়—উদ্‌ব্যূঢ় উৎ + বি + বহ্‌ + ক্ত। মৃণালো—মৃণালঃ। তই—তস্মিন্‌ অর্থে। দেই—দদাতি। চক্কাও—চক্রাবাকঃ।

মূলপাঠ—ahiṇva-mahu-loha-bhāvio taha paricumbia cūa-mañjariṃ
kamala-vasai-metta-ṇivvuo mahuara visariosi
nam kahaṃ

৫। অহিণব-মহু-লোহ-ভাবিও তহ পরিচুম্বিঅ চূঅ-মঞ্জরীং
কমল-বসই-মেত্ত নিব্বুও মহুঅর বিসরিওসি ণং কহং।

অনুবাদ—(পঞ্চম অঙ্কের সূচনায় রাজার অবহেলিতা পত্নী হংসপদিকার নেপথ্য সঙ্গীত) অভিনব মধুলোভে ভাবিত ওগো মধুকর একসময়ে আম্রমুকুল চুম্বন করে এখন কমল-বসতি মাত্র পরিতৃপ্ত হয়ে কি করে তাকে ভুলে গেলে ? [রবীন্দ্রনাথ একটু উল্টে অনুবাদ করেছেন—নবমধুলোভী ওগো মধুকর চূতমঞ্জরী চুমি,
কমল নিবাসে যে প্রীতি পেয়েছ কেমনে ভুলিলা তুমি।

টীকা—মহুলোহ—মধুলোভ। ভাবিও—ভাবিতঃ। তহ—তথা। চূঅ—চূত। আম্র। বসই-মেও—বসতিমাত্র। নিব্বুত্ত—নির্বৃত্তঃ। বিসরিওসি—বিস্মৃতঃ+অসি। ণং কহং—এনাং কথং।

মূলপাঠ—āamba-hariaventam ūsasiam via vasantamāsassa
diṭṭham cūaṃkuraam chaṇamaṅgalaam ṇiacchāmi

৬। আঅম্ব-হরিঅ-বেণ্টং উসসিঅং বিঅ বসন্তমাসস্স
দিট্‌ঠং চূঅংকুরঅং ছনণংগলঅং ণিঅচ্ছামি।

অনুবাদ—(ষষ্ঠ অঙ্কে পরভৃতিকা নামে একটি দাসী বসন্তোৎসবের জন্য আম্রমুকুল চয়নের সময় বলছে।) তামাটে সবুজ রঙের বোঁটা যুক্ত বসন্তকালের প্রাণস্বরূপ আম্র-মুকুল দেখা যাচ্ছে। মঙ্গল মুহূর্তকে আমি দেখতে পাচ্ছি।

টীকা—আঅম্ব—আতাম্র। হরিঅ—হরিত। বেণ্টং—বৃন্তং। উসসিঅং—উৎ+শ্বসিতং। প্রাণবায়ু স্বরূপ। বিঅ—ইব। ছণমংগলঅং—ক্ষণমঙ্গলকং। ণিঅচ্ছামি—নি+অক্ষামি। দেখা অর্থে বৈদিক অক্ষ ধাতু।

মূলপাঠ—Arihasi me cūaṅkura dinno kāmassa gahia-cāvassa
saccavia juai-lakkho pañcabbhahio saro houṃ.

৭। অরিহসি মে চূঅংকুর দিণ্ণো কামস্স গহিঅ চাবস্স
সচ্চবিঅ-জুঅঈ-লক্‌খো পঞ্চব্‌ভহিও সরো হউং।

অনুবাদ—(ষষ্ঠ অঙ্কে মধুকারিকা দাসী বসন্ত বর্ণনায় আম্রমুকুলকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছে।) ওগো আম্রমুকুল, কামদেব ধনু ধরেছেন, তুমি আমাদ্বারা তাঁর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হলে। সন্তপা যুবতীদের প্রতি লক্ষ্য করে তুমি পাঁচটি বাণের শ্রেষ্ঠ হবার যোগ্য।

টীকা—অরিহসি—আর্হসি। দিণ্ণো—দত্তঃ। মাগধী। গহিঅ—গৃহীত। চাবস্স—চাপস্য উদ্দেশ্যে ষষ্ঠী বিভক্তি। সচ্চবিঅ—স+অতি+তাপিত=সাত্যাপিত। বিরহে বিশেষভাবে সন্তাপিত। সত্যাপিত থেকে সচ্চাবিঅ করে কেউ কেউ বাগ্‌দত্তা অর্থ করেছেন। সাতি+তাপিত থেকে ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তনে সচ্চাবিঅ হয়েছে। জুঅঈ—যুবতী। পঞ্চব্‌ভহিও—পঞ্চভ্য+অধিকঃ। সরো—শরঃ। হউং—ভবিতুং।

(কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকের ৪র্থ অঙ্ক থেকে সঙ্কলিত কয়েকটি সঙ্গীত)

Text 66—Vikramorvaśiya; Act IV songs

মূলপাঠ—sahaari-dukkhāliddhaṃ saravarammi siṇiddhaṃ
avirala-bāha jalollaaṃ tammai haṃsī-jualaaṃ

১। সহঅরি-দুক্খালিদ্ধঅং সরবরম্মি সিণিদ্ধঅং
অবিরল-বাহ-জলোল্লঅং তম্মই হংসী জুঅলঅং।

অনুবাদ—(৪র্থ অঙ্কের ১৮ নং শ্লোক জম্ভলিকা নামক গীতি) সহচরীর দুঃখে কাতর, স্নিগ্ধ হংসীযুগল অবিরল চোখের জলে অভিষিক্ত হয়ে সরোবরে বিলাপ করছে।

টীকা—সহঅরি—সহচরী। দুক্খালিদ্ধঅং—দুঃখালীঢ়কং। সিণিদ্ধঅং—স্নিগ্ধকং। বাহ—বাষ্প। তম্মই—তাম্যতি। জুঅলঅং—যুগলকং।

মূলপাঠ—cintā-dummia māṇasiā sahaarī-daṃsaṇa lālasiā
viasia-kamala maṇoharae viharai haṃsī sarovarae.

২। চিন্তা-দুম্মিঅ-মাণসিআ সহঅরী-দংসণ-লালসিআ
বিঅসিঅ-কমল-মণোহরএ বিহরই হংসী সরোবরএ।

অনুবাদ—(৪র্থ-অঙ্কের ২৩ নং শ্লোক খণ্ডধারা নামক গীতি) চিন্তায় বিষণ্ণ মন নিয়ে সহচরীকে দর্শন লালসায় হংসী স্ফুটপদ্মে মনোহর সরোবরে বিহার করছে।

টীকা—দুম্মিঅ—দুর্মিত। সম্ভাব্য পদ সংস্কৃতে দুর্মনায়িত। মাণসিআ—মানসিকা। বিঅসিঅ—বিকশিত। মণোহরএ—মনোহরকে। বিহরই—বিহরতি।

মূলপাঠ—gahaṇaṃ gainda-ṇāho pia-virahummāa paalia viāro
visai taru-kusuma-kisalaa bhūsia-nia-deha-pabbhāro.

৩। গহণং গইন্দ-ণাহো পিঅ-বিরহুম্মাঅ-পঅলিঅ-বিআরো
বিসই তরু-কুসুম-কিসলঅ-ভূসিঅ-ণিঅ-দেহ-পব্‌ভারো

অনুবাদ—(২৬ নং শ্লোক, অক্ষিপ্তিকা নামক সঙ্গীতে রাজার বিরহোন্মত্ততার রূপক) প্রিয়বিরহের উন্মত্ততার বিকার প্রকাশ করে গজেন্দ্রনাথ নিজের দেহের অগ্রভাগ তরু, কুসুম ও কিশলয়ে ভূষিত করে গহন বনে প্রবেশ করছে।

টীকা—গইন্দ-ণাহো—গজেন্দ্রনাথঃ। বিরহুম্মাঅ—বিরহ+উন্মাদ। পঅলিঅ—প্রকলিত, প্রকটিত। বিআরো—বিকারঃ। বিসই—বিশতি। পব্‌ভারো—প্রাগ্‌ভারঃ।

মূলপাঠ—dai-rahio ahiaṃ duhio virahāṇugao
parimantharao
giri-kāṇaṇae kusumajjalae gajajūhavaī
bahujhīṇagaī.

৪। দইআ-রহিও অহিঅং দুহিও বিরহাণুগও পরিমন্থরও
গিরি-কাণণএ কুসুমুজ্জলএ গজজূহবঈ বহুঝীণগঈ।

অনুবাদ—(৪১ নং শ্লোক ভিন্নক নামক গীতি) দয়িতারহিত অধিক দুঃখিত গজযূথপতি বিরহানুরূপ মন্থর অতি ক্ষীণগতি হয়ে কুসুমোজ্জ্বল গিরি-কাননে আছেন।

টীকা—দইআ—দয়িতা। অহিঅং—অধিকং। দুহিও—দুঃখিত। গজজূহবঈ—গজযূথপতি। ঝীণগঈ—ক্ষীণগতি। ছন্দের জন্য ঈ।

মূলপাঠ—maiṃ jāṇia mialoaṇi nisaaru koi harei
jāva ṇu ṇabhatali sāmala dhārāharu varisei.

মইং জাণিঅ মিঅলোঅণি ণিসঅরু কোই হরেই
জাব ণু ণভতলি-সামল ধারাহরু বরিসেই।

অনুবাদ—(৩০ নং শ্লোকে দ্বিপদিকা নামক সঙ্গীতে রাজার উক্তি) আমি ভেবেছিলাম যে কোন নিশাচর মৃগলোচনা প্রিয়াকে হরণ করছে। এখন বুঝলাম যে শ্যামল আকাশে জলধর বর্ষণ করছে।

টীকা—মইং—ময়া (ময়েন)। জাণিঅ—জানিত (জ্ঞাত)। মিঅলোঅণি—মৃগলোচনা। নিসঅরু—নিশাচরঃ। কোই—কঃ+অপি। হরেই—হরয়তি। জাব—যাবং। সামল—শ্যামল। ধারাহরু—ধারাধরঃ। বরিসেই—বর্ষয়তি।

মূলপাঠ—gandhummāia-mahuaragīehiṃ
vajjantehiṃ parahua-tūrehiṃ
pasaria-pavaṇuvvellia-pallava—ṇiaru
sulalia-viviha-paāraṃ ṇaccai kappaaru.

৬। গন্ধুম্মাইঅ-মহুঅর গীএহিং বজ্জন্তেহিং পরহুঅ-তূরেহিং
পসরিঅ-পবণুব্বেল্লিঅ-পল্লব-নিঅরুসুললিঅ-বিবিহ-পআরং ণচ্চই
কপ্পঅরু।

অনুবাদ—(৩৭নং শ্লোক, চর্চরী নামক গীতিতে প্রকৃতি বর্ণনা) গন্ধোন্মাদিত মধুকরদের গীতিদ্বারা, পরভৃত কোকিলের তূর্যধ্বনির বাদন দ্বারা কল্পতরু বাতাসে উদ্বেলিত পল্লবসমূহ প্রসারিত করে সুললিত ভঙ্গিতে বিবিধ প্রকারে নৃত্য করছে।

টীকা—গন্ধুম্মাইঅ—গন্ধ+উন্মাদিত। গীএহিং—গীতৈঃ। প্রাকৃতে ৩য়ার বহুবচনে এহিং। বজ্জন্তেহিং—বাদ্যন্তেভিঃ। পরহুঅ—পরভৃত। তূরেহিং—তূর্যৈঃ। পসরিঅ—প্রসৃত। পবণুব্বেল্লিঅ—পবন+উদ্বেলিত। ণিঅরু—নিকরঃ। বিবিহ—বিবিধ। পআরং—প্রকারং। ণচ্চই—নৃত্যতি। কপ্পঅরু—কল্পতরু।

মূলপাঠ — parahua mahura-palāviṇi kanti
ṇandaṇa vaṇa sacchanda bhamanti
jai tuī piaama sā mahu diṭṭhī
tā āakkhahi mahu paraputṭhi

৭। পরহুঅ মহুর-পলাবিণি কন্তি ণন্দণবণ সচ্ছন্দ ভমন্তি
জই তুইঁ পিঅঅম সা মহু দিটঠী তা আঅক্‌খহি মহু পরপুট্‌ঠি।

অনুবাদ—(চতুর্থ অঙ্কে ৬০নং শ্লোক খুরকানন্তর নামক সঙ্গীতে কোকিলের কাছে উর্বশী সন্ধানরত রাজার উক্তি) পরভৃতে, তুমি মধুর আলাপ কর, তুমি সুন্দরী এবং নন্দন বনে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াও। যদি তোমাদ্বারা আমার প্রিয়া দৃষ্টা হয়ে থাকে তবে হে পরপালিতে, আমাকে বল।

টীকা—পলাবিণি—প্রলাপিনি সম্বোধন। তুঁই—ত্বয়া (ত্বয়েন) যুষ্মদ্‌ শব্দের তৃতীয়ার একবচন। মহু—মহ্যং। 'মম' অর্থে। আঅক্‌খহি—অচক্ষ্ব। আ+চক্ষ্‌ +লোট। মহু—মহ্যং। কর্মকারকে।

মূলপাঠ— haū paī pucchimi akkahi gaavaru
lalia-pahāre ṇāsia-taru-varu
dūra-viṇjjia-sasahara-kantī
diṭṭhi piapaī sammuha-jantī

। হউ পইঁ পুচ্ছিমি অক্‌খহি গঅবরু ললিঅ-পহারে ণাসিঅ-তরুবরু
দূর-বিণিজ্জিঅ-সসহর-কন্তী দিটঠী পিঅপইঁ সম্মুহ জন্তী।

অনুবাদ—(১০২নং শ্লোকে অনন্তর চর্চরী সঙ্গীতে হাতীর কাছে উর্বশীর সন্ধানে রাজার উক্তি) গজবর, তুমি ললিত প্রহারে তরুবর নষ্ট কর, তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, তুমি বল, চন্দ্রমার শোভাকে হার মানিয়ে দূরে রাখে এমন সম্মোহিনী পতিপ্রিয়াকে কি দেখেছ?

টীকা—হউ—অহং > অহকং > হকং > হউং। পইঁ—ত্বাং > *পাং (ব-এর অঘোষীভবন প) স্বরসঙ্গতিতে আং ইং হয়েছে। ত্বয়েন > *পয়েন > পইং করলে তৃতীয়ার ব্যাখ্যা হয় না। C. U. Edition-এ আছে—tvayā >* tpayā > paiṃ (nasal from the nominal ending-ena). অক্‌খহি—আ+খ্যা ধাতু লোট হি। বিণিজ্জিঅ—বিনির্জিত। পিঅপইঁ—প্রিয়াপতিং=প্রিয়পতী শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন। পতি প্রিয় যে নারীর এই অর্থে। সম্মুহজন্তী সম্মোহয়ন্তী। সম্যক মোহসৃষ্টিকারিণী।

Text 68. Saraha-Dohakosa (selection)

সরহের দোহাকোষ থেকে নির্বাচিত অংশ

মূলপাঠ—Sahaja chaḍḍi jo ṇivvāṇa bhāviu
ṇau paramattha ekka teṃ sāhiu
jo jasu jeṇa hoi santuṭṭho
mokkha ki labbhai jhāṇa-paviṭṭho.

১। সহজ ছড্ডি জো ণিব্বাণ ভাবিউ ণউ পরমত্থ এক্ক তেং সাহিউ
জো জসু জেণ হোই সন্তুটেঠা মোক্‌খ কি লব্‌ভই ঝাণ পবিটেঠা।

অনুবাদ—সহজকে ছেড়ে যে নির্বাণ ভাবে সে কিন্তু কোন এক পরমার্থ সাধন করে না। যে যেভাবে যা দ্বারা সন্তুষ্ট হয়। ধ্যানমগ্ন হলেই কি মোক্ষ লাভ হয়?

টীকা—ছড্ডি—ছর্দয়িত্বা। ভাবিউ—ভাবিতঃ। ণউ—নতু। তেং—তেন। সাহিউ—সাধিতঃ। জসু—যস্ত। হোই—ভবতি। লব্‌ভই—লভ্যতে। ঝাণপবিটেঠা —ধ্যান-প্রবিষ্টঃ।

মূলপাঠ—kintaha dīveṃ kintaha nivejjem
kintaha kijjai mantaha sevvaṃ
kintaha tittha tapovaṇa jāi
Mokkha ki labbhai pāṇi ṇhāi.

২। কিন্তহ দীবেং কিন্তহ ণিবেজ্জেং কিন্তহ কিজ্জই মন্তহ সেব্বং
কিন্তহ তিত্থ তপোবণ জাই মোকখ কি লব্‌ভই পাণি ণ্‌হাই।

অনুবাদ—কি হবে দীপ দিয়ে, কি হবে নৈবেদ্যে, মন্ত্রসেবাদ্বারাই বা কি হবে? তীর্থে তপোবনে ভ্রমণ করেই বা কি হবে। জলে স্নান করলেই কি মোক্ষ লাভ হয়?

টীকা—কিন্তহ—কিং তথা অথবা কিং তস্য। দীবেং—দীপেন। ণিবেজ্জেং—নৈবেদ্যেন। কিজ্জই—ক্রিয়তে। মন্তহ—মন্ত্রস্য। সেব্বং—সেবয়া। সেবা শব্দের ৩য়া। ণ্‌হাই—স্নাত্বা। এখানে ল্যপ্‌ হয়েছে।

মূলপাঠ— chaḍḍahu re ālīkā-bandhā
so muñcau je acchahu dhandā
tasu pariāṇe aṇṇa ṇa koi
avareṃ gaṇṇeṃ savva-vi soi.

৩। ছড্ডহু রে আলীকবন্ধা সো মুঞ্চউ জে অচ্ছহু ধন্দা
তসু পরিআণে অন্ন ণ কোই অবরেং গন্নেং সব্ব-বি সোই।

অনুবাদ—মিথ্যা বন্ধন ছাড়, যে ধাঁধায় আছে সে মুক্ত হোক। তাঁকে জানলে অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। অন্যান্য দিক থেকে বিবেচনা করলেও তিনিই সব।

টীকা—ছড্ডহু—ছর্দথ > ছড্ডহ। রে—সম্বোধন। মুঞ্চউ—মুঞ্চতু। অচ্ছহু—অচ্ছথ। অস্ ধাতু গম্ ধাতুর সাদৃশ্যে অচ্ছতি হয়। অপভ্রংশের এই অচ্ছ ধাতু থেকেই বাংলা অস্ত্যর্থক আছ ধাতু। ধন্দা—সন্দেহ > সংদেহ > ধন্দ। পরিআণে—পরিজ্ঞানে। অবরেং—অপরেণ। গম্নেং—গণ্যেন।

মূলপাঠ—

So-vi paḍhijjai so-vi guṇijjai
sattha-purāṇem vakkhāṇijjai
ṇāhi so ditthi jo tāu ṇa lakkhai
ekkem vara-guru-pāa pekkhai.

৪। সোবি পঢ়িজ্জই সোবি গুণিজ্জই সত্থ-পুরাণেং বক্‌খাণিজ্জই
ণাহি সো দিটিঠ জো তাউ ণ লক্‌খই এক্কেং বরগুরুপাঅ পেক্‌খই।

অনুবাদ—তাকেই পড়া হয়, তাঁরই গুণকীর্তন হয়, শাস্ত্রপুরাণে তাঁরই ব্যাখ্যান করা হয়। সে দৃষ্টি দৃষ্টিই নয় যে তাঁকে দেখে না। একমাত্র শ্রেষ্ঠ গুরুর পাদপ্রসাদে তাঁকে দেখা যায়।

টীকা—পঢ়িজ্জই—পঠ্যতে। গুণিজ্জই—গুণ্যতে। নামধাতু। সত্থপুরাণেং—শাস্ত্র পুরাণেন। বক্‌খাণি জ্জই—ব্যাখ্যান্যতে। নাম ধাতু। তাউ—তাং। লক্‌খই—লক্ষতি। পেক্‌খই—প্রেক্ষতে।

মূলপাঠ—

Jai guru-vuttau hiai paisai
ṇiccia hatthe ṭhaviau dīsai
Saraha bhaṇai jaga vāhia ālem
ṇia-sahāva ṇau lakkhiu bālem

৫। জই গুরু বুত্তউ হিঅই পইসই নিচ্চিঅ হত্থে ঠবিঅউ দীসই
সরহ ভণই জগ বাহিঅ আলেং ণিঅ-সহাব ণউ লকি্‌খউ বালেং।

অনুবাদ—যদি গুরুর উক্তি হৃদয়ে প্রবেশ করে তবে নিশ্চয়ই হস্তে স্থাপিত দেখা যায়। সরহ বলছেন জগৎ বৃথাই বাহিত হচ্ছে, মূর্খদ্বারা স্ব-স্বভাব লক্ষিত হয় না।

টীকা—জই—যদি। গুরুবুত্তউ—গুরুব্যুক্তি + প্রথমার একবচন। বি + উক্তি = ব্যুক্তি। হিঅই—হৃদয়ে। পইসই—প্রবিশতি। নিচ্চিঅ—নিশ্চিত। ঠবিঅউ—স্থাপিতকঃ। দিসই—দৃশ্যতে। আলেং—অলং অথবা অলীকেন। লকিখউ—লক্ষিতঃ। বালেং—বালেন। মূর্খেন।

মূলপাঠ— Jhāṇa-hīṇa pavvajjeṃ rahiau
gharahi vasanteṃ bhajjeṃ sahiau
jai bhiḍi visaa ramanta ṇa muccai
Saraha bhaṇai pariaṇa ki muccai.

৬। ঝাণ-হীন পব্বজ্জেং রহিঅউ ঘরহি বসন্তেং ভজ্জেং সহিঅউ
জই ভিড়ি বিসঅ রমন্ত ণ মুচ্চই সরহ ভণই পরিআণ কি মুচ্চই।

অনুবাদ—যে ধ্যান করে না, প্রব্রজ্যা পরিহার করে, ঘরে ভার্যার সঙ্গে বাস করে এবং নিবিড়ভাবে বিষয় ভোগ করে সে যদি মুক্তি না পায় তাহলে সরহ বলছেন যে, পরম জ্ঞানে কি মুক্তি হয়?

টীকা—ঝাণ—ধ্যান। পব্বজ্জেং—প্রব্রজ্যা+ওয়া। রহিঅউ—রহিতকঃ। ঘরহি—গৃহেভিঃ। পতি শব্দের সঙ্গে যুক্ত না হলে প্রাকৃতে গৃহ=ঘর : নতুবা গৃহপতি—গহবই। বসন্তেং—বস্+শতৃ+ওয়া। ভজ্জেং—ভার্যা+ওয়া। অ-কারান্ত শব্দরূপের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ভিড়ি—ভিন্ত>ভিড্ডিঅ।

মূলপাঠ— jai paccakkha ki jhāṇeṃ kīaa
jai parokkha andhāra ma dhīaa
Saraheṃ mittaṃ kaḍḍiu rāva
sahaja sahāva ṇa bhāvābhāva.

৭। জই পচ্চক্‌খ কি ঝাণেং কীঅঅ জই পরোক্‌খ অন্ধার ম ধীঅঅ
সরহেং পিত্তং কড্ডিউ রাব সহজ সহাব ণ ভাবাভাব।

অনুবাদ—যদি প্রত্যক্ষ হয় তাহলে ধ্যান করে কি হবে? যদি পরোক্ষ হয় অন্ধকারকে ধ্যান ক'রো না। সরহ রা কেড়ে ঘোষণা করছেন সহজানন্দের স্বভাবে ভাবও নেই অভাবও নেই।

টীকা—পচ্চক্‌খ—প্রত্যক্ষ। কিঅঅ—ক্রিয়তে। অন্ধার—অন্ধকার>অন্ধআর। বিভক্তিহীন কর্ম। ধীঅঅ—ধীয়তে। কড্ডিউ রাব—ক্রড্ডিত রাবঃ। ক্রুড্‌ ধাতুর অর্থ—চীৎকার করা।

মূলপাঠ— akkharavaṇṇo paramaguṇa rahia
bhaṇai ṇa jāṇai emai kahia
so paramesaru kāsu kahijjai
suraa kumārī jima paḍiajjai.

৮। অক্‌খরবণ্ণো পরমগুণরহিঅ ভণই ণ জানই এমই কহিঅ
সো পরমেসরু কাসু কহিজ্জই সুরঅ কুমারী জিম পড়িঅজ্জই

অনুবাদ—অক্ষর এবং বর্ণের মধ্যে পরম গুণ কিছু নেই। বলেন কিন্তু জানেন না, এমনি বলেন। সেই পরমেশ্বরের কথা কে বলতে পারে? কুমারী নারীর মিলনসুখের কথা কিভাবে প্রতিপাদিত হবে?

টীকা—এমই—এবমেব। কহিঅ—কথিত। পরমেসরু—পরমেশ্বরঃ। কাসু—কস্য। কহিজ্জই—কথ্যতে। জিম—যদেব>জেব্ব>জেম্ম>জিম। পডিঅজ্জই—প্রতিপদ্যতে।

মূলপাঠ—
bhāvābhāve jo parahīṇo
tahiṃ jaga saalāsesa vilīṇo
javveṃ tahiṃ maṇa ṇiccala thakkai
tavveṃ bhavasaṃsāraha mukkai.

৯। ভাবাভাবে জো পরহীণো তহিং জগ সঅলাসেস বিলীণো
জব্বেং তহিং মণ নিচ্চল থক্কই তব্বেং ভবসংসারহ মুক্কই।

অনুবাদ—ভাব এবং অভাব বোধের পার্থক্য যার মধ্যে নেই তার মধ্যেই বিশ্বসংসার বিলীন হয়। যখন মন নিশ্চল হয়ে থাকে তখন জন্মমৃত্যুর চক্র ভবসংসার বিলীন হয়। যখন মন নিশ্চল হয়ে থাকে তখন জন্মমৃত্যুর চক্র ভবসংসার থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

টীকা—পরহীণো—প্রহীনঃ। তহিং—তস্মিন্। সঅলাসেস—সকলাশেষ। জব্বেং তব্বেং—যাবদেব তাবদেব। থক্কই—স্থাধাতু থেকে সম্ভাব্য পদ স্থক্যতে। সংসারহ—সংসারস্য। অপাদানে ষষ্ঠী। মুক্কই—মুক্তি নামধাতু।

মূলপাঠ—
Jāva ṇa appu jāṇi para pariāṇasi
tāva ki dehāṇuttara pāvasi
emai kahijja bhanti ṇa kavvā
appahi appā bujjhasi tavvā.

১০। জাব ণ অপ্পহিঁ পর পরিআণসি তাব কি দেহাণুত্তর পাবসি
এমই কহিজ্জ ভন্তি ণ কব্বা অপ্পহি অপ্পা বুজ্ঝসি তব্বা।

অনুবাদ—যতক্ষণ নিজের দ্বারাই পরকে পরিপূর্ণ ভাবে না জানবে ততক্ষণ কি সেই দেহাতীতকে পাবে? এরূপ বলা হয়, ভুল করা উচিত নয়। তবেই নিজের মধ্যে আত্মাকে বুঝতে পারবে।

টীকা—অপ্পহিঁ—আত্মস্মিন্। পরিআণসি—পরি+জ্ঞা+মধ্যম পুরুষ। পাবসি—প্র+আপ্+মধ্যম পুরুষ। এমই—এবমেব। কহিজ্জ—কথ্যতে। কব্বা—কর্তব্যা। অপ্পা—আত্মা (মহারাষ্ট্রী) বুজ্ঝসি—বুধ্যসি। তব্বা—তদেব>তব্বেং।

মূলপাঠ—
ṇau aṇu ṇau paramāṇu vi cinta
aṇavara bhāvahi phuraï suratta

bhaṇai saraha bhanti eta vi matta
are ṇikkolī bujjhaha paramattha.

১১। ণউ অনু ণউ পরমাণু বি চিন্ত অণবর ভাবহি ফুরই সুরত্ত
ভণই সরহ ভন্তি এত বি মত্ত অরে ণিক্কোলী বুজ্ঝহ পরমত্থ।

অনুবাদ—অণুর কথা ভাববে না, পরমাণুও নয়। অনবরতই ভাবের মধ্যে সুরত্ব (পরমানন্দ) স্ফুরিত হয়। সরহ বলছেন, ইহ সংসারটাই ভ্রান্তি মাত্র। সুতরাং ওরে নিষ্কুলীন (সামাজিক বংশমর্যাদাহীন) পরমার্থকে উপলব্ধি কর।

টীকা—বি চিন্ত—অপি চিন্তয়। ফুরই—স্ফুরতি। সুরত্ত—সুরত্ব। এত বি মত্ত—এতদ্ অপি মাত্র। নিক্কোলী—নিষ্কুলিক। কুলহীন, সমাজচ্যুত। বুজ্ঝহ—বুধ্ ধাতু মধ্যমপুরুষ।

মুলপাঠ— gharem acchai vahire pecchai
pai dekkhai paḍivesi pucchai
Saraha bhaṇai vaḍha jāṇau appā
ṇau so dhea ṇa dhāraṇa jappā.

১২। ঘরেং অচ্ছই বাহিরে পেচ্ছই পই দেক্খই পডিবেসি পুচ্ছই
সরহ ভণই বঢ় জাণউ অপ্পা ণউ সো ধেঅ ধারণ জপ্পা।

অনুবাদ—ঘরেই আছে, বাইরে দেখছে, পতিকে দেখছে, প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করছে। সরহ বলছেন ওরে বোকা নিজেকে জান। সেই পরমাত্মা ধ্যেয় নয়, ধারণা নয়, জপের দ্বারাও প্রাপ্য নয়।

টীকা—অচ্ছই—অস্তি। গম্ ধাতুর সাদৃশ্যে অস্ ধাতু অচ্ছ। পেচ্ছই—প্রেক্ষতে। পই—পতি। দেক্খই—পশ্যতি। দৃশ্ ধাতু দেক্খ হয়েছে। পডিবেসি—প্রতিবেশী। পুচ্ছই—পৃচ্ছতি। বঢ—বৃদ্ধ>বড্ঢ। মূর্খ অর্থে ব্যবহার। ধেঅ—ধ্যেয়। জপ্পা—জপ্য। জপ্ ধাতু য।

মুলপাঠ— Jai guru kahai ki savva vi jāṇi
mokkha ki labbhai saala viṇu jāṇi
desa bhamai havvāsem laije
sahaja ṇa bujjhai pāpem gahije.

১৩। জই গুরু কহই কি সব্ব বি জাণী মোক্খ কি লব্ভই সঅল বিণু জাণী
দেস ভমই হব্বাসেং লইজে সহজ ণ বুজ্ঝই পাপেং গহিজে।

অনুবাদ—যদি গুরু বলেন, সবই কি জান? সবকিছু না জেনে কি মোক্ষ লাভ করা যায়? দেশ ভ্রমণ করে, অভ্যাসের বশবর্তী হয়, কিন্তু সহজকে বুঝতে পারে না, পাপে ডুবে যায়।

টীকা—কহই—কথয়তি। জাণী—জ্ঞায়তে>জাণীঅই>জাণীঅ। লব্‌ভই—লভ্যতে। দেস ভমই—দেশং ভ্রমতি। হব্বাসেং—অভ্যাসেন। লইজ্জে—লভ্যতে> লহিজ্জই। পাপেং—পাপেন। গহিজ্জে—গাহ্যতে>গহিজ্জই। গাহ-ধাতু জলে ডুবা অর্থে।

মূলপাঠ— vissa ramanta ṇa visaaṃ vilippai
uara-harai ṇa pāaī chippai
emai joī mula saranto
visahi ṇa vāhai visaa ramanto.

১৪। বিসঅ রমন্ত ণ-বিসঅং বিলিপ্পই উঅর হরই ণ পাণী ছিপ্পই
এমই জোঈ মূল সরন্তো বিসহি ণ বাহই বিসঅ রমন্তো।

অনুবাদ—বিষয় ভোগ করতে করতে যিনি বিষয়ে লিপ্ত হন না তিনি জলস্রোতে জলাহরণ করেন অথচ জল স্পর্শও করেন না। এইভাবে যোগী মূলবস্তুর অনুসরণ করে বিষয় ভোগ করেও ভোগের স্রোতে ভেসে যান না।

টীকা—রমন্ত—রম্ ধাতু শতৃ। বিলিপ্পই—বিলিপ্যতে। উঅর—শব্দটি সম্ভবতঃ জলস্রোতার্থক পূর শব্দ থেকে আগত। পূর>উর মধ্যস্বরাগম। ভবভূতির উত্তররাম চরিতে শব্দটির প্রয়োগ আছে। রবীন্দ্রনাথ মানসী কাব্যের ভূমিকায় শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কেউ ব্যাখ্যা করেছেন উদক>উরঅ (যেমন পঞ্চদশ>পণ্ণরহ)>উঅর বর্ণবিপর্যয়ে। কেউ বলেছেন—উঅর হরই>উপর ঘরহি in upper chamber. ছিপ্পই—ক্ষিপ্যতি। সরন্তো—স্ব ধাতু শতৃ। বাহই—বাহ্যতে।

মূলপাঠ — deva picchai lakkha vi dīsai
appaṇu mārii sa ki kariai
tovi ṇa tuṭṭai ehu saṃsāra.
viṇu āāseṃ ṇāhi ṇisāra.

১৫। দেব পিচ্ছই লক্‌খ বি দীসই অপ্পণু মারীই স কি করিঅই
তোবি ণ তুট্টই এহু সংসার বিণু আআসেং ণাহি ণিসার।

অনুবাদ—দেবতাকে দেখছে, লক্ষ্যও দেখা যাচ্ছে। আত্মাকে কষ্ট দিয়ে মেরে সে কি করবে? তথাপি ইহ জগতে পুনর্জন্ম টুটবে না। বিনা চেষ্টায় মুক্তি নেই।

টীকা—পিচ্ছই—প্রেক্ষ্যতে। দীসই—দৃশ্যতে। অপ্পণু—আত্মনঃ। মারীই—মার্যতে। মৃ+ণিচ্ কর্মবাচ্য। তোবি—তথাপি। তুট্টই—ত্রুট্যতে। এহু—ইহ। সংসার—সং+স্ব ধাতু জন্মগতি অর্থে। আআসেং—আয়াসেন। নাহি—ন+আসীৎ। নিসার—নিঃসার।

মূলপাঠ— animisaloaṇa citta ṇirohem̐
pavaṇa ṇirūhai sirigurubohem̐
pavaṇa vahai so niccalu javvem̐
joī kālu karai ki tavvem̐.

১৬। অণিমিস লোঅণ চিত্ত ণিরোহেং পবণ ণিরুহই সিরিগুরুবোহেং
পবণ বহই সো নিচ্চলু জব্বেং জোঈ কালু করই কি তব্বেং।

অনুবাদ—শ্রীগুরুর বুদ্ধি অনুসারে নিঃশ্বাস বায়ু নিরুদ্ধ করে অনিমেষ লোচনে চিত্ত নিরোধ করে নিঃশ্বাস চলাচল যখন নিশ্চল করা যায় তখন মহাকাল যোগীর কি করতে পারে?

টীকা—লোঅণ—লোচন। ণিরোহেং—নিরোধেন। নিরুহই—নিরুধ্যতে। সিরি—শ্রী, স্বরভক্তি। বোহেং—বোধেন। বহই—বহতি। ণিচ্চলু—নিশ্চলঃ। জব্বেং তব্বেং—যাবদেব তাবদেব। জোঈ—যোগী। কালু—কালঃ। করই—করোতি।

মূলপাঠ— jāu ṇa indiavisaa-gāma
tāva (ṇa) hi viphurai akāma
aisem̐ visama sandhi ko paisai
jo jahī atthi ṇau jāva ṇa dīsai.

১৭। জাউ ণ ইন্দিঅ বিসঅ-গাম তাব ণ হি বিফুরই অকাম
অইসেং বিসম সন্ধি কো পইসই জো জহিঁ অত্থি ণউ জাব ণ দীসই।

অনুবাদ—যতক্ষণ ইন্দ্রিয় বিষয় গত না হয় ততক্ষণ কামনাহীনতা স্ফুরিত হয় না। এরূপ বিষম সন্ধিতে (অর্থাৎ ভোগের মধ্যে কামনাহীন অবস্থায়) কে প্রবেশ করতে পারে? সুতরাং যতক্ষণ সত্য দেখা না যায় ততক্ষণ যে যেখানে আছে থাক।

টীকা—জাউ—যাবৎ। ইন্দিঅ বিসঅ-গাম—ইন্দ্রিয় বিষয় গ্রাম। বিফুরই—বিস্ফুরতি। অইসেং—ঈদৃশেন। পইসই—প্রবিশতি। জহিং—যস্মিন্। অত্থি—অস্তি। দীসই—দৃশ্যতে।

মূলপাঠ— paṇḍia saala sattha vakkhāṇai
dehahī budha vasanta ṇa jāṇai
avaṇāgamaṇa ṇa teṇa vikhaṇḍia
tovi ṇilajja bhaṇai haum̐ paṇḍia.

১৮। পণ্ডিঅ সঅল সত্থ বক্‌খাণই দেহহিঁ বুদ্ধ বসন্ত ণ জাণই
অবণাগমণ ণ তেন বিখণ্ডিঅ তোবি ণিলজ্জ ভণই হউং পণ্ডিঅ।

অনুবাদ—পণ্ডিতেরা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন কিন্তু দেহের মধ্যেই যে পরম জ্ঞান তা জানেন না। সংসারে আনাগোনা (জন্মমৃত্যুর ভবচক্র) তাতে খণ্ডিত হয় না। তথাপি নির্লজ্জ বলে—আমি পণ্ডিত।

টীকা—সঅল—সকল। সথ—শাস্ত্র। বক্‌খাণই—ব্যাখ্যানতি। নামধাতু। দেহহিঁ—দেহস্মিন্। বসন্ত—বস্+শতৃ। জাণই—জানাতি। অবণাগমণ—অব ধাতু অনট্=অবন+আ-গম্+অনট্=আগমন। বিখণ্ডিঅ—বিখণ্ডিত। তোবি—তথাপি>তহাবি। হউং—অহকং>হগং>হউং।

Text 83. Prākṛtapaiṅgala—Anonymous

(পিঙ্গলনাগের লেখা ছন্দের গ্রন্থে অজ্ঞাতনামা কবিদের রচনা থেকে সঙ্কলিত)

মূলপাঠ— are re bāhahi kāṇha ṇāva chodi
dagamaga kugati ṇa dehi
taï itthi ṇaihi santāra dei
jo cāhasi so lehi.

১। অরে রে বাহহি কাণ্‌হ ণাব ছোডি ডগমগ কুগতি ণ দেহি
তইঁ ইথী ণইহি সন্তার দেই জো চাহসি সো লেহি।

অনুবাদ—ওরে ও কানু বেয়ে যাও, নৌকাখানি ছোট, টলমল, কুগতি দিও না। তুমি মেয়েদের নদীতে পার করে দিয়ে যা চাও তাই নাও।

টীকা—বাহহি—বাহ্ ধাতু লোট। কাণ্‌হ—কৃষ্ণ। ছোডি—ক্ষুদ্র>ছুড্ড! ক্ষুদ্রার্থে ই। ডগমগ—ভাবাত্মক দেশী শব্দ। কেউ কেউ দীর্ঘমার্গ প্রভৃতি বলেছেন। দেহি—দা ধাতু লোট। তই—ত্বয়া (ত্বয়েন। অনুক্ত কর্তায় ৩য়া। ইথী—স্ত্রী। আদ্য স্বরাগম। ণইহি—নদীভিঃ। অধিকরণে। সন্তার—সম্+তৃ ধাতু পার করা অর্থে। দেই—দত্বা>দইঅ। চাহসি—যাচসে বা চক্ষসে। লেহি—লভ্ ধাতু লোট।

মূলপাঠ— Jasa sīsai Gaṅgā Gori addhaṅgā
gima pahiria phaṇih rā
kaṇṭhaṭṭhia visa pindhaṇa disā
seṇṭāria saṃsārā
kiraṇāvali-kandā bandia candā
ṇayaṇahi aṇala phurantā
so maṅgala dijjau bahusuha kijjau
tumha Bhavāṇī kantā.

২। জস সীসই গঙ্গাগোরী অদ্ধঙ্গা গিম পহিরিঅ ফাণহারা
কণ্ঠটিঠঅ বিসা পিন্ধণ দীসা সন্তারিঅ সংসারা
কিরণাবলি-কন্দা বন্দিঅ চন্দা ণয়ণহি অণল ফুরন্তা
সো মঙ্গল দিজ্জউ বহুসুহ কিজ্জউ তুম্হ ভবাণীকন্তা।

অনুবাদ—যাঁর শিরে গঙ্গা, গৌরী অর্ধাঙ্গ, যিনি গলায় পরেন ফণিহার, যাঁর কণ্ঠে বিষ, পরিধান দিগ্‌বসন, যিনি সংসারে পার করেন, কিরণাবলীর আকার চন্দ্র দ্বারা যিনি বন্দিত, যাঁর নয়নে বহ্নি স্ফুরিত হয় সেই ভবানীকান্ত তোমাদের মঙ্গল করুন। বহু সুখের বিধান করুন।

টীকা—জস—যস্য। সীসই—শীর্ষে। গোরী—গৌরী। গিম—গ্রীবা। পহিরিঅ—পরিহিত। বিপর্যয়। পিন্ধণ—অপিন্ধন। দিজ্জউ, কিজ্জউ—দীয়তু ক্রিয়তু। তুম্হ—যুষ্মাকং>তুম্হাঅং।

মূলপাঠ—Je gañjia Gaulahivai rai
uddau odda jasa bhae palai
guru-vikkama Vikkama jinia jujjha
ta kanna-parakkama iha bujjha.

৩। জে গঞ্জিঅ গউলাহিবই রাই উড্ডউ ওড্ড জস ভএ পলাই
গুরু বিক্কম বিক্কম জিণিঅ জুজ্ঝ তা কণ্ণ-পরক্কম ইহ বুজ্ঝ।

অনুবাদ—যিনি গৌড়াধিপতি রাজাকে গঞ্জনা দিয়েছেন, যাঁর ভয়ে উদ্ধত ওড্র পালিয়েছে, যুদ্ধে যিনি মহাবিক্রমশালী বিক্রমকে পরাজিত করেছেন সেই কর্ণের পরাক্রম এর দ্বারাই বুঝে নাও।

টীকা—জে—যেন। গঞ্জিঅ—গঞ্জিত। গউলাহিবই—গৌড়াধিপতি। রাই—রাজিক>রাইঅ। উড্ডউ—উড্ডীন flying অথবা উদ্ধত। ওড্ড—ওড্র—উড়িষ্যা। জুজ্ঝ—যুদ্ধ। Text এ tujjha ছাপাভুল মনে হয়।

মূলপাঠ— sera ekka jai pavahi ghitta
manadā bisa pakkala nittā
taṅka ekku jai sindhava paa
so hau raṅka so iha rāa

৪। সের এক্ক জই পাবহি ঘিত্তা মণ্ডা বীসা পকাইল নিত্তা
টঙ্ক এক্কু জই সিন্ধব পাআ সে হউ রঙ্ক সো ইহ রাআ।

অনুবাদ—সেরখানিক ঘি যদি তুমি পাও তাহলে রোজ কুড়িটা মণ্ডা তৈরী হয়। এক টাকার সৈন্ধব লবণ যদি পাওয়া যায় তাহলে সে যতই নিঃস্ব হোক সেই এখানে রাজা।

টীকা—পাবহি—প্র+আপ্+লোট। ঘিত্তা—ঘৃত। বীসা—বিংশ। ণিত্তা—নিত্য। পকাইল—পচ্ ধাতু ইল প্রত্যয়। টক্ক—তঙ্কা। সিন্ধব—সিন্ধু+ষ্ণ=সৈন্ধব। পাআ—প্রাপ্ত। হউ—ভবতু। রঙ্ক—তৎসম। রাআ—রাজা।

মূলপাঠ— ḍholla māria ḍhilli maha mucchia meācha sarīra
pura jajjala malla vara calia vīra Hambīra.
Calia vīra Hambīra paabhara meīni kampai
diga maga ṇaha andhāra dhūli sūraha raha jhampai
diga maga ṇaha andhāra āṇu khurasāṇaka ollā
daravali damasu vipakkha māru ḍhilli maha ḍhollā

৫। ঢোল্লা মারিঅ ঢিল্লি মহ মুচ্ছিঅ মেচ্ছ-সরীর
পুর জজ্জল মল্লবর চলিঅ বীর হম্বীর।
চলিঅ বীর হম্বীর পঅভর মেইণি কম্পই
দিগ মগ ণহ অন্ধার ধূলি সুরহ রথ ঝম্পই
দিগ মগ ণহ অন্ধার আণূ খুরসাণক ওল্লা
দরবলি দমসু বিপক্‌খ মারু ঢিল্লি মহ ঢোল্লা।

অনুবাদ—দিল্লীতে ঢোল বাজিয়ে, ম্লেচ্ছ-দেহগুলিকে স্তম্ভিত করে, মল্লবর জজ্জলকে সম্মুখে রেখে বীর হাম্বীর চললেন। বীর হাম্বীর চললেন, তাঁর পদভরে মেদিনী কাঁপে, দিক, পথ, অন্ধকার, ধুলায় সূর্যের রথ ঢেকে গেছে, দিক পথ আকাশ সব অন্ধকার। তিনি খুরশানের ওল্লাকে আদেশ দিলেন—দলে মলে দমন কর, বিপক্ষকে মার। দিল্লীতে ঢোল বাজাও।

টীকা—মারিঅ—মারয়িত্বা>মারইঅ। মহ—৭মীর চিহ্ন। মুচ্ছিঅ—মূর্চ্ছয়িত্বা। মেচ্ছসরীর—ম্লেচ্ছশরীর। পঅভর—পদভর। মেইণি—মেদিনী। দিগ মগ ণহ—দিক মার্গ, নভ। সুরহ—সূর্যস্ত। রহ—রথ। আণু আজ্ঞপ্ত>আণইউ। খুরসানক—খুরশান+ষষ্ঠীর ক। খুরশান নামক স্থানের। ওল্লা—আরবী শব্দ উল্লাহ্। দরবলি—দলমলি। দৃ ও মৃদ্ ধাতু। দমসু—দম্+লোট্। মারু—মারতু>মারউ।

মূলপাঠ—6. sahasa maamatta gaa lākha lākha pakkharia
sāhi dui sāji khelanta gindū
koppi pia jāhi tahi thappu jasu vimala mahi
jiṇai ṇahi koi tua Tulaka Hindū

৬। সহস মঅমত্ত গঅ লাখ লাখ পক্‌খরিঅ
সাহি দুই সাজি খেলন্ত গিন্দু।
কোপ্পি পিঅ জাহি তহি থপ্পু জস্‌ বিমল মহি
জিণই ণহি কোই তুঅ তুলক হিন্দু।

অনুবাদ—হাজার হাজার মদমত্ত গজ, লাখ লাখ পক্ষিরাজ ঘোড়া, দুই শাহ-সজ্জিত হয়ে কন্দুক খেলা করছে। হে প্রিয়, ক্রোধবশে সেখানে যাও, পৃথিবীতে বিমল যশ প্রতিষ্ঠা কর। তুরকী বা হিন্দু কেউ তোমাকে হারাতে পারবে না।

টীকা—সহস—সহস্র। মঅমত্ত—মদমত্ত। গঅ—গজ। পক্‌খরিঅ—পক্ষিরাজ>পক্‌খিরাঅ। সাহি—ইরাণীয় শব্দ শাহ্‌। দুই—দ্বে। সাজি—সজ্জয়িত্বা>সজ্জইঅ। খেলন্ত—ক্রীড়ন্ত। গিন্দু—কন্দুক, খেলার বল। কোপ্পি—কুপ্য>কুপ্পিঅ। পিঅ—প্রিয়। জাহি—যা+লোট। তহি—তস্মিন্‌>তহিং। থপ্পু—স্থাপয়। জস্‌—যশঃ। জিণই—জিনাতি। কোই—কঃ+অপি। তুঅ—ত্বাম্‌। তুলক—তুর্ক। তুরস্কবাসী।

মূলপাঠ— r·ā ludha samāja khala
vahū kalahārini sevaka dhuttau
jıvaṇa cāhasi sukkha jai
parihāru gharu jai bahuguṇajuttau

৭। রাআ লুদ্ধ সমাজ খল বহু কলহারিণি সেবক ধুত্তউ
জীবণ চাহসি সুক্‌খ জই পরিহরু ঘরু জই বহুগুণজুত্তউ।

অনুবাদ—রাজা লুব্ধ, সমাজ খল, বধূ কলহপ্রিয়া, সেবক ধূর্ত। জীবনে যদি সুখ চাও বাড়ী ছেড়ে যাও, সে বাড়ী যদি বহুগুণযুক্তও হয়।

টীকা—কলহারিনি—কলহকারিণী। বহু—বধূ। ধুত্তউ—ধূর্তকঃ। জুত্তউ—যুক্তকঃ।

মূলপাঠ— ucca uṭhāaṇa vimala gharā
taruṇi gharaṇı viṇaaparā
vittaka pūrala muddhaharā
varisa samaā sukkha karā.

৮। উচ্চ উঠাঅণ বিমল ঘরা তরুণী ঘরণী বিণঅপরা
বিত্তক পূরল মুদ্ধহরা বরিসা সমআ সুক্‌খকরা।

অনুবাদ—উচ্চ উঠান, পরিচ্ছন্ন ঘর, বিনীতা তরুণী গৃহিণী, মুদ্রাগৃহ বিত্তপূর্ণ। বর্ষার সময়টা বড় সুখের।

টীকা—উঠাঅণ—উৎ+স্থান। ঘরণী—গৃহিণী। পূরল—পূর্ণ>পূরইল্ল। মুন্ধহরা—মুদ্রাগৃহ>মুদ্দাঘর।

মূলপাঠ—Jiṇi Kaṃsa viṇāsia kitti paāsia
Mutṭhi Aritṭhi viṇāsa karu giri toli dharu
Jamalājjuṇa bhañjia paabhara gañjia
kāliakula saṃhāra karu jase bhuvaṇa bharu
cāṇura vihaṇḍia ṇia kula maṇḍia
Rāha-muha-mahu pāṇa kare jani bhamaravare
Soi tumha Ṇarāaṇa vippaparāaṇa
Cittahi cintia deu varā bhava bhīiharā.

৯। জিনি কংস বিণাসিঅ কিত্তি পআসিঅ
মুটিঠ অরিটিঠ বিণাস করু গিরি তোলি ধরু
জমলাজ্জুণ ভঞ্জিঅ পঅভর গঞ্জিঅ
কালিয়কুল সংহার করু জসে ভুবণ ভরু।
চাণুর বিহণ্ডিঅ ণিঅকুল মণ্ডিঅ
রাহা-মুহ-মহু পাণ করে জণি ভমরবরে
সোই তুম্হ ণরাঅণ বিপ্প পরাঅণ
চিত্তহি চিন্তিঅ দেউ বরা ভবভীই-হরা।

অনুবাদ—কংসকে জয় ক'রে বিনাশ করেছেন, কীর্তি প্রকাশ করেছেন, মুষ্টি এবং অরিষ্টি দানব বিনাশ করেছেন, গিরি (গোবর্ধন) তুলে ধরেছেন, যমলার্জুন ভঙ্গ করেছেন, পদভরে গঞ্জনা দিয়ে কালীয় বংশ সংহার করেছেন, যশে ভুবন ভরেছেন, চানূর দৈত্যকে ধ্বংস করে নিজের বংশ মণ্ডিত করেছেন, যেন ভ্রমরের মত রাধার মুখমধু পান করেছেন—সেই বিপ্রপরায়ণ নারায়ণকে তোমরা হৃদয়ে চিন্তা কর। তিনি ভবভীতিহর বর প্রদান করুন।

টীকা—জিনি—যেন। পআসিঅ—প্রকাশিত। তোলি—তুলয়িত্বা। জসে—যশসা। জনি—সম্ভাব্যপদ যাদৃশ>যেহ্ন>যেন। তুম্হ—যুষ্মাকং। দেউ—দদাতু। ভীই—ভীতি।

মূলপাঠ—Jāi māā puttā dhuttā, iṇṇe jāṇi kijjā juttā.

১০। জাআ, মাআ পুত্তা ধুত্তা, ইণ্ণে জাণি কিজ্জা জুত্তা।

অনুবাদ—জায়া ছলনাময়ী, পুত্রগণ ধূর্ত, এতেই জানা যায় কি করা যুক্তিযুক্ত।

টীকা—ইণ্ণে—অনেন। জাণি—জাত>জাণিঅ। কিজ্জা—ক্রিয়া। জুত্তা— যুক্তা।

মূলপাঠ— So majhu kantā dūra diganta
pāusa āve celu dulave.

১১। **সো মঝু কন্তা দূর দিগন্তা, পাউস আবে চেলু দুলাবে।**

অনুবাদ—সেই আমার প্রিয়, দূর দিগন্তে আছে। বর্ষাকাল এসেছে. আঁচল দোলাচ্ছে।

টীকা—মঝু—মহ্যং। ষষ্ঠী অর্থে। পাউস—প্রাবৃষ্। আবে—আয়াতি>আবই। চেলু—চেল, বস্ত্রাঞ্চল। দুলাবে—দোলাপয়তি>দোলাবই।

মূলপাঠ— Paṇḍava vaṃsahi jamma dharijje
sampaa ajjia dhammaka dijje
soi Juhiṭṭhira saṅkaṭa pā
devaha likkhia kena meṭā.

১২। **পণ্ডব-বংসহি জন্ম ধরিজ্জে সম্পঅ আজ্জিঅ ধম্মক দিজ্জে**
সোই-জুহিটিঠর সংকট পাআ দেবহ লিকৃখিঅ কেণ মেটাআ?

অনুবাদ—পাণ্ডব বংশে জন্মেছেন, সম্পদ অর্জন করে ধর্মের জন্য দান করেছেন। সেই যে যুধিষ্ঠির তিনিও সংকটে পড়েছিলেন। দেবতার লিখন কিভাবে মিটবে?

টীকা—বংসহি—বংশভিঃ। অধিকরণ। ধরিজ্জে—ধ্রিয়তে। ধম্মক—ধর্মায়। চতুর্থীর বিভক্তি ক। দিজ্জে—দীয়তে। পআ—প্রাপ্তঃ। দেবহ—দেবস্য। লিকৃখিঅ লিখিতং। মেটাআ—বাংলায় সমাধান করা, এখানে খণ্ডন। মিল ধাতুর বিকার হওয়া সম্ভব। অথবা কোন দেশী শব্দজাত।

মূলপাঠ—13. b lo kumā ro chaa-muṇḍadh ri
uv abiṇā muñi ekka ṇ ri
ahaṃṇisaṃ kh ti visaṃ bhikhāri
gai bhavittī kila k hām ri

১৩। বালো কুমারো ছঅ মুণ্ডধারী
উবাঅহীণা মুঞি এক্ক ণারী
অহংনিসং খাই বিসং ভিখারি
গঈ ভবিত্তা কিল কা হামারি।

অনুবাদ—বালক পুত্রটি ছয়টি মুখ। উপায়হীনা আমি একা নারী। আমার ভিখারী (পতি) অহর্নিশি বিষ খাচ্ছেন। আমার গতি যে কি হবে?

টীকা—ছঅ—ষট্। উবাঅ—উপায়। ঘোষীভবন। মুঞি—ময়া (ময়েন)। খাই—খাদতি>খাঅই। ভিখারি—ভিক্ষাকারী>ভিক্খাআরী। গঈ—গতিঃ। ভবিত্তী—ভবিত্রী। সংস্কৃতানুকরণ। হামারি—অস্মদীয়>অম্হরিঅ।

মূলপাঠ— tarala-kamaladala-sari-jua-ṇaaṇā
saraa-samaa-sasi-susarisa-vaaṇā
maagala-karivara-saalasa-gamaṇī
kamaṇa sukia-phala vihi gaḍu ramaṇī.

১৪। তরল-কমলদল-সরি-জুঅ-ণঅণা
সরঅ-সমঅ-সসি-সুসরিস-বঅণা
মঅগল-করিবর-সঅলস-গমণী
কমণ -সুকিঅ-ফল বিহি গড়ু রমণী।

অনুবাদ—চঞ্চল পদ্মপাতার সদৃশ যার নয়নযুগল, শরৎকালের চন্দ্রের সাদৃশ্যযুক্ত যার বদন, মদস্রাবী হস্তিনীর মত সালসগমনা যে নারী সেই রমণীকে বিধাতা কিরূপ সুকৃতির ফলে গড়েছেন?

টীকা—সরি—সদৃক্। জুঅ—যুগ। সরঅ—শরৎ। সমঅ—সময়। সসি—শশী। সুসরিস—সুসদৃশ। বঅণা—বদনা। সঅলস—সালস। কমণ—কস্মিন্। ডঃ সুকুমার সেনের মতে সম্ভাব্য পদ কমনঃ > কবণ কমণ। সুকিঅ—সুকৃত। বিহি—বিধি। গড়ু—গঠিতঃ।

প্রাকৃতের প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১। প্রাকৃত শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার আলোচনা করিয়া প্রাকৃতের শ্রেণীবিভাগ নির্ণয় কর এবং তাহাদের বৈশিষ্ট্যগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [ক. বি. '৬৫, ৬৭]

উত্তর। প্রাকৃত শব্দের অর্থ নিয়ে নানা আলোচনা হয়েছে। ব্যুৎপত্তি বিচার এবং প্রয়োগের ইতিহাস দুদিক থেকেই আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল। প্রকৃত শব্দের সঙ্গে অণ্ প্রত্যয়ে প্রাকৃত হয়েছে অথবা প্রকৃতি শব্দের উত্তর ষ্ণ প্রত্যয়ে প্রাকৃত হয়েছে তাও বিচার করা হয়েছে। প্রাচ্য পণ্ডিতদের অধিকাংশই প্রকৃত শব্দ দ্বারা মূল ভাষা বুঝেছেন এবং সেই ভাষার বিকৃত রূপকে বলেছেন প্রাকৃত। যাঁরা প্রকৃতি শব্দ থেকে প্রাকৃত শব্দের সৃষ্টি বলে মনে করেন তাঁরা বলেন যে ষ্ণ-প্রত্যয় হয়েছে জাত-অর্থে। প্রকৃতি শব্দের অর্থই মূলভাষা সংস্কৃত। তা থেকেই উৎপন্ন হয়েছে প্রাকৃত। হেমচন্দ্র তাঁর প্রাকৃত ব্যাকরণে বলেছেন, "প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং তত্র ভবং তত আগতং বা প্রাকৃতম্।" প্রাকৃতচন্দ্রিকা গ্রন্থেও বলা হয়েছে, "প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্।" তবে কাব্যালঙ্কার বৃত্তিতে আচার্য-রুদ্রট একটু অভিনব মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন যে প্রাকৃত ভাষা প্রকৃতি থেকেই এসেছে যেমন এসেছে সংস্কৃত। প্রকৃতিই মূলভাষা। তাতে ব্যাকরণের নিয়মাদি দ্বারা মার্জিত করে সংস্কার সাধন করা হয়নি। প্রকৃতি বলতে তিনি বুঝেছেন এমন এক বাগ্ব্যাপার বা ভাষা যা নিয়মকানুন দিয়ে মার্জিত হবার পূর্বাবস্থা। তিনি বলেন, "ব্যাকরণাদিভিরনাহিত-সংস্কারো বাগ্ব্যাপারঃ প্রকৃতিঃ।"

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের ধারণা প্রকৃতি শব্দের অর্থ প্রজাপুঞ্জ অর্থাৎ জনসাধারণ। জনগণের মুখের ভাষাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষা নাম পেয়েছিল। জার্মান পণ্ডিত বেবর (Weber) স্পষ্টই বলেছেন যে বৈদিক কথ্য ভাষাই মার্জিত হয়ে সাহিত্যে সংস্কৃত নাম নিয়ে অপরিবর্তিত থেকে গেছে এবং ঐ ভাষাই জনগণের মুখে পরিবর্তিত হয়ে প্রাকৃতে পরিণত হয়েছে।

প্রাকৃত ভাষার শ্রেণী বিভাগ ব্যাকরণ গ্রন্থাদিতে করা হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত ১৮ রকমের প্রাকৃতের সন্ধান পাওয়া গেলেও সাহিত্যিক উৎকর্ষে মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধমাগধী এবং পৈশাচী প্রাকৃতের ভাষালক্ষণই প্রাকৃত ব্যাকরণসমূহে আলোচিত হয়েছে। মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতকেই আদর্শ মনে করা হত এবং এই প্রাকৃত অবলম্বনেই ব্যাকরণ-বিধিগুলি নির্দেশ করা হয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য শ্রেণীর প্রাকৃতে মহারাষ্ট্রী থেকে ব্যতিক্রমগুলি দেখান হয়েছে। সংস্কৃত নাটকে শিক্ষিত পুরুষেরা সংস্কৃত বলতেন। নারীগণ, দাসীরা বিদূষকেরা মহারাষ্ট্রী বা শৌরসেনী বলত এবং নিতান্ত অশিক্ষিত নীচ জাতীয়দের নাট্যভাষা ছিল মাগধী বা পৈশাচী। হাস্যরস সৃষ্টির জন্যও মাগধীর ব্যবহার নাটকে করা হয়েছে। সাহিত্যিক গৌরব পেয়েছে মহারাষ্ট্রী। গাথা সপ্তশতী, সেতুবন্ধ, গৌড়বধ প্রভৃতি বিখ্যাত কাব্য মহারাষ্ট্রীতে লিখিত।

প্রধান তিনটি প্রাকৃত—মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী ও মাগধীর ভাষাগত বিশেষ লক্ষণ পারস্পরিক তুলনা সূত্রে নিম্নে উল্লেখ করা হল।

মহারাষ্ট্রী—(১) পদ মধ্যবর্তী অল্পপ্রাণ স্পর্শ বর্ণ লোপ পায় এবং মহাপ্রাণ বর্ণ হ-কারে পরিণত হয়। অপি>অই, ভবতি>হোই, কথং>কহং, কথয়তি>কহেই। (২) যুক্ত ব্যঞ্জনের সমীভবনে মহারাষ্ট্রীতে বিশেষত্ব আছে। ক্ষ>চ্ছ। কক্ষ>কচ্ছ, ইক্ষু>উচ্ছু, ক্ষার>ছার, ক্ষুর>ছুর। ত্ম>প্প। আত্মনঃ>অপ্পণো, আত্মা>অপ্পা। (৩) ষষ্ঠীতে স্য=আহ এবং সপ্তমীতে স্মিন্=ম্মি, ম্মি। নরস্য>নরাহ, তস্য>তাহ, তস্মিন্>তম্মি, নরস্মিন্>ণরম্মি। (৪) কর্মভাব বাচ্যে য-বিকরণে ধাতুর সঙ্গে 'ইজ্জ' যোগ করা হয়। গম্যতে>গমিজ্জই, লভ্যতে>লহিজ্জই, ক্রিয়তে>করিজ্জই।

শৌরসেনী—(১) পদমধ্যবর্তী একক ব্যঞ্জন লোপ না হলে ঘোষীভবন হয়। অপি>অবি, ভবতি>ভোদি, কথং>কধং, কথয়তি>কধেদি। (২) যুক্তাক্ষরের সমীভবনে শৌরসেনী প্রাকৃত সাধারণ নিয়ম মানে। কক্ষ>কক্‌খ, ইক্ষু>ইক্‌খু, ক্ষার>খার, ক্ষুর>খুর ; আত্মা>অত্তা, আত্মনঃ>অত্তণো। (৩) ষষ্ঠীতে স্স এবং সপ্তমীর স্মিন্>ম্‌হি হয়। নরস্য>ণরস্স, নরস্মিন্>ণরম্‌হি। (৪) কর্মভাব বাচ্যের য-বিকরণে ধাতুর সঙ্গে ইঅ অথবা ঈঅ হয়। গম্যতে>গমিঅই, গমীঅই ; লভ্যতে> লভিঅই, লভীঅই ; ক্রিয়তে>কিঅই, করিঅই, করীঅই।

মাগধী—(১) মাগধীতে স্বর ও ব্যঞ্জনের উচ্চারণে উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টতা আছে। অন্য প্রাকৃতে অঃ>ও, কিন্তু মাগধীতে 'এ'। দেবঃ>দেবে। ষ ও স স্থলে শ এবং জ স্থলে য, র স্থলে ল ব্যবহার করা হয়। পুরুষঃ>পুরিসো>পুলিশে ; নরঃ>ণলে, এষঃ>এশে, রাজা>লাযা, ভাস্বরঃ>ভাশুলে, জানাতি>যাণাদি। (২) পদমধ্যবর্তী একক ব্যঞ্জন

শৌরসেনীর মত ঘোষবৎ হয়। কথয়>কধেহি, ভণতি>ভণদি, ব্যাপাদয়িতুং>বাবাদেদুং, জাতিবসতিং>যাদিবশদিং। (৩) মাগধীতে যুক্তাক্ষরে দন্ত্য স এবং ন থাকে। হস্তিস্কন্ধং, হস্ত, হোস্তি, উদলব্ভুস্তলে প্রভৃতি প্রয়োগ দেখা যায়। সমীভবনে কয়েকটি বিশিষ্টতা কৌতূহলপ্রদ। ক্ষ=স্ক। কক্ষ>কস্ক, প্রেক্ষামি>পেস্কামি। চ্ছ=শ্চ। মৎস্য>মচ্ছ>মশ্চ; ইচ্ছ্যাতে>ইশ্চীঅদি, গচ্ছ>গশ্চ। র্ত=স্ট। কর্তা>কস্টা, ভর্তৃকঃ>ভস্টকে, কর্তয়ত>কুস্টেধ। র্থ=স্ত। অর্থ>অস্ত, পার্থ>পস্ত, বিক্রয়ার্থং>বিক্কঅস্তং। (৪) বিভক্তি ব্যবহারে কর্তৃকারকে এ, ষষ্ঠীতে আহ এবং সপ্তমীতে হিং। নরঃ>ণলে, নরস্য>ণলাহ, চারুদত্তস্য>চালুদত্তাহ, নরস্মিন্>ণলহিং।

প্রশ্ন ২। প্রাকৃত সংস্কৃত-নিরপেক্ষ ভাষা কিনা তাহা যুক্তি ও উদাহরণ সহ আলোচনা কর। (65, 66, 67)

উত্তর। প্রাকৃতের সঙ্গে সংস্কৃতের সম্পর্ক নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মধ্যে বড় মতভেদ। সংস্কৃত থেকে উচ্চারণ বিকৃতির ফলে প্রাকৃতের জন্ম—এই মত সরাসরি অনেকে মানতে চান নি। তাঁদের মতে বৈদিক কথ্য ভাষার আঞ্চলিক প্রয়োগ থেকে প্রাকৃতের উদ্ভব এবং সংস্কৃত প্রাকৃতের ভগ্নিসমা। কিন্তু প্রাকৃতকে সংস্কৃত সাপেক্ষ মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। যে সাহিত্যিক প্রাকৃতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সেই প্রাকৃতকে সংস্কৃত-নিরপেক্ষ কল্পনা করা যায় না।

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বলেছেন, "একঃ শব্দঃ বহবঃ অপশব্দাঃ।" একটিই মূল শব্দ, উচ্চারণের ব্যতিক্রমে বহু অপশব্দের সৃষ্টি হয়। পুলিশে এবং পুরিসো অপশব্দ, কিন্তু মূল শব্দ পুরুষঃ। প্রাচ্য পণ্ডিতদের ধারণা যে মূলভাষাই বৈদিক সংস্কৃত, সব প্রাকৃতের আদি জননী। তাই প্রাকৃত শব্দগুলিকে বুঝবার জন্য সংস্কৃত মূল সন্ধান করেত হয়। সউন্দলা, সুউমারো, অজ্জউত্ত, লাউত্তে, সংপদং প্রভৃতি শব্দ যে যথাক্রমে শকুন্তলা, সুকুমারঃ আর্যপুত্র, রাজপুত্রঃ সাম্প্রতং প্রভৃতি শব্দের বিকৃতিমাত্র তা স্বীকার করতেই হয়। তাই প্রাকৃত ভাষা সংস্কৃত নিরপেক্ষ নয়।

সংস্কৃত নাটকে নায়ক সংস্কৃতে বলছেন, নায়িকা বলেন মহারাষ্ট্রী, নায়কের বয়স্য এবং নায়িকার সখারা বলেন শৌরসেনী এবং ভৃত্য বলে মাগধী। ভাষাগত এই বিভেদ কথোপকথনকে কিছুমাত্র বিপর্যস্ত করেনা। প্রাকৃত যদি সংস্কৃত-নিরপেক্ষ হত তাহলে একের কথা অন্যজন বুঝতেই পারত না। আসল কথা প্রাচীন আর্য ভাষাই সংস্কৃত, প্রাকৃত আঞ্চলিক ভাষা। তাই সংস্কৃত কক্ষ শব্দটি কচ্ছ, কক্খ এবং কস্ক রূপে বিভিন্ন প্রাকৃতে দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে সাধু বাংলা শব্দ 'খাইব' পশ্চিমবঙ্গে 'খাব', পূর্ববঙ্গে 'খামু', দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে 'খায়াম' উত্তর-পূর্ব বঙ্গে 'খাইতাম'—এই রকম প্রাকৃত রূপ গ্রহণ করেছে। প্রাকৃত ভাষার উচ্চারণবিধি,ব্যাকরণ বৈশিষ্ট্য এবং শব্দসম্ভারের তাৎপর্য বুঝতে হলে সংস্কৃত ভাষার দ্বারস্থ হতে হয়। সুতরাং এই বহুবিচিত্র ভাষাকে সংস্কৃত-নিরপেক্ষ বলা সমীচীন বলে মনে হয় না।

প্রশ্ন ৩। প্রাকৃতকে আঞ্চলিক ভাষা বলিবার কারণ কি তাহা আলোচনা কর। (63, 68)

উদ্বেল তরঙ্গ কাহিনীকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিলেও ঐ সব অ্যাডভেঞ্চারগুলির সঙ্গে মুখ্য পাত্রপাত্রীদের হৃদয়ের গভীরতর সম্বন্ধ অনুভব করা যায় না। লাউসেন বাঘ মারিয়াছে, কুমীর মারিয়াছে, দুর্বৃত্তা রমনীদের দমন করিয়াছে, কানাড়াকে পরাজিত করিয়া বিবাহ করিয়াছে, ইছাইঘোষকে হত্যা করিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়াছে। লাউসেনের বীরত্বপূর্ণ কার্যাবলী বর্ণনায় প্রভূত সুযোগ থাকিলেও মানবিক কামনাবাসনার সহিত সমন্বিত না হওয়ায় উহা বহিরঙ্গ উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাসর্বস্বতা-মাত্র; উচ্চাঙ্গের শিল্পগুণ সেখানে আমরা দেখিতে পাই না।

চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলের তুলনায় মনসামঙ্গলের কবিরা এমন একটা কাহিনী হাতের কাছে পাইয়াছেন যাহার নিজস্ব আকর্ষণী শক্তি অনেক বেশী। লোক-কল্পনার স্তরেই উহা এমন একটা দ্বন্দ্বমূলক এবং সুগঠিত গল্প হইয়া উঠিয়াছিল যে যেমন-তেমনভাবে লেখায় মধ্যে রূপায়িত করিলেও উহার মোটমুটি উপভোগ্যতা বজায় থাকিবে। প্রকৃতপক্ষে ঘটিয়াছেও তাহাই। মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্রের মত উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন কবি মনসামঙ্গলের ধারায় আবির্ভূত হন নাই। বিজয় গুপ্ত কেতকদাস প্রভৃতির ন্যায় মধ্যশক্তিসম্পন্ন কবিরা মনসামঙ্গল কাব্যধারাটিকে উপভোগ্য আকর্ষণের বস্তু করিয়া তুলিয়াছেন—তাহার কারণ কাব্যটির আভ্যন্তর কাহিনীগত সম্ভাবনা। মনসামঙ্গলের মূল কাহিনীটি চাঁদ ও মনসার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করিয়া। মনসার পূজা মর্ত্যে প্রচার করিবার জন্য চাঁদ সদাগরের সমর্থন প্রয়োজন। কবিরা পারস্পরিক অভিশাপ প্রভৃতি নানাবিধ অলৌকিক কারণ নির্দেশের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ইহার পেছনে একটি মূল সামাজিক কারণ বর্তমান। চাঁদসদাগর প্রাচীনতর বাংলাদেশের অভিজাত বণিক শ্রেণীর প্রতিনিধি। লোকসংস্কারে-জাত মনসা-দেবীকে উচ্চমার্গে স্বীকৃতি পাইবার জন্য প্রয়োজন ছিল চাঁদ সদাগরের পূজার। কিন্তু চাঁদ পৌরাণিক দেবতা শিবের ভক্ত। লৌকিক দেবতা মনসার পূজা করিতে সে কিছুতেই রাজী ছিল না। এই মূল দ্বন্দ্বই ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া পরিণতি লাভ করিয়াছে মনসামঙ্গল কাব্যকাহিনীতে। এই দ্বন্দ্বের পশ্চাতে তুর্কিবিজয়ের বহু পূর্ব হইতে আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির যে সংঘাত কাজ করিয়াছিল তাহাই বাস্তব পটভূমি ছিল। ক্রমে অবশ্য উহা স্মৃতিতে পরিণত হয়। কিন্তু তখন দ্বন্দ্বটি গল্পে দানা বাঁধিয়াছে। চাঁদের চরিত্রের দৃঢ় পৌরুষ, কোন অবস্থাতেই—লোভে বা ভয়ে, নমনীয় না হইবার প্রতিজ্ঞা এই দ্বন্দ্বকে একটা বিবর্ণ উল্লেখমাত্রে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া কাব্যের আদ্যন্তে প্রসারিত ব্যাপকতা ও তীব্রতা দান করিয়াছে। অপরপক্ষে মনসাদেবীর চরিত্রটিও হিংস্রতায় ও উদ্দেশ্যচরিতার্থতার একমুখী চেষ্টায় এমনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে যাহাতে সংঘাতটি প্রবলভাবে চলিবার সুযোগ পাইয়াছে।

মনসা ঝালুমালুর বাড়িতে পূজা পাইয়াছে। তাহারা জেলে। রাখালেরা সমারোহের সহিত তাহার পূজা করিয়াছে। কিন্তু চাঁদ সদাগরের নিকট মনসা-পূজার প্রস্তাব যাহারা করিয়াছে তাহারাই অপমানিত হইয়াছে। কিন্তু শুধু অন্ত্যজ শ্রেণী নয়; চাঁদের স্ত্রী সনকাও মনসার প্রতি ভক্তিমতী। অভিজাত

সম্প্রদায়ের মহিলাদের মধ্যেও এই দেবীর প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। চাঁদ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া আপনার আদর্শে দৃঢ় রহিয়াছে।

মনসা আপনার পূজা প্রচারের জন্য কোন কাজ করিতেই পিছু পা হইল না। মনসা চাঁদকে ভয় দেখাইয়া কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করিল। মনসার স্বভাবেই রহিয়াছে ক্রোধের প্রচণ্ডতা। চাঁদ তাহার পূজা করিল না, উপরন্তু কুৎসিত ভাষায় গালাগালি করিতে লাগিল। ইহাতে ক্রুদ্ধ মনসা চাঁদের ক্ষতি করিতে উদ্যত হইল। ক্রোধ এবং ক্ষতি করিবার বাসনা যুগপৎ মনসার কার্যগুলির নিয়ন্ত্রা।

মনসার প্রথম কাজই হইল চাঁদের সম্পত্তি নাশ। চাঁদের একটি বিশাল সুপারী বাগিচা ছিল (মতান্তরে একটি ফুল ও ফলের মূল্যবান বাগান)। মনসাপ্রেরিত সাপের দল সেই বাগানের যাবতীয় গাছ কাটিয়া-কুটিয়া শেষ করিল। কিন্তু চাঁদ এই ঘটনায় কিছুমাত্র কাতর না হইয়া বন্ধু ধন্বন্তরি ওঝা (মতান্তরে শঙ্কর গাড়রী)-কে ডাকিয়া পাঠাইল। ওঝার মন্ত্রে কাটাগাছ বাঁচিয়া উঠিল। চাঁদ মনসাকে লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। তাহার এলাকায় মনসা-পূজা নিষিদ্ধ করিল। কেহ লুকাইয়া মনসা-পূজা করিতেছে সংবাদ পাইলে চাঁদ মনসার ঘট ভাঙিয়া পূজার দ্রব্য ফেলিয়া একাকার কাণ্ড করিতে লাগিল।

মনসা বুঝিল ধন্বন্তরি বাঁচিয়া থাকিতে চাঁদকে দমন করা যাইবে না। অনেক কৌশলে সে ধন্বন্তরিকে হত্যা করিল। ধন্বন্তরির মৃত্যুর পরে মনসা খবর পাইল চাঁদ স্বয়ং মহাজ্ঞান জানেন। মরা বাঁচাইবার ক্ষমতাটি সে মাথায় একটি জটার আকারে ধারণ করিয়া রাখে। মনসা নটীর বেশ ধরিয়া চাঁদকে ভুলাইল এবং তাহার কামবিহ্বলতার সুযোগে মহাজ্ঞানরূপ জটাটি ছিঁড়িয়া লইয়া পলাইল। চাঁদ অনেকখানি শক্তিহীন হইল বটে, কিন্তু মনের বল তাহার একটুও কমিল না।

মনসা চাঁদের মনের মধ্যে বড় রকমের আঘাত দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহা ছাড়া এত চেষ্টায়ও চাঁদকে দমন করা যাইতেছে না দেখিয়া মনসা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া একটি চূড়ান্ত নিষ্ঠুর অপকর্ম করিল। চাঁদ সদাগরের ছয়টি বালকপুত্র ছিল। তাহাদের ভাতে সাপের বিষ মিশাইয়া মনসা তাহাদের হত্যা করিল। চাঁদ সদাগর বেদনার্ত হৃদয়ে পুত্রদের মৃতদেহ জলে ভাসাইয়া দিল। মনসার প্রতি তাহার দ্বেষ ও ঘৃণা তীব্রতর হইয়া উঠিল।

মনসার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না। সে আরও বড় রকমের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তৈয়ারী হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে চাঁদ সদাগর দক্ষিণপাটনে বাণিজ্য করিবার জন্য সাতটি (মতান্তরে চৌদ্দটি) নৌকা সাজাইয়া যাত্রা করিল। যাইবার আগে চাঁদ হঠাৎ আবিষ্কার করিল সনকা গোপনে মনসার পূজা করিতেছে। ক্রুদ্ধ চাঁদ মনসার ঘট পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিল। মনসা রাগে জ্বলিতে লাগিল এবং সদাগর যখন বাণিজ্যসম্পদে প্রভূত লাভবান হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিতেছিল তখন মেঘবৃষ্টির সমাবেশ ঘটাইয়া চাঁদের নৌকাগুলি ডুবাইয়া দিল। চাঁদের বহু কষ্টলব্ধ সব সম্পদ, আত্মীয়বান্ধব জলে ডুবিয়া প্রাণ

হারাইল। সদাগর একা ভাসিতে লাগিল। আকাশ হইতে মনসা বলিল, চাঁদ তাহার পূজা করিলে মৃত পুত্রবান্ধবসহ ধনসম্পদ সব ফিরিয়া পাইবে। চাঁদ এই প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিল। অতি কষ্টে সে প্রাণে বাঁচিল। মনসার ছলনায় বিদেশে নানারূপ কষ্ট ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া সদাগর ঘরে ফিরিয়া আসিল।

এইবার মনসা চূড়ান্ত আঘাত হানিয়া নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা করিল। চাঁদ বিদেশে থাকাকালে লক্ষীন্দর নামে তাহার একটি পুত্র জন্মিয়াছিল। দেশে ফিরিয়া চাঁদ পুত্রের বিবাহ দিল। বধূ বেহুলা নানাগুণে গুণবতী হইলেও বিবাহের রাত্রে স্বামী হারাইল। লোহার বাসর তৈয়ারি করাইয়া চাঁদ পুত্রকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু মনসার সাপ কালনাগিনী তাহাকে দংশন করিয়া গেল।

বৃদ্ধ বয়সে একমাত্র পুত্র লক্ষীন্দরের মৃত্যু চাঁদের বুকে শেলের মত বিঁধিল। চাঁদ শোকে যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষতচিত্তে মৃতপুত্রকে কলাগাছের ভেলায় ভাসাইয়া দিল। বেহুলাও মৃত স্বামীর সহিত চলিল।

দ্বন্দ্বমূলক এই কাহিনীটি অতঃপর কতকটা অলৌকিক রূপকথার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। বেহুলা স্বর্গে গিয়া নানাভাবে দেবতাদের খুশি করিয়াছে এবং মনসার দয়ায় স্বামী ও আত্মীয়বান্ধবদের প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াছে; সাত ডিঙ্গাসহ ধনসম্পদ উদ্ধার করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। বেহুলার অনুরোধে চাঁদের কঠোর হৃদয় বিগলিত হইয়াছে এবং সে মনসাপূজা করিয়াছে।

কাহিনীর শেষটুকু পূর্বপ্রসঙ্গের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হইয়াছে এরূপ বলা চলে না। চাঁদ-মনসার সংঘাতের সূত্রে বিকশিত কাহিনীর এ-জাতীয় ভক্তিদ্রব পরিণতি আধুনিক শিল্পবিচারের মানদণ্ডে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কিন্তু মধ্যযুগের কাব্যাদর্শ এবং ধর্মীয় ভাবনার গুরুতর সম্বন্ধের কথা মনে রাখিতে হইবে। সেই সীমাবদ্ধতার মধ্যে বিচার করিয়াই ইহার কাহিনী-রচনার এইরূপ পরিণতি স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

মনসামঙ্গলের কাহিনীতে প্রতিদিনের বাঙালী সংসারের খুঁটিনাটি তুচ্ছ ছবি যেমন প্রাণের স্পর্শে ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছে, সেইরূপ বিশাল পৌরুষের মহিমা প্রকাশের স্থান রহিয়াছে। দেবতার সহিত স্পর্ধা করিয়াছে মানুষ—শত সহস্র আঘাতেও সে টলে নাই—তাহার দৃঢ়তার ও ট্যাজেডির পাশেই হৃদয় ব্যাকুলতার গৌরব, স্বপ্নকল্পনামূলক বেহুলার প্রসঙ্গ, মৃত্যুর হাত হইতে জীবনকে জয় করিবার কথা স্থান পাইয়াছে। ট্যাজেডি মধ্যযুগীয় আদর্শে ভক্তিমূলক কমেডিতে রূপান্তরিত হইয়াছে।

এ-জাতীয় কাহিনী-সম্ভাবনা মনসামঙ্গলের ন্যায় অন্য কোন মঙ্গলকাব্যেই মেলে না।

প্রশ্ন ২। সমাজবিবর্তনের ইতিহাস ও কাব্যোৎকর্ষের দিক দিয়া বাইশ কবির মনসামঙ্গলের মূল্য নির্ণয় কর। [ক. বি., ১৯৬৬]

উত্তর: মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মনসামঙ্গলের ধারাটি একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রবাহরূপে আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কানা হরিদত্তের কাব্য রচনার কাল নিশ্চয়ই

পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে—কিন্তু ঠিক কোন শতকে বলা কঠিন। বিশেষতঃ হরিদত্তের কাব্যের ক্ষুদ্র একটি অংশই মাত্র পাওয়া গিয়াছে। বিজয়গুপ্ত-নারায়ণ দেব এবং বিপ্রদাস পিপলাইকে মোটামুটিভাবে পঞ্চদশ শতাব্দীর অর্থাৎ প্রাক্-চৈতন্যপর্যায়ের কবি বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। তাঁহাদের নামে প্রচলিত পুঁথিগুলির যথার্থরূপ নির্ণয় করা যায় নাই বটে, কিন্তু যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাদ্বারা কালোচিত বৈশিষ্ট্যের কিছু ধারণা করা যাইতে পারে। চৈতন্যপ্রভাবকালের কবিদের মধ্যে দ্বিজ বংশীদাস এবং কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। চৈতন্যপ্রভাব অবসানের পরে বাংলাদেশের সমাজ-মানস তথা সাহিত্যে যে সর্বব্যাপী অবক্ষয় সূচিত হইয়াছিল তাহার নিদর্শন হিসাবে জগজ্জীবন ঘোষাল, জীবন মৈত্র প্রভৃতির নামোল্লেখ করা চলে। এই তিন পর্বে বিস্তৃত মনসামঙ্গলকাব্যের একটি প্রতিনিধিত্বপূর্ণ সঙ্কলন এই বাইশ কবির মনসামঙ্গল। বাইশ কবির মনসামঙ্গলের সাহায্যে কাব্যকাহিনী গঠনের প্রথম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া যুগে যুগে উহার ক্রমবিকাশ ও পরিণতির পশ্চাতে যে সমাজবিবর্তনের ইতিহাস রহিয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

মনসামঙ্গলের কাহিনীটি দানা বাঁধিয়া উঠিতে তুর্কিবিজয়ের পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া চৈতন্য-আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত কয়েক শতাব্দী কাল অতিবাহিত হয়। প্রথম দিকে লোককাহিনীর আকারে বীজাকারে ইহার রূপটি প্রকাশ পাইতে থাকে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে একাধিক কবির রচনায় পূর্ণাঙ্গ কাব্যের রূপ ধরিয়া মনসামঙ্গল দেখা দেয়।

মনসামঙ্গল কাব্যে বহির্বাণিজ্যের একটি প্রসঙ্গ আছে। গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের নেতা চাঁদ সদাগরের চরিত্র কাব্যটির মূলে রহিয়াছে। পরবর্তীকালে চণ্ডীমঙ্গলকাব্যেও ধনপতি সদাগর এবং তাহার সামুদ্রিক বাণিজ্যের কথা আছে। কিন্তু চাঁদের চরিত্রের দৃঢ়তা, সর্ববিধ বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম করিবার দুঃসাহস মধ্যযুগের বাঙালী চরিত্রের কমনীয়তা ও গতানুগতিকতার মধ্যে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের ব্যাপার। এ-জাতীয় মূর্তির পশ্চাতে দূর সমুদ্রে যাত্রী বণিকবৃত্তির স্বাভাবিক পটভূমি আছে এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। দেখা যাইতেছে বণিক চাঁদ শুধু চরিত্রদৃঢ়তা ও পৌরুষের গুণেই বিশিষ্ট নয়, ধনসম্পদের প্রাচুর্যে যেমন তাহার সামাজিক মর্যাদা অত্যুচ্চ সেইরূপ তাহার প্রভাবও খুবই বেশী—প্রায় রাজার ন্যায় তাহার সম্মান। কাহিনীর মধ্যে আর একটি ইঙ্গিত বেশ স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। চাঁদ পূজা না করিলে সমাজে মনসার পূজা প্রচলিত হইবে না। অর্থাৎ বণিক-শ্রেণীর সামাজিক প্রতিপত্তি ছিল অতি উচ্চে। অভিজাতবর্গের মধ্যে ইহারা যখন প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল বাঙালীর ইতিহাসের সেই অতিপ্রাচীনকালেই মনসামঙ্গল কাহিনীর ভিত্তি রচিত হয়। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গলেই ব্রাহ্মণ্য, স্মার্ত ও পৌরাণিক সংস্কার ও বিশ্বাসের সঙ্গে অব্রাহ্মণ্য, লৌকিক, অপৌরাণিক ধর্মচেতনার দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্বের সুপ্ত ইতিহাস আছে। ঝালুমালু রাখাল প্রভৃতির দ্বারা পূজিত মনসা বেহুলা-সনকার ন্যায় অভিজাত সমাজের নারীদের কাছে স্বীকৃতিলাভ করিলেও, উচ্চসমাজ এখনও পাদানের

স্থান নির্ধারিত হয় নাই। লোকদেবতার আর্যসংস্কারে আসন লাভের এই চেষ্টা বাংলাদেশের সমাজে তুর্কিবিজয়ের বহু:পূর্ব হইতেই আরম্ভ হইয়া যায়। চাঁদ-মনসার বিবাদের মধ্যে তাহারও ইতিহাস লুকানো আছে। দেবখণ্ডের কাহিনীতেও সেই ধর্ম ও সংস্কৃতিদ্বন্দ্বের পরিচয় পাই। (অযোনীসম্ভূতা মনসা শিবকন্যা পরিচয়ে দেবভূমিতে স্থানলাভের চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাঁতালি পর্বতে তাহাকে পৃথক গৃহনির্মাণ করিয়া বাস করিতে হইল। অনেক মনসামঙ্গলেই বলা হইয়াছে—চণ্ডীর বিদ্বেষই ইহার কারণ। কিন্তু সপত্নী-কন্যার প্রতি চণ্ডীর এই আচরণের পারিবারিক সূত্রের পেছনে রহিয়াছে পূর্বোক্ত গুরুতর সামাজিক কারণ। পৌরাণিক দেবমণ্ডলীতে মনসার স্থানলাভের চেষ্টা এবং তৎসংশ্লিষ্ট সামাজিক সংঘর্ষ ইহার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে।)

বণিক সমাজের প্রতিনিধিরূপে চাঁদের মর্যাদা বহির্বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যাইবার ফলেই কমিতে থাকে। বল্লাল সেন কর্তৃক গন্ধবণিকদের কুলপ্রতিষ্ঠা হরণও তাহারই প্রতিক্রিয়া। মনসামঙ্গলকাব্যগুলি যখন পূর্ণাঙ্গ কাব্যরূপে গড়িয়া ওঠে তখন বহির্বাণিজ্য এবং বণিকদের সামাজিক গুরুত্ব স্মৃতিতে পর্যবসিত হইয়াছে। সেই স্মৃতিচয়নই দেখিতেই পাই মনসামঙ্গল কাহিনীতে।

মনসামঙ্গলের নানা প্রসঙ্গে সামাজিক আচার-আচরণের বিবরণ রহিয়াছে। উহাদের ঠিক ইতিহাসসম্মত প্রসঙ্গ বলা চলে না। কারণ চারিশত বৎসর ব্যাপিয়া মোটামুটি একই ধরনের সামাজিক-পারিবারিক রীতিনীতি প্রচলিত ছিল। তবে চৈতন্যপ্রভাবের ফলে বাংলাদেশের সর্বক্ষেত্রে যে ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ঢেউ আসিয়া আঘাত করে মনসামঙ্গলেও তাহার চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। চৈতন্যপ্রভাবিত যুগের কবিদের হাতে মনসা অনেকখানি স্নিগ্ধ ভক্তিরসের আশ্রয় হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিজ বংশীর কাব্যে আমরা বিজয়গুপ্ত-নারায়ণদেবের ন্যায় চাঁদের রূঢ় পৌরুষের বা মনসার ভয়াল হিংস্রতার ছবি পাই। চৈতন্যপ্রবর্তিত প্রেমধর্মের প্রভাবে ভক্তিবাদের প্রাধান্য যেমন স্থাপিত হইয়াছে সেইরূপ পৌরাণিক ও লৌকিক ধর্মের সমন্বয়ও সাধিত হইয়াছে। ফলে প্রাক্-চৈতন্য মনসামঙ্গলের রূপ অনেকখানি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। সে-যুগে মনসামঙ্গল কাব্যের লেখকেরা মনসাদেবীর ভক্ত ছিলেন, মনসাপূজা প্রচারের জন্যই কাব্য লিখিয়াছিলেন। চৈতন্যোত্তর কালের কোনো কোনো কবি কাব্য হিসাবেই মনসামঙ্গল লিখিয়াছেন। চৈতন্যপ্রভাবিত যুগের সাহিত্যের মার্জিতরূপের প্রভাবে কেতকাদাসের রচনা অনেক শিল্পগুণসম্পন্ন হইয়া উঠে।

চৈতন্যপ্রভাব শেষ হইবার পরে বাংলার সমাজেতিহাসে চারিত্রিক অবক্ষয় সূচিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখকদের রচনায় এই কাব্যের পুরাতন তাৎপর্যটি অনেকটা কমিয়া যায়। কিছু রুচিবিগর্হিত গল্পাংশ আসিয়া উপস্থিত হয়।

মনসামঙ্গলকাব্যে সমাজবিবর্তনের ইতিহাসেরই শুধু প্রতিবিম্বন ঘটিয়াছে এমন নয়। কাহিনীটির যে রূপ দাঁড়াইয়াছে তাহার শিল্পোৎকর্ষও অবশ্য প্রশংসার যোগ্য। মনসা-মঙ্গলকাব্য-কাহিনীর সঙ্গে মূল চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্যও বিজড়িত হইয়া আছে। চাঁদ

সদাগরের ব্যক্তিত্বের মধ্যে রহিয়াছে দৃঢ় পৌরুষের একটি ছবি। সে কিছুতেই মনসার পূজা করিবে না। আবার মনসারও তাহাকে দিয়া পূজা না করাইয়া উপায় নাই, কারণ তাহা হইলে মর্তে মনসাপূজার প্রচার হইবে না। মনসা ছলে-বলে চাঁদের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। তাহার বাণিজ্যসম্ভারপূর্ণ নৌকাগুলি ডুবাইয়া দিল। লক্ষীন্দরসহ ছয় পুত্রের প্রাণহানি ঘটাইল। চাঁদকে কিন্তু কিছুতেই বশীভূত করা গেল না। চাঁদ আপনার প্রতিজ্ঞায় অবিচল রহিল। চাঁদের দৃঢ় ব্যক্তিত্ব এবং মনসার হিংস্রস্বভাবের জন্য দুপক্ষের দ্বন্দ্বটি বেশ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। এই কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে কাব্যকাহিনীটিকে সুবলম্বিত সুষ্ঠু গঠন দিবার সুযোগ পাইয়াছেন মনসামঙ্গলের কবিরা।

এই দ্বন্দ্বে একটি নূতন মাত্রা যুক্ত হইয়াছে বেহুলার চরিত্রবৈশিষ্ট্যের দ্বারা। বেহুলার চরিত্রেও একদিকে রহিয়াছে ব্যক্তিত্বের বড় শক্তি, তীব্র আত্মবিশ্বাস ও কর্মতৎপরতা। ঐ-সব বৃত্তিগুলির সঙ্গে সহজেই মিলিয়াছিল গভীর ভক্তির সুর। ভক্তিমতী বেহুলা নির্জনে বসিয়া দেবীপূজায় কালক্ষেপ করে নাই, স্বর্গে গিয়া দেবতাদের নিকট হইতে স্বামী-স্বজনের প্রাণ এবং শ্বশুরের সম্পত্তি সে জয় করিয়া আনিয়াছে। তখন দ্বন্দ্ব একটি নূতন পথ ধরিয়াছে। চাঁদ নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করিবে, না, বেহুলার সাধনালব্ধ ফলের মূল্য দিবে—এই দ্বন্দ্বকে মনসামঙ্গলের কবিরা যেভাবে মিলাইয়া দিয়াছেন তাহাতে শিল্পসৌন্দর্য অপেক্ষা ধর্মীয় অভিপ্রায়ই বড হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সমাপ্তি-সমাধানের কথা বাদ দিলে চাঁদ-মনসার দ্বন্দ্ব এবং তাহারই পরিণতিস্বরূপ চাঁদ-বেহুলার দ্বন্দ্বের যে চিত্র মনসামঙ্গলকারেরা আঁকিয়াছেন তাহার মধ্যে উচ্চাঙ্গের শিল্পগুণ রহিয়াছে।

মনসামঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে চরিত্রগত গুণপনাও বড কম নাই। বিজয়গুপ্ত বিশেষ করিয়া মনসাচরিত্রটির বিশ্লেষণ ও রূপায়নে মনস্তত্ত্ববোধের পরিচয় দিয়াছেন। মনসার হিংস্রকুটিল রূপটি তাঁহার ন্যায় আর কোন কবিই এতটা সার্থকভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। বেহুলার সাহসিক চরিত্রের সতীত্বমহিমা অধিকাংশ কবির রচনায়ই সাফল্যের সঙ্গে প্রকটিত। কেতকাদাসের মত কোন কোন কবি উহার সহিত ব্যক্তিগত মহিমাবোধের একটি অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করিয়াছেন। সনকার চরিত্রে বাঙালীমাতার একটি চিরকালীন রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে অধিকাংশ মনসামঙ্গল-কারের রচনায়। উহার মধ্যে বৈচিত্র্য বা অভিনবত্ব বিশেষ না থাকিলেও আছে জীবন্ত অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যের স্বাভাবিক কমনীয় রূপ। চাঁদ সদাগরের বীর্যদৃঢ় চরিত্রসৃষ্টিতে বিশেষভাবে দক্ষতা দেখাইয়াছেন বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণ দেব। পরবর্তী কবিদের রচনায় অবশ্য এই চরিত্রটির শিল্পগৌরব বিশেষ রক্ষিত হয় নাই।

মনসামঙ্গলের কবিরা এক-একজন এক-একদিক দিয়া বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়াছেন। বিজয়গুপ্ত কৌতুকরস সৃষ্টিতে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। তাঁহার শিবচরিত্র, হাসান-হোসেন পালা এবং বাণিজ্যপালা উহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। নারায়ণদেব বিশেষভাবে সার্থক করুণরসের বর্ণনায়। লক্ষীন্দরের মৃত্যুর পরবর্তী অংশের চিত্রাঙ্কন শিল্পগুণের দিক দিয়া

খুবই উন্নত। দ্বিজ বংশীদাস কমনীয় ভক্তিরস সৃষ্টিতে সফল। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের গুণপনা প্রকাশ পাইয়াছে সুমার্জিত ভাষা ব্যবহারে।

মনসামঙ্গলের কোন কবিই মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্রের ন্যায় অত্যুচ্চ প্রতিভার অধিকারী নন। কিন্তু এই কাব্যকাহিনী ও চরিত্রগুলির মধ্যে যে সম্ভাবনা সুপ্ত হইয়া আছে তাহাকে নানা কবি নানা দিক দিয়া ব্যবহার করিয়াছেন শিল্পসাফল্যের সঙ্গে।

প্রশ্ন ৫। "বাইশ কবির মনসামঙ্গল" একাধিক কবির রচনা একত্র সংকলিত হওয়ায় কাব্যের দিক দিয়া কিরূপ লাভ বা লোকসান হইয়াছে দেখাও। প্রাচীনকালে এইরূপ সংকলন প্রচলিত হইয়াছিল কেন?

[ক. বি., ১৯৫৮]

অথবা, বিভিন্ন কবির রচনা অবলম্বনে "বাইশা"-জাতীয় গ্রন্থ সংকলনের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা বিচার কর। [ক. বি., ১৯৬১]

উত্তর: "বাইশ কবির মনসামঙ্গল" বা "বাইশা" মধ্যযুগে প্রচলিত মনসামঙ্গলের সঙ্কলন গ্রন্থের নাম। প্রধানতঃ পূর্ববঙ্গে এই শ্রেণীর সঙ্কলনগ্রন্থ প্রস্তুত করা হইত। মনসার "ভাসান" বা "রয়ানী" গানের মূল গায়েনেরা এই জাতীয় সংকলন প্রস্তুত করিতেন। কোন অঞ্চলে জনপ্রিয় বা পরিচিত মনসামঙ্গলগুলির অংশবিশেষ একত্র করিয়া কাহিনীটি আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত বলা হইত। তাঁহাদের সঙ্কলন ও বিন্যাসের পেছনে কোন জাতীয় মনোভাব কাজ করিয়াছে বলা কঠিন, অন্তত এইটুকু বলা যায় যে শিল্পবোধের কোনরূপ ভূমিকা সেখানে থাকিত না। কথাটির সোজা অর্থের সহিত তাৎপর্যের কোন সঙ্গতি নাই। বাইশ কবি বলিতে কোনকালে ঠিক বাইশজন কবির রচনাকেই বোঝান হইত কিনা ঠিক করিয়া বলা যায় না। তবে শেষ পর্যন্ত "বাইশ কবি" কথাটি "অনেক কবি" অর্থেই ব্যবহৃত হইতে থাকে।

আলোচ্য সঙ্কলনটি মধ্যযুগের বাইশার ঢঙে সঙ্কলিত। সম্পাদক মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য "নিবেদন" অংশে লিখিয়াছেন, "মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মনসামঙ্গলের পদসঙ্কলনকে 'বাইশা' বা 'বাইশ কবির মনসামঙ্গল' বলিত; বর্তমান সঙ্কলনখানিও প্রধানতঃ এই আদর্শেই সঙ্কলিত হইয়াছে বলিয়া ইহাও 'বাইশ কবির মনসামঙ্গল' বা 'বাইশা' বলিয়া উল্লেখ করা গেল। তবে ইহার সঙ্গে মধ্যযুগের বাইশাগুলির একটু পার্থক্য লক্ষিত হইবে। মধ্যযুগের বাইশাগুলি আঞ্চলিক ভিত্তিতে সঙ্কলিত হইত, সমগ্র বাংলাদেশের ভিত্তিতে সঙ্কলিত হইত না—বর্তমান সংগ্রহখানি সমগ্র বাংলাদেশের ভিত্তিতে সঙ্কলিত হইয়াছে।"

আলোচ্য সংগ্রহ গ্রন্থটিতে সম্পাদক নয়জন কবির রচনাংশ গ্রহণ করিয়াছেন—হরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব, বিপ্রদাস, দ্বিজ বংশীদাস, কেতকদাস ক্ষেমানন্দ, ষষ্ঠীবর, বিষ্ণুপাল, জীবন মৈত্র। সম্পাদক মহাশয় নিজস্ব পরিণত শিল্পবোধ ও কাহিনীগত প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অংশগুলি নির্বাচিত করিয়াছেন। বিজয়গুপ্ত হইতে

তিরানব্বুই পৃষ্ঠা, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের পঞ্চাশ পৃষ্ঠা, নারায়ণদেবের পঁয়ত্রিশ, দ্বিজ বংশীর আঠাশ এবং ষষ্ঠীবর ও জীবন মৈত্রের কুড়ি পৃষ্ঠা করিয়া। অপরাপর কবিদের রচনা হইতে অল্পই সঙ্কলিত হইয়াছে। শিল্পগত প্রশ্নে নানাবিধ মতভেদ থাকা সম্ভব। তবুও একথা স্বীকার করিতে হইবে সম্পাদক যে ভাবে সঙ্কলন করিয়াছেন তাহাতে মনসামঙ্গলের একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিত্বমূলক রূপ পাওয়া গিয়াছে।

প্রাচীনতম মনসামঙ্গল রচয়িতা হরিদত্তের মনসা-বন্দনা দিয়া কাব্যারম্ভ যথার্থ তাৎপর্যপূর্ণ। সম্পাদক প্রচলিত মঙ্গলকাব্যের বহুদেব-বন্দনামূলক দীর্ঘ ও গতানুগতিক অংশ বাদ দিয়াছেন। উহা কাহিনীর কাব্যগুণের দিক দিয়া অবান্তর এবং আধুনিক পাঠকসমাজের রুচিরও পরিপন্থী। হরিদত্ত-প্রণীত দেবীর সর্পসজ্জার পরেই বিজয়গুপ্ত কথিত মনসার কাহিনী—জন্ম হইতে সাঁতালীতে নির্বাসন পর্যন্ত। বিজয়গুপ্তের কাব্যেই এই কাহিনীটি পূর্ণরূপে প্রকটিত—মনসার চরিত্ররূপও উহার মধ্যে উদ্ঘাটিত। অন্য কোন কবির রচনায় এই অংশটি নাই বলিলেই হয়। সম্পাদক সঙ্গতভাবেই বিজয়গুপ্ত হইতে এই অংশ সংগ্রহ করিয়াছেন। বিজয়গুপ্ত হইতে ধন্বন্তরী ওঝা এবং চাঁদের ছয়পুত্র বধের কাহিনীও গ্রহণ করা হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য যে অন্য কোন মনসা-মঙ্গলে এই কাহিনী দুইটি এত বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয় নাই। কাহিনীর গৌরবার্থে এবং উপস্থাপন-নৈপুণ্যের কথা স্মরণ রাখিয়াই সম্পাদক এই সংগ্রহকার্য করিয়াছেন। নারায়ণদেবের করুণরস বর্ণনার নৈপুণ্য বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে কাব্যের সমাপ্তি অংশে। চাঁদ সদাগরের দৃঢ়পৌরুষ এবং বেহুলার অনুরোধে মনসাপূজা করিতে গিয়া আভ্যন্তর অবক্ষয় তাহার মনসাপূজা করার মধ্যে ভালভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। নারায়ণদেব হইতে সঙ্কলিত অংশে কাব্যটি শেষ করিয়াছেন সম্পাদক। দ্বিজ বংশীদাস' হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে চাঁদের পূর্ববিবরণ। ইহার কারণ বংশীদাসের কাব্যেই ঐ প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে, অন্যত্র নহে। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের রচনা হইতে ভাসান অংশ সঙ্কলনের কারণ হইল কবি এই অংশেই বেহুলার তীক্ষ্ণ আত্মসম্মান-বোধ ও ব্যক্তিত্বের সর্বাপেক্ষা সার্থক ছবি আঁকিয়াছেন। অপরাপর কবিদের রচনা হইতে সঙ্কলিত অংশগুলি অনেকটা কাহিনীর ক্রমবিকাশের ফাঁকগুলি পূর্ণ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। বর্তমান "বাইশার" সংগ্রহ ও বিন্যাসপ্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য,—"তিনি (অর্থাৎ সম্পাদক) কালানুক্রমিকভাবে বিভিন্ন মনসামঙ্গল রচয়িতার কাব্য হইতে কাব্যগুণসমৃদ্ধ ও ঐতিহাসিক তাৎপর্যযুক্ত অংশগুলি উদ্ধার করিয়া ধারাবাহিকতার সূত্রে গ্রথন করিয়াছেন। অধ্যায়গুলি এমনভাবে সাজান হইয়াছে যে, আখ্যায়িকার সমগ্রতা ও নাটকীয় রস কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই—সব কয়টি উদ্ধৃতি মিলিয়া একটি পরিপূর্ণ মঙ্গলকাব্যে পরিণত হইয়াছে। অথচ প্রত্যেকটি উদ্ধৃতিতে উহার রচয়িতার বৈশিষ্ট্যটুকু যথাসম্ভব প্রতিফলিত হইয়াছে।"

মনসামঙ্গল বা অন্য যে কোন মঙ্গলকাব্যের পক্ষে কাহিনীর ক্রম বজায় রাখিয়া এই জাতীয় সঙ্কলন রচনা করা সম্ভব। কারণ—

মঙ্গলকাব্যগুলিতে কাহিনীর ক্ষেত্রে গতানুগতিকতা অত্যন্ত প্রকট। মনসামঙ্গলের কবিরা পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মূলতঃ চাঁদ-মনসার বিবাদ-সংক্রান্ত একটি বিশেষ গল্পই বলিয়াছেন। মনসা কর্তৃক চাঁদের বন্ধু ধন্বন্তরী (বা শঙ্কর) ওঝা বধ, চাঁদের ছয়পুত্র বধ, বাণিজ্যতরী ডুবান; অনিরুদ্ধ-উষার লক্ষীন্দর-বেহুলারূপে জন্মগ্রহণ, বাসরে লক্ষীন্দরের মৃত্যু, বেহুলার মৃতদেহ লইয়া স্বর্গে গমন, সকলের প্রাণলাভ, চাঁদের মনসাপূজা। এই এক কাহিনী সব কবিই বলিয়াছেন। উপপ্রসঙ্গের মধ্যেও হাসান-হোসেন প্রসঙ্গ অনেকের কাব্যেই স্থান পাইয়াছে। ফলে নানা কবির শ্রেষ্ঠ অংশ-সমন্বয়ে সমগ্র কাব্যগ্রন্থন খুবই সম্ভব। উহাতে গল্পে জোর করিয়া জোড়াতালি দিবার প্রয়োজন হয় না। আর নানা কবির স্বল্প বৈশিষ্ট্য তথা স্বাতন্ত্র্য বুঝিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কাব্যও পাঠ করিতে হয় না।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এইরূপ বাইশা সঙ্কলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—"এই মঙ্গলকাব্যগুলি বিষয়ের দিক দিয়া একই আখ্যানের পুনরাবৃত্তি—বিভিন্ন কবির কাব্যে কিছু কিছু বর্ণনাভঙ্গির বৈচিত্র্য, কবিত্বশক্তির তারতম্য ও খণ্ড আখ্যানের নূতন সংযোজনের মাধ্যমে কবির স্বাতন্ত্র্যের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সমস্ত কাব্যগুলি একসঙ্গে সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য; পরিমাণের দিক দিয়া এত বিরাট যে একজন সাধারণ রসপিপাসু পাঠকের পক্ষে এগুলি সমস্ত পড়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপারের পর্যায়ভুক্ত বলা চলে। অথচ ক্রমবিবর্তনের ধারাটি অনুসরণ ও বিভিন্ন কবির দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনা-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যটুকু অনুধাবন করিতে হইলে কালানুক্রমিক ও ধারাবাহিক আলোচনা অপরিহার্য। সুতরাং মঙ্গলকাব্যের একখানি সুনির্বাচিত সঙ্কলনগ্রন্থের উপযোগিতা অনস্বীকার্য।"

কিন্তু তবুও একথা অস্বীকার করা যায় না যাহারা উচ্চাঙ্গের গবেষণা করিতে চান তাঁহারা বিশিষ্ট প্রাচীন কবিদের গোটা কাব্যই পড়িবেন। বিজয়গুপ্ত কিভাবে কাব্যের আরম্ভ বা সমাপ্তি ঘটাইলেন তাহা সম্পাদকের নির্বাচিত অংশ পড়িয়া বুঝা যাইবে না। সম্পাদক যত বড় পণ্ডিত ও সমালোচকই হোন না কেন তাঁহার বিচারের সঙ্গে অপরের মতভেদের সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। যাঁহারা নারায়ণ দেব বা জীবন মৈত্র সম্বন্ধে স্বাধীন মতবাদ গড়িয়া তুলিতে চান তাঁহারা উক্ত কবিদের সমগ্র কাব্যই পড়িতে চাহিবেন। এ-জাতীয় সঙ্কলনে বিভিন্ন কবির রচনার শিল্পগুণান্বিত অংশই সঙ্কলিত হইবার কথা। কিন্তু উঁহাদের রচনার দুর্বল অংশগুলির সংবাদ পাঠক জানিতে পারে না, ফলে কোন লেখকেরই যথার্থ পরিচয় জানিবার উপায় থাকে না। কাহিনীকাব্য হইবার ফলে আরও একটি সমস্যা দেখা দিয়াছে। যত অল্প পার্থক্যই থাকুক, কোন আখ্যানকাব্যের লেখকের কৃতিত্ব ঘটনাবিন্যাসের উপরে অনেকখানি নির্ভর করিতে বাধ্য। এ-জাতীয় সঙ্কলনের মধ্য দিয়া:

(১) কোন একজন কবির কাহিনীবিন্যাসের রীতিনীতি—তাঁহার সাফল্য ও দুর্বলতা; কাহিনী বিষয়ে তাঁহার নূতন প্রসঙ্গ উদ্ভাবনের চেষ্টা, পুরাতন প্রসঙ্গে নব সূত্রসংযোজন, পরিণতি ঘটাইবার কৌশল জানিবার উপায় থাকে না।

(২) একজন কবি কোন চরিত্রকে কিভাবে কল্পনা করিয়াছেন তাহার বিকাশ ও পরিণতি ঘটাইতে চাহিয়াছেন, অপর কবিদের সহিত তাঁহার এই রচনা সামান্য হইলেও কোন পার্থক্য আছে কিনা তাহা বুঝা যায় না। অথচ আধুনিককালে কবিকে বাদ দিয়া কাব্যসমালোচনা করা একান্ত অর্থহীন ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। বাইশাকে আশ্রয় করিলে কবিকে ভুলিয়া মনসামঙ্গলকাব্যের পরিচয় লইবার চেষ্টা করিতে হয়। যথার্থ কাব্য-পাঠকের নিকট ইহা একটি বড় ত্রুটি।

আসলে সাধারণ পাঠকদের জন্য মনসামঙ্গলের গল্পরস পুরাতন কবিদের ভাষায় উপস্থিত করার মধ্যেই বাইশার কৃতিত্ব।

প্রশ্ন ৪। মনসামঙ্গলকাব্যের জনপ্রিয়তার কারণ নিরূপণ কর। এই প্রসঙ্গে ইহার চরিত্রগুলির মধ্য দিয়া সাধারণ মানবিক বৃত্তি কিরূপ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে দেখাও। [ক বি, ১৯৫৯]

অথবা, **মনসামঙ্গলের নর-নারীর চরিত্রপরিকল্পনার বৈচিত্র্য বিভিন্ন কবির রচনায় কতটা উদাহৃত হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ-সাহায্যে পরিস্ফুট কর।** [ক. বি, ১৯৬২]

অথবা, **মনসামঙ্গলকাব্যে নারীচরিত্রের প্রাধান্য।—এই মন্তব্য কি তোমার সম্পূর্ণ সমীচীন মনে হয়? যুক্তি সহযোগে এ বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত কর।** [ক বি., ১৯৬৯]

উত্তর: [প্রথম প্রশ্নটির প্রথমাংশে মনসামঙ্গল কাব্যের জনপ্রিয়তার কারণ নিরূপণ করিতে বলা হইয়াছে। দুইটি কারণে কাব্যটি জনপ্রিয়—(ক) কাহিনীর আকর্ষণে (খ) প্রধান চরিত্রগুলির মাহাত্ম্যে। কাহিনীর আকর্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে ১ নং প্রশ্নোত্তরে। এখানে প্রধান চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ করা হইল। প্রথম প্রশ্নটির উত্তর করিতে হইলে ১নং ও ৪ নং দুইটি প্রশ্নোত্তর সংক্ষিপ্তভাবে দিতে হইবে।

অন্য দুইটির প্রশ্নে শুধু চরিত্র আলোচনা করিতে বলা হইয়াছে।]

মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনী-অংশের আকর্ষণ তো আছেই, কিন্তু সেই কাহিনীকে মানবীয় করিয়া তুলিয়াছে কয়েকটি নরনারীর চরিত্র। চরিত্রের মধ্যে যথার্থ গভীরতা ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য না থাকিলে তাহাদের কাহিনী বাহিরের চমক আমদানী করিতে পারে কিন্তু যথার্থ শিল্পগুণান্বিত হইয়া উঠিতে পারে না।

বাংলা ধর্মমঙ্গলকাব্যে প্রধান পুরুষ লাউসেন বীর হইলেও ব্যক্তিত্বহীন। রমণী চরিত্রগুলিতেও বীররসের প্রবলতায় অন্যান্য মানবিক গুণ ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে কোন বড় বীর বা মহিমাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের রূপ নাই। বাংলাদেশের অভিজাত ও অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষের বাস্তব জীবনের চিত্র আঁকিতে গিয়া কয়েকটি সাধারণ ঘরোয়া মানুষের টাইপ আঁকিবার সুযোগ পাইয়াছেন কবিরা। মুকুন্দরাম সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া কালকেতু, ফুল্লরা, ভাঁড়ুদত্ত, মুরারি ও তাহার স্ত্রী, ধনপতি,

সাহনা, খুল্লনা, দুর্বলা প্রভৃতি অনেকগুলি বিচিত্রস্বভাব মানুষের পরিচয় দিয়াছেন। ইহারা কেহই চরিত্রহিসাবে বড় নয়, জটিল নয়; কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র স্বভাব। সীমাবদ্ধ অর্থে "Here is Gods plenty"।

কিন্তু মনসামঙ্গল কাব্যে প্রধান চরিত্র তিনটি—চাঁদ-বেহুলা-সনকা। সব মনসামঙ্গল কাব্যেই এই তিনটি চরিত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্ররূপে প্রকাশিত। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলকাব্যে আমরা আরও কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্র পাই—মনসা-শিব-চণ্ডী। বিজয়গুপ্ত বাদে অন্য মনসামঙ্গলে আমরা মাত্র তিনটি প্রধান চরিত্র পাই, লক্ষীন্দরের চরিত্রটি নামেই আছে। 'উহার ব্যক্তিত্ব বা স্বভাবধর্ম কিছুমাত্র বিকশিত হইয়া উঠে নাই। লক্ষীন্দরের অস্পষ্ট চরিত্ররূপের পটভূমিতে বেহুলার ব্যক্তিত্বপূর্ণ কর্মতৎপরতা যেন আরও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

বেহুলা-চরিত্রের কর্মতৎপরতা ও ঔজ্জ্বল্যের জন্য এবং সনকা চরিত্রের প্রতিফলিত সর্বংসহা বাঙালী মাতার রূপের জন্য কেহ কেহ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে মনসামঙ্গল কাব্যের নারীচরিত্রগুলিই পুরুষচরিত্রের তুলনায় প্রধান। কিন্তু এই মতবাদের সত্যতা উপলব্ধি করিবার আগে চরিত্রগুলির যথাযোগ্য বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

চাঁদসদাগর: মনসামঙ্গলকাব্যের প্রধান চরিত্র চাঁদ সদাগরের। চাঁদ-চরিত্রটি সবচেয়ে ভাল ফুটিয়াছে বিজয়গুপ্ত-নারায়ণদেবের কাব্যে। কেতকাদাসের চাঁদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বলিষ্ঠতা লক্ষ্য করা যায় না। চরিত্রটির একটি পূর্ণচিত্রও যেন সেখানে প্রকাশ পায় নাই। চাঁদ-চরিত্রটির ব্যাখ্যান প্রথমোক্ত দুইজন কবির রচনার অনুসরণেই করা হইতেছে।

চাঁদ বণিক সম্প্রদায়ের নেতা। বিত্তবান গৃহস্থ। শিবের উপাসক। সমাজে তাহার প্রতিপত্তি এত বেশী যে সে যদি মনসার পূজা না করে তাহার পূজা প্রচলিত হইবে না। চাঁদ কিন্তু কিছুতেই মনসার পূজা করিতে রাজী নয়। মনসার সহিত এই লইয়া চাঁদের বিবাদ বাঁধিয়া উঠিল। বিবাদের আরম্ভ মনসার দিক হইতে। মনসা চাঁদকে ভয় দেখাইয়া বশীভূত করিতে চাহিল। কালুমালু-রাখাল প্রভৃতি এমন কি হাসান-হোসেনও মনসার শক্তির কাছে মাথা নত করিয়াছে। সেই একই রীতিতে চাঁদকেও শেষ পর্যন্ত দমন করা যাইবে মনসার এই ধারণা ছিল। মনসা প্রথমে চাঁদের বিশাল "গুয়াবাড়ী" বিনষ্ট করিল। চাঁদের বন্ধু ধন্বন্তরী ওঝাকে মারিল, যাহাতে ধন্বন্তরীর সাহায্যে চাঁদ মনসার আক্রমণকে প্রতিহত করিতে না পারে। এমন কি চাঁদের নিজস্ব যে মন্ত্রবিদ্যা ছিল, ছলনা করিয়া মনসা তাহাও হরণ করিল। লক্ষ্য করিলে দেখা যায় মনসাই আক্রমণকারী—চাঁদ আহত ও পীড়িত। প্রত্যাঘাত করিবার পর্যাপ্ত শক্তি তাঁহার ছিল না। বাহিরের শক্তির দিক হইতে মনসা যে অনেক বলশালী ছিল তাহাতে সন্দেহ হয় না। এইভাবে দেখিলে ইহা অত্যন্ত অসম যুদ্ধ। আপাতদৃষ্টিতে চাঁদ শুধুই "sufferer"। কেউ কেউ মনে করেন চাঁদের প্রত্যাঘাত দিবার ক্ষমতা না থাকায় কাহিনী জমে নাই। কথাটি মানিয়া লওয়া চলে না। চাঁদ পশুশক্তির বিরুদ্ধে

আত্মিক শক্তি লইয়া সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছে। কোন ক্ষতি বা ভীতির কাছে সে মাথা নত করিবে না। দেবতার পূজা ভক্তির ব্যাপার। মহাদেব ভয় দেখাইয়া তাহার পুজা আদায় করেন নাই।

চাঁদের এই আত্মশক্তি ও পৌরুষের দৃঢ়তার মধ্যে মাঝে মাঝে গ্রাম্যতা মিশিয়া গিয়াছে। বাংলাদেশের মধ্যযুগের যে সব কবি মনসামঙ্গলকাব্য লিখিয়াছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই গ্রামজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে চরিত্রাদির মৌল উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। গ্রামের জনসমাজের রুচি অনুযায়ী তাঁহারা কাব্য লিখিয়াছেন; এবং তাঁহাদের নিজেদের রুচিও নাগর বৈদগ্ধ্যে' মার্জিত হইবার সুযোগ পায় নাই। ফলে তাঁহাদের চাঁদ আত্মিক শক্তির দৃঢ়তা সত্ত্বেও গ্রাম্যতা মুক্ত নয়। চাঁদ মনসার প্রবলশক্তির বিরুদ্ধে শক্তি লইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই—চিত্ত লইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সে মনসাকে "লঘুজাতি কানী", "চেঙমুড়ি কানী" "ঢেমনা ভাতারী" বলিয়া গালি দিয়াছে। মনসার ক্ষমতা সম্বন্ধে ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছে—সে তাহার নিজের কানা চক্ষু ঔষধ দিয়া ভাল করে না কেন? চাঁদের এই সব কথার মধ্যে অসহায়ত্বের জ্বালা প্রকাশ পাইয়াছে। মনসার ধ্বংসবৃত্তি যেন অনায়ত্ত দৈবীশক্তির আক্রমণ। চাঁদের ভর্ৎসনা সেই নিয়তির অন্ধকার দুরত্বের প্রতি নিক্ষিপ্ত। এই রূপ একটি তাৎপর্য চাঁদের কথার মধ্যে থাকা সম্ভব। কিন্তু উহা যে ভাবে কাব্যমধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে গ্রাম্যরমণীর কলহের সুর বাজিয়াছে। চাঁদের চরিত্রমাহাত্ম্য উহার ফলে যে অনেকটা অবনমিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

চাঁদের উপরে খুব বড় রকমের আঘাত আসিল ছয় পুত্রের হত্যাসাধনে। সদাগর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। মনসার নাগাল পাইল না। কিন্তু কাহাকেও মনসাপূজা করিতে দেখিলে তাহাকে আক্রমণ না করিয়া ছাড়িত না। ইহার পরে চাঁদ সদাগর বাণিজ্য যাত্রা করিল। বাণিজ্যকর্মের মধ্য দিয়া চাঁদের একটি বাস্তব দিক প্রকাশ পাইয়াছে। মনসামঙ্গলের কবিরা চাঁদের আদর্শবাদী ব্যক্তিত্বের অতি উচ্চ কল্পনাকে একান্ত বাস্তব জীবনের সহিত সম্বন্ধ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অন্তত দুইটি দিক দিয়া বাস্তবরূপ প্রকট;—চাঁদের বাণিগ্‌বৃত্তি এবং নটী সম্পর্কিত তাহার লুব্ধতা। চাঁদ বাণিজ্য করিতে গিয়া কথায় এবং কাজে চমৎকার চাতুর্যের পরিচয় দিয়াছে। কথার মার প্যাঁচে দক্ষিণ-পাটনের রাজাকে ঠকাইতে সে দ্বিধা করে নাই। নটীবেশিনী মনসা সহজে চাঁদকে বশীভূত করিতে পারিয়াছিল। বাণিজ্যডিঙা হারাইয়া দারিদ্র্যক্লিষ্ট চাঁদ দুটি পয়সা পাইলে নটী বাড়ী যাইবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ করে নাই।

চাঁদের চরিত্রের এই বাস্তবতার ভিত্তিটির উপরে দাঁড়াইয়া আছে তাঁহার অপরাজেয় পৌরুষ ও ব্যক্তিত্ব। চাঁদের বাণিজ্য নৌকাগুলি মনসার চেষ্টায় কালীদহে ডুবিয়া গেল। চাঁদ অকূল দরিয়ায় ভাসিতে লাগিল। ভীতি ও ক্ষতির এই মুহূর্তে মনসা প্রলোভনের মায়া বিস্তার করিল। মনসা ডুবিয়া যাওয়া বাণিজ্যতরীগুলি তাহাকে ফিরিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিল—কিন্তু তাহাকে পরিবর্তে মনসাপূজা করিতে হইবে। চাঁদ সেই চরম সঙ্কটমুহূর্তেও আপন প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত হইল না।

চাঁদের চরিত্রের সমাপ্তিতে দেখা গেল তাহার বৃদ্ধ বয়সের পুত্র লক্ষীন্দরের বিবাহ রাত্রে মৃত্যু হইয়াছে। মৃতদেহ লইয়া বেহুলা ভাসিয়া চলিল অজানা স্বর্গরাজ্যের দিকে। ঐ সদাগরের জীবনব্যাপী সাধনা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। দৈবনিগ্রহে তাহার দৃঢ়পৌরুষ, পার্থিব সর্ব ফল বিসর্জন দিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাই চাঁদ সদাগরের চরিত্রের ট্র্যাজেডি।

চাঁদ সদাগরের চরিত্রের পরিণতি খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ হইল শিল্প বা সাহিত্য-গত তাৎপর্যের দিক দিয়া কোন কবিই এই পরিণতিকে বিচার করেন নাই। মনসা-মঙ্গলকাব্যের মূল লক্ষ্য হইল মনসাপূজা প্রচার। সব বাধা অপসারিত হইবে। বিরুদ্ধ শক্তি অবনত হইবে। তাহাই ঘটিয়াছে। চাঁদকে দিয়া মনসাপূজা করাইয়া ছাড়িয়াছেন কবিরা। কিন্তু ঐ পরিণতিকে চাঁদচরিত্রের যথার্থ সাহিত্যিক ফলশ্রুতিরূপে দেখা উচিত নয়।

বেহুলা—চাঁদ সদাগর ছাড়া যে-চরিত্রটি সব মনসামঙ্গলে সুচিত্রিত তাহা বেহুলার। বিজয়গুপ্ত-নারায়ণদেব এবং পরবর্তীকালের কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের হাতে বেহুলার চরিত্রটি বিশেষ বর্ণসম্পাতে রঙীন হইয়া উঠিয়াছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যে সব নারীচরিত্র দেখি তাহাদের অধিকাংশই ঘরোয়া জীবনের বাস্তবরূপের প্রতিফলন। ফুল্লরা, খুল্লনা, লহনা, উমা, মেনকা, যশোদা, জটিলা, কুটিলা, মায় বড়ায়ি-হীরা মালিনী পর্যন্ত পরিবার ও গ্রাম্যজীবনের বাস্তব আদর্শের আদলে আঁকা। আর একধরনের রমনীচরিত্রে কবিকল্পনার আতিশয্য লক্ষ্য করা যায়। কানাড়া বা লক্ষীডুমনী তাহাদের বীরত্বে পরিবারজীবনের তুচ্ছতার উর্ধ্বে স্থান পাইয়াছে। রাধা, প্রেমকল্পনায় হইয়া উঠিয়াছে বর্ণাঢ্য। অপরপক্ষে বেহুলাও পরিবারজীবনের বিবর্ণতাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে তাহার দুঃসাহসে ও ব্যক্তিত্বের দ্যুতিতে।

বেহুলার চরিত্র ঘিরিয়া কবিকল্পনার অতিরেক যতই উদ্বেল হইয়া উঠুক, উহার ভিত্তিতে একান্ত বাস্তব সংসার-জীবনাশ্রয়ী এক নববধূর একান্ত বাস্তব ও জীবন্ত মূর্তিটিই সুস্থির হইয়া আছে। বেহুলা বহুগুণবতী এক সুন্দরী রমণী। অনেক পরীক্ষার পরে চাঁদ তাহাকে পুত্রবধূরূপে বরণ করে। নৃত্যগীতেও ছিল তাহার পটুত্ব। কিন্তু সর্বোপরি বেহুলার চরিত্রে ছিল আশ্চর্য তেজস্বিতা। কোনরূপ আত্মাবমাননা সে সহ্য করিতে রাজী ছিল না। বিবাহের রাত্রে স্বামীর মৃত্যু হওয়ায় তাহার চরিত্র একটি নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

লক্ষীন্দরের মৃত্যুতে বেহুলার ক্রন্দনের মধ্যে ব্যর্থ জীবন-যৌবন এক তরুণীর আর্তনাদ অনেক কবির রচনায়ই সার্থকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষ করিয়া নারায়ণদেব ও কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে বেহুলাচরিত্রের এই ভাবটি সুন্দর ফুটিয়াছে। সনকা বেহুলাকে কুলক্ষণা নারী বলিয়া দোষারোপ করায় বেহুলা সেই ক্রন্দনোচ্ছ্বাসের মধ্যেও বলিয়াছে—পূর্বের ছয় পুত্রের মৃত্যুর জন্যও কি সে দায়ী?

ক্ষেমানন্দ বেহুলার মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মানবোধের এক নূতন মাত্রা যোগ করিয়াছেন। স্বামীর মৃত্যুর পরে সে স্বেচ্ছায় মৃতদেহের সঙ্গে ভেলায় চড়িয়া যাত্রা

করিয়াছে। স্বর্গে গিয়া স্বামীকে বাঁচাইয়া তুলিবে ইহা এক স্বপ্নকামনা ও গল্পকথা মাত্র। ইহার বাস্তব দিকটি বড়ই নিদারুণ।

প্রকৃতপক্ষে বেহুলা আত্মহননেই অগ্রসর হইয়াছে। স্বর্গে যাওয়া রূপকথা মাত্র। বেহুলা একটা কাল্পনিক দুরাশার পেছনেই ছুটিয়াছে এইরূপ মনে করিবার কারণ নাই। কোন কোন কবি চমৎকারভাবে তাহার চরিত্রে একটি ব্যক্তিত্বের অভিমান প্রকাশ করিয়াছেন। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের বেহুলা বলিয়াছে—"খাইলু আপন পতি কে মোরে বলিবে সতী"। তাহার ভাইয়েরা পিতৃগৃহে তাহাকে ফিরাইয়া লইবার জন্য আসিয়াছে। তখন বেহুলা তাহাদের যে কথাগুলি বলিয়াছিল তাহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ—

বেহুলা বলেন আমি হৈল্যাম কড়্যা র াড়ী
কত ফেলাইব ভাই নিরামিষ্যা হাঁড়ী ॥
মা-বাপের বাড়ীতে আমার নাহি সাজে।
সকল ভাউজের সঙ্গে মোর দ্বন্দ্ব বাজে ॥
সহিতে না পারি আমি দুর ক্ষর বাণী।
কূলে দাণ্ডাইয়া ভাই আর কান্দ কেনি ॥

বেহুলার নানা বিপদের মধ্য দিয়া স্বর্গে পৌছান এবং বুদ্ধি ও কৌশলে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির মধ্যে তাহার কর্মতৎপরতা ও দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। আবার সহজ শক্তির কবিরা ইহার মধ্যে মোটামুটি সতীত্বের তেজ এবং মহিমা প্রকাশ করিয়াই খুশি থাকিয়াছেন।

কিন্তু বেহুলা-চরিত্রের মধ্যে একটা সাঙ্কেতিক তাৎপর্য কোন কোন সমালোচক লক্ষ্য করিয়াছেন। বেহুলার স্বর্গে গমন এবং লক্ষীন্দর ও অপর মৃতদের বাঁচাইয়া এবং বিনষ্ট সম্পদ উদ্ধার করিয়া প্রত্যাবর্তন কোন বাস্তব ঘটনা নয়, উহা মানবচিত্তের একটি উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস মাত্র, মৃত্যুকে, দুঃখকে জয় করিবার একটি স্বপ্নমাত্র। যে কামনা জীবনে সত্য হয় না সেই কামনার দেহীরূপ বেহুলার মধ্যে—এই সত্য যেন কাব্যের এই অংশে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সনকা ঃ সনকা-চরিত্রটির মধ্যে জটিলতা বা বৈচিত্র্য তেমন নাই। চরিত্রটি সরল হইলেও মনসামঙ্গলের প্রায় সব কবিই ইহাকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। সনকা-চরিত্রের ভিত্তি একান্ত বাস্তব বাঙালী জীবন। বাংলা দেশের মাতার স্নেহকোমল রূপটি আঁকিতে বাঙালী কবি কোন দিন ভুল করেন না। চাঁদ সদাগরের দেবতার সহিত বিবাদ তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। তিনি গৃহকোণে সরল ভক্তিতে সব দেবতার পূজা করিয়াছেন। মনসার প্রতি তাঁহার ভক্তি এবং বৎসলস্বভাব মাতৃমূর্তিই কাব্যমধ্যে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। লক্ষীন্দরের মৃত্যুতেই সনকার চরিত্র সুন্দর ফুটিয়াছে। বিজয়গুপ্তের সনকা বধূ বেহুলার ভাগ্যের দোষ দিয়াছে, নারায়ণদেবের সনকা কাহাকেও দোষ দেয় নাই, নিজের দুর্ভাগ্যের কথাই মাত্র স্মরণ করিয়াছে—

সর্বগুণ বধূর তিলেক দোষ নাই।
যে বলিমু বধূর দোষ মৈলেকে লখাই ॥

বেহুলা ও সনকা চরিত্রের সফলতা সত্ত্বেও মনসামঙ্গল কাব্যগুলির শ্রেষ্ঠ চরিত্র চাঁদসদাগর। তাহার ট্রাজেডিই এই কাব্যের গভীরতম আবেদন।

অবশ্য পূর্বোক্ত তিনটি প্রধান চরিত্র ছাড়াও কোন কোন কবি অন্য দু-একটি চরিত্রকে বিশেষ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন, উহাদের মধ্যে নাম করিতে হয় বিজয়গুপ্ত অঙ্কিত মনসা এবং চণ্ডী চরিত্রের। মনসাকে হিংস্র ও আক্রমণকারী একটু জটিল চরিত্ররূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে। মনসাচরিত্রের খলতাবিকাশের মনস্তত্ত্বসম্মত চিত্র কবি আঁকিয়াছেন। চণ্ডী চরিত্রটিতে দেবভাব বড় নয়, সপত্নী কন্যার সহিত গৃহস্থ বধূর ব্যবহার তাহার চরিত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। গৌণ পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে অদ্ভুত শিবচরিত্রটি বেশ জীবন্ত। গ্রাম্য বৃদ্ধের এই চরিত্রে শিথিলতার ভাব ও অলসতা হিউমারের বর্ণে রঞ্জিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রশ্ন ৫। বাইশ কবির মনসামঙ্গলে উদ্ধৃত বিভিন্ন কবির রচনার মধ্যে নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত ও ক্ষেমানন্দ কেতকাদাসের রচনার সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ কর। [ক. বি., ১৯৫৯]

অথবা, বাইশ কবি মনসামঙ্গলের অন্তর্গত যে-কোন তিনজন কবির রচনা-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা কর। [ক. বি., ১৯৬৩]

উত্তর : [মনসামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি তিনজন নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত এবং কেতকা-দাস। যে কোন তিনজন কবির রচনাবৈশিষ্ট্য লইয়া আলোচনা করিতে দিলে ইহাদের তিনজনের কথাই প্রথম আলোচনা করিতে হয়।]

নারায়ণদেব : নারায়ণদেবের কাব্যরচনার কাল লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকে তো বলেন নারায়ণদেবের নামাঙ্কিত রচনাবলীর যথার্থতাও নাই। সে বিষয়ে বিতর্কের এখনও সমাধান হয় নাই। তাঁহার রচনার সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য তাহার নামে প্রচলিত মনসামঙ্গলের যথার্থতা মানিয়া লইয়াই করিতে হইবে। প্রাপ্ত তথ্যাদির সাহায্যে এইটুকু মাত্র বলা যায় যে নারায়ণদেব চৈতন্য আবির্ভাবের পূর্বে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন এবং মনসামঙ্গলের আদি কবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম। নারায়ণদেব মনসামঙ্গল কাব্যের কাঠামোটি কোন প্রাচীনতর কবির পূর্ণাঙ্গ রচনা হইতে গ্রহণ করেন নাই বলিয়াই মনে হয়। হয়ত কিছু আগে হরিদত্ত মনসামঙ্গল কাব্যের কোন সংক্ষিপ্ত রূপ ভাষাবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং সমকালে বিজয়গুপ্ত মনসা-মঙ্গলের পূর্ণাঙ্গরূপ দিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া মৌলিক আখ্যানকাব্য সে যুগে বড় পাওয়া যায় না—ব্যতিক্রম শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। কাজেই একটি কাহিনীকাব্য লিখিবার

রীতিনীতি আয়ত্ত করা নারায়ণদেবের পক্ষে কম গুরুতর ব্যাপার ছিল না। নারায়ণদেব কাহিনীকাব্যের উপস্থাপনরীতিতে যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন।

নারায়ণদেবের কাব্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁহার পৌরাণিক বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ। এ সম্পর্কে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করিয়াছেন, "নারায়ণদেব কেবলমাত্র যে স্বভাবকবি ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার কাব্য পৌরাণিক রত্নভাণ্ডার। সুগভীর অধ্যবসায়ের সঙ্গে তিনি ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং সেই অধ্যবসায়ের ফল তাঁহার কাব্যের ছত্রে ছত্রে ব্যক্ত হইয়াছে। কবিত্বের সঙ্গে পাণ্ডিত্যের তিনি এমন একটি সহজ যোগসূত্র রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন……সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্যকে বাঙ্গালীর নিজস্ব ঘরের জিনিষ করিয়া লইতে তিনি নিপুণ ছিলেন বলিয়াই পাণ্ডিত্য তাঁহার কবিত্ব প্রকাশের বাধা না হইয়া নিতান্ত সহজাত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বাংলার ঘর ও বাহিরকে এমনভাবে একাকার করিয়া লইতে তাঁহার পূর্বে আর কোন কবিই এমন সার্থকতা লাভ করিতে পারেন নাই।"

নারায়ণদেবের কাব্যের একটি প্রধান শক্তি করুণরস প্রকাশের ক্ষমতায়। বিশেষতঃ লখীন্দরের মৃত্যুর ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া তিনটি নরনারীর শোক প্রকাশের ব্যাপারে কবি সার্থকভাবে স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। মৃত স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বিনষ্টআশা এবং বিফলীকৃত যৌবনের আর্তনাদ বাজিয়াছে বেহুলার কণ্ঠে—

হাসি হাসি দেয় মোরে অঙ্গে আলিঙ্গন।
তবে যে জুড়াএ প্রভু অভাগীর প্রাণ॥
বিশুদ্ধ কাঞ্চন যেন শরীরের জ্যোতিঃ।
অকালেতে রাড়ী হৈলুম শুন প্রাণপতি॥

নারায়ণদেবের সনকা সান্ত্বনাহীন বেদনায় দগ্ধ হইয়াছে। বধূকে "খণ্ডকপালিনী" বলিয়া অভিযোগ তুলিবার কথাও তাঁহার সঙ্গত বোধ হয় নাই—

সর্বগুণ বধূর তিলেক দোষ নাই।
যে বলিমু বধূর দোষ সেলেক লথাই॥

পুত্রের মৃত্যুতে চাঁদের শোকে সর্বহারার বেদনা এবং দুরন্ত ক্রোধ যুগপৎ প্রকাশ পাইয়াছে।

চন্দো বলে পুত্র চাহিমু গিয়া পাছে।
বিচারিয়া চাহি নাগ কোন থানে আছে॥

বিস্তর চাহিয়া তবে নাগ না পাইয়া।
কান্দিতে লাগিল চন্দো বিষাদ ভাবিয়া॥...
ডালমূল গেল মোর মৈন্ধমাত্র সার।
অখনে কানির সঙ্গে চাপি কর বাদ॥
যদি কানির লাইগ পাম একবার।
কাটিয়া সুজিব আমি মরা পুত্রের ধার॥

শুধু করুণরসের ক্ষেত্রেই নয়, চাঁদের ট্রাজেডির যন্ত্রণা প্রকাশেও নারায়ণদেব দুর্লভ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, বিশেষতঃ কাব্যের সমাপ্তিতে। চাঁদ কিছুতেই মনসার পূজা করিবে না। জীবনের সবকিছু হারাইয়াছে সে আপন মনের দৃঢ় প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করিয়া। আজ জীবনসায়াহ্নে সে দেখিল বেহুলা হারানো সব ধনজন লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই ধনজনের লোভে মনসাপূজা করিয়া চাঁদের আর কি লাভ? সারা জীবন সে শুধু সংগ্রাম করিয়াছে; ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, ধনসম্পদ হারাইয়াছে—পুত্র বান্ধবদের বিসর্জন দিয়াছে। আর আজ যদি আপন দৃঢ়-চিত্ততার বিনিময়ে সব কিছু ফিরিয়া পায়, সেই প্রাপ্তির কি কোন মূল্য আছে? উহার জন্য তো আপন ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিতে হইবে। কিন্তু বেহুলার প্রাণান্তকর সাধনার কথা ভাবিয়া, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চাঁদ শেষ পর্যন্ত মনসাপূজায় রাজী হইয়াছে। ইহার মধ্যে ভক্তচিত্তের আনন্দোদ্বেলতার প্রকাশ নাই, আছে একটি ট্র্যাজিক ব্যক্তিত্বের অবসিত রূপ।

নারায়ণদেবের কাব্য-সমাপ্তির সঙ্কেতময়তাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত। বেহুলা লখীন্দরের মৃতদেহের সঙ্গে ভেলা ভাসাইয়া দিল। মৃত্যুরাজ্য হইতে সে জীবনকে জয় করিয়া আনিবে। এই চেষ্টার মধ্যে বাস্তবতা নাই। মনসামঙ্গলের কবিরা, বিশেষ করিয়া নারায়ণদেব ইহার মধ্যে কল্পনা করিয়া লইয়াছেন মানুষের দুর্জয় আশার ছবি। বেহুলার অসাধ্যসাধন যেন কোন বাস্তব ব্যাপার নয়, উহা যেন এক স্বপ্ন—মানুষের অচরিতার্থ কামনা যেন সেখানে রূপ ধরিয়াছে।

বিজয়গুপ্ত: মনসামঙ্গলের কাহিনী যাঁহাদের হাতে প্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্যের রূপ ধারণ করিয়াছে বিজয়গুপ্ত তাঁহাদের অন্যতম। চৈতন্য আবির্ভাবের আগেই তিনি এই কাব্যটি লেখেন। তাঁহার কাব্যের কোন নির্ভরযোগ্য পুঁথি পাওয়া যায় নাই। তবু যে সব পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহার সাহায্যে কবির প্রতিভার সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা করা যাইতে পারে।

বিজয়গুপ্ত হাস্যরস এবং করুণরস সৃষ্টিতে যুগপৎ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। তাঁহার মনসামঙ্গলের বৈশিষ্ট্য করুণরসাত্মক অংশগুলিকে সাফল্যের সঙ্গে চিত্রিত করায়।

এ বিষয়ে একমাত্র নারায়ণদেবই তাঁহার সমকক্ষতা দাবি করিতে পারেন। লখীন্দরের মৃত্যুতে বিজয়গুপ্ত চাঁদ সদাগরের বেদনার্তি প্রকাশ করিতে গিয়া তাহার ব্যর্থ জীবন-সাধনার আর্ত হাহাকারকে ভাষারূপে ধরিয়াছেন—

লোহার ঘরে দেখে সাধু লখাইর মরণ।
আহা পুত্র বলি সাধু হৈলা অচেতন ॥
ক্ষণেক চেতন পাইয়া সাধুর নন্দন।
পুত্র পুত্র বলি ডাক ছাড়ে ঘন ঘন ॥
কোথা লখাই কোথা লখাই বলে সদাগর।
চম্পকের রাজা আমার বালা লখীন্দর ॥
বিধুমুখে বাপ বলিয়া আর না ডাকিলা।
চম্পকরাজ্য তুমি কারে দিয়া গেলা ॥

চাঁদের দৃঢ় পৌরুষ, সব হারাইবার বেদনা, অবক্ষয়চিত্তে শেষ পর্যন্ত মনসাপূজা চরিত্রটির ট্র্যাজিক পরিণতিকে যথাযোগ্যভাবেই প্রকাশ করিয়াছে।

তবে বিজয়গুপ্তের বৈশিষ্ট্য হইল বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে। কবি চাঁদ চরিত্রের দৃপ্ত পৌরুষ ও গাঢ় ট্র্যাজেডির কথা বলিতে গিয়াও তাহার দুইটি চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ না করিয়া ছাড়েন নাই। চাঁদ নটীবেশিনী মনসার রূপে ভুলিয়া আপনার মহাজ্ঞান হারাইয়াছে; নৌকাডুবির পরে কাঠুরিয়াদের সহিত কাজ করিবার সময়ে চাঁদ ভাবিয়াছে—

আর দুপণ কড়ি পাইলে নটীবাড়ি যাব।

বাণিজ্য করিবার সময়েও চাঁদের বাস্তববুদ্ধির ও চতুরতার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। কথার ছলে দক্ষিণ পাটনের রাজাকে ভুলাইয়া সে অনেক সম্পদ লাভ করিয়াছে। বিজয়গুপ্ত-নির্দেশিত চাঁদচরিত্রের এই সব ত্রুটিবিচ্যুতি তাহার পৌরুষ-দৃঢ় আদর্শবাদী চরিত্রকে অনেকখানি মাটির কাছাকাছি আনিয়া ফেলিয়াছে।

বিজয়গুপ্ত বেহুলা ও সনকা চরিত্রাঙ্কনেও যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। তবে এবিষয়ে মনসামঙ্গলের অন্যান্য প্রধান কবিদের সহিত তাঁহার রচনার কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য চোখে পড়ে না। কিন্তু তাঁহার মনসামঙ্গলে দেবখণ্ডের যে কাহিনী ও চরিত্রগুলি প্রকাশ পাইয়াছে উহা একান্তভাবে তাঁহার নিজস্ব কল্পনার ফল। দেবখণ্ডে তিনি তিনটি দেবদেবীর চরিত্র আঁকিয়াছেন। শিব-চরিত্রটি তাহার হাতে পড়িয়া একান্তভাবেই মানবিক হইয়া উঠিয়াছে। পরবর্তীকালে ভারতচন্দ্র শিবকে কখনও বাদিয়ার মূর্তিতে কখনও, পুরাণানুমোদিত রুদ্র রূপে, কখনও আবার ব্যঙ্গের

পাত্ররূপে দেখিয়াছেন। শিবায়নে শিব কৃষকের বেশ ধারণ করিয়াছে। বিজয়গুপ্তের শিব একটি গ্রামীণ বৃদ্ধ। সে বেশ শিথিল চরিত্র। এইজন্য স্ত্রী তাহাকে চোখে চোখে রাখে। সেও স্ত্রী চণ্ডীকে মনে মনে বিশেষ ভয় করে, কিন্তু সুযোগ পাইলে স্ত্রীর চোখ এড়াইয়া বাহির হইয়া পড়ে। খেয়া নৌকার পাটনী-রমণী বা অপরিচিতা সুন্দরী কন্যা সকলের প্রতিই সে লোভ প্রকাশ করে। শিব চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য শিশুর সরলতা। এয়োদের মধ্যে উলঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া সে পানসিন্দুর খরচের পয়সা বাঁচাইতে চায়; নৌকা পার হইবার সময়ে বলে—আমার বলদের গায়ে তুলা হেন ভার। শিব চরিত্রের এই বাস্তব গ্রামীণ এবং কৌতুককর রূপকল্পনায় যেমন সাফল্যের পরিচয় দিয়াছেন বিজয়গুপ্ত তেমনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন পার্বতীর চরিত্রচিত্রণে। পার্বতী বা চণ্ডীর চরিত্রটি বাস্তবজীবনের আদর্শে অঙ্কিত হইয়াছে। সে গৃহবধূ। বৃদ্ধ, শিথিল-চরিত্র স্বামীকে সামলাইতে ব্যতিব্যস্ত। সপত্নীকন্যা মনসার প্রতি তাহার যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে উহা বাস্তব জীবনের প্রভাবে উত্তপ্ত।

কিন্তু বিজয়গুপ্ত দেবখণ্ডের যে চরিত্রটি অঙ্কনে সর্বাধিক নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন তাহা হইল মনসার চরিত্র। মনসা কিভাবে ধীরে ধীরে বাস্তব জীবনের আঘাত সহ্য করিয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ কবি দিয়াছেন। মনসা অজ্ঞাতকুলশীলা। তাহার জন্মদাতা পিতা তাহার প্রতি কামনিবেদন করিয়াছে। পরে পিতৃগৃহে বিমাতার ঘৃণা ও অত্যাচারের মধ্যে সে বড় হইয়াছে। দেবসমাজে সে অবহেলিতা। বিমাতা তাহার একচোখ কানা করিয়া দিয়াছে। বিবাহের রাত্রে স্বামী তাহার যৌবনধর্মকে অবহেলা করিয়াছে। বিবাহের রাত্রেই স্বামীর সঙ্গে তাহার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। শেষ পর্যন্ত দেবগণের আবাস স্বর্গ ছাড়িয়া তাহাকে নির্বাসনে যাইতে হইয়াছে। তাহার কণ্ঠে বিজয়গুপ্ত যে ভাষা দিয়াছেন তাহা দেবকন্যার ভাষা নয়, মর্তমানবীর ভাষা—

জনম-দুঃখিনী আমি দুঃখে গেল কাল।
যেই ডাল ধরি আমি ভাঙে সেই ডাল॥
শীতল ভাবিয়া যদি পাষাণ লই কোলে।
পাষাণ আগুন হয় মোর কর্মফলে॥
কারে কি বলিব মোর নিজ কর্মফল।
দেবকন্যা হইয়া স্বর্গে না হইল স্থল॥

ভাগ্যই মনসার কোমল হৃদয়কে কঠোর ও খলতায় পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। যাহার নিজের জীবনযৌবন ব্যর্থ হইয়াছে অন্যের জীবনে সুখ দেখিলে তাহার বিষ নয়নে আগুন জ্বলিয়া উঠে। এ বিষয়ে জনৈক আধুনিক সমালোচক তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন "সর্বনাশ বর্ষণে মনসা দ্বিধাহীন। উদ্দেশ্যে সে স্থির এবং উপায়ের নীতি ন্যায়বিচারের

বাইরে। চাঁদসদাগরকে ধ্বংস করতে হবে। যে কোন উপায়ে মনসার তা করা চাই, শিশুপুত্রদের ভাতে লুকিয়ে বিষ মিশিয়ে কিংবা সদ্যবিবাহিত লক্ষীন্দরের বাসরে সাপ ঢুকিয়ে দিয়ে। ......তাহার ব্যবহারে একটা দ্বিধাহীন হিংস্রতা এমনভাবে আপনাকে অবারিত করেছে, নটীবেশ ধারণের হীনতা বা মালিনীর ভূমিকাগ্রহণের তুচ্ছতা এত স্বাভাবিকভাবে সে স্বীকার করেছে যাতে একটা তীব্র আক্রোশ যেন শতধারে আপনার সূচীমুখ উদ্যত করে রেখেছে বলে মনে হয়। মনসার এ আক্রমণ যেন মূর্তিমতী নিষেধ—নিষেধ দাম্পত্যমিলনের প্রথম মুহূর্তের রোমাঞ্চকর ঘনিষ্ঠতার বিরুদ্ধে, নিষেধ মানব কামনার সুপ্রচুর সম্পদসঞ্চয়ের সফল সাধনার বিরুদ্ধে।" [ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত : প্রাচীন কাব্য ও সৌন্দর্যজিজ্ঞাসা]

বিজয় গুপ্তের অপর বৈশিষ্ট্য কৌতুকরস সৃষ্টিতে। কবির বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীই এই কৌতুক সৃষ্টির উৎসে সক্রিয়। বিজয় গুপ্ত শিবের চরিত্র পরিকল্পনায়, চাঁদের বাণিজ্য ব্যাপারে এই হাস্যের ধারা উন্মুক্ত করেছেন।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ : মনসামঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। তিনি চৈতন্য-পরবর্তীযুগের কবি। চৈতন্যোত্তর কালে সাধারণভাবে বাংলাসাহিত্যের গুণগত উন্নতি ঘটিয়াছে। ভাষা ও ভাব অনেক মার্জিত হইয়াছে। বহু শিক্ষিত কবির অনুশীলনের ফলে বাংলা ভাষা অনেক সাবলীল ও গ্রাম্যতামুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ববর্তী কবি নারায়ণদেব ও বিজয়গুপ্তের কাব্যে ভাষা ব্যবহারে একটা অবহেলার ভাব মাঝে মাঝে দেখা যায়। গ্রাম্যতাও প্রকট। কেতকদাস সচেতনভাব কাব্যভাষাকে লাবণ্যময় করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন।

কেতকাদাসের মনসামঙ্গলের সম্পাদক অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য তাঁহার ভাষারীতি প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন—"অতি স্বাভাবিকভাবে যে সকল অলঙ্কার কবির কাব্যে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের সৌন্দর্য ও প্রয়োগকুশলতা অলঙ্কার-রসিক মাত্রকেই তৃপ্তিদান করিবে। অর্থালঙ্কারের মধ্যে উপমা, মালোপমা, রূপক, অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি, দৃষ্টান্তানিদর্শনা, অর্থাপত্তি কাব্য লিঙ্গের প্রয়োগ।" জনৈক আধুনিক সমালোচক কেতকদাসের ভাষা বৈশিষ্ট্য বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন—"কেতকাদাসের এই সুমার্জিত এবং সঙ্গীত-রসাত্মক ভাষার প্রধান গুণটি হল আতিশয্যহীনতা। পড়বার সময়ে এই কাব্য সহজে রুচিবান চিত্তকে আকর্ষণ করে, কিন্তু কবির ভাষাপ্রয়োগের সচেষ্টতা কোথাও অতিপ্রকট হয়ে ওঠে না। তাঁর অধিকাংশ শ্লোকে যে অনুপ্রাসের ধ্বনিসাম্যকে মৃদুভাবে ব্যবহার করে একটা সুরের রেশ প্রবাহিত রাখা হয়েছে তা সতর্ক পাঠক ব্যতীত অন্যের চোখেও পড়বে না। কাব্য কৌশলকে গোপন করার মধ্যেই তার

সার্থকতা। এ সিদ্ধি আয়ত্ত করেছিলেন কেতকাদাস।" [ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত : প্রাচীন কাব্য ও সৌন্দর্যজিজ্ঞাসা।]

কেতকাদাসের মনসামঙ্গলে জ্ঞানতৃষ্ণার বিশেষ পরিচয় রহিয়াছে। তাঁহার তথ্যনিষ্ঠা দেখিয়া যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বলিয়াছেন—"কবি যখন যে বিষয়ের বর্ণনা দিতে গিয়াছেন তখন সেই বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান কতটুকু তাহা সুস্পষ্টভাবে তাঁহার গ্রন্থপাঠক ও শ্রোতাদের মনে অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।" কবি যেখানেই সুযোগ পাইয়াছে দীর্ঘ সব তালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন। সত্তর রকম পাখি, ষাটটি সাপ, ষাট সত্তরটি গরু, পঁচিশ রকম ফুল, নানা অস্ত্রশস্ত্র, বাদ্যযন্ত্র—প্রভৃতির নামের তালিকা দিতে কবি যেন শ্রান্তিহীন।

বিষয়বস্তুর দিক হইতে কেতকাদাসের কাব্যের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। চাঁদ মনসার বিবাদ-কাহিনী কাব্যের অর্ধাংশেরও কম স্থান জুড়ে আছে। উষাহরণ, সমুদ্রমন্থন, রাখালপূজা প্রভৃতি পালাগুলি অনেকখানি স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ কাহিনী হইয়া উঠিয়াছে। চাঁদসদাগরের চরিত্রের যে গৌরব বিজয়গুপ্ত নারায়ণদেবের কাব্যে প্রকাশিত এখানে তাহার চিহ্নমাত্র নাই। চাঁদের মনসা বিরোধিতার মধ্যে বহুস্থলেই অতিমাত্রায় রূঢ়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে—

ভাল হৈল পুত্র মৈল কি আর বিষাদ।
কানী চেঙ্গমুড়ি সনে ঘুচিল বিবাদ॥
ক্রোধ হৈয়া নাড়ারে বলিছে চাঁদ বাঙ্গা।
কানীর উচ্ছিষ্ট মড়া ফেল দিয়া টাঙ্গা॥
ঝাট কর‍্যা কাট নাড়া রামকলার পাত।
মৎস্য পোড়া দিয়া আজি খাব পান্তাভাত॥

কিন্তু বেহুলার চরিত্রাঙ্কনে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন কবি। বেহুলা যখন স্বামীর মৃতদেহ লইয়া কলার ভেলায় করিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে তাহার ভাইয়েরা তাহাকে শব ফেলিয়া তাহাদের সঙ্গে চলিয়া আসিতে বলিল। বেহুলা উহার উত্তরে যে কথা বলিয়াছে তাহাতে বেহুলার চরিত্রের তীক্ষ্ণ আত্মাভিমান ও আত্মসম্মানবোধ প্রকাশ পাইয়াছে—

মা বাপের বাড়ীতে আমারে নাহি সাজে।
সকল ভাউজের সঙ্গে মোর দ্বন্দ্ব বাজে॥
সহিতে না পারি আমি দুরক্ষর বাণী।
কূলে দাণ্ডাইয়া ভাই আর কান্দ কেনি॥

প্রশ্ন ৬। মঙ্গলকাব্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কি দেবতার অত্যাচার ও মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা না সমন্বয়মূলক পরমতসহিষ্ণুতার প্রতিষ্ঠা—এই বিরোধী অভিমত দুটি বিচার করিয়া তোমার নিজের সিদ্ধান্তটি প্রতিষ্ঠিত কর। [ক. বি., ১৯৬৪]

অথবা, **মঙ্গলকাব্যে দেবতা ও মানুষ যথাক্রমে উৎপীড়ক রাজশক্তি ও নির্যাতিত শাসিতের প্রতীক। পঠিত মনসামঙ্গলের কাহিনী বিশ্লেষণ করিয়া এই মতের যাথার্থ্য বিচার কর।** [ক. বি., ১৯৬৫]

অথবা, **চাঁদের পৌরুষ অথবা শিবশক্তির দ্বন্দ্ব, ইহার কোনটিই মনসামঙ্গলের আসল কথা নহে; স্নেহসহিষ্ণুতার জয়ই তাহার মূল সুর।—বেহুলা-সনকার চরিত্র এবং চাঁদের পরাজয় অবলম্বনে এই অভিমতের সত্যতা বিচার কর।** [ক. বি., ১৯৬৮]

উত্তর: মনসামঙ্গলে মঙ্গলকাব্যের আদিরূপ লক্ষ্য করি। মনসামঙ্গলের কাহিনীর আদর্শটি চৈতন্য-পূর্ববর্তী কালেই সুনির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। পরবর্তী কালের কবিরা এই প্রতিষ্ঠিত আদর্শ অনুসরণ করিয়া কাব্যরচনা করায় পুরাতন ভাবপরিবেশ ও সমাজপরিবেশের ছাপ ইহার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। অন্য মঙ্গলকাব্যগুলি অনেক পরবর্তীকালে ভাষায় কাব্যরূপ পায়। ফলে মঙ্গলকাব্যের প্রথমযুগের দ্বন্দ্ব সংঘাতভিত্তিক আবির্ভাবের রূপটি মাত্র মনসামঙ্গলে রক্ষিত হইয়াছে।

রাজনৈতিক পরিবেশের কথা মনে রাখিলে দেখা যাইবে মঙ্গলকাব্যগুলি এমন একটা যুগে দানা বাঁধিয়াছিল যখন তুর্কি রাজশক্তি বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। মনসামঙ্গলকাব্যের মূল কাহিনীর পরিকল্পনায় উৎপীড়ক রাজশক্তি দেবতার ছদ্মবেশ ধরিয়া দেখা দিয়াছিল এবং নির্যাতিত প্রজাশক্তি মানুষের রূপ লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল—এইরূপ ব্যাখ্যান অনেকে দিয়া থাকেন। কেহ কেহ এই কাহিনীর মূল সংঘাতকে শৈব ও শাক্ত মতের দ্বন্দ্বের প্রতিফলন বলিয়া মনে করিয়াছেন। অনেকে ইহার পরিণতিকে দেবতার নিকট মানুষের বীর্যের পরাজয় বলিয়া মনে করিয়াছেন; অনেকে তাহা স্বীকার করেন নাই—কাব্যের পরিণতিতে পৌরুষের পরাজয় কবিদের লক্ষ্য ছিল না, ছিল স্নেহ-সহিষ্ণুতার জয়, এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। মনসামঙ্গলের কাহিনী বিশ্লেষণ করিলেই ইহার কোন্ মতটি কতটা সত্য তাহা বুঝা যাইবে।

মনসামঙ্গলকাব্যে হাসানহোসেন পালা নামক একটি আখ্যান পাওয়া যায়। মুসলমান রাজশক্তি এবং রাজশক্তির ছত্রছায়াতলে পুষ্ট মোল্লা-পীর-কাজীদের

অত্যাচারে হিন্দু জনসমাজ তখন ত্রাহি ত্রাহি রব তুলিতেছিল। উক্ত হাসানহোসেন পালায় দেখা যায় মুসলমান কাজীরা হিন্দুর হিন্দুয়ানী নষ্ট করিবার জন্ত সর্বদাই কিরূপ ব্যাগ্র ছিল। মনসার হাতে ধর্মদ্বেষী কাজীরা কিরূপ শাস্তিভোগ করিল হিন্দু কবিরা উল্লাসভরে তাহার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। রাজশক্তির উৎপীড়ন সেযুগে ছিল বিচারহীন এবং বিবেকহীন। মনসার পূজা আদায়ের পদ্ধতির মধ্যে একটা প্রবল জোরজবরদস্তি লক্ষ্য করা যায়। দুর্বলচিত্ত সাধারণ মানুষ যেমন শক্তিমান রাজশক্তির কাছে বিনা বাধায় মাথা নীচু করে তেমনি রাখালেরা, ঝালুমালু প্রভৃতি মনসার কাছে সহজেই আত্মসমর্পণ করিয়াছে। বলিষ্ঠ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চাঁদ সদাগর মনসার শক্তির নিকট মাথা নীচু করিতে চায় নাই। তাই মনসা তাহার উপর একের পর এক আক্রমণ চালাইয়াছে। তাহার সম্পদ নষ্ট করিয়াছে, তাহার পুত্রদের মৃত্যু ঘটাইয়াছে। একথা অস্বীকার করা যায় না যে কবিরা দেবতার চরিত্র ও আচার-আচরণের চিত্র আঁকিতে গেলেও মানুষের জীবন-ঘটনারই অনুসরণ করিয়া থাকেন। পারিপার্শ্বিক সমাজ-অভিজ্ঞতা হইতেই তাঁহারা কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করেন। মনসা যে ভাবে পূজা ও ভক্তি আদায় করিয়াছে তাহার বর্ণনা করিতে গিয়া আদি মনসামঙ্গলের কবিরা সমকালীন উৎপীড়ক রাজশক্তির ব্যবহার হইতে উপাদান গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। তবে প্রধান উৎপীড়িত ব্যক্তি চাঁদের চরিত্র ও আচরণের মধ্যে এমন একটা আভিজাত্য ও ব্যক্তিত্বের গৌরব প্রকাশিত যাহাতে তাহাকে প্রজাসাধারণের প্রতিনিধি বলিয়া মনে করা যায় না। মনসার বড় বড় আঘাতকে যে ভাবে সে প্রতিহত করিয়াছে তাহাতে নির্যাতিত শাসিত মাত্র সে নয়—সে বিপ্লবী শক্তিমানের প্রতীকরূপেই অভিহিত হইবে।

এই ধারার ব্যাখ্যা মনসামঙ্গলের কাহিনী বিশ্লেষণের ব্যাপারে কতকটা যুক্তিবহ হইলেও, এই রাজশক্তি ও শাসিতের দ্বন্দ্ব-প্রদর্শনই এই কাব্যকাহিনীর অভিপ্রায় এইরূপ বলা আদৌ ঠিক নয়। অন্যান্য নানা রীতিতেও ইহার ব্যাখ্যা দেওয়া চলে—অন্তত বলা যায় আরও নানা ভাবনা এই কাব্য পাঠকালে পাঠকের মনে আপনিই আসিয়া পড়িবে।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে ধর্মঘটিত একটি দ্বন্দ্বের বীজ লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যানুযায়ী মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সমকালীন সমাজ-মনে ধর্মবিশ্বাস লইয়া যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল তাহার প্রতিফলন রহিয়াছে। প্রধানত: নির্বিরোধী শৈব ধর্মের প্রাচীনতর প্রভাবের স্থলে শাক্ত দেবদেবীর প্রভাব বিস্তৃত হইবার কাহিনী এই মনসামঙ্গল। শিবভক্ত চাঁদ শক্তিদেবী

মনসার নিকট মাথা নীচু করিবে না। মনসা শক্তিদেবী। সে শক্তির প্রকাশ দেখাইয়াছে। চাঁদসদাগরের সম্পদ ও স্বজন হরণ করিয়াছে। চাঁদের আরাধ্য দেবতা শিব পরম নিরাসক্তির সঙ্গে দূরে সরিয়া রহিয়াছেন। কাজেই শেষ পর্যন্ত বাধ্য হইয়া শৈব চাঁদকে শাক্ত দেবী মনসার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছে। শৈব প্রভাবের স্থলে শাক্ত ধর্মীয় প্রভাব এইভাবেই বাড়িয়া গিয়াছিল বাংলা দেশের সমাজে।

মনসামঙ্গল কাহিনীর এই জাতীয় ব্যাখ্যান অনেকখানি আরোপিত বলিয়াই মনে হয়। কারণ মঙ্গলদেবীদের প্রতিষ্ঠার আদিযুগে শৈব প্রভাব অপসারিত করিয়া শাক্ত প্রভাব দেখা দিয়াছিল—ইতিহাস এরূপ প্রমাণ করে না। বাংলাদেশের জনজীবনে শাক্তপ্রভাব অতি প্রাচীনকাল হইতেই বর্তমান ছিল।

সমাজতত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিতে হইলে মনসামঙ্গল কাহিনীর একটি স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। মনে হয় উহা প্রস্তাবিত পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাগুলির তুলনায় অনেক বেশী ইতিহাসসম্মত।

মনসা শাক্তদেবী, কিন্তু তিনি অনার্য, অব্রাহ্মণ্য, অস্মার্ত লোক-সংস্কার হইতে আগত। অভিজাত ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে এই দেবী কিছুতেই গৃহীত হইতেছে না। প্রকৃতপক্ষে তুর্কিবিজয়ের পূর্ব হইতেই বাংলায় এই দুই সংস্কৃতি ধারার দ্বন্দ্ব শুরু হইয়া যায়। তুর্কিবিজয়ের ফলে এই দুই বিবদমান ধারার মিলন-সম্ভাবনা ঘটে। তবে এই ব্যাপার ঘটিতে অন্তত দু তিনশ বছর সময় লাগিয়াছে। মনসার কাহিনীতে সামাজিক ইতিহাসে ঐ বাস্তব সত্যই যেন প্রতিফলিত। মহাদেবের কন্যারূপে পরিচয় লইয়া দেবসমাজে তাহার আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা। কিন্তু শেষপর্যন্ত দেবসমাজে এই বাহিরাগত দেবীটি স্থান পাইল না। তাহাকে নির্বাসন লইয়া সাঁতালি পর্বতে গিয়া আশ্রয় লইতে হইল।

এই দেবীটি স্বাভাবিকভাবে তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর মানুষের পূজা পাইতে লাগিল। কারণ এই দেবী তাহাদের নিজস্ব দেবী। রাখালেরা তাহার পূজক, জেলে ঝালুমালু তাহার পূজা করিল, সনকার ন্যায় উচ্চবর্ণের গৃহবধূরা এই দেবীর ভক্ত। কিন্তু চাঁদের মত উচ্চবর্ণের প্রতিনিধি মনসাকে পূজা করিতে চাহিল না। চাঁদ ও শঙ্কর গারুড়ি মনসার পূজা প্রচারে বাধা দিতে লাগিল।

চাঁদ ও মনসার দ্বন্দ্বটি এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখাই উচিত। চাঁদের পৌরুষের সুদৃঢ় শক্তি একদিকে যেমন ব্যক্তিগত অন্যদিকে তেমনি সমাজঘটিত। চাঁদ সমাজের অভিজাত শ্রেণীর প্রতিনিধিস্থানীয়। চাঁদের মনসাপূজা করিবার অর্থই হইল গোটা উচ্চ আর্যানুমোদিত সমাজের নিকট মনসার স্বীকৃতি লাভ। এইরূপ

স্বীকৃতিলাভের মধ্য দিয়াই বাঙালী সমাজে এই দুই স্তরের মধ্যে একটা সমন্বয় ঘটা সম্ভব। চাঁদ-মনসার দ্বন্দ্ব-কাহিনীর মধ্যে আর্য অভিজাত ব্রাহ্মণ্য-সমাজের সহিত অনার্য অনভিজাত লোকসমাজের দীর্ঘকালব্যাপী সাংস্কৃতিক সংঘাত ও সমন্বয়ের ইতিহাস প্রতিফলিত হইয়াছে।

চাঁদ ও মনসার সংঘাতের প্রত্যক্ষ রূপটিও কম আকর্ষণীয় নয়। সব ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের কথা বাদ দিলেও শুধু প্রত্যক্ষ মানসিক সংঘাতের রূপটিও জীবন্ত। মনসাদেবী—অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারিণী। সর্পকুল তাহার সামান্য ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিতেছে, মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়-নদী তাহার আজ্ঞার অধীনে। জীবন্ত লোককে মারা যেমন তাহার পক্ষে সহজসাধ্য তেমনি মৃতকে জীবন্ত করিয়া তোলাও তাহার সাধ্যানুগ!

চাঁদের আছে শুধু পৌরুষ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। দেবতার অসীম ক্ষমতার সহিত মানুষের গম্ভীর ব্যক্তিত্বের সংগ্রাম। এই সংগ্রাম যে অসম তাহাতে সন্দেহ নাই। সর্বশক্তিমান দেবতা শুধু আক্রমণ করে, মানুষ শুধু অত্যাচারিত ও পীড়িত হয়। আত্মরক্ষার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। চাঁদ সদাগরের বৈশিষ্ট্য হইল—আঘাতের যন্ত্রণায় তাহার বুক ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, কিন্তু সে আত্মসমর্পণ করে নাই। মধ্যযুগের ভক্তিবাদী কবিরা মনুষ্যধর্মের এই মর্যাদা স্বীকার করিতে চাহেন নাই। তাহারা চাঁদের পৌরুষকে শেষ পর্যন্ত মনসার পায়ের তলায় লুটাইয়া দিয়াছে।

অনেকে বলেন যে মনসামঙ্গলকাব্যের সমাপ্তিতে চাঁদের পরাভব ও মনসাপূজাকে ঠিক পৌরুষ ও মনুষ্যত্বের বিপর্যয় বলিয়া গ্রহণ করা উচিত নয়। চাঁদ শিব ও চণ্ডীর উপাসক, মনসাকে পূজা করিতে রাজী নয়। সে বলিয়াছে—

যে হাতে পূজি আমি শঙ্কর ভবানী।
সেই হাতে না পূজিব লঘুজাতি কানী॥

সমালোচক বলিতে চান যে ইহা ধর্মীয় ভেদবুদ্ধির নিদর্শন। কাব্যের শেষে কোন কোন কবি বর্ণনা করিয়াছেন; চণ্ডী ও মনসা এক রথে আকাশপথে আবির্ভূত হইয়া চাঁদকে জানাইয়াছে যে উহারা অভিন্ন, চাঁদ যেন ভেদবুদ্ধির বশীভূত হইয়া উহাদের পৃথক করিয়া না দেখে। চাঁদ চণ্ডীর উপদেশ মানিয়া লয়। চাঁদের মনসাপূজাকে তাই অনেকে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বিজয় বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছেন।

কিন্তু গোটা মনসামঙ্গলের কাহিনীতে এই তাৎপর্যটি বিশেষ গভীরভাবে মুদ্রিত নাই। এই ধর্মসমন্বয়ের সুরটি আকস্মিক ও বহিরঙ্গ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু চাঁদের মনসাপূজায় স্বীকৃতি দানের মধ্যে পৌরুষের কঠোরতার উপরে স্নেহমমতার জয় যে ঘোষিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। চাঁদ যখন দেখিল বেহুলা তাহার জীবনকে

তুচ্ছ করিয়া দীর্ঘ ও কঠোর সাধনার মধ্য দিয়া মৃত স্বামী ও ভাশুরদের ফিরাইয়া আনিয়াছে তখন চাঁদ মনসাপূজা না করিলে তাহার সব চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়।

ব্রাহ্মণে হাত ধরে শূদ্র ধরে পাএ।
পাত্রগণে চান্দের আগে কহিয়া বোঝায়॥
একদিন পূজ সাধু জয় বিষহরী।
ধনেপুত্রে ঘরে লহ চম্পক-অধিকারী॥

বেহুলার প্রতি মমতায়, আত্মীয়-স্বজনের দিকে চাহিয়া চাঁদ মনসাপূজা করিয়াছে। ইহাতে কঠিন বিদ্রোহীচিত্তের উপরে স্নেহকোমলতার জয় সূচিত হইয়াছে।

প্রশ্ন ৭। "বাইশ" কবির মনসামঙ্গল সংকলনগ্রন্থের মধ্যে আখ্যায়িকার কিরূপ নূতন নূতন সূত্র সংযোজিত হইয়াছে ও সামগ্রিকভাবে উহার অগ্রগতি কিরূপে সাধিত হইয়াছে তাহা বিচার কর। [ক. বি., ১৯৬২]

অথবা, মনসামঙ্গলের আখ্যানভাগ "বাইশ কবির মনসামঙ্গল"-এ কিরূপ অবিচ্ছিন্নভাবে অনুসৃত ও কতকটা সার্থকভাবে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে তাহা কাহিনীবিন্যাস-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও। [ক. বি., ১৯৬৩]

অথবা, বাইশ কবির মনসামঙ্গল মধ্যযুগের বাঙালী কবিদের দীনেশচন্দ্র সেন কথিত 'পুচ্ছগ্রাহিতা'র একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন—এই মন্তব্যের যাথার্থ্য বিচার কর। এই কাব্য-প্রয়াসে কাহিনীগত ঐক্য ও রসপরিণাম কতখানি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, এই প্রসঙ্গে তৎসম্পর্কে আলোচনা কর। [ক. বি., ১৯৬৪]

অথবা, বাইশ কবির মনসামঙ্গল কাব্যে দেখা যায় যে নানা কবির রচনা হইতে সঙ্কলিত কাহিনীর বিভিন্ন অংশ একটি অভিন্ন ভাবসূত্রে গ্রথিত অখণ্ড আখ্যানকাব্যে সংহত হইয়াছে। ইহার মধ্যে মহাকাব্যের কিছু কিছু লক্ষণ বর্তমান আছে কিনা তাহা এই বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে নির্ণয়ের চেষ্টা কর। [ক. বি., ১৯৬৭]

অথবা, মনসামঙ্গল কাব্যকে মধ্যযুগের বাংলায় জাতীয় কাব্য আখ্যা দেওয়ার যৌক্তিকতা কতখানি, পঠিত কাব্যের গঠন ও ভাববস্তু বিশ্লেষণ করিয়া তাহা বিচার কর। [ক. বি., ১৯৬৯]

উত্তর: বাইশ কবির মনসামঙ্গল প্রকৃতপক্ষে একটি সংকলনগ্রন্থ। মনসামঙ্গলের কাহিনীটির অনুসরণে মনসামঙ্গলের প্রধান প্রধান কবির রচনার অংশবিশেষ সংকলন করিয়া পূর্ণাঙ্গ কাহিনীটি দাঁড় করাইয়াছেন সম্পাদক মহাশয়। কাহিনীটি

যেভাবে মনসামঙ্গলের কবিরা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে মোটামুটি কোন পার্থক্য নাই। সব কবিই মূল কাহিনীটি একইভাবে বলিয়া গিয়াছেন। কতগুলি গৌণপ্রসঙ্গে মাত্র কবিদের মধ্যে কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। গায়েনরা নানা কবির কাব্য হইতে সংকলন করিয়া বাইশা গ্রথিত করিতেন। এ বিষয়ে মঙ্গলকাব্য বিশেষজ্ঞ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় লিখিয়াছেন, "গায়েনগণ যে অঞ্চলে মনসা-মঙ্গল গান করিতেন, সেই অঞ্চলের বিভিন্ন কবির রচনা একত্র করিয়া একটি সংকলন সম্পাদন করিয়া লইতেন; ইহাতে যে কবির যে অংশ সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হইত, সেই কবির সেই অংশই সংকলিত হইত। এইভাবে বহু কবির রচনা একত্র করিয়া এক একটি পুঁথি গ্রথিত হইত।" এইরূপ ঘটা সম্ভব হইয়াছে কারণ সব কবির মনসামঙ্গলেই একটি বিশিষ্ট কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। অন্য মঙ্গলকাব্যও তাই। "এই মঙ্গলকাব্যগুলি বিষয়ের দিক দিয়া একই আখ্যানের পুনরাবৃত্তি—বিভিন্ন কবির কাব্যে কিছু কিছু বর্ণনাভঙ্গির বৈচিত্র্য, কবিত্বশক্তির তারতম্য ও খণ্ড আখ্যানের নূতন সংযোজনের মাধ্যমে কবির স্বাতন্ত্র্যের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়।" [ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]।

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের একটি প্রধান লক্ষণ ছিল পুচ্ছগ্রহিতা। মনসামঙ্গলের একই কাহিনী সব মনসামঙ্গলকার বলিয়াছেন, চণ্ডীমঙ্গলের কবিরাও একই কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। মুকুন্দরামের মত প্রতিভাবান কবিও ঐতিহ্যের নিকট হইতে পাওয়া গল্পই পুরোপুরি ব্যবহার করিয়াছেন। সেইরূপ ধর্মমঙ্গলেরও কবি অনেক, কিন্তু কাহিনী এক। বৈষ্ণবপদাবলীতেও দেখিতে পাই একই প্রেম-পর্যায় একই মুড একই চিত্রের ব্যবহার একের পর এক অনেক কবিই করিয়াছেন। এই অনুকরণ-প্রিয়তার একটি বড় কারণ হইল মধ্যযুগীয় জীবন পরিবেশ। মধ্যযুগে বাঙালীজীবনে কোনরূপ বৈচিত্র্য ছিল না। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তাহারা একইভাবে জীবন চালাইত। ফলে তাহাদের জীবন সম্পর্কিত বোধের মধ্যে কোনরূপ বৈচিত্র্য ছিল না। কোনরূপ স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটে নাই। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি ছিল না সমাজে। জীবন যেমন এক পথে ধীর গতিতে গড়াইয়া চলিত—মনও সেই একইভাবে চলিত। যে সব কাহিনী জনপ্রিয় তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে সেকালের কবিদের সংকোচ ছিল না। বরং এইরূপ করিলেই তাহাদের শ্রোতা ও পাঠকেরা তৃপ্তি পাইত; অন্যরূপ করিলে—প্রচলিত পথ ছাড়িয়া নতুন কিছু, মৌলিক কিছু করিতে গেলে জনসাধারণ তাহাকে সদয় চিত্তে গ্রহণ করিত না। তাহা ছাড়া অধিকাংশ কবিই ছিলেন সাধারণ স্তরের ক্ষমতাসম্পন্ন। তাঁহাদের মানসিক আলস্যই নূতন কাহিনী উদ্ভাবনে বাধা দিত।

মনসামঙ্গল কাহিনীর কেন্দ্রীয় অংশ হইল চাঁদ ও মনসার বিবাদ। এই বিবাদ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত গল্পগুলি আসিয়াছে—মনসার ধন্বন্তরি বা শঙ্কর গারুড়ি বধ, চাঁদের ছয় পুত্র বধ, চাঁদের বাণিজ্য ও নৌকাডুবি, লক্ষীন্দর-বেহুলার জন্ম কথা ও অনিরুদ্ধ-উষার বিবরণ, লক্ষীন্দর-বেহুলার বিবাহ, বাসরে লক্ষীন্দরের মৃত্যু, মৃতদেহ লইয়া বেহুলার স্বর্গে গমন ও ধনজনসহ প্রত্যাবর্তন, চাঁদের মনসাপূজা। মনসামঙ্গলের সব কবিই এই ঘটনাগুলির বিবরণ দিয়াছেন। ইহার মধ্যে কেহ কেহ ধন্বন্তরি বধ কাহিনীকে অতিরিক্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন স্বয়ং বিজয়গুপ্ত। অনেকের কাব্যেই এ প্রসঙ্গ বেশ সংক্ষিপ্ত। কাব্যের মূল কাহিনীর পক্ষে অতটা বিস্তার অবাস্তর ছিল। আবার অনিরুদ্ধ-উষা-হরণ বৃত্তান্তকে কেতকাদাস ও বিষ্ণুপাল সুবিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন। অনেক কবিই ইহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখমাত্র করিয়াছেন।

পূর্বোক্ত মূল ঘটনাগুলি ছাড়াও কয়েকজন মনসামঙ্গলের কবি যেমন বিজয়গুপ্ত, দ্বিজবংশী প্রভৃতি হাসান-হোসেন নামক দুই কাজীর অত্যাচার এবং মনসার হাতে তাহাদের শিক্ষালাভের কাহিনী উল্লাসভরে বলিয়াছেন। অনেক মনসামঙ্গলে ইহার উল্লেখমাত্র আছে, আবার বহু কবির কাব্যে ইহার উল্লেখও নাই। তাহাছাড়া মনসার পূর্ব বিবরণ মিলিতেছে একমাত্র বিজয়গুপ্তের কাব্যে। সেখানেই মনসাচরিত্র পরিকল্পনায় বিজয়গুপ্তের মনস্তত্ত্ববোধের সুন্দর পরিচয় রহিয়াছে। আবার মাত্র দ্বিজবংশীদাসের কাব্যেই চাঁদের পূর্বকথা বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে।

বর্তমান বাইশার সম্পাদক মহাশয় চাঁদ-মনসার বিবাদ, বেহুলা কর্তৃক সেই বিরোধের অবসান—এই মূল সূত্রে কাহিনীটি গ্রথিত করিয়াছেন। তাঁহার শিল্পবোধ অনুযায়ী তিনি এমনভাবে অংশগুলি নির্বাচিত করিয়াছেন যাহাতে গল্পের ধারাটি অব্যাহত থাকে অথচ পাঠক সুরচিত অংশ পড়িবার সুযোগ পায়। তিনি দ্বিজবংশীদাসের কাব্য হইতে চাঁদ মনসার বিবাদের সূত্রপাত অংশটি গ্রহণ করিয়াছেন। ধন্বন্তরি-বধ বিজয়গুপ্ত হইতে গৃহীত হইবার কারণ, তাঁহার কাব্যেই এই বিষয়টি একটি বিস্তৃত ও সুপুষ্ট রূপ লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। অন্য কবিদের রচনায় ইহা একান্ত অপুষ্ট। ছয়পুত্র-বধ-কথাও বিজয়গুপ্তের কাব্যান্তর্গত। এই অংশের বর্ণনায় বিজয়গুপ্ত যে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন সে কারণেই উক্ত কবির রচনা হইতে এই অংশগুলি সম্পাদক গ্রহণ করিয়াছেন। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল হইতে গৃহীত অংশে বেহুলার চরিত্র-ব্যক্তিত্বে—একটা তীক্ষ্ণ আত্মাভিমানের ভাব প্রকটিত। এই দিক দিয়া মনসামঙ্গলের অপরাপর কবির তুলনায় তিনি শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়াছেন। নারায়ণদেবের রচনা হইতে সম্পাদক মহাশয় কাহিনীর শেষাংশ সঙ্কলন করিয়াছেন।

এই বিষয়ে গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে সম্পাদক লিখিয়াছেন, "কাহিনীর শেষাংশের পরিকল্পনাতেই নারায়ণদেব সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—তাঁহার পরবর্তী কবিগণও এই বিষয়ে কোন দিক্ দিয়াই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। মনসামঙ্গল কাহিনীর শেষাংশের দুইটি প্রধান বিষয় আছে—প্রথমতঃ, বেহুলা-লক্ষীন্দরের প্রত্যাবর্তন ও দ্বিতীয়তঃ, মনসার প্রতি চাঁদের আচরণ। এ কথা সত্য যে, মনসামঙ্গলের উপসংহারে বেহুলা-লখীন্দরের পুনঃপ্রত্যাবর্তন কবি-কল্পনাপ্রসূত একটি রূপকমাত্র; ইহা সত্য নহে, সত্য হইতেও পারে না। ভারতীয় ধর্ম ও সাহিত্যের আদর্শে বীর কিংবা বীরাঙ্গনার মৃত্যুর পর তাঁহার পুনর্জীবনপ্রাপ্তি না দেখাইলে তাহা কাব্য হইতে পারে না; সেইজন্য মনসামঙ্গলকে একটি আনুপূর্বিক কাব্যরূপ দিবার জন্য বেহুলা লক্ষীন্দরের প্রত্যাবর্তনের বৃত্তান্ত ইহাতে যুক্ত হইয়াছে। কিন্তু যাহা রূপক কিংবা কল্পনাশ্রয়ী মাত্র, তাহা সত্য বলিয়া ভ্রম করিলে রসসৃষ্টির ব্যাঘাত হয়। রূপককে রূপকের মত করিয়া বর্ণনা করাও সাধারণ কবি-শক্তির কাজ নহে; সেইজন্য অধিকাংশ কবির রচনাতেই রূপকের সঙ্গে সত্যের ব্যবধানটুকু ঘুচিয়া গিয়াছে। কিন্তু নারায়ণদেব এই রূপকের মর্যাদা সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়াছেন।.........তাঁহার বর্ণনায় কল্পনা কল্পনাই রহিয়াছে। এই সঙ্কলনের শেষ কয়টি অধ্যায় স্বপ্নমাত্র—সর্বশেষ অধ্যায়টি সুমিত্রার স্বপ্ন; অপূর্ব কৌশলে নারায়ণদেব এই স্বপ্নকে রূপায়িত করিয়াছেন।" [ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য]

সমগ্রতঃ বলা যায় মঙ্গলকাব্যবিষয়ে অভিজ্ঞ এবং রসিক সম্পাদক ডঃ ভট্টাচার্য মনসামঙ্গলের কাহিনীটি যথাযথ রক্ষা করিয়াছেন, এবং নির্বাচন-গুণে শ্রেষ্ঠ অংশ সমূহের সংযোজনের দ্বারা আপন অভীষ্ট সিদ্ধিতে সমর্থ হইয়াছেন। পাঠক পৃথক পৃথক কবিদের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে না বটে, কিন্তু মনসামঙ্গলের কাহিনী ও চরিত্র-গুলির বিকাশ ভালভাবেই অনুভব করিতে পারে। গল্পটির মধ্যে আকর্ষণী শক্তি আছে, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটি তীব্র দ্বন্দ্বের সূত্রে কাহিনীটি গ্রথিত হইয়াছে। বাইশ কবির মনসামঙ্গলে মনসামঙ্গলের সব শিল্পগুণই রক্ষিত হইয়াছে।

এই কাহিনীকে জাতীয় মহাকাব্য বলা যায় কিনা এই প্রশ্নটির বিচার করিতে গেলে মনে রাখিতে হইবে যে মঙ্গলকাব্য মহাকবির হাতের সৃষ্টি নয়। মনসামঙ্গলের কোন কবিই এত প্রতিভাধর ছিলেন না, কিংবা এত বিশাল ও গাঢ় জীবনদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন না যাহাতে তাঁহাদের কাহাকেও মহাকবি আখ্যায় ভূষিত করা চলে। মহাকবির হাতে পড়ে নাই বলিয়া মনসামঙ্গল অবশ্যই যথার্থ মহাকাব্য বলিয়া দাবি করিতে পারে না। কিন্তু উপযুক্ত মহাকাব্য হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা ইহার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ছিল।

প্রথমতঃ, মনসামঙ্গলে বাংলাদেশের জাতীয় জীবনের একটা বিশিষ্ট কাল প্রতিফলিত। একথা ঠিক বিজয়গুপ্ত পঞ্চদশ শতকের এবং জগজ্জীবন ঘোষাল অষ্টাদশ শতকের কবি। কিন্তু এই চারিশত বৎসর বাংলাদেশের সমাজজীবনে মধ্যযুগের আবহাওয়া বিরাজ করিয়াছে। তাহার মধ্যে ওলটপালট হইয়া যাইবার মত গুরুতর কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। বাংলাদেশের সেকালের সমাজ তাহার বৈচিত্র্য লইয়া জীবন্ত হইয়া আছে মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে। জাতকর্ম, বিবাহ, প্রেতকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য-হাটবাজার; ভোজন, পোষাক, শিক্ষাব্যবস্থা সমাজের সর্বমহলেরই স্পষ্ট ছবি মনসামঙ্গল ধরিয়া রাখিয়াছে। এই দিক দিয়া মনসামঙ্গলকে জাতীয় কাব্য বলিয়া চিহ্নিত করা চলে।

দ্বিতীয়তঃ, মনসামঙ্গলের উত্তরকালের কবিরা পূর্ববর্তী কবিদিগের আদর্শটিরই অনুসরণ করিয়াছেন। প্রথম দিকের কবিদের হাতে, চৈতন্যপূর্বকালেই কাহিনীগুলির আদিরূপ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তখনও ব্রাহ্মণ্য অব্রাহ্মণ্য সাংস্কৃতির দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে নাই। এই যুগগত তাৎপর্যটি মনসামঙ্গল কাব্যে রক্ষিত হইয়াছে। সেই দিক দিয়া ভাবিতে গেলে মনসামঙ্গলে জাতীয় জীবনের একটি বিরাট সত্য ও তাৎপর্য ধরা পড়িয়াছে।

সন্দেহ নাই ব্রাহ্মণ্য-অব্রাহ্মণ্য সংস্কারের দ্বন্দ্ব, চাঁদ সদাগরের দৃঢ় এবং মনসা-দ্রোহী চরিত্র, দেবতার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মানুষের দুঃসাহসী প্রতিরোধ উচ্চস্তরের মহাকাব্যের বিষয়।

কাজেই একথা বলা চলে যে জাতীয় মহাকাব্য হইয়া উঠিবার উপাদান মনসামঙ্গলে অবশ্যই আছে।

মিশ্রিত হইয়াছে। কখনও পূর্বের ঘটনা পরে উপস্থিত করিয়া কৌতূহল বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কাহিনীকাব্যের এই নূতন আদর্শ মধুসূদন পাইয়াছেন ইউরোপীয় সাহিত্যের নিকট হইতে। বাংলা মঙ্গলকাব্যে অথবা প্রাচীন সংস্কৃত আখ্যানকাব্যে কোথাও এই রীতির সন্ধান মেলে না। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এই প্রয়াস সুনিশ্চিত অগ্রগতিরূপে গণ্য হইতে পারে।

তাহা ছাড়া মধুসূদনের মেঘনাদবধকাব্যে আমরা এমন একটা স্বাদ পাইলাম যাহা বাংলা সাহিত্যে একেবারে নূতন। উহা মহাকাব্যের আস্বাদ। মহাকাব্যিক স্বাদের মূল কথাটি হইল Sublime। গভীর, গাঢ়, ব্যাপক ও মহিমাময়। Authentic এবং literary epic নামে দুই শ্রেণীর মহাকাব্যেই এই বিশিষ্ট আস্বাদটি পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে কালিদাস-মাঘ-ভারবি প্রভৃতি কবির যেসব রচনা মহাকাব্য নামে পরিচিত তাহারা ঠিক এই অর্থে মহাকাব্য নয়। রামায়ণ ও মহাভারতেই মাত্র এই সাব্লাইমের মহান আস্বাদ আমরা পাইয়া থাকি। সব দেশের সাহিত্যে মহাকাব্য রচিত হয় নাই। বিশেষতঃ মহাকাব্যের যুগ বহুদিনই গত হইয়াছে। শেষ মহাকাব্য পাই মিলটনের। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় মধুসূদন এমন একখানি কাব্য রচনা করিলেন যাহার মধ্যে যথার্থ ক্লাসিক মনোভাব এবং সাব্লাইমের স্বাদ লাভ করা যায়।

আধুনিক বাংলা কাব্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া আখ্যানকাব্য-মহাকাব্যের প্রাধান্যই চলিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্য-গুলির জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ ছিল।

মেঘনাদবধকাব্য আধুনিক বাংলা কাব্যের সর্বপ্রধান গুণ যে মানবমুখীতা তাহাকে শিল্পসৌন্দর্যের পরিপূর্ণতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিল। পূর্ববর্তী কাব্যে দেববিষয়ই ছিল অবলম্বনীয় বিষয়। দেবতার মহিমাকীর্তন, ভক্তিরসের প্রচার, ধর্মভাবের প্রসারই ছিল সববিধ বাংলা কবিতার লক্ষ্য। মানুষ ছিল গৌণ। মানুষের জীবন ও ভাবাবেগের যে সব চিত্র কাব্যে স্থান পাইত তাহা মামুলী ধরনের। তাহার মধ্যে গভীরতা বা জটিলতা ছিল না। মধুসূদনই প্রথম বাঙালী কবি যিনি দেবতার দিক হইতে সুনিশ্চিত ও সম্পূর্ণভাবে মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। মানবচরিত্রের বিচিত্র রহস্য তিনি অনুধাবন করিতে চাহিলেন। মেঘনাদবধ কাব্যে মানবপ্রবণতা প্রকাশ পাইয়াছে নিক্ত রীতিগুলির মধ্য দিয়া।

প্রথমতঃ, তিনি মধ্যযুগপ্রচলিত ধর্মভাব ও ভক্তি-ভাবনার বিরুদ্ধে যেন এক বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। রামচন্দ্র যেন সব ভক্তি বিশ্বাস ও ভগবৎভাবনার প্রতিনিধিরূপে চিত্রিত। রাবণ ও মেঘনাদে সব মনুষ্যবীর্য ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। কবি এই মনুষ্যবীর্যের প্রতিই তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে চাহিয়াছেন। "I despise Rama his rabble, but the idea of Ravana kindles and elevates my imagination. He was a grand fellow." দ্বিতীয়তঃ, মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি কবি সমর্থন ও শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা individualism বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার পথিকৃৎরূপে বিবেচিত হইতে পারে। মানুষ একটা

পুঁথিগত আদর্শমাত্র নয়। মানুষ দোষগুণের তালিকা নয়। প্রতিটি মানুষের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা এবং না-জানা রহস্যের বৈচিত্র্য রহিয়াছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাহা অসাধারণ। মধুসূদনই প্রথম মেঘনাদবধকাব্যে চরিত্রের ব্যক্তিগত বৈচিত্র্যের চিত্র আঁকিয়াছেন। রাবণ, মেঘনাদ, প্রমীলা, সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, মন্দোদরী, চিত্রাঙ্গদা প্রতিটি চরিত্রই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে দীপ্যমান। কাহাকেও পাপী, কাহাকেও পুণ্যাত্মা, কাহাকেও ভীরু দুর্বল, কাহাকেও যুদ্ধলিপ্সু রমণী—এত সরল ভাবে বাহির হইতে অঙ্কন করা হয় নাই। বীরাঙ্গনা রমণীও এখানে প্রেমভাবে কাতর, বিশ্বাসঘাতক পিতৃব্যও ক্বচিৎ ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি স্নেহে ব্যাকুল, পরনারীহরণকারী স্নেহে প্রেমে কর্তব্যে বীর্যে রাজকীয় গুণে বেদনাবোধে মহিম। এই জাতীয় চরিত্রচিত্রণ প্রণালী বাংলা সাহিত্যে একেবারে নূতন এবং আধুনিক ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রমাণ।

মেঘনাদবধকাব্য রসসৃষ্টির আদর্শেও একেবারে অভিনবত্ব সৃষ্টি করিয়াছে। পুরাতন কোনো কাব্যে ইহা ছিল না, নবীন কাব্যাদির ইহাই একমাত্র আদর্শ। মেঘনাদবধ-কাব্য মিশ্ররসের রচনা। যে জাতীয় রসাবেদনে মিশ্রণ ঘটানো সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে নিষিদ্ধ ছিল তাহাদের মধ্যে মিলন ঘটাইয়া অভিনব স্বাদসৃষ্টির কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে মেঘনাদবধকাব্যে। বীররস এ-কাব্যে প্রধান হইয়া উঠে নাই—শেষ পর্যন্ত যেন করুণ-রসেরই প্রতিষ্ঠা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সে করুণরস মোটেই মামুলী করুণরস নয়—ইহার সহিত বীর্যভাবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আবার শৃঙ্গাররসাত্মক প্রসঙ্গগুলিও শুধু শৃঙ্গার-রসের স্বাদই বিতরণ করে না। উহার সহিতও বীরভাবের সংযোগ বর্তমান। বলা যায় কবির একটি আঙুল যখন শৃঙ্গার বা করুণ রসের তার বাজাইয়াছে তখন অন্য আঙুলে পিছন হইতে রুদ্র গম্ভীর স্বরে বীররসের সুর আকাশে উঠিয়াছে। আধুনিক কবি মানবজীবন ব্যক্তিচরিত্র হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখেন নাই। ফলে রসের স্বাদ ব্যক্তিচরিত্রের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সমন্বিত রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

মেঘনাদবধকাব্যের পূর্বে দু-তিনটি নাটকে ট্র্যাজেডি রচনার ক্ষীণপ্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সে-সব ক্ষেত্রে করুণরস বিশেষ গভীর বা সার্থক হইয়া উঠে নাই। অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত করুণরসের সহিত ট্র্যাজেডির যে গোড়ার পার্থক্য আছে তাহাও অনেকেই অনুধাবন করিতে পারেন নাই। মধুসূদনের রাবণ চরিত্রে ট্র্যাজেডির যে দাবদাহ সৃষ্টি হইল তাহা বাংলা সাহিত্যের সামনে একটি সম্পূর্ণ নূতন সম্ভাবনাদ্বার খুলিয়া দিল। আধুনিককালে সাহিত্যে যাহা কিছু বড় সৃষ্টি সব কিছুই ট্র্যাজেডি। মেঘনাদবধ কাব্যে বাংলা ট্র্যাজেডি-সাহিত্যের ভিত্তি পত্তন হইল।

আধুনিক সাহিত্যের একটা প্রধান সুর হইল স্বাদেশিকতা। বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে ইহা অজ্ঞাত ছিল। মধুসূদনের পূর্বে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় এবং রঙ্গলালের পদ্মিনীতে আমরা এই ভাবধারার প্রথম প্রকাশ দেখি। কিন্তু কাব্যপ্রাণের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত হইয়া মেঘনাদবধকাব্যে উহা শিল্পশোভন রূপ ধরিয়াছে। মেঘনাদের চরিত্রে, রাক্ষসদের স্বদেশ প্রেমে, বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের উক্তিতে উহা সম্যক প্রতিফলিত।

ঘটনা হিসাবে মেঘনাদের মৃত্যুকে কেন্দ্রে রাখিয়া রাবণের শোকের আর্তনাদই এই কাব্যের আসল ব্যাপার। রাবণের শোকার্তিতে এই সুরই বাজিয়াছে যে দৈবাহত হইয়াই তাহার এই সর্বনাশ ঘটিতেছে। কেহ হয়ত বলিবেন সীতাহরণের পাপের ফলেই রাবণের বিরুদ্ধে বিশ্ববিধান গিয়াছে। কিন্তু বিশ্বব্যাপী যে কপটতা, যে চক্রান্ত মেঘনাদের মৃত্যু ঘটাইবার জন্য উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে তাহা পাপের শাস্তিরূপে পুণ্যের বিধান একথা বলা চলে না। পাপ-পুণ্য, কল্যাণ-অকল্যাণের প্রশ্ন নয়—রুষ্ট বিশ্ববিধানের কার্যপরম্পরা বুদ্ধির অতীত। অজ্ঞাত নিয়তিই এই সর্বনাশের মূল নিয়ন্তা।

প্রশ্ন ১১। মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে সমালোচকের নিম্নোক্ত মন্তব্য অবলম্বন করিয়া বিস্তৃত আলোচনা কর—"সত্য বটে, শব্দাড়ম্বর সর্বত্র কাব্যের মাধুর্য বাড়ায় নাই, কিন্তু অনেক স্থানেই শব্দচ্ছটা চিত্র ও ভাবকে মূর্ত ও গাঢ়বদ্ধ এবং ভাষাকে দীপ্ত করিয়াছে।" **(ক. বি. ১৯৬২)**

উত্তর। মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য লইয়া সমালোচকেরা যেসব সমালোচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে একটি প্রধান বিষয় ছিল কাব্যটির ভাষার অতিমাত্রায় গাম্ভীর্য, লালিত্য এবং মাধুর্যের অভাব, অকারণ শব্দাড়ম্বর। সবদাই যেন কবি বিশাল সমুদ্রের গর্জন, পর্বতের সমুচ্চতা লইয়া আসিয়াছেন। সবদাই কাব্যমধ্যে রথরথী অশ্বগজে প্রকম্পিত হইয়াছে এই কাব্য দেহ। ইহার ফলে কাব্যটি কৃত্রিম শব্দাড়ম্বরপূর্ণ একটা নিষ্প্রাণ বিপুল দেহস্থূলতায় পর্যবসিত হইয়াছে অথবা ইহার দ্বারা কবি কাব্যমধ্যে কোনো বিশেষ ধরনের রসসৃজনে সফল হইয়াছেন—তাহাই দ্রষ্টব্য।

মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা ও ছন্দের প্রধান লক্ষ্য হইল গাম্ভীর্য ও বীর্যের ভাব জাগাইয়া তোলা। তিনি যেন একটি Heroic Poem লিখিতে বসিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মিনী উপাখ্যানে Heroic Poem রচনার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হইয়াছিল, বিশেষ করিয়া ভাষা-ব্যবহারে যথার্থতার অভাবের জন্য। মধুসূদনের লক্ষ্য আরও উচ্চ ছিল। তিনি Heroic Poem-এর মধ্যে সবচেয়ে উঁচুজাতের যে সাহিত্যরূপ সেই মহাকাব্য রচনা করিতে গেলেন। এতকাল বাংলা ভাষা ললিত লাবণ্য সৃষ্টিতেই বেশী উৎসাহ অনুভব করিয়াছে। বৈষ্ণব কবিতার ভাবানুধায়ী ভাষারও মুখ্য লক্ষ্য ছিল মাধুর্য। যুদ্ধবর্ণনামূলক কাব্যগুলিও আদৌ যুদ্ধের উদ্দাম সুরটি প্রকাশ করিতে পারে নাই। যে-কোনো ভাব বা রসের প্রকাশই তরল ছিল। পয়ার-ত্রিপদী ছন্দের আবেদনে বীর্যবত্তা প্রকাশের সুযোগ বড় ছিল না। মধুসূদন দত্ত শব্দ ও ছন্দের ক্ষেত্রে একেবারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন লইয়া আসিলেন। ভাষা ও ছন্দকে তিনি গম্ভীর বিপুল বিস্তৃত অনুভূতি প্রকাশের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিলেন।

মেঘনাদবধকাব্যের ভাষা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য উহার ছন্দ-কল্পনার অভিনবত্বের সঙ্গে যুক্ত। সাধারণ পয়ার-ত্রিপদীর ঢিমে তাল ও একঘেয়ে সুরের পক্ষে শব্দের এরূপ বিপুল ঐশ্বর্যকে ধরিয়া রাখা আদৌ সম্ভবপর হইত না। সেক্ষেত্রে এরূপ শব্দ ব্যবহার

শব্দের অকারণ কোলাহল বলিয়া মনে হইত। কিন্তু মধুসূদন-উদ্ভাবিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যে শব্দধারণের এক অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা রহিয়াছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দ অত্যন্ত গতিশীল। চোদ্দমাত্রার চরণে উহার গতি শৃঙ্খলিত নয়। যেমন প্রবল বেগবতী নদীগর্ভে পতিত প্রস্তরখণ্ডগুলি জলধারার গতিকে ব্যাহত করিতে পারে না, শুধু পারস্পরিক সংঘর্ষে এক বিচিত্র বাজনা বাজাইয়া তোলে। অমিত্রাক্ষর ছন্দ যতি-পাতকেও ভাবানুযায়ী যদৃচ্ছ দৈর্ঘ্য দান করিতে পারে,—ফলে ভাবগাম্ভীর্য সৃষ্টির সম্ভাবনা এই ছন্দের মধ্যেও রহিয়াছে যথেষ্ট।

মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা অর্থাৎ ইহার শব্দচয়ন, শব্দবয়ন, নূতন শব্দ নির্মাণ এবং শব্দচিত্র গঠন বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কবি অত্যন্ত সচেতনভাবে এই কাজগুলি করিয়াছেন। তাঁহার ঝোঁক কিন্তু তৎসম শব্দের দিকে। বিশেষ করিয়া যে শব্দ-গুলিতে যুক্তাক্ষরের ধ্বনিঝঙ্কার শ্রুত হয়, যে শব্দগুলি গম্ভীর, যেগুলি সমাসবদ্ধ তাহাদের প্রতিই কবির বেশী আকর্ষণ। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গের মাত্র প্রথম ত্রিশটি চরণে নিম্নলিখিত শব্দগুলি পাওয়া যাইতেছে—

বীর-চূড়ামণি, অমৃতভাষিণি, সেনাপতি-পদে, রক্ষঃকুলনিধি, রাক্ষসভরসা,
ঊর্মিলা-বিলাসী, নিঃশঙ্কিলা, চরণারবিন্দ, শ্বেতভুজে, পদ্মাসন, ভবমণ্ডল,
কাব্যরত্নাকর, সুচন্দন-বৃক্ষশোভা, বিশ্বরমে, চিত্ত-ফুলবন-মধু।

এই অল্প একটু নিদর্শনের সাহায্যে বুঝা যাইতেছে কবির কাব্য কি ধরনের শব্দ-বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। একথা অবশ্য ঠিক নয় যে মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষায় কোমল ও মধুর ভাব মোটেই ফুটিয়া উঠে নাই। কোনো কোনো স্থানে কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং তাঁহার শব্দব্যবহারের বিশিষ্টতার সাহায্যে গম্ভীর ও বিপুলের রস না ফুটাইয়া, প্রকাশ করিয়াছেন অন্য ধরনের অনুভূতিকে। যেমন, চতুর্থ সর্গটি জুড়িয়া কবি একটি কোমল করুণ ও মধুর সুর বাজাইয়াছেন। কবির ভাষা ও চন্দ ঐরূপ রসসৃষ্টিতে প্রয়োজন বোধে যে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইতে সমর্থ ইহা দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হয়। চতুর্থ সর্গে সীতাবর্ণিত পঞ্চবটীর যে চিত্র কবি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার কোমল মাধুর্য বিশেষভাবে উপভোগ্য।

সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী-করে ;
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু
সৌর-কর-রাশি-বেশে সুর-বালা-কেলি
পদ্মবনে ;

আবার— অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে !
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরু-মূলে,
সখী-ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা
কুরঙ্গিণী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি।

ইহা ছাড়া অন্যত্রও মাধুর্যসৃষ্টিতে কবি-ভাষার সার্থকতা লক্ষ্য করার মত। মেঘনাদ-প্রমীলার প্রণয়সম্পর্কের চিত্র কোথাও তরল হইয়া উঠে নাই, কিন্তু উহার সংযত মাধুর্যসৃষ্টিতে কবির ভাষা বিস্ময়কর সাফল্য দেখাইয়াছে। পঞ্চম সর্গে মেঘনাদ কর্তৃক প্রমীলার নিদ্রাভঙ্গের যে চিত্র আঁকা হইয়াছে তাহার একটু অংশ এখানে উদ্ধৃত হইল। মেঘনাদ প্রমীলাকে বলিতেছে—

ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখীকুল! মিল, প্রিয়ে, কমল-লোচন!
উঠ, চিরানন্দ মোর! সূর্যকান্তমণি
সম এ পরাণ, কান্তা, ...
উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম!

এইরূপ কয়েকটি বিশেষ বিশেষ স্থানে কোমল মাধুর্য প্রকাশ করিলেও তাহার মধ্যে একটি অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়। কবির ভাষার এমনই নৈপুণ্য যাহাতে উহার মধ্যেও গাঢ়তা ও সংযম দানা বাঁধিয়া রহিয়াছে।

মেঘনাদবধ কাব্যে ট্র্যাজেডিই মুখ্যবাদ। উহাও ঠিক তরল করুণ রস নয়, উহার মধ্যে রহিয়াছে অত্যন্ত গাঢ় দৃপ্ত অনুভূতি। শব্দব্যবহারের ফলে একটা গম্ভীর সুর, একটা উজ্জ্বল গাঢ়বদ্ধ চিত্র কিভাবে ধরা পড়িয়াছে নিম্নের উদ্ধৃতিগুলির মাধ্যমে তাহা দেখান যাইতে পারে। উপমাচিত্রে ভাবের ভয়ঙ্করত্ব শব্দাড়ম্বরের মধ্য দিয়া গাঢ় রূপ লাভ করিয়াছে এইসব স্থানে—

পশিলা পুরে রক্ষঃ-মন্দাকিনী
রণবিজয়িনী ভীমা, চামুণ্ডা যেমতি
রক্তবীজে নাশি দেবী, তাণ্ডবি উল্লাসে,
অট্টহাসি রক্তাধরে, ফিরিলা, নিনাদি.
রক্তস্রোতে আর্দ্রদেহ।

আবার প্রমীলার বীর সৈন্যবাহিনার হুঙ্কারের প্রতিক্রিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে শব্দব্যবহারের বৈশিষ্ট্য—

কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে, কাঁপিল
মাতঙ্গ নিষাদী, রথে রথী, তুরঙ্গমে
সাদীবর, সিংহাসনে রাজা, অবরোধে
কুলবধূ, বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে,
পর্বত-গহ্বরে সিংহ, বন-হস্তী বনে,
ডুবিল অতল জলে জলচর যত।

মধুসূদনের কবিচিত্তের বিশিষ্ট প্রবণতা এবং কাব্যবস্তুর গম্ভীর মহিমা তথা মহাকাব্যিক রসাবেদন স্থষ্টির বাসনায়ই তাঁহার ভাষাঘটিত গাঢ় শব্দাড়ম্বর দেখা দিয়াছে। ইহার সার্থকতা অবশ্যই স্বীকার্য। তবে ইহার ফলে শব্দাড়ম্বরের অতিরেক যে মাঝে মাঝে অপ্রয়োজনীয় এবং রসচ্যুতির কারণ হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—"Mr. Dutta, however, is not faultless. He wants repose. The winds rage their loudest when there is no necessity for the lightest puff. Clouds gather and pour down a deluge, when they need do nothing of the kind; and the sea grows terrible in its wrath, when everybody feels inclined to resent its interference. All the bombast is unworthy of Mr. Dutta's genius and cultivated taste."

প্রশ্ন ১২। 'মেঘনাদবধ'-এর যুদ্ধবর্ণনার মধ্যে পৌরাণিক আদর্শ অনুসৃত হইলেও উহার যুদ্ধ পরিবেশটি ফুটাইয়া তুলিতে কবিকে বিশেষ কৌশল ও ব্যঞ্জনাশক্তির প্রয়োগ করিতে হইয়াছে।—মন্তব্যটির সমীচীনতা বিচার কর। (ক. বি. ১৯৬৫)

উত্তর। মেঘনাদবধকাব্যকে কবি Heroic Poem বলিয়াছেন। কাব্যের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন—

গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত।

অবশ্য তাহার অর্থ এই নয় যে বীররসপ্রধান—মুখ্যতঃ যুদ্ধবর্ণনামূলক কাব্য তিনি রচনা করিতে চাহিয়াছেন। আসলে একটি ভাবগম্ভীর বীর্যগুম্ফিত মহাকাব্য রচনাই তাঁহার উদ্দেশ্য। যুদ্ধপ্রসঙ্গ কাব্যটির আন্তস্থ নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এই বিষয়ে কবি একটি চিঠিতে বলিয়াছেন, "The nature of the story does not admit much in the martial line. Homer is nothing but battle. I have, like Milton, one. That is Book VII and I hope I have succeeded, at least, to a respectable extent." কবির এই চিঠির দ্বারাই বুঝা যায় যুদ্ধ ব্যাপারের স্থূল প্রসঙ্গে কবি মধুসূদনের চিত্ত কোনোকালেই বিশেষ আসক্ত হয় নাই।

কাব্যের প্রধান ঘটনা লক্ষ্মণের হাতে মেঘনাদের মৃত্যু। কিন্তু সেখানেও যুদ্ধ ঘটে নাই। বিনাযুদ্ধে শৃঙ্খলাবদ্ধ সিংহের ন্যায় মেঘনাদ নিহত হইয়াছে। একমাত্র কাব্যের সপ্তম সর্গে যুদ্ধবর্ণনা রহিয়াছে। সারা কাব্যটি জুড়িয়া সুসজ্জিত সৈন্যদের বর্ণনা অনেক আছে। এ বিষয়ে জনৈক সমালোচকের উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, "মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে সৈন্যদের রণসজ্জা ও পথ-পরিক্রমার একাধিক চিত্র আছে, যুদ্ধান্তে রণক্ষেত্রের ধ্বংসাবশেষও একটি চিত্রে অঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধবর্ণনা বড় নেই।... মেঘনাদবধকাব্যের সর্গে সর্গে যুদ্ধসজ্জা, যুদ্ধযাত্রার বর্ণোজ্জ্বল সমারোহ, কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধবর্ণনা একটিমাত্র সর্গে। আসলে মধুসূদন বীররসের শোভাযাত্রার তটস্থ দর্শক, অবগাহনকারী উপভোক্তা নন।" ("মধুসূদনের কবিআত্মা ও কাব্যশিল্প")

সপ্তম সর্গে রাবণ যুদ্ধযাত্রা করিয়াছে পুত্র মেঘনাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্ত। এই যুদ্ধে রাবণ লক্ষ্মণকে শক্তিশেলে আহত করিয়াছে। এই যুদ্ধবর্ণনামূলক সর্গটি কিন্তু কাব্যগুণের বিচারে উচ্চস্তরের রচনা নয়। মেঘনাদবধকাব্যের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য রহিয়াছে প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ এবং নবম সর্গে।

সপ্তম সর্গ অবশ্য কাব্যের একটি শ্রেষ্ঠ অংশ নয়। কিন্তু যুদ্ধবর্ণনায় কবি যে সাফল্য দেখাইয়াছেন পূর্বের বা পরের অন্য কোনো বাঙালী কবি তাহা দেখাইতে পারেন নাই। বাংলা কাব্য যুদ্ধবর্ণনায় প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষ লাভ না করিলেও—মধুসূদনের রচনাই উহার মধ্যে সম্ভবমত সফলতা লাভ করিয়াছে।

মধুসূদন যুদ্ধবর্ণনার ক্ষেত্রে পৌরাণিক রীতির অনুসরণ করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণের যুদ্ধবর্ণনার একটু অংশ এখানে উদ্ধৃত হইল। রাবণ বিভীষণকে আঘাত করিল—

রথ না সম্বরে রাজা গর্জিয়া কোপেতে।
বিভীষণে মারিতে যে শেল লয় হাতে॥
শেলপাট এড়িলেক দিয়া হুহুঙ্কার।
স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে লাগে চমৎকার॥
শেলপাট দেখে চমকিত বিভীষণ।
ডেকে বলে প্রাণ রাখ ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
শেলের উদ্দেশেতে লক্ষ্মণ এড়ে বাণ।
তিন বাণে শেল কাটি করে চারিখান॥

সরল পয়ার ছন্দে পৌরাণিক বর্ণনার প্রচলিত সহজ রীতিতে কৃত্তিবাস যুদ্ধের একটি বিশ্বাসযোগ্য চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। মধুসূদন যুদ্ধবর্ণনায় এই রীতিকেই শব্দগাম্ভীর্যে বীর্যমণ্ডিত রূপ দান করিয়াছেন। সুগ্রীব ও রাবণের রণ বর্ণ... অস্ত্র দ্বারা অস্ত্র নিবারণের চিত্র আঁকিয়াছেন কবি।—

এতেক কহিয়া বলী। অর্থাৎ সুগ্রীব) গর্জি নিক্ষেপিলা
গিরিশৃঙ্গ। অম্বর আঁধারি ধাইল
শিখর, সুতীক্ষ্ণ শরে কাটিলা সুরথী
রক্ষোরাজ, খান খান করি সে শিখরে।
টঙ্কারি কোদণ্ড পুনঃ রক্ষঃ-চূড়ামণি
তীক্ষ্ণতম শরে শূর বিঁধিলা সুগ্রীবে
হুঙ্কারে!

পৌরাণিক বর্ণনার সহিত মধুসূদনের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে সন্দেহ নাই। মধুসূদন অভিপ্রেত রসের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বর্ণনারীতিকে বিশিষ্ট করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। প্রথমতঃ, পৌরাণিক বর্ণনার তুলনায় তাঁহার রচনা অনেক বেশী চিত্রধর্মী। দ্বিতীয়তঃ, ঘটনার পরে ঘটনা এমন সুকৌশলে বিন্যস্ত

করিয়াছেন কবি যাহাতে নাট্যরস সৃষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ, শব্দচয়নের ব্যাপারে কবি অত্যন্ত সতর্ক। শব্দগাম্ভীর্যে যুদ্ধক্ষেত্রের পরিবেশ, বীর্যের ভাব, বিভীষিকা প্রভৃতি সুন্দর ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

মধুসূদন ভারতীয় পুরাণ এবং গ্রীক পুরাণ দুই উৎস হইতেই বর্ণনার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ এই দুই শ্রেণীর পুরাণের সহিতই তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কোন্ জাতীয় পুরাণের কি ধরনের আদর্শ তিনি অনুসরণ করিয়াছেন একটু লক্ষ্য করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

প্রথমতঃ, ভারতীয় পুরাণে যুদ্ধের যে বর্ণনা আছে তাহা অনেকখানি আদর্শায়িত (idealised)। ব্যাস-বাল্মীকির মহান সৃষ্টি হইতে কৃত্তিবাস-কাশীরাম দাস পর্যন্ত একই ধারা প্রবাহিত। অস্ত্রাঘাতে অস্ত্র নিরোধ, তীর দ্বারা তীর বা ভল্লাদি প্রতিরোধ করার দীর্ঘ তালিকা সেখানে একটা বড় স্থান জুড়িয়া আছে। কিন্তু হোমরাদির রচনায় অর্থাৎ ইউরোপীয় পৌরাণিক কাব্যে আমরা দেখি যুদ্ধের বর্ণনা তুলনামূলক ভাবে অনেক বাস্তবধর্মী। সেখানে ভল্ল-কুন্তের দ্বারা এক এক আঘাতেই শত্রু নিপাতিত হয়। মধুসূদন বর্তমান ক্ষেত্রে ভারতীয় পুরাণের রীতিতেই কলাকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, হোমরের কাব্যে দেবতাদের প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতে দেখা যায়। ভারতীয় পুরাণে অনুরূপ বর্ণনা কোথাও দেখা যায় না। এক্ষেত্রে মধুসূদন গ্রীক মহাকবির অনুসরণ করিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ, ভাষা ও উপমাদি ব্যবহারে পরবর্তী লেখকদের তুলনায় অতি প্রাচীন মহাকবিদের আদর্শে তিনি গাম্ভীর্যসৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছেন এবং সফলও হইয়াছেন।

প্রশ্ন ১৩। মেঘনাদবধকাব্যের চরিত্ররূপায়ণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একদা যে কৃত্রিমতার অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কি বিচারসহ? রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ বিশ্লেষণ করিয়া এ বিষয়ে তোমার মতামত দাও। (ক. বি. ১৯৬৬)

উত্তর। প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধকাব্য সম্বন্ধে অত্যন্ত বিরূপ সমালোচনা করিয়াছিলেন। নানা কারণে মেঘনাদবধকাব্যটি কবির ভালো লাগে নাই। উহার প্রধান কারণ সম্ভবত কবির রোমাণ্টিক গীতিধর্মী মন মধুসূদনের ক্লাসিকপ্রবণতা পছন্দ করে নাই। মহাকাব্যের কাহিনীবিন্যাস, যুদ্ধবর্ণনার বাহুল্য, বীররসাত্মক চরিত্রসৃষ্টির চেষ্টা গীতিকবি রবীন্দ্রনাথের কাছে কৃত্রিম বলিয়া মনে হইয়াছে। মানুষের হৃদয়ের একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি-উপলব্ধিই কবির নিকট অকৃত্রিম সত্য। কিন্তু মেঘনাদবধের চরিত্রসৃষ্টির মূল্য বিচার করিতে হইলে কাহিনীকাব্যের দিক হইতেই ইহাকে দেখিতে হইবে। এই জাতীয় চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে বিচারের প্রথম মাপকাঠি হইল—চরিত্রগুলি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে কিনা। জনৈক সমালোচক বলিয়াছেন যে রচনার পাত্র-পাত্রীর গায়ে ছুরি বসাইয়া দিলে রক্ত পড়িবে বলিয়া যদি মনে হয় তবেই তাহারা সার্থক। মেঘনাদবধকাব্যের অধিকাংশ চরিত্র সার্থকতার এই প্রথম বিচারে তো উত্তীর্ণ হই,

কাহিনীসম্পদ হইতে তিনি অংশবিশেষ নির্বাচন করিয়াছে। কিন্তু সেই কাহিনীর মধ্যেই তিনি এমন একটি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন যাহাতে সমগ্র মহাভারতীয় কাহিনীরই একটি ইতিহাসোচিত ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতে পারে।

নবীনচন্দ্র সেন অতীত ভারতের একটি নব্য ঐতিহাসিক পরিচয় প্রদান—মহাভারতের অলৌকিক কাহিনীর ও কাব্যসৌন্দর্যের মধ্যে লুক্কায়িত প্রাচীন সত্য—আবিষ্কার করিতে চাহিয়াছেন। এই আবিষ্কার ও ব্যাখ্যানের মধ্যে রহিয়াছে নবযুগোচিত ভাবনা ও জীবনদৃষ্টি।

নবীনচন্দ্রের ধারণা—প্রাচীন ভারতের ইতিহাস মহাভারতে কাব্যাকারে বর্ণিত হইয়াছে, উহা কল্পনাপ্রসূত মহাকাব্য মাত্র নয়। মহাভারতের মন্ত্র হইল গোটা ভারতের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ, ধর্ম ও বিশ্বাসের মধ্যে মিলনসাধনের। ভারতভূমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু রাজ্যে বিভক্ত মগধ, মিথিলা, চেদি, অযোধ্যা, হস্তিনা, বিদর্ভ, বিরাট, সিন্ধু, মথুরা, গান্ধার, অঙ্গ, বঙ্গ, উৎকল প্রভৃতি। রাজ্যগুলি পরস্পর বিবদমান। কৃষ্ণের সাধনা হইল খণ্ড খণ্ড ভারতভূমিকে সম্মিলিত করিয়া সর্বপ্রকার অনৈক্যের অবসান। অন্যথায় আর্যজাতির কোনো ভবিষ্যতই আর থাকিবে না। কৃষ্ণ কাব্যের সপ্তদশ সর্গে এই আদর্শটি বুঝাইয়াছেন অর্জুনকে—

এক ধর্ম এক জাতি, একমাত্র রাজনীতি,
একই সাম্রাজ্য, নাহি হইলে স্থাপিত,
জননীর খণ্ড দেহ হবে না মিলিত।
ততদিন হিংসানল, হায়! এই হলাহল,
নিবিবে না, এ শ্মশান হইবে ভারত,
আর্যজাতি, আর্যনাম, হবে স্বপ্নবৎ।

ভারত ইতিহাসের এই অনৈক্য শুধু রাজ্যে রাজ্যে দ্বন্দ্ব নয়—ইহার মূলে রহিয়াছে আর্য-অনার্য বিরোধ। এই বিরোধের কারণ হইল ব্রাহ্মণদের প্রচারিত নীতিবোধ—যাগযজ্ঞপ্রধান জটিল ধর্মপ্রথা। উহার ফলে অনার্যদের ন্যায় একটি অতি প্রাচীন জাতি ভিক্ষুকে পরিণত—

যেই নীতিচক্রে
হতেছে অনার্যজাতি এত নিষ্পেষিত,
তোমরা ব্রাহ্মণগণ প্রণেতা তাহার
শীর্ষস্থানে ঋষিগণ। (রৈবতক—৪র্থ সর্গ)

ইহাদের মিলনের সব বাধা দূর করিতে হইবে, কৃষ্ণ-প্রেমের মধ্য দিয়া পূর্ণ সম্মিলন ঘটিবে। ঐকান্তিক ভাবে নিষ্কাম ধর্মের আদর্শকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করিবে।

এই পরিকল্পনাটিকে কবি তিনটি কাব্যে মহাভারতের তিনটি প্রতিনিধিমূলক কাহিনীর মধ্য দিয়া উপস্থিত করিতে চাহিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র একটি চিঠিতে নবীনচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার পরিকল্পনাটি খুবই বিশাল ও মহিমান্বিত—কিন্তু তার রূপায়ণ যথোপযুক্ত হওয়া চাই—

"You have planned a new 'Mahabharat' indeed—an exceedingly ambitious work......It is nothing against the plan that it is ambitious. Provided that you execute with same grandeur as you have planned, you will perfectly justify yourself. Properly executed, the poem will of course take its rank as the greatest in the language ...I warn you, however, not to be too confident of success......If executed adequately, many will probably consider it as the Mahabharat of the nineteenth century. The old Mahabharat is so grand and has such a deep hold of your readers that only first class execution can make the new acceptable to them."

বঙ্কিমচন্দ্র যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই শেষ পর্যন্ত সত্য হইয়াছে। বিষয়-ভাবনা ও আদর্শগত বিশালতা সত্ত্বেও কাব্যগঠনে নবীনচন্দ্র সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই।

রৈবতক কাব্য সামগ্রিক পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়। রৈবতকে কৃষ্ণের ধর্মরাজ্য মহাভারত স্থাপনের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের বিবাহ এই কাব্যের কাহিনীরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। মহাভারতের সুভদ্রাহরণের গল্পরূপে আকর্ষণ আছে। এই গল্পটিকে শুধুমাত্র গল্পহিসাবে বিবৃত করিতে চাহেন নাই। তিনি ঐ কাহিনীর মধ্য দিয়া মহাভারত-ভাবনার প্রথম স্তরটি স্থাপিত করিতে চাহিয়াছেন। সুভদ্রাকে কৃষ্ণের মহান আদর্শের একটি প্রধান স্তম্ভরূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন কবি। সুভদ্রা সেবাধর্মের প্রতীক—এই সেবার মধ্যে নিষ্কাম আচরণের চরম সত্য প্রকাশ পাইয়াছে। অর্জুনকে কবি শ্রীকৃষ্ণের বাহুবলরূপে কল্পনা করিয়াছেন। অর্জুন-সুভদ্রার বিবাহের মধ্য দিয়া বাহুবল ও সেবাধর্মের মিলন ঘটাইয়াছেন কবি। প্রথম কাব্য রৈবতকের এই ভিত্তির উপরেই "কুরুক্ষেত্র" কাব্যটি গড়িয়া উঠিয়াছে।

পরিকল্পনা যত বিশালই হউক, এবং তত্ত্বভাবনার তাৎপর্য যাহাই হউক না কেন, তাহাকে উপযুক্ত কাব্যরূপে রচনা করিয়া তুলিতে হইবে। কাহিনীর মধ্য দিয়া, চরিত্রের স্বাভাবিক মানবিক রূপের মধ্য দিয়া কবির আইডিয়াটি প্রকাশিত হওয়া চাই। বক্তৃতা বা বিবৃতির মত করিয়া যদি আইডিয়া প্রকাশিত হয়—তাহাকে কাব্যহিসাবে গ্রহণ করা চলে না।

রৈবতকের ক্ষেত্রেও সেই বিপদ ঘটিয়াছে। রৈবতকে কবি আপনার আইডিয়াটি বেশ স্পষ্ট করিয়াই বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই তত্ত্বটি বুঝাইতে গিয়া কাব্যমধ্যে বক্তৃতাকে একটা বড় রকমের স্থান দিতে হইয়াছে। সাধারণ সংলাপ মানুষের চরিত্রের একটা স্বাভাবিক ও আভ্যন্তর প্রকাশ। উহা একটা জীবন্ত ব্যাপার। কাহারও সংলাপের মধ্য দিয়া যদি কোনো তত্ত্বচিন্তা প্রকাশও পায় তাহাও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের সহিত মিলিয়া যাওয়া উচিত। কোনো ব্যক্তি যদি নীতিগ্রন্থের মত পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা তত্ত্ব ব্যাখ্যান করিতে ও উপদেশ দিতে থাকে তাহা হইলে উহার মনুষ্যত্বেই সন্দেহ জাগে।

রৈবতকে কৃষ্ণ, ব্যাস প্রভৃতি প্রধান পাত্ররা প্রায়ই বক্তৃতাকার রূপে বড়—জীবন্ত প্রাণোত্তাপে পূর্ণ চরিত্র হইয়া উঠে নাই। আবার সুলোচনা, সত্যভামা, শৈল প্রভৃতি চরিত্রে প্রাণলীলার তরলতা এতই উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে যাহাতে মহাকাব্যের সব গাঢ়তা, কবির পরিকল্পনার সব বিশালতা একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। দুর্বাসা, বাসুকি, জরৎকারুর চরিত্র তিনটিই মাত্র জীবন্ত মানুষ রূপে ধরা দেয়। বাসুকি চরিত্রের গঠনে কতকটা ভাস্কর্যধর্মী নিপুণতা আছে, জরৎকারুর কামনাকম্পিত ভাব এবং দুর্বাসার খলমূর্তি সুচিত্রিত। ইহারা সকলেই আবেগতরঙ্গিত, কিন্তু পূর্বোক্ত চরিত্রগুলির মত ইহারা একেবারে তরল হইয়া পড়ে নাই। চরিত্রের অতি তরলতা মহাকাব্যোচিত পরিবেশের পক্ষে একান্ত অসঙ্গত।

চরিত্রসৃষ্টিতে কবি দুই একটি ক্ষেত্রে মাত্র সীমাবদ্ধ সাফল্যের পরিচয় দিয়াছেন। অধিকাংশ স্থলেই তাঁহাকে ব্যর্থতা বরণ করিতে হইয়াছে।

চরিত্রসৃষ্টিতে যে তরলতা ও অতিরিক্ত-উচ্ছ্বাসপ্রবণতা দেখি, বর্ণনাকেও তাহাই করিয়া তুলিয়াছে অসংহত, অসংবদ্ধ। কোথাও যেন দৃঢ়তা, গাঢ়তা বা মেরুদণ্ড নাই। মাঝে মাঝে বাঙালীর পরিবার-রসের উপস্থাপনায়, বা বালক চরিত্রের (যেমন মন্মথ, ষষ্ঠ সর্গ) আধোআধো ভাব মহাকাব্যের সমুন্নত রসকে বিনষ্ট করিয়াছে।

কবির বর্ণনক্ষমতা গম্ভীরের জগতে পৌছিতে কিভাবে বাধা পাইয়াছে নীচে উদ্ধৃত একটি নিদর্শনের দ্বারা তাহা দেখা যাইতে পারে। কবি সমুদ্রের তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ মহিম রূপের ছবি আঁকিতে চাহিয়াছেন—

গম্ভীর ওঁকার ধ্বনি প্লাবিল গগন,
ভাসিল সমুদ্র মন্দ্রে, উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে
ছুটিল তরঙ্গপৃষ্ঠে দিগ্ দিগন্তরে।
ঊর্ধ্বে মহাশূন্যে, মহা জলধি-হৃদয়ে,
সেই মহাধ্বনি সহ শত শঙ্খধ্বনি,
ভাসিল সমুদ্রবাহী প্রভাত-অনিলে।
শঙ্খকণ্ঠ, সিন্ধুকণ্ঠ, নরকণ্ঠ মিলি,
সেই ধ্বনি, সেই ধাম, সে দৃশ্য মহান্!

কবির শব্দ-চয়নের দৈন্য প্রথমেই চোখে পড়ে। কবি একই শব্দকে একাধিক বার ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার ফলে কবির আন্তরিক তাগিদ মাত্র বুঝা যাইতেছে,—কবি বারবার বলিতেছেন 'উচ্ছ্বাস'—ইহার ফলে কবির চিত্ত যে উচ্ছ্বসিত এইটুকুই মাত্র বুঝা যাইতেছে—পাঠকের মনকে উহা আবেগোচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিতে পারিতেছে না। কবি এই কয়েকটি চরণ বর্ণনায় "মহা", "মহান" এই শব্দটি চারবার ব্যবহার করিয়াছেন, "কণ্ঠ" শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে তিনবার, "ধ্বনি" তিনবার। কবি খুবই উত্তেজিত—বর্ণনাটি পাঠে এইরূপ বুঝা যায়, কিন্তু কবি-চিত্তের উত্তেজনাকে থিতাইয়া ছবি করিয়া তোলায় কবির চেষ্টা বিশেষ সফল নয়।

চরিত্রসৃষ্টি এবং বর্ণনায়ই শুধু নয়, কাহিনীগঠনেও সৃজনীক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। সুভদ্রাহরণের গল্পটির প্রতি নবীনচন্দ্র যেন মোটেই দৃষ্টি দিবার সময় পান নাই। কখনও দ্বন্দ্বসঙ্কুল করিয়া, কখনও পাঠকের কৌতূহল উদ্রেক করিয়া, কখনও ঘটনার দ্রুতগতিতে, কখনও ধীরভাবে অগ্রসর হইয়া কবিরা কাহিনীকে আকর্ষণীয় করিয়া তোলেন। কিন্তু নবীনচন্দ্র যেন আদর্শটির অবলম্বনরূপেই মাত্র সুভদ্রাহরণকে অবলম্বন করিয়াছেন। গল্পের প্রতি তাঁহার কোনো মায়া নাই।

উদ্দেশ্যপ্রবণতা তাঁহার চরিত্রগুলির মত কাহিনীটিকেও ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। কবির উদ্দেশ্য—সুবৃহৎ পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ উচ্চ ঘোষণা হইয়াই থাকিয়াছে—সার্থক কাব্যসৃষ্টি হইয়া উঠে নাই।

প্রশ্ন ২। "রৈবতক পাঠ করিয়া কবি হেমচন্দ্র বলেন, নবীনচন্দ্র সাদাসিধা 'সুভদ্রাহরণ' লিখিলেই ভাল করিতেন। নবীনচন্দ্র বলেন, সুভদ্রাহরণ লেখা যে রৈবতকের উদ্দেশ্য নহে, তাহা কি হেমবাবু বুঝিলেন না?"—এই বাদ-প্রতিবাদে তুমি কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবে? উপযুক্ত যুক্তি-সহযোগে আলোচনা কর।

(ক. বি. ১৯৬৭)

অথবা,

রৈবতক কাব্যে কাহিনীগঠন কি সার্থক হইয়াছে? কিম্বা কাহিনীর শিল্পরূপ তাত্ত্বিক আদর্শের চাপে একেবারে গৌণ হইয়া পড়িয়াছে?

উত্তর। রৈবতক কাব্যের অবলম্বিত বিষয় হইল সুভদ্রাহরণ। এই সুভদ্রাহরণকে আশ্রয় করিয়া কবি একটি বিশাল তাত্ত্বিক ভাবাদর্শকে উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছেন, কাব্যতত্ত্ব নহে। কোনোরূপ তাত্ত্বিক উদ্দেশ্যের স্পর্শমাত্র না থাকিলেও আখ্যান-কাব্য হইতে পারে, খুব উচ্চস্তরের কাব্যই রচিত হইতে পারে। যেমন মধুসূদনের মেঘনাদবধকাব্য। এই কাব্যে জীবনের একটি গাঢ় গভীর ভাবনার প্রকাশ আছে, এবং উহারও কোনো স্বতন্ত্র রূপ নাই। সব তাৎপর্যই কাহিনীর মধ্যে লীন হইয়া আছে কাহিনীটিই যেন সব। অন্যদিকে অবলম্বিত কাহিনীটি নেহাৎই বহিরঙ্গ বিষয় হইলে যত মহৎ তত্ত্বকথাই বলা হউক না কেন—কাব্য হিসাবে উহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যায়।

নবীনচন্দ্র সেন রৈবতক কাব্যে সুভদ্রাহরণকে কাহিনীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কাহিনীরূপে কবি ইহাকে কতটা সার্থকভাবে রূপায়িত করিতে পারিয়াছেন সেই সমস্যার উপরেই কাব্যহিসাবে ইহার মূল্য নির্ভর করিতেছে।

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "বীরবাহু" নামক সাধারণ আখ্যান-কাব্য এবং "বৃত্রসংহার" নামক মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। মহাকাব্য হিসাবে বৃত্রসংহার সার্থক নয়। কিন্তু একথা ঠিক যে হেমচন্দ্র কাব্যের মধ্যে কোনো তত্ত্বচিন্তা লইয়া আসিতে চাহেন নাই। তিনি গল্প বলিয়াছেন, মোটামুটি সুসংগতভাবেই বলিয়াছেন;—চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, খুব উচ্চতর জীবনরহস্য প্রকাশ না পাইলেও মোটামুটি জীবন্ত নরনারী গঠন করিয়াছেন। তাহার গল্প ও চরিত্রের মধ্য দিয়া নবযুগের কিছু ভাবনা

প্রকাশিত হইলেও তাহা গল্প বা চরিত্রকে কোথাও আচ্ছন্ন করে নাই। গল্প ও চরিত্র আপনিই চলিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর নব্যমানবচেতনা এবং স্বাজাত্যবোধ তাহার সহিত একাকার হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। তাই "রৈবতক" পড়িয়া হেমচন্দ্র যখন অভিযোগ করেন যে কবি নবীনচন্দ্র সাদাসিধা সুভদ্রাহরণ লিখিলেই পারিতেন, তখন তিনি বলিতে চাহেন দুটি কথা—

(১) নবীনচন্দ্র সুভদ্রাহরণের কাহিনী লিখিতে গিয়া বেশী তত্ত্বকথা আনিয়া ফেলিয়াছেন। ফলে মূল গল্পটি বিঘ্নিত হইছে।

(২) সাধারণভাবে কাহিনীকাব্যে 'সাদাসিধা' কাহিনী-কথনই কবির লক্ষ্য হওয়া উচিত; কাহিনীটিকে গৌণ অবলম্বনে পরিণত করিয়া তত্ত্বচিন্তাকে প্রাধান্য না দেওয়াই সঙ্গত।

হেমচন্দ্রের এই মন্তব্যের পূর্বোক্ত তাৎপর্য যথাযথভাবে অনুধাবন করিতে পারেন নাই কবি নবীনচন্দ্র। তিনি ভাবিলেন যে হেমচন্দ্র তাঁহার রৈবতক রচনার অভিপ্রায়টি বুঝিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার বক্তব্য—"সুভদ্রাহরণ লেখা যে রৈবতকের উদ্দেশ্য নহে, তাহা কি হেমবাবু বুঝিলেন না।" হেমবাবু তাহা অবশ্যই বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে সমর্থনযোগ্য মনে করেন নাই। উহার ফলেই নবীনচন্দ্রের কাব্যটি শিল্প হিসাবে ব্যর্থ হইয়াছে, ইহাই তাঁহার অভিযোগ।

সন্দেহ নাই হেমচন্দ্রের সমালোচনাই অনেক বেশী যুক্তিযুক্ত। "রৈবতক" কাব্যটির বিষয় বিশ্লেষণ করিলেই সে কথা বুঝা যাইবে।

রৈবতক কাব্যটি আয়তনে সুবিশাল। প্রথম সর্গের নাম "প্রভাস"। কবি মহাকাব্যের [illegible]াংশের নায়ক কৃষ্ণকে আখ্যানাংশের নায়ক অর্জুনের সঙ্গে উপস্থিত করিয়াছেন। উভয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্যরসে মগ্ন। ঋষিগণ সৌরাষ্টক, মহাষ্টক প্রভৃতি আবৃত্তি করিয়া কাব্যদেহ বৃদ্ধি করিয়াছেন। ঘটনার সাক্ষাৎ মিলিল সর্গের শেষে, দুর্বাসা যখন ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণার্জুনকে অভিশাপ দিলেন। কৃষ্ণ-দুর্বাসার বিবাদের সঙ্গে কাহিনীর এবং তত্ত্বচিন্তার সম্পর্ক গুরুতর। অর্জুন-সুভদ্রার মিলন ব্যাপারে দুর্বাসা বারবার গুরুতর প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিবে। কৃষ্ণের সর্বমানব মিলনমন্ত্রের বিরুদ্ধবাদী ভেদবুদ্ধির প্রতীক দুর্বাসা। কিন্তু সেই দুর্বাসা-কৃষ্ণের বিরোধের যে কারণ দেখান হইয়াছে তাহা অর্থহীন, যুক্তিহীন। হয়ত শকুন্তলার অভিশাপের (কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক) অনুসরণেই এইরূপ পরিস্থিতির কল্পনা করিয়াছেন কবি। কিন্তু এখানেও তাঁহার কল্পনা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে। কারণ এক্ষেত্রে দুর্বাসার ভূমিকা দীর্ঘস্থায়ী ও গুরুতর—শকুন্তলার ন্যায় সাময়িক ও আকস্মিক নয়। তাই এই বিরোধের পেছনে বাস্তব ও গুরুতর কারণ থাকা প্রয়োজন ছিল।

দ্বিতীয় স্বর্গ "ব্যাসাশ্রমে"—ব্যাসের আশ্রমের বর্ণনা আছে, ঋষিদের আশ্রমের [illegible]স মহিমা অতিরিক্ত বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত। সর্গের শেষদিকে কৃষ্ণের মুখ সুভদ্রার অনেক গুণপনা (বিশেষত: তাহার সেবাধর্মের কথা) শুনিয়া অর্জুন তাহার সম্পর্কে শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছে। অর্জুন-সুভদ্রার এক ধরনের পূর্বরাগরূপে কবি এই অংশকে

ব্যবহার করিতে চাহিয়াছেন। নিঃসন্দেহে এই পদ্ধতি দুর্বল। কবি যদি সুভদ্রার সেবামূর্তির সম্বন্ধে এত বেশী আচ্ছন্ন না হইতেন তবে কাহিনীর নায়ক-নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎকারের পূর্বে এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া প্রাথমিক আকস্মিকতা ও রোমান্স-রসকে অনেকখানি নষ্ট হইতে দিতেন না।

তৃতীয় সর্গ "অদৃষ্টবাদ।" ব্যাসদেবের উপদেশে এই সর্গ ভারাক্রান্ত; মূল কাহিনীর অর্থাৎ সুভদ্রা-অর্জুনের প্রসঙ্গমাত্র নাই। বরং এক উপকাহিনীর সূত্রপাত আছে। অনার্য রাজ্যচ্যুত নাগরাজ চন্দ্রচূড়কে ভুল করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন অর্জুন। অনুশোচনা-ভারাক্রান্ত চিত্তে তিনি চন্দ্রচূড়ের অনাথা বালিকা-কন্যার খোঁজ করিয়া বেড়াইতেছেন। পরবর্তী অংশে দেখা যায় যে, এই সূত্র কাহিনীর মধ্যে অবান্তর প্রসঙ্গ ও চরিত্র আনিয়া অনভিপ্রেত অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে।

চতুর্থ সর্গ "মহাসন্ধি"। ঘটনাক্রমে এই সর্গটি গুরুত্বপূর্ণ। দুর্বাসা এবং বাসুকি কৃষ্ণের অভিপ্রায় বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে। বাসুকির কৃষ্ণবিরূপতা তথা সুভদ্রার প্রতি আসক্তিকে দুর্বাসা কৃষ্ণের আদর্শ বিনষ্ট করিবার কাজে লাগাইবে। এইভাবে সুভদ্রা-অর্জুনের মিলন তথা কৃষ্ণের আদর্শ দুইদিক হইতেই প্রতিপক্ষকে উপস্থাপন করা হইয়াছে এই সর্গে। ঘটনার নাটকীয়তা এবং চরিত্রদুইটির প্রবৃত্তিতাড়িত চঞ্চলরূপ নিঃসন্দেহে কাহিনীপুষ্টির সহায়ক হইয়াছে।

"অনুরাগ" নামে চিহ্নিত পঞ্চম সর্গে অতি তরল গীতরসধারা প্রবাহিত। সুলোচনা এবং সত্যভামার সখি-সমাচার পারিবারিক তরল রস সৃষ্টি করিয়াছে। সুভদ্রার অর্জুনানুরাগের সংবাদ মিলিয়াছে এই সঙ্গে—তাহাও সুলোচনার মারফৎ সংবাদ আকারে পরিবেশিত, প্রত্যক্ষ বর্ণনায় জীবন্ত হইয়া উঠে নাই।

ষষ্ঠ সর্গ "পুরোদ্যানে"। অর্জুন সুভদ্রার প্রথম সাক্ষাৎ। কবি ঘটনাহীন এই প্রণয়ী-সাক্ষাতে গীতিরস ও বাৎসল্যরসের বিচিত্র সমন্বয় ঘটাইয়াছেন। পাত্রপাত্রীর চরিত্রমহিমা তো রক্ষিতই হয় নাই; উপরন্তু ঘটনাহীন এই সর্গে বর্ণনীয় বিষয়বস্তুর অভাব কবি নানারূপ অর্থহীন, প্রসঙ্গহীন, অযৌক্তিক ও অবিশ্বাস্য আকল্পনার (fancy) দ্বারা পূরণ করিয়া লইয়াছেন।

সপ্তম সর্গে শ্রীকৃষ্ণের "পূর্বস্মৃতি"। ইহাতে কৃষ্ণের বৃন্দাবন ও মথুরালীলার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় কাব্যকাহিনীর সঙ্গে উহার কোনোরূপ সম্বন্ধ আবিষ্কার করা যায় না। কৃষ্ণচরিত্রের দিক হইতে সপ্তম সর্গ তাৎপর্যপূর্ণ কিন্তু সুভদ্রাহরণ কাহিনীর দিক হইতে একেবারে প্রয়োজনহীন।

অষ্টম সর্গে "দলিত ফণিনী" জরৎকারুর চিত্র। কৃষ্ণের প্রতি তাহার ব্যর্থ প্রণয়ের যন্ত্রণা—দুর্বাসার সহিত তাহার বিবাহ প্রভৃতি বৃত্তান্ত মূল কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয় নাই। তবে পৃথকভাবে দেখিলে তাহার কামনা-প্রগল্‌ভ চরিত্রটি সুঅঙ্কিত।

নবম সর্গের নাম "আত্মবিসর্জন" খুব শ্লথগতিতে হইলেও মূল কাহিনী আগাইয়াছে। অর্জুনের প্রতি বালকের ছদ্মবেশধারিণী শৈলজার (মৃত চন্দ্রচূড়ের কন্যা) নীরব প্রেম,

শৈলজার নিকট হইতে অর্জুন-সুভদ্রার অনুরাগ-বার্তা শ্রবণে বাসুকির ক্রোধ সীমাবদ্ধভাবে হইলেও নাটকোচিত ভঙ্গীতে প্রকাশিত।

দশম সর্গে "কুমারী ব্রত"। কবি সামান্যতম উপলক্ষে সুভদ্রাকে দিয়া বিশ্বপ্রেমের অনেক বক্তৃতা শুনাইয়াছেন। তবে এই সর্গে কিছু ঘটনাও আছে। বাসুকি কর্তৃক সুভদ্রা হরণের চেষ্টা, অর্জুনের কাছে তার পরাজয় ও পলায়ন। কিন্তু নৃত্যপর লঘু ছন্দে এবং চটুল ভাষায় আদ্যন্ত বিবৃত হওয়ায় এই অংশ আদৌ বিষয়ানুগ হইয়া উঠে নাই।

একাদশ সর্গে "মানিনীর পণ"। সর্গের শেষদিকে সত্যভামা অর্জুন-সুভদ্রার মিলন ঘটাইবার প্রতিজ্ঞা করিতেছে। কিন্তু গোটা সর্গ জুড়িয়া সত্যভামা, সুলোচনা এবং মহাভারত-স্রষ্টা কৃষ্ণ যে মান-অভিমানের লীলা অভিনয় করিয়াছে তাহা যাত্রাগানের "মানভঞ্জন" পালা হইতে কিছুমাত্র উৎকৃষ্ট নয়। উহা মূলকাহিনীর সহিত সম্পর্কহীন, কবির অভিপ্রেত তত্ত্বের সহিত সংযোগহীন, এবং মহাকাব্যের রসাস্বাদ সমূলে বিনষ্ট করিবার উপযোগী।

দ্বাদশ সর্গ "সোঽহং"। মহাভারতীয় কর্মকাণ্ডের নায়ক কৃষ্ণ বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তর সংবাদ সংগ্রহ করিতেছেন। চতুর্দিকে পুঞ্জীভূত অস্থিরতা, একটা প্রবল বিপর্যয় ঘনাইয়া আসিতেছে। তাহারই মধ্যে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণ আপনার নতুন ভাব-উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিতেছেন ব্যাসদেব ও অর্জুনের নিকট। নবীনচন্দ্রের তাত্ত্বিক আদর্শের দিক হইতে এই সর্গটি প্রয়োজনীয়—অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অবলম্বিত কাহিনীর সহিত ইহার কোনো যোগ নাই। তাহা ছাড়া কাব্য-হিসাবেও এই সর্গের মূল্য বিশেষ নাই। ইহা আদর্শবাদী বক্তৃতা মাত্র।

"দুর্বাসার দৌত্য" নামক ত্রয়োদশ সর্গ কাহিনীর বিবর্তনের দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দুর্বাসা কৃষ্ণভ্রাতা বলরামের সহিত দেখা করিয়া পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে তাহাকে উত্তেজিত করিতেছে। বলরামকে ভুলাইয়া দুর্যোধনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করিতেছে। দুর্বাসার উদ্দেশ্য অনেকখানি সিদ্ধ হইয়াছে। কারণ কৃষ্ণ অর্জুন-সুভদ্রার বিবাহের প্রস্তাব করিলেও বলরাম তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া দিলেন। এই সর্গে নাট্যঘটনায় বিশেষ জটিলতা দেখা গিয়াছে। অবশ্য বলরামের চরিত্র-কল্পনায় ও সংলাপে যে ধরণের লঘুতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে তাহাতে কবির শিল্পগত অভিপ্রায় অনেকখানি বিনষ্ট হইয়াছে।

চতুর্দশ সর্গের নাম "ঊর্ণনাভ"। এই সর্গে দুর্বাসা ও বাসুকির আলাপে সুভদ্রা বিষয়ে বাসুকির আসক্তি এবং দুর্বাসার চক্রান্তের কথা প্রকাশ পাইয়াছে। কিছুটা শিথিলভাবে হইলেও মূল কাহিনীর জটিলতা বৃদ্ধিতে এই সর্গ সাহায্য করিয়াছে।

পঞ্চদশ সর্গের নাম দেওয়া হইয়াছে "গঙ্গা-যমুনা"। বলরাম দুর্যোধন-সুভদ্রার বিবাহ দিবার চেষ্টা করায় যে সমস্যা দেখা দিয়াছে সে-বিষয়ে কৃষ্ণ, রুক্মিণী ও সত্যভামা বিচিত্র বাক্যজাল বিস্তার করিয়াছে। তাহাতেও কাহিনী বিবর্তনে কোনো নূতন প্রসঙ্গ সংযোজিত হয় নাই। বরং দীর্ঘস্থান জুড়িয়া রুক্মিণী-সত্যভামা এই দুই সপত্নীর মধ্যে এক ধরনের অবান্তর রসকলহ চলিয়াছে।

"ব্যাধিবন্ধন" নামক ষোড়শ সর্গে সুভদ্রা-অর্জুনের প্রণয়ালাপ—শেষার্ধ সত্যভামা-সুলোচনার চটুল রসিকতায় পূর্ণ।

সপ্তদশ সর্গের নাম "মহাভারত"। কৃষ্ণ এই সর্গে বিস্তৃতভাবে তাঁহার নব ভারত রচনার পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঘটনার স্রোত থামিয়া গিয়াছে। এখানে শুধুই তত্ত্বভাবনা। প্রসঙ্গক্রমে অর্জুনকে সুভদ্রাহরণের ইঙ্গিত করিয়াছেন কৃষ্ণ—ইঙ্গিতমাত্র।

অষ্টাদশ সর্গে "তপস্বিনী" জরৎকারুর চিত্র। জরৎকারুর সহিত দুর্বাসার বিবাহ হইয়াছে। দুর্বাসা এই সম্পর্কের মধ্য দিয়া অনার্যদের উপরে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিবার পরিকল্পনা করিয়াছে।

উনবিংশ সর্গের নাম "অদৃষ্টফল"। অর্জুন ছদ্মবেশিনী শৈলজার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিয়াছে। চন্দ্রচূড়-কন্যাই শৈলজা। মূল কাহিনীর সহিত সম্পর্কহীন প্রসঙ্গ কাব্যমধ্যে স্থান পাইয়াছে এমন একটি সময়ে যখন কাব্যের ঘটনাবৃত্ত ক্লাইম্যাক্সর সামনে আসিয়া অধীর হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে কাহিনীর গতিবেগ যেমন ব্যাহত হইয়াছে তেমনি আকর্ষণ-কেন্দ্র অকস্মাৎ পরিবর্তিত হইয়াছে। আখ্যানগঠনের ক্ষেত্রে ইহা একটি প্রধান ত্রুটি। বিশেষ করিয়া যখন লক্ষ্য করি যে শৈলজা-প্রসঙ্গটি কোনো দিক হইতেই সুভদ্রা-অর্জুন প্রণয়কাহিনীকে প্রভাবিত করে নাই।

বিংশ সর্গের নাম "অঙ্কুর"। এইটিই কাব্যের শেষ সর্গ, শেষ সর্গের নাম অঙ্কুর হওয়া খুবই তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নাই। কবি বলিতে চান তাঁহার বিপুল কাব্যপরিকল্পনার অঙ্কুর দেখা দিল রৈবতক কাব্যের মধ্য দিয়াই। এই সর্গে সুভদ্রাহরণ ঘটিয়াছে। কিন্তু কাব্যকাহিনীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যাপারটি পাঠকের সামনে প্রত্যক্ষভাবে ঘটানো হয় নাই। দুর্বাসার প্ররোচনায় এবং বলরামের সম্মতিতে দুর্যোধন সসৈন্যে সুভদ্রাকে বিবাহ করিবার জন্য আসিয়াছে—এরূপ অবস্থায় কৃষ্ণের রথে চড়িয়া অর্জুন সুভদ্রাকে লইয়া গিয়াছে। সুভদ্রা স্বয়ং রথরজ্জু ধারণ করিয়াছে। অর্জুন শরবর্ষণে যাদববাহিনীকে অনায়াসে পরাভূত করিয়াছে। এই উত্তেজনাপূর্ণ ও আকর্ষণীয় ঘটনাকে কবি সংবাদের মধ্য দিয়া পরিবেশন করিয়াছেন। ঘটনার রক্তরঞ্জিত আবেদন ইহার ফলে একেবারে নস্যাৎ হইয়া গিয়াছে।

কাব্যকাহিনী উপরে বিশ্লেষিত হইল। ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে কবি তাঁহার বিপুল মহান পরিকল্পনাকে কাব্যে যথাযোগ্য রূপ দিতে পারেন নাই। আদর্শ যতই বড় হউক, যতই সর্বাঙ্গীন হউক তাহাকে কাব্যের সুনিয়ন্ত্রিত গঠনের মধ্যেই ধরিয়া দিতে হইবে। নবীনচন্দ্র সে কার্যে ব্যর্থ হইয়াছেন। মূল কাহিনীটি ঘটনাবিরল। জরৎকারু, শৈলজা, প্রভৃতির প্রসঙ্গ নানা পথে শাখায়িত হইয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণের প্রতি জরৎকারুর প্রেম, অর্জুনের প্রতি শৈলজার নীরব প্রীতি, সুভদ্রা সম্পর্কে বাসুকির জলন্ত ভালোবাসা, মূল কাহিনীকে জটিল করিয়া তুলিবার কাজেও ব্যবহৃত হয় নাই। কারণ ইহাদের প্রেম একেবারে একমুখী—প্রীতিভাজনের চিত্তে উহার কোন প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া বর্তায় নাই।

তাহা ছাড়া সুভদ্রাহরণ কাহিনীটি ঘটনাবিরল ও বৈচিত্র্যহীন। কৃষ্ণের মহাভারত স্থাপনের মহিমাময় আদর্শ টি এই কাহিনীর সহিত ওতপ্রোত জড়িত হইয়া উহার মধ্য হইতে ব্যঞ্জনার আকারে প্রকাশ পায় নাই। স্বতন্ত্রভাবে বক্তৃতার মধ্য দিয়া বার বার তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য কবিকে সুযোগ সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। বক্তৃতার তোড়ে ঘটনা ভাসিয়া গিয়াছে, মানবিক আবেগ-উত্তাপ সঙ্কুচিত হইয়াছে। ভালো ভালো আদর্শের কথা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিলেই তাহা কাব্য হইয়া উঠে না।

কবির ভাষার তরলতা, উচ্ছ্বাসের প্রবলতা ও অসংযম এবং চটুল ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টির ফলে মহান পরিকল্পনা একেবারেই বিনষ্ট হইয়াছে। "রৈবতক" সহ নবীনচন্দ্রের তিনটি মহাকাব্যেই এই বিফলতা ঘটিয়াছে।

প্রশ্ন ৩। 'রৈবতকের' কয়েকটি চরিত্রের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সন্দেহাতীত। এই মন্তব্যটি কতটা সমর্থনযোগ্য তাহা চরিত্রগুলি আলোচনা করিয়া নিরূপণ কর।
(ক. বি. ১৯৬৫)

উত্তর। নবীনচন্দ্র সেনের রৈবতক কাব্যটিতে একটি বড় আদর্শ উপস্থাপনের চেষ্টা আছে। কিন্তু কাব্য, কাব্য বলিয়াই এবং তত্ত্বকথা নয় বলিয়াই সব আদর্শই কাহিনীর মধ্য দিয়া—ঘটনা ও চরিত্রের সংযোগে প্রয়োগ করিতে হয়। নবীনচন্দ্রও রৈবতকে কয়েকটি পাত্র-পাত্রী এবং একটি কাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের চরিত্র-সৃষ্টির এই চেষ্টা কতটা সার্থক হইয়াছে তাহা বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিবার মত।

রৈবতকে পুরুষ ও নারী চরিত্র অনেকগুলি, কাব্যটিও দীর্ঘ—কুড়িটি সর্গে বিস্তৃত। কাব্যটির প্রধান পুরুষচরিত্র কৃষ্ণ। কৃষ্ণ কাহিনী-অংশের নায়ক না হইলেও তত্ত্বাংশের নায়ক। এবং তত্ত্বপ্রতিপাদনের জন্যই কবি সুভদ্রাহরণের কাহিনীটি অবলম্বন করিয়াছেন। কাজেই কবি সচেতনভাবেই কৃষ্ণকে তাহার "রৈবতক", "কুরুক্ষেত্র", "প্রভাস" এই তিনটি কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্ররূপে অঙ্কন করিয়াছেন। বলা যাইতে পারে কৃষ্ণের মহিমাকীর্তনই নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ীপরিকল্পনার প্রেরণা। নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রের পরিকল্পনা বিষয়ে মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। "নবীনবাবু প্রথম হইতেই ব্রজলীলায় বিশ্বাসবান। নবীনবাবু সর্বত্রই ভাগবতের কোমলতা ও মহাভারতের কঠোরতা, এই উভয় মিলাইয়া রৈবতক ও কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণচরিত্র অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।" বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এইখানে নবীনচন্দ্রের গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে। অন্য নানা দিক দিয়া তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত। রৈবতকে কৃষ্ণের যে রূপ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে কবি-তত্ত্বাদর্শের সঙ্গে কতকটা মানবতার ভাব রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন। দেবভাব উঁকি দিলেও প্রধান হইয়া উঠে নাই—ত্রয়ী কাব্যমালার শেষ কাব্য—"প্রভাসে" দেবভাব প্রধান হইয়া মানবরূপকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। নবীনচন্দ্র রৈবতকে কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলাকে মানবিক দিক দিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছেন। কৃষ্ণের

মনুষ্যত্ববিকাশে এবং জীবনাদর্শ পরিস্ফুট হইয়া উঠিবার পক্ষে তাঁহার বাল্যজীবনের ভূমিকা কতকটা মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

অবশেষে কৃষ্ণের যে পূর্ণমূর্তি কবি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাঁহার লক্ষ্য হইল আর্য-অনার্যের মহাসম্মিলন ঘটানো। ভারতের সব বিভেদ, সব খণ্ডত্ব দূর করিয়া নিষ্কাম ধর্মের মহিমা সেখানে প্রতিষ্ঠিত করা। এই আদর্শের নায়ক কৃষ্ণকে আমরা প্রথমাবধিই নিষ্ক্রিয়, বক্তৃতাসর্বস্ব মানুষ হিসাবে দেখি। একবার মাত্র দেশের নানা অংশ হইতে সংবাদসংগ্রহে তাঁহাকে আগ্রহী দেখা যায়, অন্য কোনোরূপ কর্মের মধ্যে তাঁহাকে নিবিষ্ট হইতে দেখি না। এত বড় বিপুল কর্মকাণ্ডের নায়ক যিনি, তিনি শুধু স্বপ্ন দেখিয়া এবং বক্তৃতা করিয়া কাল কাটাইয়াছেন, তাঁহার প্রতি জরুৎকারুর প্রণয়প্রসঙ্গে তিনি নিরুত্তাপ, চতুর্দিকের ঘটমান বিষয়গুলি তাঁহার হৃদয়ে প্রবৃত্তির দোলা দিতে পারে না। অথচ সত্যভামা-সুলোচনার সহিত কৃষ্ণকে একান্ত চটুল রসিকতায় মাতিয়া উঠিতে দেখা যায়। সব মিলিয়া কৃষ্ণ-চরিত্রটি যতটা তত্ত্বময় ততটা ব্যক্তিরূপে সুনিশ্চিত নয়। রৈবতক কাব্যের কবি-নির্দিষ্ট এই প্রধান চরিত্রটি এই কারণে ব্যর্থ হইয়াছে।

কৃষ্ণের সহযোগী চরিত্রের মধ্যে অর্জুনের নাম সর্বাপেক্ষা বেশী উল্লেখযোগ্য। কারণ এই কাব্যের কাহিনী-অংশের নায়ক অর্জুন। অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রাহরণই এই কাব্যের কেন্দ্রীয় ঘটনা। অর্জুনকে মহাবীর্যবান ব্যক্তিরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। বাসুকি ও অনার্যদের পরাভূত করিয়া যাদবকুমারীদের তিনিই রক্ষা করেন। যাদবসৈন্যদের প্রতিরোধকে ব্যর্থ করিয়া তিনি সুভদ্রাকে গ্রহণ করেন। অর্জুন বীর এবং প্রণয়ী। সুভদ্রার প্রতি তাঁহার প্রণয়ব্যাকুলতা একাধিক সর্গে প্রকাশ করিয়াছেন কবি। অর্জুনের বিবেকবোধের ও দয়াশীলতার নিদর্শনও কাব্যমধ্যে আছে। চন্দ্রচূড় তাঁহার দ্বারা হত হইয়াছেন। নিহত চন্দ্রচূড়ের অনাথা কন্যার জন্য অর্জুন অনুতপ্তচিত্তে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছেন। অর্জুনকে কবি তত্ত্বের দিক দিয়াও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণের নবভারত স্থাপনের প্রধান সহায়। তিনিই কৃষ্ণের বাহুবল। দেখা যাইতেছে রৈবতক কাব্যের এই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রটিকে নানা গুণের আধাররূপে সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন কবি। কিন্তু সব উপাদানগুলি মিলিয়া একটা ব্যক্তিগত সমগ্রতা—একটা বিশিষ্ট মনুষ্যমূর্তি বা Personality ফুটিয়া উঠে নাই। তাঁহার প্রণয়ের পশ্চাতে হৃদয়ের রক্ত-বেগ-চাঞ্চল্য অনুভূত নয়; তাঁহার বীরকর্মগুলি যেন সাজাইয়া তোলা যান্ত্রিক প্রক্রিয়ামাত্র।

ব্যাসদেবের চরিত্রটি তাত্ত্বিক প্রয়োজনে মাত্র কাব্যমধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাঁহাকে কৃষ্ণের নবভারত গঠন-আদর্শের জ্ঞানের প্রতীকরূপে অঙ্কিত করিতে চাহিয়াছেন কবি। চরিত্রটি নিষ্প্রাণ তত্ত্বভাবনামাত্র হইয়া থাকিয়াছে, প্রাণবন্ত হইয়া উঠে নাই।

বলরাম চরিত্রটিকে কবি হাস্যরসের আধার করিয়া ফেলিয়াছেন। আপাত-তরলমতি এই চরিত্রটিকে সহজেই উত্তেজিত করা সম্ভব। দুর্বাসা তাহা করিয়াছেও। চরিত্রটি সম্বন্ধে কিছু তাত্ত্বিক ভাবনা ব্যাসের মুখে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু কবি

তাহার উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। বলরাম তত্ত্বালোকের পাদপীঠে দাঁড়ান নাই বলিয়া তাহার চরিত্রের মানবিক স্বাভাবিকতা কতটা রক্ষিত হইয়াছে। চরিত্রটি জীবন্ত সন্দেহ নাই—কিন্তু ভাষায় ও প্রকাশভঙ্গিতে যাত্রার দলের ভাঁড় হইয়া পড়িয়াছে। ফলে এখানে অনৌচিত্য দোষ প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।

পূর্বোক্ত চরিত্রগুলির তুলনায় কৃষ্ণবিরোধী চরিত্র দুইটি অনেক বেশী জীবন্ত। দুর্বাসা এবং বাসুকি তত্ত্বাদর্শের আলোকলাভ করে নাই—সম্ভবতঃ সেই কারণেই তাহাদের স্বাভাবিক মানবরূপ অনেক বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছে। দুর্বাসা সম্পর্কে কবি নিজে অবশ্য অত্যন্ত বিরূপ। কৃষ্ণের উদ্দেশ্য পণ্ড করিয়া দিবার জন্য তাহার চেষ্টার বিরাম নাই। তাহাকে কাব্যের খলনায়করূপে গ্রহণ করিতে হয়। সে অত্যন্ত কোপনস্বভাব এবং ষড়যন্ত্রকুশল ব্যক্তি। বাসুকিকে নানা যুক্তিজালের সাহায্যে দুর্বাসা ষড়যন্ত্রের মধ্যে জড়াইয়া ফেলিয়াছে। বলরামকে অর্জুনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছে, সুভদ্রাকে দুর্যোধনের সহিত বিবাহ দিতে রাজী করাইয়াছে। ঘটনাবর্তের গতিকে কৃষ্ণের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিয়াছে। কবি দুর্বাসা চরিত্রটির প্রতি কোনোরূপ সহানুভূতি প্রদর্শনই করেন নাই। বরং যতটা সম্ভব কালি তাহার চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু তবুও হৃদয়বৃত্তির চাঞ্চল্যে, উদ্বেগ, আশঙ্কা, ক্রোধ প্রভৃতি বিচিত্র মানসিক প্রবৃত্তির স্ফুরণে দুর্বাসা চরিত্রটি ব্যক্তিত্ব লাভ করিয়াছে।

বাসুকি চরিত্রটি "রৈবতকে"র পুরুষ-চরিত্রগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ রচনারূপে গৃহীত হইতে পারে। সেও কৃষ্ণবিরোধী, কিন্তু কবি বাসুকি সম্পর্কে মনের গভীরে সহানুভূতি পোষণ করেন। কারণ নবীনচন্দ্র জানেন যে বাসুকির কৃষ্ণবিরোধিতার অন্তরালে গভীর কৃষ্ণপ্রীতি রহিয়াছে। অনার্যদের প্রধান বাসুকির চরিত্রগঠনে ভাস্করকর্মের ন্যায় দৃঢ়তা লক্ষ্য করা যায়। যেন পাথর কুঁদিয়া তাহার মূর্তি তৈরী করা হইয়াছে। কবি তাঁহার বর্ণনায় বলিতেছেন—

শৈলকক্ষে যেন
দৃঢ় শৈলস্তম্ভ এক হইল স্থাপিত।
বর্ণ কৃষ্ণ, দেহ খর্ব, বলিষ্ঠ শরীরে
স্থানে স্থানে মাংসপেশী উঠিছে ফাটিয়া।
স্থূল অঙ্গ, স্থূল নাসা, স্থূল ওষ্ঠাধর,
নেত্র ক্ষুদ্র সমুজ্জ্বল! ব্যাঘ্রের মতন
কি যে এক বিভীষিকা মুখ ভঙ্গিমায়
গাম্ভীর্যের সঙ্গে যেন রয়েছে মিশিয়া,
দেখিলে হৃদয়ে হয় ভীতির সঞ্চার।

দৃঢ়দেহ বলিষ্ঠ পৌরুষে দৃপ্ত কিন্তু শিশুর মত সরল তাহার মন। বাসুকি কৃষ্ণের বিরুদ্ধে গিয়াছে একেবারে ব্যক্তিগত কারণে। সে সুভদ্রাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল—আকৈশোর সুভদ্রার প্রতি তাহার হৃদয় আকৃষ্ট ছিল। কিন্তু সুভদ্রা

বালিকামাত্র—তাহার নিজের অভিপ্রায় ছাড়া কৃষ্ণ জোর করিয়া কাহারও সহিত তাহার বিবাহ দিতে পারে না। কৃষ্ণের এই অভিমতকে বাসুকি রূঢ় প্রত্যাখ্যান বলিয়াই মনে করিয়াছিল। কৃষ্ণের সহিত তাহার গাঢ় সখ্য তৎক্ষণাৎ বিচলিত হইল। সে কৃষ্ণের পরম শত্রুতে পরিণত হইল। কিন্তু কৃষ্ণের প্রচারিত সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শের মধ্যে সে খারাপ কিছু দেখিতে পায় না। দুর্বাসার ন্যায় কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য—ব্রাহ্মণদের ভেদবুদ্ধির স্বার্থরক্ষার বাসনা বাসুকির নাই। ব্যক্তিগত ক্রোধই তাহাকে উত্তেজিত করিয়াছে। এই ব্যক্তিগত উত্তেজনা—তীব্র হৃদয়ব্যাকুলতা ও প্রবৃত্তিলোকের গাঢ় আন্দোলন বাসুকি-চরিত্রকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। কৃষ্ণের প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও সে সুভদ্রার কথা ভুলিতে পারে নাই। সুভদ্রাকে সে হরণ করিতে চাহিয়াছে। ক্রোধে ক্ষোভে সে কৃষ্ণের সব আয়োজন পণ্ড করিয়া দিতে চাহিয়াছে। ব্যক্তিসত্তার সুস্পষ্ট প্রকাশের জন্যই বাসুকির চরিত্রটি এতটা শিল্পসার্থকতা লাভ করিয়াছে।

নারী-চরিত্রগুলি চিত্রণেও নবীনচন্দ্র একই নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছেন। তিনি অধিকাংশ নারীচরিত্রকেই আঁকিয়াছেন তত্ত্বের প্রকাশ হিসাবে। যে-সব ক্ষেত্রে তত্ত্বপ্রধান হইয়া উঠে নাই, সেখানেই কবি মানবরূপ অঙ্কনে যথার্থ সাফল্যলাভ করিয়াছেন।

নারী-চরিত্রগুলিকে প্রণয়াশ্রয়ী রূপ দিয়াছেন নবীনচন্দ্র। প্রণয়ের নানা রূপ—নানা অভিব্যক্তি যেন এক একটি পাত্রীকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। রুক্মিণীর পূর্ণ শান্ত প্রেমের কথা স্মরণ করিয়াই বোধ হয় একটি গানে পদ্মের সঙ্গে তাহার তুলনা করা হইয়াছে—

প্রেমের প্রৌঢ়তা-মূর্তি পদ্মিনী সুন্দরী রে!
সুখ-শান্তি-স্বরূপিনী
প্রীতিপূর্ণ সরোজিনী,
যৌবনসৌরভে আছে হৃদয়েতে লুকায়ে,
ব্রীড়া নাই, ক্রীড়া নাই,
সেই চঞ্চলতা নাই,
প্রীতি-পারাবারে গেছে সেই লজ্জা মিশায়ে,
ঝড়ে বজ্রে নাহি টলে, পদ্মিনী সুন্দরী রে!

রুক্মিণীর প্রেমে চাঞ্চল্য নাই, ঈর্ষা-অভিমান-ক্ষোভ নাই। কিন্তু আছে গভীরতা। তাহার হৃদয়পাত্র পূর্ণ হইয়া চারিধারে উহা যেন আপনিই ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

রুক্মিণীর সহিত সত্যভামার চরিত্রের একটি বৈপরীত্য সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন কবি। সত্যভামার প্রেম যৌবনচঞ্চল, হাবভাব লীলা তাহার মধ্যে অতি প্রবল। অভিমান ও উচ্ছ্বাস তাহার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। কবি সুলোচনার গানের মাধ্যমে সত্যভামাকে তুলনা করিয়াছেন একটি গোলাপ ফুলের সঙ্গে—

প্রেমের যৌবন দেখ বিকচ গোলাপে রে !
প্রীতিময়, প্রেমময় ,
শোভাময়, সুধাময় ,
ব্রীড়ায় ঈষৎ হাসি ভাসিতেছে অধরে !
অতৃপ্ত সৌরভে, রাগে,
অতৃপ্ত বাসনা জাগে,
তথাপি কোমল প্রাণ,—ঝড়বেগে ঝরে রে !

এই যৌবনচাঞ্চল্যই তাহাকে সুভদ্রা-অর্জুন মিলন ব্যাপারে সহায়তা করিবার জন্ম প্ররোচিত করিয়াছে। চরিত্রটি জীবন্ত সন্দেহ নাই—এবং অনেকখানি ব্যক্তি-লক্ষণাক্রান্ত। কিন্তু অতিমাত্রায় তরলতা তাহাকে কতকটা শিল্পমূল্য অবনমিত করিয়াছে।

সুলোচনা চরিত্রের জন্মই সত্যভামা চরিত্রটিও ত্রুটিপূর্ণ হইয়াছে। সুলোচনার চরিত্রটি অত্যন্ত চটুল ও তরল। তাহারা দুইজনে গৃহাভ্যন্তরে যে ধরনের সখিত্ব প্রকাশ করিয়াছে তাহা পারিবারিক উপন্যাসের বিষয়বস্তু হইতে পারে, কদাপি মহাকাব্যে স্থান পাইবার যোগ্য নয়। সুভদ্রার সঙ্গেও তাহার চটুল সখিত্ব। তাহার চরিত্রের অভ্যন্তরে কোনো বেদনার গূঢ় উৎস আছে কিনা—এরূপ প্রশ্ন উঠিয়াছে। কারণ সুলোচনার একটি গানে সম্ভবত তাহার নিজের সম্পর্কেই বলা হইয়াছে—

প্রেমের বিধবা শেষ ওই শেফালিকা রে !
আঁধারে আঁধারে ফুটে—
আঁধারে ভূতলে লুটে,
কাঁদি সারা নিশি পড়ি অশ্রুভারে ঝরিয়া
মাটিতে রাখিয়া বুক
জুড়ায় মনের দুখ,
আপন সৌরভে থাকে আপনিই মরিয়া , ইত্যাদি।

সুলোচনার অন্তরের এই সুপ্ত-গভীর দুঃখের উৎস কোথায় এবং বাহিরের কৌতুক-চপলতা সেই গাঢ় দুঃখ ভুলিয়া থাকিবার চেষ্টা কিনা তাহা অবশ্য এই কাব্য পড়িয়া বুঝিবার উপায় নাই। সুলোচনার এই গান ছাড়া উহার এই চরিত্রভঙ্গী স্বীকার করিয়া লইবার মত অন্য কোনো ইঙ্গিত মিলিতেছে না।

সম্ভবত: শৈলজার অর্জুনের প্রতি মৌন প্রণয়ের কথা স্মরণ করা হইয়াছে এই গানে—

প্রেমের দুরাশা ব্রতী ওই সূর্যমুখী রে !
কোথায় গগনে রবি,
প্রচণ্ড অনলচ্ছবি,

কোথা গন্ধহীন ফুল ধরাতলে ফুটিয়া!
কি দুরাশা হৃদে বহে!
অনিমিষ নেত্রে রহে,
যায় শুকাইয়া সেই রবিপানে চাহিয়া,…।

শৈলজার অর্জুনের প্রতি প্রণয়ে দেহগন্ধহীন এক প্রকার পূতপূজার ন্যায় মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। সন্দেহ নাই প্রেমের এই একটি ভঙ্গী—একটি আদর্শ। কবি বৃন্দাবনে গোপীলীলার আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সুলোচনা এবং শৈলজা চরিত্রে প্রেমের কামস্পর্শহীন ইন্দ্রিয়াতীত দুইটি চিত্র আঁকিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কবি শৈলজাকে পূর্বোক্ত সুনির্দিষ্ট প্যাটার্ণের সীমা অতিক্রম করাইয়া জীবন্ত চরিত্ররূপে উপস্থিত করিতে পারেন নাই। ধূপের ন্যায় অন্তরগভীরে নীরবে যে প্রেম জ্বলিয়া যন্ত্রণা দিয়া শুধু গন্ধ বিতরণ করে তাহার এ জাতীয় চঞ্চল কিশোরীমূর্তি মোটেই সুসঙ্গত হয় নাই।

সুভদ্রার চরিত্র কবির কাছে আরও বেশী গুরুত্ব পাইয়াছে। কারণ দুইটি। প্রথমত: সুভদ্রা কাব্যের কাহিনী অংশের নায়িকা। দ্বিতয়ত:, এই নারী-চরিত্রটির মধ্যেই নবীনচন্দ্র তাঁহার তত্ত্বভাবনাকে খুব বেশী করিয়া প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। সুভদ্রা কৃষ্ণের সেবা-ধর্মের প্রতীক। পরবর্তী কাব্য "কুরুক্ষেত্রে" তাহার যে সেবাপরায়ণা মূর্তি প্রকাশ পাইয়াছে রৈবতকে তাহা মাত্র বীজাকারে বর্তমান। রৈবতকে সুভদ্রা যেন একটু ধ্যানস্থ—যেন অতিমাত্রায় আত্মবিস্মৃত। বাস্তব পৃথিবী হইতে বহুদূরে কোন্ এক আদর্শবাদের অস্পষ্ট জগতের প্রতিই তাহার দৃষ্টি। সুভদ্রার প্রণয়েও যেন জীব মানবধর্ম যৌবনধর্মের উত্তাপ নাই। উহা যেন বহুদূর নক্ষত্রলোকের একটা ধূসর ব্যাপার। রথরজ্জু ধারণ করিয়া সে যে বীর্যময়ী প্রণয়িনীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে তাহাকে মাত্র সংবাদে পরিণত করিয়া, জীবন্ত করিয়া তোলেন নাই নবীনচন্দ্র।

কৃষ্ণের পরিবার-পরিমণ্ডলের সঙ্গে পূর্বোক্ত নারীচরিত্রগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত। ইহাদের বাহিরে থাকিবার ফলেই সম্ভবত: অনার্যরমনী জরৎকারুর চরিত্রটি স্বতন্ত্র ধাতুতে গঠিত হইয়াছে। নবীনচন্দ্রের যাহা সাধারণ দুর্বলতা অর্থাৎ ভাবোচ্ছ্বাসের অতিরেক, এবং প্রকাশরীতির তরলতা তাহা এ চরিত্রেও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তাহার কামোদ্রেককারীরূপ, প্রবৃত্তিতাডিত চিত্তবৃত্তি, রূপসচেতনতা এবং রূপগর্ব চরিত্রটিকে অভিনবত্ব দিয়াছে। কৃষ্ণের প্রতি তাহার গাঢ় প্রেম, ব্যর্থতার তীব্র জ্বালা এবং সুতীক্ষ্ণ অপমানবোধ জরৎকারুকে বিশিষ্ট মানবিকগুণে ভূষিত করিয়াছে। ব্যর্থপ্রেমের প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য সে দুর্বসাকে বিবাহ করিয়াছে—এক কথায় আত্মবিসর্জন দিয়াছে। চরিত্রটি রৈবতকের নারীচরিত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে শিল্পগুণান্বিত।

প্রশ্ন ৪। রৈবতক কাব্যের নায়ক ও প্রতিনায়ক চরিত্রদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ-কল্পনার সঙ্গতি ও ঔচিত্য বিচার কর। (ক. বি. ১৯৬৬)

উত্তর। নবীনচন্দ্র রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস এই কাব্যত্রয়ীর জন্য একটি প্রস্তাবনা তৈরী করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিবার জন্য দিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইহার উত্তরে

নবীনচন্দ্রকে বিস্তৃত এক পত্র লেখেন। উহাতে তিনি নবীনচন্দ্রের পরিকল্পার গুরুত্ব এবং বিশালতা স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি দুইটি বিষয়ে আপত্তি করেন।

১। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম অভিযোগ হইল এই যে নবীনচন্দ্র কৃষ্ণকে ধর্মসংস্কারকরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয় অভিযোগ হইল—শ্রীকৃষ্ণকে ব্রাহ্মণ্যশক্তির বিরোধীরূপে দেখানো; তাহাছাড়া ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়দের দমন করিবার উদ্দেশ্যে অনার্যদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন, এই ধারণাও ঠিক নয়। বঙ্কিম নবীনচন্দ্রের এই চিন্তাধারাকে বলিয়াছেন "Historically and Politically untrue".

এই সমস্যাটির বিচার করিতে গেলে প্রথমে দেখিতে হইবে নবীনচন্দ্র প্রাচীন মহাভারত ও ভাগবতের কর্মকাণ্ডকে নূতন যুগের আলোকে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া প্রতিষ্ঠিত সত্যকে সম্পূর্ণ ওলটপালট করিয়া দিয়াছেন কিনা—আর সেইরূপ করিয়া থাকিলে কাব্য সৌকর্যের দিক হইতে কোনোরূপ ক্ষতি হইয়াছে কিনা।

কৃষ্ণ শুধু মহাভারতের একটি মুখ্য চরিত্র নয়, ভাগবত প্রভৃতি বহু প্রধান পুরাণের তিনি কেন্দ্রীয় চরিত্র। সারা ভারতে কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া প্রাচীন ও মধ্যযুগে কত বিচিত্র ধরনের কাব্যকবিতা যে রচিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মহাভারতের কৃষ্ণ এবং ভাগবতের বৃন্দাবনের লীলাময় কৃষ্ণের মধ্যে রূপ ও ভাবনার পার্থক্য অবশ্যই আছে। আবার পদাবলী সাহিত্যে যে প্রণয়ী কৃষ্ণের রূপ দেখি—বৈষ্ণব গোস্বামীদের গ্রন্থে অচিন্ত্যভেদতত্ত্বের আলোতে কৃষ্ণের যে ভাবরূপ প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা একেবারে নূতন রকমের ব্যাপার। উহার সম্ভাবনা বা বীজ মহাভারতে ছিল কিনা তাহা লইয়া তর্ক করা বৃথা।

নবীনচন্দ্র সেন কৃষ্ণচরিত্রকে অবলম্বন করিয়া মহাভারতীয় ঘটনাভিত্তির একটি নূতন রকম ব্যাখ্যা দিতে চাহিয়াছেন। আসলে কবির লক্ষ্যই হইল প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-জীবনের একটি ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দেওয়া। আর্য এবং অনার্যদের দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্ব এবং সমন্বয় ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসের মুখ্য সামাজিক বিষয়। আধুনিককালে যাহারা বিশুদ্ধ ধর্মীয় ভাবাবেগের বশবর্তী না হইয়া সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের চর্চা করিতে চাহিবেন তাহারা এই দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের ব্যাপারটিকে অবজ্ঞা করিতে পারিবেন না। এই সংঘাতের নানা রক্ষিত বর্ণনা বিভিন্ন প্রাচীন কাব্যে ছড়াইয়া আছে। ভারতীয় জাতিগুলির জন্ম ও ক্রমবিকাশ, বিভিন্ন জাতীয় ভাষাগুলির উদ্ভব ও ক্রমোন্নতি এই পদ্ধতির মধ্য দিয়াই ঘটিয়াছে। ভারতের সামাজিক নেতৃত্ব লইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের বিরোধও শুধু কবি-কল্পনার সামগ্রী নয়। বুদ্ধদেবের বিপুল প্রভাব বিস্তারের মধ্যে কি শুধু ধর্মীয় ভাবনাই সক্রিয়—কোনোরূপ সামাজিক তাৎপর্য নিহিত নাই? অনেক সমাজতাত্ত্বিক ঐতিহাসিকই বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়দের বিদ্রোহ লক্ষ্য করিয়াছেন। সর্বদেশেই প্রাচীনকাল হইতে শ্রেণীসংগ্রাম সমাজভিত্তির পরিবর্তনের মূলে কাজ করিয়াছে। ভারতবর্ষও তাহার ব্যতিক্রম নয়। স্বামী বিবেকানন্দ এই শ্রেণীদ্বন্দ্ব সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন "পৌরোহিত্য শক্তি কালক্রমে শক্ত্যাধার প্রজাপুঞ্জ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন

করিয়া তাৎকালিক প্রজাসহায় রাজশক্তির নিকট পরাভূত হইল; রাজশক্তিও আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বিচার করিয়া প্রজাকুল ও আপনার মধ্যে দুস্তর পরিখা খনন করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে প্রজা-সহায় বৈশ্যকুলের হস্তে নিহত বা ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া গেল।" (বর্তমান ভারত)। এইসব যুক্তির সাহায্যে বলা যাইতে পারে যে নবীনচন্দ্র প্রাচীন ভারতে যদি ব্রাহ্মণ ও ক্ষাত্রশক্তির দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব অনুভব করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দোষ দেওয়া চলে না।

কৃষ্ণ ও দুর্বাসা চরিত্র দুইটিকে অবলম্বন করিয়া অতি প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের এক নূতন ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিতে চাহিয়াছেন নবীনচন্দ্র সেন। পুরাতন ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের প্রতিনিধি হইলেন দুর্বাসা। তিনি ভেদপ্রধান সমাজব্যবস্থা বজায় রাখিবার পক্ষে। তিনি চান ব্রাহ্মণদের সামাজিক প্রাধান্য রক্ষিত হউক। এই প্রাধান্য রক্ষা করিতে হইলে শুধু নিজের শক্তির উপরে নির্ভর করিলে চলিবে না। তাই দুর্বাসা অনার্যদের ছলে-বলে-কৌশলে নিজের দলে টানিয়াছে। কৃষ্ণের নূতন ধর্মপ্রচারের এবং ঐক্যবদ্ধ মহাভারত স্থাপনের আদর্শ নষ্ট করিয়া দেওয়াই দুর্বাসার উদ্দেশ্য।

মধুসূদন হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙালী কবিরা পৌরাণিক চরিত্র ও ঘটনাবলীকে নিজেদের নব্য চেতনা-ভাবনার আলোকে বিচার করিয়াছেন। সাহিত্য-শিল্পে এইরূপ নবরূপদানের প্রথা অনেক দিন হইতে নানা ভাষায় চলিয়া আসিয়াছে। এই পরিবর্তন কখনো কখনো সমালোচক-পাঠকদের প্রচলিত সংস্কার বা ধর্মবোধকে আঘাত করিয়াছে। সেই দিক হইতে যাহারা আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থনযোগ্য নয়। আসলে দেখিতে হইবে কবি যাহা কল্পনা করিয়াছেন এবং রচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে আভ্যন্তর সঙ্গতি আছে কিনা।

কৃষ্ণকে যাঁহারা ভক্তের ভগবান হিসাবে দেখিতে চান তাঁহারা নবীনচন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইতে পারেন। তাঁহার স্পষ্ট কৃষ্ণের সঙ্গে অনেকখানি ঐতিহাসিক বোধও জড়িত। রৈবতকের কৃষ্ণ অনেকখানি মানুষ। কাব্যত্রয়ীর শেষ কাব্য প্রভাসে কিন্তু কৃষ্ণ সম্পূর্ণ দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন। কৃষ্ণচরিত্রের যে পরিকল্পনা এবং যে রূপ রৈবতকে প্রকাশ পাইয়াছে তাহার মধ্যে ঔচিত্যবোধ বা অন্তঃসংগতির অভাব নাই।

কৃষ্ণচরিত্র পরিকল্পনার মূল সুরটি ব্যাখ্যা করিয়া ডঃ সুবোধরঞ্জন রায় নবীনচন্দ্র সম্পর্কিত গবেষণায় বলিয়াছেন, "নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে শুধু perfect man নয় superman কিংবা তার চাইতেও বড় করে তুলতে চেয়েছেন। আমাদের ধারণা, নবীনচন্দ্র যুগাদর্শের প্রেরণায় শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ মানবসত্তার উপর যদিও অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে চেয়েছেন, তবু গভীর বিশ্বাস এবং ভক্তিপ্রবণতার দরুন শ্রীকৃষ্ণের ভগবৎসত্তা বা ঈশ্বরত্ব কখনোই ভুলতে পারেন নি। এই অনুভূতিই তাঁর প্রেরণার আদি উৎস, এই বিশ্বাস তাঁর অধ্যাত্ম-প্রকৃতির মূলে বিদ্যমান থেকে তাঁর কাব্যদৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।...... কবি নিজেই বলেছেন 'বুঝিলাম, অতিমানবিক শক্তিবলে ও কৌশলে শ্রীকৃষ্ণ একসঙ্গে ধর্ম, রাজ্য ও সমাজসংস্কার করিয়াছেন এবং তিনিই নিষ্কামত্বের উপর স্থাপিত করিয়া এই মহাধর্মরাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। এই জন্যই ভারতীয় শাস্ত্রে অন্য সকল অবতার, আর

কৃষ্ণস্তু ভগবান্‌স্বয়ম্‌।' (আমার জীবন—৪র্থ)। নবীনচন্দ্র বিশ্বাস ও আবেগের ভিত্তিতে কৃষ্ণচরিত্র রূপায়ণে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের মত যুক্তি ও চারের পথে যান নি।"

নবীনচন্দ্রের এই চরিত্র-পরিকল্পনার মধ্যে অবশ্যই কিছু নূতনত্ব আছে। কিন্তু উহাতে অনৌচিত্যজনিত দোষ ঘটে নাই। কৃষ্ণচরিত্রের মধ্যে ভাবগত চিন্তাগত বা রূপঘটিত কোনোরূপ অসঙ্গতিও দৃষ্ট হয় না।

দুর্বাসা চরিত্রের পুরাণানুমোদিত যে রূপ জনমনে কিছুটা পূর্বসংস্কারের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা হইল দুর্বাসার দুরন্ত ক্রোধ এবং চূড়ান্ত অসহনশীলতা। তাহার চরিত্রে ঋষিসুলভ প্রসন্নতা, সর্ববিধ রিপুর প্রদাহমুক্ত মনোভাব মোটেই দেখা যায় না। নবীনচন্দ্র দুর্বাসার চরিত্রের এই সর্বজনবিদিত রূপের উপরেই তুলি বুলাইয়াছেন। দুর্বাসার চরিত্রটিকে তিনি প্রতিনায়করূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। তাহাকে ষড়যন্ত্রকুশল, প্রতারক, অত্যন্ত ঈর্ষাদ্বিষ্ট ও প্রতিহিংসাপরায়ণরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। মুনি-ঋষিদের চরিত্র এরূপ আঁকা উচিত নয়—এ জাতীয় অভিযোগ কাব্যাদির ক্ষেত্রে একেবারেই অচল। কাজেই দুর্বাসার চরিত্রও অসঙ্গতিদুষ্ট—এরূপ অভিযোগ করা চলে না।

নায়ক কৃষ্ণের চরিত্র সম্পর্কে শিল্পগুণের দিক হইতে একটি প্রশ্ন তোলা যায়। কৃষ্ণ যতটা আদর্শের মূর্তি, ততটা মানবিক গুণে জীবন্ত নয়। তিনি কাব্য জুড়িয়া যতখানি ধ্যান করিয়াছেন ও বক্তৃতা দিয়াছেন, ততখানি কর্মচঞ্চল ব্যক্তিত্বরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। দুর্বাসা চরিত্র অবশ্য শিল্পগুণের দিক হইতে সার্থক। তাহাকে আমরা ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ কর্মনিরত মানুষ হিসাবে দেখি।

নায়ক কৃষ্ণ এবং প্রতি-নায়ক দুর্বাসা চরিত্রের মধ্যে যে সংঘাত নবীনচন্দ্র দেখাইয়াছেন তাহা আদর্শগত। তাহার মধ্যে অনৌচিত্য বা অসংগতি কিছু নাই। ব্রাহ্মণ্য নেতৃত্বে ভেদপ্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য দুর্বাসা উৎসুক। তিনি বাসুকির ব্যক্তিগত বিক্ষোভ কাজে লাগাইয়া অনার্য সমাজকে দলে টানিয়া আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চান। কৃষ্ণ আপনার ঐক্যমন্ত্রে সবাইকে উজ্জীবিত করিতে আগ্রহী। এ বিষয়ে নবীনচন্দ্র বিষয়ক গবেষণায় লেখা হইয়াছে—"শ্রীকৃষ্ণের ব্রাহ্মণ-বিরোধিতার ঐতিহাসিক ভিত্তি হয়ত খুব সুদৃঢ় নয়, কিন্তু প্রাচীন যুগে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিদ্বেষ যে কম উগ্র ছিল না, তা ইতিহাসেও স্বীকৃত হয়েছে।···সেই সংঘর্ষের প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে বড় সুন্দরভাবে নির্ণয় করেছেন। তাঁর মতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধ মূলত পুরাতনের সঙ্গে নবীনের বিরোধ।···তাই নবীনচন্দ্রের পরিকল্পনা অসত্য বা সঙ্গতিহীন বলে মনে হয় না। তেমনি ক্ষত্রিয় দলনের উদ্দেশ্যে অনার্যের সঙ্গে ব্রাহ্মণের (বাসুকি-দুর্বাসার) মিলন ও ষড়যন্ত্র ব্যাপারে ইতিহাসের সমর্থন না-ও থাকতে পারে, কিন্তু পূর্বোক্ত প্রতিপাদ্যকে (আর্য-অনার্য সংঘাত ও সম্মিলনকে) বিচিত্র জটিলতার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে সুষ্ঠু পরিণতি দানের জন্যে ব্রাহ্মণ-অনার্য মৈত্রীপ্রসঙ্গ কাব্যে যুক্ত করে নবীনচন্দ্র কাহিনীগ্রন্থনে নৈপুণ্যই দেখিয়েছেন।" (ডঃ সুবোধ রায়)

প্রশ্ন ৫। মধুসূদন ও নবীনচন্দ্রের কাব্যে পৌরাণিক কল্পনার উদ্দেশ্য ও প্রয়োগরীতি সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা কর। (ক. বি. ১৯৫৮)

উত্তর। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিবার ফলে বাঙালী জাতির জীবনে নূতন ভাবনা দেখা দিল। ইউরোপীয় জীবনাদর্শ অনেকখানি গৃহীত হইল। মানবিক নবীন ভাবধারা যাহার অন্য নাম নব মানবতাবাদ জাতীয় জীবনের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় হইল। বাঙালী চিন্তাবিদেরা পাশ্চাত্য জীবনদৃষ্টি, যুক্তিবাদ, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতিতে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা যে পুরাতন দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সব সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেন এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। বরং প্রাচীন ভারতের দর্শন ও কাব্যকে নূতন করিয়া আবিষ্কার করিবার, ব্যাখ্যা করিবার একটি বড় প্রবণতা দেখা দিল। কবিরাও অনেকে প্রাচীন পুরাণ তথা মহাকাব্যের বিষয়বস্তু গ্রহণ করিয়া কাব্য লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সব কাহিনী নব্য কবিদের আধুনিক ভাবধারার বাহন হইয়া উঠিল। পুরাণ মহাকাব্যগুলি প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় প্রবণতার সাহিত্যরূপ। পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া একালের কবিরা যে কাব্য লিখিলেন তাহাতে আধুনিক জীবনবোধ এবং এইসব কবিদের ব্যক্তিগত ভাব-উপলব্ধিই প্রকাশ পাইল। সেই অনুসারে নবীন কবিরা বিষয়বস্তুর পরিবর্তনও ঘটাইলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী কবিদের মধ্যে প্রধানতঃ তিনজন পৌরাণিক বিষয়বস্তুর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিয়াছেন। মধুসূদন দত্ত "তিলোত্তমাসম্ভব", "মেঘনাদবধ" এবং "বীরঙ্গনা" এই তিনটি কাব্যেই রামায়ণ মহাভারত এবং কচিৎ ভাগবতের বিষয়বস্তু গ্রহণ করিয়াছেন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "বৃত্রসংহার"—"দশমহাবিদ্যা" কাব্যে মহাভারত এবং তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহ হইতে বিষয়বস্তু গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিজস্ব যুক্তিবোধ ও স্বাজাত্যচেতনার পরিচয় দিয়াছেন। নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার "রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস" এই কাব্যত্রয়ীর মধ্যে মহাভারতের তথা ভাগবতের বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া নব্যকাব্য রচনা করিয়াছেন।

অবশ্য ইঁহারা সকলেই যে একেবারে সদৃশ মনোভাব লইয়া পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিতেন এবং একইভাবে অবলম্বিত বিষয়বস্তুর পুনর্বিন্যাস করিয়াছেন—এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। তাঁহারা একইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া পুরাণ বিষয়কে ব্যবহারও করেন নাই। মধুসূদন এবং নবীনচন্দ্রের কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে সাধারণভাবে ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেও জীবনবোধ ও রচনারীতিতে বৈসাদৃশ্যই বেশী।

মধুসূদন রামায়ণ-মহাভারত ও ভাগবত হইতে নানা কাহিনী গ্রহণ করেন। তিনি খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়াই শুধু নয়, প্রাচীন ধর্মীয় সংস্কার সম্পর্কে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত বলিয়াও—কোনো ভক্তিভাবনা লইয়া, হিন্দুসুলভ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া পুরাণের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। তিনি পৌরাণিক কাহিনীগুলির চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রোমান্টিক সাহিত্যান্দোলনের যুগে আবির্ভূত হইলেও মধুসূদনের

শিল্পীমনে ক্লাসিসিজমের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিল। পৌরাণিক বিষয়বস্তু তাঁহার ক্লাসিক —রস-রূপের তৃষ্ণাকে অনেকখানি মিটাইত। প্রাচীন বিষয়বস্তুর মধ্যে মধুসূদনের কবি-কল্পনা একটি বিপুল মুক্তির পটভূমি খুঁজিয়া পাইয়াছিল। পৌরাণিক যুগের রথরথী অশ্বগজে প্রকম্পিত মেদিনী, ঐশ্বর্যশোভিত নগরী, যুদ্ধের প্রচণ্ডতা কবির চিত্তলোকে প্রবলশব্দে রণদামামা বাজাইত। রামায়ণ-মহাভারতের মানুষগুলির মধ্যে শক্তির ও প্রবৃত্তির যে অতিশয়িত প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় মধুসূদনের মনুষ্যভাবনা তাহার প্রতি গাঢ় আসক্তি অনুভব করিয়াছে। দেখা যাইতেছে যে মধুসূদনের পুরাণাদির প্রতি আকর্ষণের মূলে শুধুই একটা অভিপ্রায় নাই, প্রাচীন জীবনধারার প্রতি ভালোবাসাও সক্রিয়। মেঘনাদের মৃত্যুকাহিনী বা তিলোত্তমার সৃষ্টি বিবরণ অবলম্বন মাত্র—ইহাদের আশ্রয় করিয়া কবি নূতন মানববোধ এবং একালীন সৌন্দর্যবোধ প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন—মধুসূদনের কাব্য সম্পর্কে এইরূপ কথা বলা যায় না। অনেক নূতন কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পৌরাণিক জগতকে আপন ভাষাবলে পুনর্জীবিত করিয়াছেন।

নবীনচন্দ্র কিন্তু আদৌ এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া পুরাণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। নবীনচন্দ্রের মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে তাঁহার "আমার জীবন" গ্রন্থে। তিনি উক্ত গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন "এতদিন ইংরাজের শিক্ষত্বের কল্যাণে আমার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, মহাভারতখানি একটি অদ্ভুত গল্পমাত্র। বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণ কেহ ছিলেন না। থাকিলেও তিনি একজন কূটনীতিপরায়ণ রাজনৈতিক ছিলেন মাত্র।" পরবর্তীকালে কিভাবে নবীনচন্দ্রের চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা তিনি ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন, "আমি ঘোরতর বিপন্ন হইয়া ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে চট্টগ্রাম হইতে ...ক্ষেত্র বদলি না হইলে আমার সেই যৌবন-সুলভ বিলাস-বাসনাপূর্ণ হৃদয়ে ভক্তির পবিত্রছায়া পতিত হইত না; প্রভাস রচনা করিতে পারিতাম না।...সেখানে বসিয়াই আমি ভাগবতের ব্রজলীলা এক নূতন আলোকে দেখিতে লাগিলাম, এবং আমার হৃদয়ে প্রথম কৃষ্ণভক্তি অঙ্কুরিত হইল। উৎসবে-উৎসবে অসংখ্য যাত্রীর ভক্তিপ্রবাহে আমার পাষাণ হৃদয়ও কৃষ্ণভক্তিতে আর্দ্র হইল। সেই সময়ে আমি ভাগবতের একখানি বাংলা অনুবাদ পাঠ করিতাম এবং উদ্বেলিত হৃদয়ে একাকী নির্জন সমুদ্রসৈকতে বসিয়া লহরীলীলা দেখিতে দেখিতে আমি কৃষ্ণলীলার লহরী ধ্যান করিতাম।"

নবীনচন্দ্র হিন্দুপুনরুত্থানের কবি। একজন ভক্তহিন্দুর বিশ্বাস ও ভক্তি লইয়া তিনি মহাভারত ও পুরাণকাহিনী অবলম্বন করিয়াছেন। মহাভারত-ভাগবতের কাহিনীকে তিনি ইতিহাস বলিয়াই মনে করিতেন। উহার মধ্যে লুকাইয়া আছে যে মানব-ইতিহাস, কাব্যকাহিনীতে তাহাকে ধরিয়া রাখিবার সাধনাই কবি নবীনচন্দ্রের। মধুসূদনের মনোভাবের সহিত তাঁহার মনোভাবের গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে।

মধুসূদন এবং নবীনচন্দ্রের কাব্যে পুরাণ যে-ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতেও বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে। মধুসূদনের "মেঘনাদবধ কাব্য" এবং নবীনচন্দ্রের "রৈবতকে"র সাহায্যে ইহা দেখান যাইতে পারে।

মেঘনাদবধ কাব্যের মূল কাহিনীটুকু রামায়ণের ইন্দ্রজিৎ বধ হইতে গ্রহণ করা

হইয়াছে। মধুসূদন বাল্মীকি রামায়ণের কাহিনীর ভিত্তিটুকু মাত্র গ্রহণ করিয়া আপন কল্পনার দ্বারা তাহাকে পল্লবিত করিয়া তুলিয়াছেন। মধুসূদন দেবতাদের ষড়যন্ত্রকুশল-রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। রামের মধ্যে তিনি বীরত্বের তুলনায় কোমলতা, স্নেহ-প্রবণতা এমন কি ভীরুতাই যেন বেশী দেখিয়াছেন। লক্ষ্মণ যত বড় বীর হউক মেঘনাদের সামনে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। বিভীষণ তাঁহার দৃষ্টিতে স্বদেশদ্রোহী ও রাজ্যলোভী। তিনি রাবণ এবং মেঘনাদকে মহাবীর্যবান, বিভিন্ন গুণে ভূষিত নায়কোচিত চরিত্রমহিমা দান করিয়াছেন। লক্ষ্মণকে দিয়া একান্ত অন্যায় যুদ্ধে তিনি মেঘনাদকে বধ করাইয়াছেন। বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বলিতে হয়—

প্রথমতঃ, মধুসূদনের জীবনবোধ রাবণমুখী—রাম-বিরোধী। তাঁহার মনুষ্যত্ববোধ, এবং মধ্যযুগীয় দেবনির্ভরতার বিরুদ্ধাচরণের মনোভাব বাল্মীকি রামায়ণের ঘটনাক্রম এবং চরিত্রকল্পনাকে বহুক্ষেত্রে ওলট পালট করিয়া দিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, মধুসূদন দেশীয় পৌরাণিক কাহিনী গ্রহণ করিলেও লিখিয়াছেন পাশ্চাত্য আদর্শের অনুবর্তী হইয়া। একটি চিঠিতে তিনি লিখিয়াছিলেন "যদিও আমি গ্রীক কাহিনী গ্রহণ করিব না, কিন্তু একজন গ্রীক যেভাবে লেখে সেইভাবে লিখিব।" মধুসূদন হোমারের "ইলিয়াড" কাব্যের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। অন্যান্য ইউরোপীয় মহাকাব্যের প্রভাবও মধুসূদন বরণ করিয়া লইয়াছেন। যেমন হোমারের "ওডেসি", ভার্জিলের "ঈনিড", তাসোর "জেরুসালেম ডেলিভার্ড" দান্তের "ডিভাইন কমেডি," মিল্টনের "প্যারাডাইস লস্ট" প্রভৃতি।

তৃতীয়তঃ, বর্ণনার সৌন্দর্য-সৃষ্টি করিবার জন্য তিনি বহু ক্ষেত্রে মূলাতিরিক্ত বিষয়বস্তু আনিয়া ফেলিয়াছেন। যেমন অষ্টম সর্গের নরকবর্ণনা।

চতুর্থতঃ, নব্য মানবচেতনা, প্রাচীন সংস্কারের প্রতি অনাস্থা এবং স্বাজাত্যবোধ মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ পাইয়াছে।

পঞ্চমতঃ, গ্রীক ধরনের ট্রাজিক হাহাকারকেই তিনি মেঘনাদবধকাব্যের মুখ্য আস্বাদ করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন।

নবীনচন্দ্রসেন "রৈবতক" প্রভৃতি কাব্যে পৌরাণিক বিষয়ের ব্যবহারে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দেখাইয়াছেন। কারণ তাঁহার মূল দৃষ্টিভঙ্গীই স্বতন্ত্র। তিনি বৈপ্লবিক বিরুদ্ধবাদী হিসাবে সুভদ্রাহরণ প্রসঙ্গকে পরিবর্তিত করিতে চাহেন নাই। কিন্তু মহাভারতের কাহিনীকে তিনিও আপন প্রয়োজনানুযায়ী নানাভাবে পল্লবিত করিয়া তুলিয়াছেন। শৈলজা, সুলোচনা প্রভৃতি চরিত্রগুলি সম্পূর্ণই লেখকের মৌলিক কল্পনার ফল। বাসুকি জরৎকারু প্রভৃতি চরিত্রগুলিও মহাভারতের ইঙ্গিতটুকুমাত্র সম্বল করিয়া একেবারে নিজস্ব কল্পনা বলেই গঠন করিয়াছেন কবি। দুর্বাসা-কৃষ্ণের বিরোধ, দুর্বাসা-বাসুকির দলবদ্ধ হওয়া, দুর্বাসা-জরৎকারুর বিবাহ প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলি সম্পূর্ণই কবির আবিষ্কার। সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে—

প্রথমতঃ, মহাভারতের সুভদ্রাহরণ কাহিনীর প্রতি কবির আকর্ষণ বেশী নাই। অথচ সুভদ্রাহরণ প্রসঙ্গই রৈবতকের কাব্য-ভিত্তি। কিন্তু নানা শাখায় শাখায়িত হইয়া

কিন্তু এসব দুর্বলতা সত্ত্বেও রৈবতক কাব্যটিকে নস্যাৎ করিয়া দেওয়া সঙ্গত নয়। কাব্যটির মধ্যে একটি বৃহৎ প্রয়াস আছে এবং কোথাও কোথাও রচনাসৌন্দর্যও যে দেখা দেয় নাই এমন নয়। গীতিধর্মী বর্ণনায় মাঝে মাঝে কবি রোমান্টিক কল্পনার চমৎকারিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। রৈবতক কাব্য উচ্চস্তরের সৃষ্টি না হইলেও স্বতন্ত্র কাব্যহিসাবে ইহার কোনো মূল্য নাই এমন নয়।

কিন্তু রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস মিলিয়া একটি পূর্ণ কাব্য-কল্পনা গড়িয়া উঠিয়াছে। রৈবতকে যে পরিকল্পনার ভিত্তি স্থাপিত হইল, কুরুক্ষেত্রে তাহার প্রতিষ্ঠা ঘটিল। প্রভাসে তাহার পরিণতি তথা অবসান। শুধুমাত্র তত্ত্বের দিক হইতে দেখিতে গেলে রৈবতকের চিন্তাধারা অপূর্ণ। কৃষ্ণের যে পরিকল্পনা এখানে উপস্থাপিত হইয়াছে পরবর্তী কাব্য দুইটিতে তাহা পরিস্ফুট ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেইদিক হইতে দেখিলে রৈবতক কাব্য কাব্যত্রয়ীর অংশ হিসাবেই আলোচিতব্য।

স্বপ্নপ্রয়াণ

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

[**গ্রন্থ পরিচয়**—স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যটির প্রথমাংশ ১৮৭৩ সালে "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৭৫ সালে গ্রন্থাকারে কাব্যটি প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তি ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁহার বিশিষ্ট ভূমিকা প্রাবন্ধিক হিসাবে। তিনি চার খণ্ডে সম্পূর্ণ "তত্ত্ববিদ্যা", "নানাচিন্তা", "চিন্তামণি", "প্রবন্ধমালা" প্রভৃতি প্রবন্ধ-গ্রন্থ রচনা করেন। একদিকে দার্শনিকতা অন্যদিকে কবিত্ব তাঁহার প্রতিভার মধ্যে এই দ্বিমুখী প্রবণতা ছিল। তিনি যেমন ব্রাহ্মধর্মকে পদ্যে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন, তেমনি আবার সর্ববিধ তাত্ত্বিকতামুক্ত "মেঘদূতের" কাব্যানুবাদ করিয়াছিলেন। কবিত্ব তাঁহার প্রতিভার মূল কথা না হইলেও উহা তাঁহার অন্তরের দ্বিতীয় কেন্দ্র এবং যখন তিনি তত্ত্বভাবনার সহিত কবিত্বকে মিলাইতে পারিয়াছেন তখনই উল্লেখযোগ্য কবিতার জন্ম হইয়াছে। "স্বপ্নপ্রয়াণ" এই মিলনসাধনের ফল। প্রমথনাথ বিশী বলিয়াছেন, "স্বপ্নপ্রয়াণ প্রকাশের পূর্বেই চার খণ্ডে সম্পূর্ণ তাঁহার তত্ত্ববিদ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। স্বপ্নপ্রয়াণের পরে তিনি আর কাব্য রচনা করেন নাই। আগেও তত্ত্ব, পরেও তত্ত্ব, মাঝখানে একবারের জন্য কাব্যে ও তত্ত্বে গ্রন্থি বাঁধিয়া গিয়াছে—আবার তার পরেই দ্বিগুণিত বেগে তত্ত্ববিদ্যার প্রবাহ ছুটিয়াছে, কাব্যের প্রবাহ স্বপ্নপ্রয়াণেই সমাপ্ত।"]

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' একটি রূপক কাব্য। রূপক কাব্য বলিতে কি বুঝা যায়? রূপক কাব্য হিসাবে স্বপ্নপ্রয়াণের সার্থকতা বিচার কর।

অথবা, **স্বপ্নপ্রয়াণ বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ রূপক কাব্য। কাব্যটির বিষয় বিশ্লেষণ করিয়া এই মন্তব্যটি ঠিক কিনা বল।**

উত্তর। কাব্যনাটকাদির নানাশ্রেণীর মধ্যে রূপক একটি বিশিষ্ট শ্রেণী। ইংরেজীতে এই শ্রেণী allegory নামে পরিচিত। আধুনিক কালে রূপক কাব্য বা নাটক রচনা করিতে গিয়া এদেশের লেখকেরা পাশ্চাত্ত্য আদর্শেরই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীনকালেও আমাদের দেশে এ জাতীয় রচনা অপরিচিত ছিল না। সংস্কৃত ভাষায় লেখা শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের রূপক নাটক "প্রবোধচন্দ্রোদয়"-এর নাম প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয়। সমালোচক কানাই সামন্ত এই নাটকের রূপকার্থ বিশ্লেষণ করিয়া লিখিয়াছেন, "উক্ত দৃশ্যকাব্যের আখ্যায়িকাসূত্র হইল এই যে, আদি পুরুষের সংকল্প হইতে মায়া মন নামক পুত্র প্রসব করিলেন। সেই মন হইতে প্রবৃত্তির গর্ভে মহামোহ কামক্রোধ আদি এবং

নিবৃত্তির গর্ভে বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি জন্মিল। প্রবৃত্তিপক্ষীয়গণের চক্রান্তে আত্মা আত্মবিস্মৃত ও বন্দীকৃত। নিবৃত্তিপক্ষীয়গণের চিন্তা ও চেষ্টার বিষয় হইল তাঁহাকে মুক্ত করা। ফলে, বিবেকের ঔরসে ও উপনিষদের গর্ভে বিদ্যানাম্নী কুলগ্রাসিনী কন্যার জন্ম ও তাহারই অনুজ প্রবোধচন্দ্রের উদয়ে আত্মার স্বাস্থ্যলাভ ও স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা।"

আদি ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে রূপক কবিতার প্রচলন বড় কম ছিল না। তত্ত্বকথা বুঝাইবার জন্য চর্যার কবিরা, রামপ্রসাদাদি শাক্ত পদকর্তারা এবং বাউলফকীরা নানাবিধ রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন।

আধুনিক বাংলা কবিতায় রূপক-রচনার প্রেরণা আসিয়াছে ইংরেজী সাহিত্য হইতে। ইংরেজী সাহিত্যের নামকরা রূপককাব্য হইল Spenser-এর Faerie Queene এবং Bunyan-এর গদ্যগ্রন্থ Pilgrim's Progress. স্পেনসরের কাব্যে Holiness, Temperance, Friendship প্রভৃতি মানবপ্রবৃত্তি সমূহ মানবমানবীরূপে উপস্থিত। বুনিয়ানের রূপকে নায়ক ক্রিশ্চিয়ান মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কাপট্য, মিথ্যা, নিরাশা প্রভৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস, জ্ঞান প্রভৃতির সাহায্যে জয়লাভ করে ও দিব্যধামে প্রবেশ করে। উভয় রূপকেই নায়ক আধ্যাত্মিক কাম্যবস্তু লাভের জন্য যাত্রা করে এবং নানাবিধ মানসিক সংগ্রামের মধ্য দিয়া ইষ্টলাভে অগ্রসর হয়। মানসিক সংগ্রামকে ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সংগ্রামরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণের উপরে এই গ্রন্থদুইটির নিশ্চিত প্রভাব রহিয়াছে। এটি বাংলা ভাষায় একটি বিশিষ্ট রূপক কাব্য।

রূপক কাব্য বলিতে যথার্থ কি বুঝা যায় তাহা লইয়া সাহিত্যবিদদের মধ্যে মতভেদ বিশেষ নাই। সাধারণতঃ কোন তাত্ত্বিক-দার্শনিক ভাবনাকে প্রকাশ করিবার জন্য এই রীতি অবলম্বিত হইয়া থাকে। তত্ত্ব-দর্শনের কোনো চেহারা নাই। এই রূপহীন তত্ত্বকে রূপের মধ্যে ধরিয়া দেওয়াই রূপকের উদ্দেশ্য। এই কারণে কবি মানবজগতের, বস্তুজগতের চিত্র আঁকেন। কিন্তু এইসব বাস্তব ঘটনা, মানবমানবী ও প্রাণীকুলের কোনো পরিচয় দেওয়া কবির উদ্দেশ্য নয়। উহাদের মধ্য দিয়া অন্য কোনো কথা কবি বলিতে চান। ঐসব নরনারী ও বাস্তব ঘটনা লেখকের অবলম্বন মাত্র —উহাদের ভেতরে লুকানো একটি তত্ত্বের দিকেই কবির লক্ষ্য; তাহাই তিনি প্রকাশ করিতে চান। তত্ত্ব বুঝাইবার একটি সর্বজনবিদিত পদ্ধতি আছে। উহা হইল যুক্তি ও প্রমাণমূলক। কিন্তু সে পদ্ধতি চিন্তাবিদের—প্রাবন্ধিকের, কবির নয়। কবি রূপ-সৃষ্টির মধ্য দিয়া তত্ত্বটি উপস্থিত করেন—যুক্তি দিয়া বোঝান না, চরিত্র ও ঘটনার মধ্য দিয়া পাঠকের মনে সঞ্চারিত করেন। রূপক কাব্যে বাহিরের যাহা দেখা যায় তাহার সমান্তরাল ভাবে ভিতরে একটি অর্থ প্রবহমান। বাহিরের বস্তুময়, চরিত্রময় ও কাহিনীময় আবরণটি উন্মোচিত করিলে অন্তরের তত্ত্বসত্যটি আত্মপ্রকাশ করিবে। যাহারা রূপক-কবিতায় উচ্চস্তরের সাফল্য লাভ করিতে চান, তত্ত্ব প্রতিপাদন তাঁহাদেরও লক্ষ্য, কিন্তু তাহারা রূপের—বর্ণনার—চরিত্রের সৌন্দর্যও একেবারে অবহেলা করিতে চান না।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "স্বপ্নপ্রয়াণ" একখানি রূপককাব্য। কবি পাঠকদের এই রূপকটি বুঝাইবার জন্য বিশেষ যত্ন লইয়াছেন। প্রতিটি সর্গের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যান করিবার উপযোগী কাহিনীসূত্র সর্গারম্ভে লিখিয়া দিয়াছেন। তাহার দ্বারা অর্থবোধ সহজতর হইতে পারিবে। প্রথম সর্গের নাম "মনোরাজ্যপ্রয়াণ।" প্রথমেই স্বপন-রমণীর ছবি। স্বপন-রমণী কবিকে কুহকে ভুলাইল। কল্পনা মনোরথ নামক বিমানে চড়াইয়া কবিকে লইয়া চলিল মনোরাজ্যের দিকে। সেই কাম্য রাজ্যের বর্ণনা দিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন—

মনোরাজ্য নামটি মধুতে ভরা।
ফুটে যথা পারিজাত, বিচরে গন্ধর্ব-অপ্‌সরা!
দলি স্বর্ণ রেণু
চরে কামধেনু।
কল্পতরু-ছায়া-তলে রঙ্গে হাসে ধরা॥
তোমা সঙ্গে তথায় না যাব যদি
কেন তবে এতেক সাধ্য-সাধনা শৈশব-অবধি।
অই মম তপ,
অই মম জপ,
অই চাঁদে উনমাদ বাসনা-জলধি॥

দ্বিতীয় সর্গের নাম "নন্দনপুর-প্রয়াণ"। মনোরাজ্যে পৌঁছিয়া কবি সখ্যরস ও দাস্যরসের সংস্পর্শে আসিলেন। মনোরাজ্যের মধ্যেই নন্দনপুর। নন্দনপুরের রাজা আনন্দ নরপতি। তাঁহার রাণী মায়া। কল্পনা তাঁহারি কন্যা। রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রমোদ বাস করেন বিলাসপুরে। নন্দনপুরে যেন কবি বাল্যকালে ছিলেন। এখানে আসিয়া কবির বাল্যস্মৃতি মনে পড়িল। এই সর্গের ঘটনাবলীর পরিচয় দিতে দিয়া কবি সূচনা অংশে লিখিয়াছেন, "সাত্ত্বিকা (সত্বগুণ) কবিকে পথ দেখাইয়া মায়ামাতার সন্নিধানে লইয়া গেল। রাজসী (রজোগুণ) কবির মনকে কল্পনার প্রতি প্রভাবিত করিল। তামসী (তমোগুণ) কবির মনকে বিষাদের হ্রদে ডুবাইয়া দিল। কল্পনার তিনসখী সুরুচি, মাধবী, শরন্ময়ী। সুরুচি কিনা কাব্যরসাস্বাদন শক্তি—রসজ্ঞতা। মাধবী কিনা বাসন্তীভাব—মাধুর্যগুণ। শরন্ময়ী কিনা শরদীয় ভাব প্রসাদগুণ।" এই কাহিনী-কাঠামোতে নানা পাত্রপাত্রী সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। যেমন রাজসভায় স্বাস্থ্য, দাক্ষ্য, মৈত্রী, বাৎসল্য প্রভৃতি সভাসদ; তাহা ছাড়া লজ্জা, সজ্জা, শোভা, কল্যাণ প্রভৃতি নামাঙ্কিত চরিত্রও অঙ্কিত হইয়াছে।

তৃতীয় সর্গের নাম "বিলাসপুর-প্রয়াণ"। কবি সখ্যরসের মোহে পড়িয়া মাতার আজ্ঞায় নৌকায় করিয়া বিলাসপুরে যাত্রা করিলেন। "সখ্যরস প্রমোদ রাজার সভার মাঝখানে কবিকে অতিরিক্ত বাড়াইয়া তুলিয়া তাঁহাকে লজ্জায় ফেলিল। প্রমোদ যখন বাল্যকালে নন্দনপুরে কবির সঙ্গে খেলাধূলা করিত তখন সে নন্দনপুরের প্রমোদ ছিল (অর্থাৎ নির্দোষ আমোদ ছিল), এখন সে বিলাসপুরের প্রমোদ। তাই তার সংসর্গদোষে

বি লালসানাম্নী আদিরসের প্রাণবল্লভার কুহকে পড়িয়া এবং হাস্যরসের নষ্টামির দায়ে পড়িয়া কল্পনাকে হারাইল এবং সেই খেদে পাগলের মতো হইয়া ভ্রমিতে ভ্রমিতে বিলাসপুর হইতে বিষাদপুরে গিয়া পড়িল। সভার মাঝখানে প্রমদাহরণ ঘটিল—এ ঘটনাটিও কবির দুঃখজলে আহুতি দিল।" কবির সেই দুঃখদীর্ণ সন্ধ্যানব্যাকুলতার ছবি চমৎকার আঁকিয়াছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ—

ঘনাইয়া অমনি বন-আঁধার,
পাতিল ভয়ের দুর্গ, দশদিক করি একাকার।
শাখা ঠেকে গায়ে,
বাধা লাগে পায়ে,
বিষম ঠোকর খায়, পথ-চলা ভার॥
ডাকিলে সাড়া দিবার নাহি লোক।
নিশ্বসিয়া উঠে ঝাউ, কত যেন হইয়াছে শোক!
দারুণ ব্যাপার!
অরণ্য অপার
শাখা বাহু উত্থমিয়া খেদায় আলোক॥

চতুর্থ সর্গের নাম "বিষাদপুর-প্রয়াণ।" কবি পাগলের মতো কল্পনার খোঁজে ঘুরিতে ঘুরিতে বিষাদপুরে পৌছিলেন। বিষাদপুরের মধ্যে রহিয়াছে এক ভীষণ বিষাদারণ্য। সেখানে—

করিয়া জয় মহা-প্রলয়
বাজিয়া উঠিল বাজনা নানা।
তাল-বেতাল দিচ্চে তাল
ধেই ধেই নাচে পিশাচ-দানা॥

বিষাদারণ্যে কবি নানাপ্রকার অদ্ভুত জিনিস দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি আধিব্যাধি কর্তৃক ধৃত হইলেন। বিষাদপুরের রাজা হাহাহুহু নামক গন্ধর্ব। কবিকে ধরিয়া আধিব্যাধি নামক দূতদ্বয় রাজার কাছে লইয়া গেল। হাহাহুহু রাজা কবিকে জাড্যের (অর্থাৎ তামসিক জড়তার) নিকট বিচারের জন্য সমর্পণ করিল। তাহার বিচারে কবি রসাতলে প্রেরিত হইলেন।

ষষ্ঠ সর্গ "সমর-প্রয়াণ"। এই সর্গে কবি বীর ও ভয়ানক এই দুই রসের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ দেখাইয়াছেন। মৈত্র, অনুরাগ, স্বাস্থ্য, দাক্ষ্য, কৌশল প্রভৃতি বীররসের প্রধান মন্ত্রণাদাতা। অপর পক্ষে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দ্বেষ, হিংসা, ঘোর অত্যাচার প্রভৃতি সেনাপতিদের লইয়া আক্রমণ করিতে আসিয়াছে ভয়ানকরস। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে দাক্ষ্য, মারীর সঙ্গে স্বাস্থ্য, দ্বেষের সঙ্গে মৈত্র, হিংসার সঙ্গে অনুরাগ যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

দুই দিক হইতে দুর্বার নদী
প্রচণ্ড তুমুল বেগে এক ঠাঁই আসি পড়ে যদি,

কলকল-ঘোষে
ফেনাইয়া রোষে
উচ্চে ঠিকরিয়া উঠে গগন পরিধি ॥

মহামারীর সঙ্গে রুদ্ররসের যে যুদ্ধ হইল তাহা মহাভীষণ। কবির ভাষার শক্তি সে বিষয়ে বড় ন্যূন নয়। অবশেষে বীররসের সর্বাত্মক জয় ঘটিল।

সপ্তম সর্গের নাম "শান্তিপ্রয়াণ।" যুদ্ধ শেষ হইবার পরে রণক্ষেত্রের একটি ছবি আঁকিয়াছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। কবি হত ও আহতে সমাকীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র দেখিয়া বেদনার্ত হইলেন। তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল। তখন করুণার প্রসাদে তিনি সুসঙ্গের দেখা পাইলেন। কনকদণ্ড হাতে সুসঙ্গ কবিকে তপোগিরিতে লইয়া চলিল। এই পথে প্রথমেই তাঁহারা পড়িলেন বিঘ্নবনের মধ্যে। উহা লঙ্ঘন করিয়া দেখিতে পাইলেন সামনে দুটি পথ প্রসারিত। একটি পথের নাম শ্রেয়, অন্য পথ প্রেয়। শ্রেয় পথ ধরিয়া কবি শমদমের আশ্রমে গিয়া পৌছিলেন। ধৈর্য বর্ম পরিয়া তিনি পাশবরৃত্তিগুলির উচ্ছেদ সাধন করিলেন। তখন তাঁহার ভাগ্যে সাধুসম্মিলন ও দেব-সম্মিলন ঘটিল। কবির সহিত কল্পনার শুভ পরিণয় ঘটিল। শোভার সহিত কল্যাণের, বীরের সহিত প্রমদার মিলন ঘটিল। অবশেষে কবির স্বপ্নভঙ্গ ও নিদ্রাভঙ্গে কাব্যের সমাপ্তি ঘটিল।

কবির কাব্যটি যে অন্তরঙ্গ তত্ত্বের একটি স্বতন্ত্র আবরণ মাত্র তাহাতে সন্দেহ থাকে না। কবি মনোরাজ্যে ভ্রমণ করিতেছেন। সবটাই মনের আভ্যন্তর জগতের ব্যাপার—এ সবই চিন্ময়। "হর্ষ, বিলাস, বিষাদ, মূর্ছা, উদ্‌বোধ, উত্তম, শান্তি—মানব মনেরই বিচিত্র অবস্থা, একের সীমান্ত পার হইয়া আর একটিতে কখন কেমন করিয়া গিয়া পড়ি তাহার নিশ্চয়তা কিছু নাই; এক মনেরই ভিতরে চতুর্দশ ভুবন এবং সেই নিখিল ভুবনাধীশ হইলেন আনন্দ, নিখিল রসের তিনিই ঘনীভূত মূর্তি, মায়া তাঁর পত্নী।'

এই পরিকল্পনা লইয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বপ্নপ্রয়াণ রচনা করেন। কিন্তু পূর্বোক্ত সহজ তত্ত্বকথাটি অনেক বেশী জটিল রূপ লইয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেতনায় ধরা দিয়াছিল। এই কাহিনী যে কোনো মানবের মনোরাজ্যের সত্যানুসন্ধানের রূপক নয়, বিশেষ করিয়া কবির সত্য-সৌন্দর্যের আদর্শ খোঁজা। কল্পনা মনোরথে করিয়া কবিকে নন্দনপুরে লইয়া গেলেন। নন্দনপুর হইল æsthetic-লোক। কল্পনার চরম বিকাশ কবিকে æsthetic-জগৎ পর্যন্ত লইয়া আসে। Art for art's sake-কে চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিলে কবি নন্দনপুরকেই তাহার সব কাম্য পাইলেন ভাবিয়া থামিয়া যাইবেন। তাহা হইলে গভীর ভ্রান্তি ও দুঃখের মধ্যে পড়িতে হইবে। কবিও ভাবিয়াছিলেন কাব্যের শেষ কথা এই সত্য-মিথ্যা জীবন-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ সৌন্দর্য বা æsthetic pleasure-ই। ফলে কবিকে ভুলের মধ্যে পড়িতে হইল। æsthetic-জগতের কাছেই বিলাসপুর। সেখানে রাজা প্রমোদ। লালসার প্রভাবে পড়িতে হইল কবিকে। হাস্যরস সব গম্ভীর গাম্ভীর্য বিনষ্ট করিয়া দিল। ফলে

কবি কল্পনাকে হারাইলেন। কবির অন্তর হইতে কল্পনাই যদি বিদূরিত হয় তাহা হইলে তাঁহার গভীর দুঃখভোগ ও হাহাকার ছাড়া আর গতি কি আছে? কাজেই কবিকে দেখি বিষাদপুরে দুঃখে কাতর হইতেছেন—রসাতলে নিমজ্জিত হইতেছেন। কিন্তু কবির চিত্তমধ্যে জাগ্রত বীর্যবত্তা ও উৎসাহ (যাহাকে বীররস বলিয়া সেনাপতিরূপে অভিহিত করা হইয়াছে কাব্য মধ্যে) তাঁহাকে মানস-পতন হইতে উদ্ধার করিল। কল্পনাকে হারাইয়া রসাতলের মুখে পড়িয়া কবির মনে যে ভয় জাগিয়াছিল তাহা দূর হইল। কবি শান্তিধামে পৌছিলেন। এইখানে কল্পনার সহিত তাঁহার মিলন ঘটিল। এ বিষয়ে বিশিষ্ট সমালোচক প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—"নন্দনপুর পর্যন্ত যে কল্পনাকে দেখিয়াছি তাহা কবিকল্পনামাত্র; কিন্তু শান্তিপুরে যে কল্পনাকে দেখিলাম তাহার সংজ্ঞা ও সার্থকতা ব্যাপকতর, সে আর কবির আরাধ্যধনমাত্র নয়, যোগী জ্ঞানী সাধু সন্ত মনুষ্যমাত্রেরই ধ্যানের ধন, তাহার অভাবে মনুষ্য জীবন অন্ধ ও অকর্মণ্য। নন্দনপুরের কলাকৈবল্য হইতে আমরা অনেকদূরে আসিয়া পড়িয়াছি, এখন আর art for art's sake নয়, এখন art for life's sake-এ দাঁড়াইয়াছে।" ঠিক এই একই দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন সমালোচক প্রিয়নাথ সেনও—"পরমার্থের সঙ্গে সৌন্দর্যকে গ্রথিত করিয়া হিন্দু কবি কাব্যকে অশেষ এবং অসীমের দিকে প্রসারিত করিয়াছেন।...এক কথায় কবি সুনিপুণ চারণ বৈজ্ঞানিকের মত মানবহৃদয়কে বিশ্লেষণ করিয়া মানবজীবনের ক্ষেত্রের জটিলতা এবং উচ্চতার গভীরতা দেখাইয়াছেন। তাহাতে কাব্যচর্চার নিজ ক্ষেত্র অনেক দূর অতিক্রম করা বা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।"

কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ যে তত্ত্বটি উপস্থিত করিতে চাহিয়াছেন তাহা মামুলি ও সর্বজনবিদিত দার্শনিক চিন্তামাত্র নয়, তাহার মধ্যে রহিয়াছে কবির নিজস্ব অত্যন্ত মৌলিক ভাবনা। কবির সৌন্দর্য-সত্যের খোঁজে ইহার আরম্ভ এবং মনুষ্যমাত্রের জীবনসত্য-সন্ধানে তাহার পরিসমাপ্তি। কবি এই তত্ত্বভাবনাটিকে একটি কাহিনী, কতকগুলি পাত্রপাত্রীর মধ্য দিয়া পরিবেশন করিয়াছেন। কবির তত্ত্বদৃষ্টিটি অবিকল থাকিলেও বর্ণনার বিচিত্র সৌন্দর্য, ভাষাচিত্রের ঐশ্বর্য, কাহিনীর সাবলীল ভঙ্গী রক্ষিত হইয়াছে। ফলে তত্ত্ব ও কবিত্বের মিলনে "স্বপ্নপ্রয়াণ" একটি খাঁটি রূপক হইয়া উঠিয়াছে।

প্রশ্ন ২। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "স্বপ্নপ্রয়াণে"র উপরে দেশী-বিদেশী বিখ্যাত রূপকধর্মী গ্রন্থগুলির প্রভাব কতটা পড়িয়াছে? কবির মৌলিক কল্পনাই বা কতটা?

উত্তর। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "স্বপ্নপ্রয়াণ" একটি রূপক কাব্য। এই জাতীয় রূপক কাব্য বা রূপক গদ্যকাহিনী বাংলা সাহিত্যে বা অন্যান্য সাহিত্যেও খুব বেশী রচিত হয় নাই। বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় নাটকে যে Symbolic movement দেখা দিয়াছিল তাহার সঙ্গে মিশিয়া কিছু কিছু allegorical নাটকও লেখা হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব-পর্যন্ত এই শ্রেণীর রচনার সংখ্যা বড় বেশী নয়। নাম করা গ্রন্থগুলির মধ্যে রহিয়াছে সংস্কৃত ভাষায় লেখা শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নামক নাটক; ইংরেজ কবি স্পেনসরের "ফেয়ারী কুইন" এবং বুনিয়নের গন্ত-কাহিনী "পিলগ্রিম্স প্রগ্রেস"। মধ্যযুগের বাংলা কবিতায় রূপকধর্মী রচনার প্রচলন ছিল। যেমন চর্যার বৌদ্ধ সহজিয়াদের গান, বাউল-সুফী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কবিতা, রামপ্রসাদ প্রভৃতির অনেক শাক্তসঙ্গীত। কিন্তু এই জাতীয় রূপকধর্মী সাধন-গীতগুলির সহিত দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যের বিশেষ সম্পর্ক নাই। তবে শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকটির খ্যাতিও সেকালে যথেষ্ট ছিল, এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণের সঙ্গে ইহার বেশ কিছুটা সাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়।

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে মানুষের অন্তরজগতের সংগ্রামের কথাই রূপকের ছলে বলা হইয়াছে। নাটকটির কাহিনীভাগ সূত্রাকারে বিবৃত হইতেছে। মনের জন্ম হইল আদিপুরুষের সংকল্পে মায়ার গর্ভে। মনের দুই পত্নী—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রবৃত্তির গর্ভে মহামোহ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতির এবং নিবৃত্তির গর্ভে বিবেক, বৈরাগ্য প্রভৃতি সন্তানের জন্ম হইল। প্রবৃত্তি-সন্তানদের চক্রান্তে আত্মা আত্মবিস্মৃত ও বন্দী হইল। নিবৃত্তি-সন্তানেরা আত্মাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই উদ্দেশ্যে বিবেকের ঔরসে উপনিষদের গর্ভে বিদ্যানাম্নী কন্যা এবং প্রবোধচন্দ্র নামক পুত্রের জন্ম হইল। প্রবোধচন্দ্রের চেষ্টায় আত্মা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। জনৈক সমালোচক এই নাটকটি সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "এই নাটকখানি যে পুরাদস্তুর একখানি রূপক, সে কথা বলাই বাহুল্য এবং ইহার তত্ত্বাংশও, খুব সম্ভব, যুক্তিতর্কসিদ্ধ দার্শনিক সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত ও অখণ্ডনীয়। কিন্তু, ঐ পর্যন্তই। ইহাকে সার্থক দৃশ্যকাব্য বলা যায় না। ইহাতে ঘটনা নাই বলিলেই হয়, ঘটনার বর্ণনাও বিরল, কারণ শব্দের সঙ্গে শব্দ মিলাইয়া বর্ণ ও রেখাপাতের বিভূতি সুলভ নয়। ঘটনার ব্যাখ্যাতেই আগাগোড়া ছয়টি অঙ্ক ভরাট হইয়া আছে।...মোট কথা, তত্ত্ব আর কল্পনা বাস্তব আর অবাস্তব মিলাইয়া বেশ একটি গোলযোগ সৃষ্টি করা হইয়াছে। ফলে, তত্ত্ব হিসাবে ইহা যত উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থই হউক, কল্পনা হিসাবে স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য শুষ্ক ও শ্রীহীন বলিয়া বোধ হয়।" (—কানাই সামন্ত)। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের ন্যায় স্বপ্নপ্রয়াণের কাহিনীও আসলে মনোজগতের সত্যানুসন্ধানের—এই কারণে উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিত সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। সম্ভবতঃ স্বপ্নপ্রয়াণ লিখিবার সময়ে সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে উক্ত নাটকটির কথা মনে পড়িয়া থাকিবে।

ইংলণ্ডের নবজাগৃতি যুগের প্রধান কবি এডমণ্ড স্পেন্সরের রূপক কাব্য "ফেয়ারি কুইন" একটি অমর কীর্তি। বারো পর্বে পরিকল্পিত কাব্যটির অর্ধাংশমাত্র পাওয়া গিয়াছে। প্রত্যেক পর্বে এক একটি নৈতিক গুণের কথা বলিয়াছেন কবি। কোনো পর্বে holiness বা পবিত্রতা; কোথাও Friendship বা মৈত্রী এবং কোথাও আবার Temperance বা মিতাচারকে যোদ্ধারূপে উপস্থিত করিয়া তাহাদের কার্যাবলী ও বিশিষ্টতা প্রদর্শিত হইয়াছে। কাব্যটির প্রথম পর্বের কাহিনীবিন্যাসের একটু পরিচয়

লইলেই ইহার রূপক-বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা যাইবে। "ইহার Knight of the Red Cross পবিত্রতার এবং বিশুদ্ধতার উপাসক—নায়িকা (Una) সত্যকে বিপন্মুক্ত করিয়া স্ত্রীরূপে লাভ করিবার জন্য অভিলাষী এবং তাহাতে (Duessa) মিথ্যা, (Archimago) কাপট্য প্রভৃতির চক্রান্তে নানা বিপদ আপদে পড়িয়া ভ্রান্তির অরণ্যে (Wood of Erros) পথ হারাইয়া নিরাশার গহ্বরে (cave of despair) পতিত হইয়া পরে অভিলষিত লাভ করেন।" (—প্রিয়নাথ সেন: "প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি")। অবশ্য ফেয়ারী কুইনকে অনেকে যুগপৎ নৈতিক এবং রাজনৈতিক আদর্শের রূপক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সমকালীন ইংলণ্ডের রাজনৈতিক জীবনে ছায়াপাত ইহার মধ্যে ঘটিয়াছে। "The allegorical story is thus both moral and political."

এই কাব্যটির প্রভাব দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় অবশ্যই আছে। তবে পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতার আদর্শ-সন্ধানের তুলনায় তাঁহার কাব্যাদর্শের সন্ধান অনেক বেশী কবিত্ব-সম্ভাবনাপূর্ণ। কিন্তু অনেক সমালোচকই মনে করেন যে ফেয়ারি কুইনের রূপকত্ব অপেক্ষা নৈতিক গুণাবলী ও মনোজগতের সংখ্যাতত্ত্বের তুলনায় চিত্রসৌন্দর্য্য অনেক বেশী উপভোগ্য। তত্ত্বের কথা ভুলিয়া গেলেই মাত্র কাব্যটির সত্য মূল্য অনুধাবন করা যায়। তাহা হইল ইহার বর্ণাঢ্য চিত্ররস।

বুনিয়ানের "পিলগ্রিম্‌স প্রগ্রেস" সপ্তদশ শতাব্দীর একখানি বিখ্যাত গদ্য-রূপক। লেখক নিষ্ঠার সঙ্গে রূপক কাহিনীটি গড়িয়া তুলিয়াছেন। "নায়ক Christian মুক্তি লাভের জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কাপট্য, মিথ্যা এবং নিরাশা প্রভৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া বিশ্বাস (faithful), আশ্বাস (Hopeful), জ্ঞান (Knowledge), সতর্কতা (Watchful) প্রভৃতির সাহায্যে পথের নানা বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিয়া মুক্তিলাভ করিয়া দিব্যধামে (celestial city) প্রবেশ করে।" (—প্রিয়নাথ সেন: "প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি")।

পিলগ্রিম্‌স প্রগেস-এর ন্যায় বিখ্যাত গ্রন্থের আদর্শটি দ্বিজেন্দ্রনাথের মনে অবশ্যই জাগ্রত ছিল। কিন্তু সমকালে বাংলা দেশের রূপক রচনাবলীর সহিত তাঁহার কাব্যের সাদৃশ্য কতটা ছিল তাহা ভাবিবার মত। বঙ্কিমচন্দ্রের "লোকরহস্য" এবং "কমলাকান্তের" রূপক ব্যবহার তথা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রূপক কাব্য "আশাকানন" দ্বিজেন্দ্রনাথের "স্বপ্নপ্রয়াণে"র প্রায় সমকালের রচনা। ইহাদের সহিত দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের কথা ভাবা যাইতে পারে, কিন্তু ঠিক প্রভাবের কথা আসে না। "আশাকানন" বর্ণনাপ্রধান রূপক কাব্য, আখ্যানধর্মী নয়। এখানেই হেমচন্দ্রের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের পার্থক্য। উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে এই দুইটি দীর্ঘ রূপক কাব্য রচিত। ইহাদের তুলনার মধ্য দিয়ে কবিদ্বয়ের প্রতিভা ও জীবনদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য অনুধাবন করা যাবে। "দশটি কল্পনায় বিন্যস্ত এই কাব্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। আশাদেবীর সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ এবং তার সঙ্গে আশাকাননে প্রবেশ। কর্মক্ষেত্রের ছয় দ্বারে শক্তি, অধ্যবসায়, সাহস, ধৈর্য, শ্রম, উৎসাহের পাহারা, পুরীমধ্যে যশঃশৈল। রত্নমণ্ডিত আকাঙ্ক্ষাভবন—দুরাকাঙ্ক্ষার রূপ। যশঃশৈলে

আরোহণপ্রথা—ভিন্ন ভিন্ন শিখর-দর্শন, স্নেহভক্তি বাৎসল্য প্রণয় প্রভৃতির নিবাস—পরিণয়-সেতু। প্রণয়োদ্যান—সতীনির্ঝর—প্রণয়ের মূর্তিদর্শন। স্নেহউপবন—সান্ত্বনা-মন্দির—দ্বারদেশে ভ্রান্তির অবস্থান। বিবেকের আগমন ও আশার অন্তর্ধান—শোকারণ্যে প্রবেশ এবং শোকের মূর্তিদর্শন। নৈরাশ্যক্ষেত্র—মধ্যভাগে মরুপ্রদেশে চিরপ্রদীপ্ত অনলকুণ্ড—হতাশের মূর্তিদর্শন।" (—ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত: "হেমচন্দ্রের নির্বাচিত কবিতাবলী।") হেমচন্দ্রের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যের প্রধান পার্থক্যগুলি হইল—

প্রথমতঃ, "আশাকাননে" বর্ণনার মাল্যরচনা। সে-সব বর্ণনা কাহিনীমধ্যে ধরা পড়ে নাই। অপরপক্ষে "স্বপ্নপ্রয়াণে" একটি কাহিনীসূত্র বেশ শৃঙ্খলার সঙ্গেই অনুস্যূত হইয়াছে। সেক্ষেত্রেও বর্ণনাই মুখ্য কিন্তু বর্ণনা কাহিনী-আশ্রয়ী।

দ্বিতীয়তঃ, বর্ণনার ক্ষেত্রে স্বপ্নপ্রয়াণের কাব্যমূল্য অনেক বেশী। হেমচন্দ্রের বর্ণনার সৌন্দর্য অকিঞ্চিৎকর। আশাকাননে ভাবনাকে একটা স্বচ্ছ রূপাবরণ দেবার চেষ্টা হইয়াছে। বর্ণনাগুলি মামুলি এবং প্রাণহীন। শব্দগুলি বর্ণময়, বর্ণনাগুলি প্রাণময় হইয়া উঠে নাই এই কাব্যে। কবি যেন বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত—য়ুরোপীয় রূপককাব্যের একটি দেশীয় সংস্করণ রচনার দ্বারা বাংলা কাব্যের সীমা বাড়াইতেই মাত্র বদ্ধপরিকর। অপরপক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বপ্নভাবনায় বিভোর হইয়া রঙে-রসে একটা আশ্চর্য কাণ্ড করিয়া তুলিয়াছেন—

অচেতনে চেতন ঘুমন্তে জাগা
সকলই বিচিত্র স্বপনের কাণ্ড
গোড়া নাই আগা।

তৃতীয়তঃ, দ্বিজেন্দ্রনাথ শিল্পের ও জীবনের নৈতিক মূল্য-বোধের মধ্যে একটি সম্পর্ক আবিষ্কার করিতে চাহিয়াছেন. এই কাব্যে, এই ভাবনা তাঁহার আভ্যন্তর জিজ্ঞাসারই ফলশ্রুতি। হেমচন্দ্রের ভাবনা নৈতিক নয়, কাব্য-তত্ত্ব-ঘটিতও নয়। মানবজীবনে আশার প্রভাব এবং আশাভঙ্গের মনোক্ষোভ তিনি অঙ্কিত করিতে চাহিয়াছেন। উহা একটা সচেতন চিন্তা মাত্র, তাহার অধিক কিছু নয়।

স্বপ্নপ্রয়াণ রচনার প্রায় সমকালে বঙ্কিমচন্দ্র "লোকরহস্য" এবং "কমলাকান্তে" কিছু রূপকনিবদ্ধ রচনা করেন। রচনাগুলি শিল্পসৌষ্ঠবের উচ্চ সার্থকতার নিদর্শন। কিন্তু উহাদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথের ন্যায় নীতিঘটিত সমস্যার ভাবনা নাই, আছে সমাজনীতির রূপকরূপ; এবং অধিকাংশই ব্যঙ্গাত্মক ও কৌতুকরসে উপভোগ্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে এবং স্বতন্ত্র রীতিতে রূপকের ব্যবহার করিয়াছেন, এবং উভয়ের রচনার শিল্পগত ফলশ্রুতিও সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক দিয়াই সার্থক।

স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যটি মানুষের মনোজগতের কাহিনী। প্রতিকূল মানসপ্রবণতাগুলির সহিত সংগ্রাম করিয়া তবেই কবিচিত্ত তাঁহার অভিলষিত লক্ষ্যে গিয়া পৌছিতে পারে। ফেয়ারি কুইন কিংবা পিলগ্রিম্‌স প্রগ্রেসেও ঐ একই ধরনের বিষয়বস্তু কাহিনীর মধ্য দিয়া রূপকরূপ লাভ করিয়াছে। তবে বুনিয়নের গ্রন্থটির তত্ত্বচিন্তা সুস্পষ্ট ও

প্রত্যক্ষভাবে খ্রীষ্টীয় চিন্তাধারার ফলশ্রুতিমাত্র। লেগ্যঁ-কাজামিয়াঁর ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে পিলগ্রিম্‌ প্রগ্রেস সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে,

"The work of Bunyan is, so to say, a lay Bible, stripped of all that is not, to a Puritan conscience, the direct teaching of salvation; and as this teaching of salvation, and this teaching for a simple and naive mind, can only take the concrete form of an experience, each of his great works gives the story of the supreme experience in which is summed up every soul's life, of the decisive choice that it must make between God and the devil."

দ্বিজেন্দ্রনাথের চিন্তাধারা সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় নীতিচেতনাসম্ভূত নয়। এদিক দিয়া বুনিয়ান এবং স্পেনসরের রচনার সহিত স্বপ্নপ্রয়াণের বহিরাঙ্গিক সাদৃশ্য মাত্র আছে, তাহার বেশী কিছু নাই। স্বপ্নপ্রয়াণের মধ্যে কবির কল্পনায় সৌন্দর্যচেতনা এবং কল্যাণীবুদ্ধির ভূমিকা লইয়া যে তাত্ত্বিক ভাবনা কবিপ্রকাশ পাইয়াছে তাহা সর্বজনীন নীতিশাস্ত্রের বিষয়ভূত নয়—সৌন্দর্যশাস্ত্রের অঙ্গীভূত।

স্পেনসরের কাব্যে অবশ্য কাহিনীরচনা আদ্যন্ত সুনিয়ন্ত্রিত নয়। বহুক্ষেত্রে রূপক অস্পষ্ট। সে দিক দিয়া বুনিয়ানের গ্রন্থ অনেক বেশী সুপরিকল্পিত। তত্ত্ব ও রূপকরূপ বস্তুতাত্ত্বিক সুস্পষ্টতায় পূর্ণাঙ্গ। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার রূপক কাব্যে কিন্তু কাহিনীর পূর্ণতা বজায় রাখিতে পারিয়াছেন। কোথাও গল্প পথভ্রষ্ট হয় নাই। অকারণ বহিরাগত প্রসঙ্গ ও সূত্রে কাব্যকাহিনী পথভ্রষ্ট নয়। কিন্তু সুগঠিত রূপককাহিনী এবং তত্ত্বমাহাত্ম্য সত্ত্বেও বুনিয়ানের গ্রন্থ উচ্চস্তরের শিল্পসৃষ্টি নয়। বরং স্পেনসরের কাব্যে বর্ণনার নয়নাভিরাম সংগ্রহ আছে।—

"The Faerie Queen is essentially a picture-gallery. Spenser is a great painter who never held a brush. It was his fate to be born in a country in which the plastic arts did not flourish until two centuries after his time. Had he been born in Italy, he might have been another Titian, a second Veronese; born in Flanders, he would have forestalled Rubens and Rembrandt. Fortune made him a painter in verse, perhaps the most wonderful who has ever lived." (—Legouise and Cazamian : History of English Literature).

এদিক দিয়া স্পেনসরের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিস্বভাবের সাদৃশ্য অনেকেই অনুভব করিবেন। ইহা অবশ্য সাদৃশ্যই, প্রভাব নয়।

প্রভাবের কথা বলিতে গেলে স্বীকার করিতে হয় যে "প্রবোধচন্দ্রোদয়", "ফেয়ারি কুইন" এবং "পিলগ্রিম্‌স প্রগ্রেস"-এর কথা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে ছিল "স্বপ্নপ্রয়াণ" রচনার সময়ে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের তত্ত্বচিন্তার মধ্যে রহিয়াছে মৌলিকতা। তিনি ধর্মগ্রন্থ ও নীতিশাস্ত্রাদিতে প্রাপ্ত ধ্যান-ধারণাকে কাব্যে রূপ দিতে চাহেন নাই। তিনি নিজেই কাব্যকল্পনার লক্ষ্য কি তাহা লইয়া ভাবিয়াছেন এবং মানব অন্তরের বিচিত্র

প্রবণতার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতে চাহিয়াছেন। ইহার ফলে, কবি শেষ পর্যন্ত কাব্যসৌন্দর্যের আদর্শ কি খুঁজতে গিয়া মানবজীবনের লক্ষ্য যে বিশুদ্ধ কল্যানী শান্তিবোধ তাহাতে গিয়া পৌছিয়াছেন। কাব্যসাধনা শেষ পর্যন্ত জীবনসাধনার সহিত মিলিত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে এই ভাবনা একটা বস্তুনিষ্ঠ দার্শনিক প্রত্যয় মাত্র নয়। তাঁহার একান্ত আন্তরিক শিল্প-জিজ্ঞাসা এবং যেহেতু তিনি একাধারে শিল্পী এবং তাত্ত্বিক—তাই শিল্পভাবনা এবং তত্ত্বমূলক জীবনচেতনা তাঁহার কাছে একাকার হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যচেতনা স্বল্পস্থায়ী হইলেও খাঁটি ছিল। তাই রূপকের আবরণে একটি তত্ত্বকথা বলিয়াই তিনি সুনিশ্চিত হইতে পারেন নাই। তিনি রূপকটিকে আশ্রয়মাত্র করিয়া বর্ণনায় ও বর্ণসম্পাতে একটা স্বপ্নময় সৌন্দর্যজগত গড়িয়া তুলিয়াছেন। সমালোচক ঠিকই বলিয়াছেন, "বস্তুতঃ পদে-পদেই শব্দের কারুকার্যে প্রকাশভঙ্গীর চারুতায় ও ভাবের বৈচিত্র্য দ্বিজরাজকে আসন্নউদয় রবির পূর্ববর্তী বলিয়া বুঝিতে কিছুই অসুবিধা হয় না।"

প্রশ্ন ৩। দ্বিজেন্দ্রনাথের "স্বপ্নপ্রয়াণ" কাব্যটি তত্ত্বের রূপক হিসাবে যতটা সার্থক হইয়াছে, কবিত্বের সৌন্দর্যের দিক দিয়া ততটা সফল হইয়াছে কিনা বিচার কর।

অথবা, তত্ত্ব ও কাব্যের লক্ষ্য ভিন্ন। দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণে' কবিত্ব কি তত্ত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন? অথবা তত্ত্ব ও কাব্যের লক্ষ্য সমন্বিত হইয়াছে? কিংবা কাব্যলক্ষ্য তত্ত্বকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে?

উত্তর। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "স্বপ্নপ্রয়াণ" কাব্যটি রূপককাব্য হিসাবে বিশেষ ধরণের সাফল্যের দাবি করিতে পারে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে এক কবি-চিত্তের সত্যানুসন্ধানের কাহিনী বলিয়াছেন। এক কবি মনোরাজ্যে ভ্রমণ করিতেছেন। কল্পনাসুন্দরী পথ দেখাইতেছে। তিনি নন্দনপুরে আসিলেন। কবিরা সৌন্দর্যসৃষ্টির রম্যজগতেই যাইতে চান। এই রম্য জগৎ বা aesthetic plaeure-এর জগতই নন্দনপুরীরূপে চিত্রিত হইয়াছে। কল্পনার সাহায্যেই কবিরা এই সৌন্দর্যলোকে আসিয়া পৌছান। কিন্তু কাব্যসাধনার এইটিই চরম কথা নহে। এখানে তাহাকে পথ বাছিয়া লইতে হয়। নন্দনপুরকে যে মানুষ চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করে সে কলা কৈবল্য বা art for art's sake তত্ত্বকে শিল্পের উদ্দেশ্য মনে করে। মনে করিলেই ভ্রান্তি ও দুঃখ। কবি সেইরূপ মনে করিবার ফলে ভুল পথ ধরিয়া নন্দনপুরের গা ঘেঁষিয়া যে বিলাসপুর অবস্থিত সেখানে গিয়া পৌছিয়াছেন।" স্বভাবতঃ বিলাস-লালসার মধ্যে পড়িলে কবির কল্পনা কোথায় চলিয়া যায়। উহার ফলে তাহার কাব্যধর্মের চ্যুতি ঘটে। কবি তখন নানাবিধ বিপদে পড়েন। কিন্তু কঠিন আত্মিক সংগ্রামের মধ্য দিয়া তিনি শান্তিপুরে আনন্দধামে পৌছিলেন। সেখানে কবির সঙ্গে কল্পনার পূর্ণমিলন ঘটিল। নন্দনপুরে যাহা ছিল শুদ্ধমাত্র কাব্যসৌন্দর্য—কলাকৈবল্য, এখন তাহা গভীরতর জীবনসত্যে উন্নীত হইয়াছে। ভোগবিলাসের ঊর্ধ্বে

সৌন্দর্য-চেতনাকে উঠাইয়া লইয়া, মানস শুভবুদ্ধিগুলির অনুশীলনের মধ্য দিয়া দুর্বলা অশুদ্ধিকে দূরীভূত করিয়া উর্ধ্বতর বোধিতে গিয়া পৌঁছানই যে মানবমাত্রেরই লক্ষ্য—কবির লক্ষ্য এবং অপর সকলেরও—তাহাই শেষ পর্যন্ত এই কাব্যে দেখান হইয়াছে। প্রিয়নাথ সেন যথার্থই লিখিয়াছেন, "পরমার্থের সঙ্গে সৌন্দর্যকে গ্রথিত করিয়া হিন্দুকবি কাব্যকে অশেষ এবং অসীমের দিকে প্রসারিত করিয়াছেন।...এক কথায় কবি সুনিপুণ চারণ বৈজ্ঞানিকের মত মানব-হৃদয়কে বিশ্লেষণ করিয়া মানব জীবনের ক্ষেত্রের জটিলতা এবং উচ্চতার গভীরতা দেখাইয়াছেন। তাহাতে কাব্যচর্চার নিজক্ষেত্র অনেকদূর অতিক্রম করা বা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।"

নিপুণভাবে তত্ত্বকথাকে রূপকের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন কবি। কিন্তু প্রশ্ন হইল তত্ত্বভাবনার গভীরতা এবং রূপকরচনার সার্থকতা সত্বেও কাব্যটি যথার্থ কাব্যসৌন্দর্যের দিক হইতে কতটা সফল হইয়াছে।

স্বপ্নপ্রয়াণকে শুধুমাত্র কাব্যহিসাবে (তত্ত্বের কথা ভুলিয়া গিয়া) দেখিলে কাহিনী কাব্য হিসাবে তাহার একটি চেহারা অবশ্যই চোখে পড়িবে। কাহিনীকাব্য উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে-সব কাহিনী মানবিক কাহিনী বলিয়া তাহার ঘটনাংশের মধ্যে প্রাণের স্বাভাবিক স্পন্দন ছিল। আর ছিল চরিত্রগুলির মানবিক রূপ। দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্য রূপক বলিয়া ইহার ঘটনাংশ অত্যন্ত পরিকল্পনা-মাফিক (schematic) মনে হয়। উহা স্বাভাবিক ও প্রাণবন্ত বলিয়া মনে হয় না। চরিত্রগুলিও এক একটি ভাবের প্রতীক বলিয়া ঠিক রক্তমাংসের মানুষের মত হইয়া উঠে নাই।

কবি তাঁহার কাব্যের পাত্রপাত্রীদের সম্পূর্ণ মানবিক রূপ দিবার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহীও ছিলেন না। তিনি কোনো চরিত্রের নাম দিয়াছেন প্রমোদ, কাহারও নাম মায়া, কেউ বা কল্পনা। নামকরণ দেখিয়া বুঝা যায় কবি তাত্ত্বিক আদর্শকেই মানবরূপ দান করিতে চাহিয়াছেন। বীররস, সখ্যরস প্রভৃতি পাত্রপাত্রীর নাম দেখিয়াও বুঝা যায় কবি রূপক তাৎপর্যটিকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া দিতে চান নাই। স্থানের নামকরণও তত্ত্বভাবনাটির প্রতি সরাসরি অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

পাত্রপাত্রীর নামকরণ যতটা তত্ত্বাশ্রয়ী—গুরুত্বপূর্ণ পাত্রপাত্রীরা কিন্তু ততটা ছায়াময় নয়। তাহারা অনেকটা ভাবাদর্শের ইঙ্গিতবাহী, তবে মানবসুলভ প্রাণ-লক্ষণ হইতে উহারা একেবারে বঞ্চিত একথা বলা যায় না। অবশ্য মধুসূদনের কাব্যগুলির পাত্র-পাত্রীদের ব্যক্তিগত চিত্তচাঞ্চল্য অথবা অক্ষয় চৌধুরী. রবীন্দ্রনাথের গাথা-কবিতার পাত্র-পাত্রীদের মনুষ্যধর্মের সমকক্ষতা এই সব চরিত্রগুলির নাই।

স্বপ্নপ্রয়াণের ঘটনাবলীও ছকে বাঁধা। তাহার মধ্যে নাটকীয় চমক নাই। প্রত্যাশার আকস্মিকে জড়ানো চঞ্চলতা নাই। কবির ভ্রান্তি, বিপদে পতন, বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব এবং সর্বশেষে কবির সিদ্ধি—ঘটনার ক্রম এইরূপ সরল পথে অগ্রসর হইয়াছে। সেক্ষেত্রেও উপভোগযোগ্য কোনোরূপ চমৎকৃতি নাই।

স্বপ্নপ্রয়াণকে তাই তত্ত্বের কথা ভুলিয়া কাহিনীকাব্যরূপে গ্রহণ করিবার সুযোগ বিশেষ নাই। প্রথমতঃ, কবি পাঠকদের রূপকার্থ একবারও ভুলিতে দেন না। দ্বিতীয়তঃ কাহিনীকাব্যরূপে ইহার নিশ্ছিদ্র উপভোগ্যতাও বেশী নয়। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে রূপককাব্যে কাহিনীর সরল রূপাবরণটি দ্বিজেন্দ্রনাথ আদ্যন্ত যেরূপ অভঙ্গভাবে রক্ষা করিয়াছেন সেরূপ অন্যান্য রূপককাব্যের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। এরূপ দীর্ঘ কাব্যে রূপক কাহিনীটি বজায় রাখাও কম কৃতিত্বের কথা নয়।

কিন্তু এই সব গুণাবলী স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যকে শিল্পগুণের দিক হইতে খুব উচ্চ আসন দিতে পারিত না, স্বপ্নপ্রয়াণের কাব্যমহিমা অন্যত্র—ইহার বর্ণনা-বৈচিত্র্যে। কাব্যটির সরল কাহিনী, পাত্রপাত্রীর কথাবার্তা, ভাবভঙ্গী সব কিছুই বর্ণনাত্রয়ী, বর্ণনাগুলি চিত্রময়, চিত্রগুলি বর্ণময় এবং বর্ণ-বৈচিত্র্য হৃদয়ভাবের দ্বারা বিশেষভাবে রঞ্জিত।

বসন্তের আগমনের রূপটি যৌবনাবেগের সংযত প্রকাশে বিশিষ্ট ; যেমন—

দক্ষিণের দ্বারখুলি মৃদুমন্দ গতি
বনভূমি পদার্পিয়া ঋতুকুলপতি
লতিকার গাঁটে গাঁটে ফুটাইল ফুল।
অঙ্গ ঘেরি পাইল পল্লবে-দুকূল ॥
কি জানি কিসের লাগি হইয়া উদাস
ঘরের বাহির হল মলয় বাতাস।
ফুলের ঘোমটা খুলি কাড়য়ে সুবাস।
'এ নহে সে' বলি শেষে ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥

শব্দে শব্দে কমনীয়ত্ব যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমনি একটি লঘু কল্পনা-বিলাসের রঙও যেন তাহার সহিত মিশিয়া রহিয়াছে। তবে তাহা কোথাও অতিমাত্রায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই ; শব্দকেন্দ্র ত্যাগ করিয়া উক্ত সুর দিগ্বিদিকে ধাবিত হয় নাই। দ্বিজেন্দ্রনাথ চিত্রপ্রাণ কবি—ভাবকে তিনি ছবির মধ্যে বাঁধিয়া রাখিতে পারেন। সুরকে রঙে রূপান্তরিত করিয়া ফেলেন। কোমল সুন্দর ভাবাসঙ্গ প্রকাশে কবির স্বাভাবিক নৈপুণ্য বারংবার প্রকাশ পাইয়াছে। উপবনের রম্যতায় কবিচিত্তের আনন্দচাঞ্চল্য চিত্ররূপ ধারণ করে—

পুষ্প-লতা মিলি-জুলি,
সমীরে হেলি দুলি
করিছে কোলাকুলি
অভেদ প্রাণে॥
পথ দিব্য দেখা যায়
জ্যোৎস্নার কৃপায় ;
হেলিয়া তরু তায়
ছায়া বিছায়।

এই জাতীয় চিত্রের প্রতি কবিচিত্তের বিশেষ আকর্ষণ সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে কবি বিহারীলালের সহিত দ্বিজেন্দ্রনাথের তুলনা করা যাইতে পারে। বিহারীলালও প্রধানতঃ কোমল কমনীয়তার কবি। তাঁহার শব্দগুলি পর্যন্ত কাঠিন্যহীন—বহুক্ষেত্রে অস্থিহীন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের কমনীয়তা কাঠিন্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। গন্ধধর্মী শব্দের ব্যবহারে, সংযুক্তাক্ষরবহুল তৎসম শব্দের প্রয়োগে কোমল চিত্রকল্প অনেকটা বিপরীত রসের সঙ্গে সমন্বিত যেন। যেমন—

বাতায়ন পেয়ে মুক্ত,
মলয় সুধা-সিক্ত,
সৌরভ সংযুক্ত
হিল্লোল হানে।
কল্পনা সুধীরে উঠি,
আঁখিরে দিল ছুটি
বাহির পানে॥

প্রথম দিকে "সংযুক্ত" শব্দটির ব্যবহার যেমন লক্ষ্য করিবার মত, তেমনি শেষদিকে "ছুটি" কথাটির প্রয়োগে দিগন্তকামনার রোমান্টিক আবেগ ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

ভাষা ব্যাপারটা কবির সম্পূর্ণ আয়ত্ত। এবং সে ভাষা অপ্রমত্ত। কবি বিচিত্র ভাবানুভূতিকে প্রকাশ করিতে গিয়া যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছেন। যেমন, হর্ষোৎফুল্ল চাঞ্চল্য রূপ পাইয়াছে নিম্নলিখিত শব্দবন্ধে—

ছুটিছে ফোয়ারা, হর্ষে মাতোয়ারা,
শূন্যে চড়ি-উড়িয়া ধরিতে যায় গগনের তারা।……
… … … …
কুমুদিনী-সদনে পড়িয়া খসি—
তল্ তল্ থল্ থল্ করিতেছে প্রতিবিম্ব-শশী।

উপরোক্ত উদাহরণে "উড়িয়া", "ধরিতে" প্রভৃতি শব্দের গত্যাত্মক আবেদন তল্ তল্ জ্যোৎস্নাতারল্য এবং হর্ষোন্মত্ত ফোয়ারাধারার আকাশ কামনাকে তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছে। পাশাপাশি ভীতবিহ্বল পাতালপুরীর চিত্রাঙ্কনও গম্ভীর ভাষাসহযোগে সফল হইয়া উঠিয়াছে।—

গম্ভীর পাতাল। যথা কালরাত্রি করাল-বদনা
বিস্তারে একাধিপত্য! শ্বসয়ে অযুত ফণিফণা
দিবানিশি ফাটি রোষে; ঘোর নীল বিবর্ণ অনল
শিখাসঙ্ঘ আলোড়িয়া দাপাদাপি করে দেশময়
তমোহস্ত এড়াইতে—প্রাণ যেথা কালের কবল!

বীভৎস বা "অবিশ্বাস্ত অদ্ভুত কিম্ভূতকিমাকার" গড়িয়া তুলিতেও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৈপুণ্যের অভাব ছিল না।

ঝুপ্‌সি-ঝাপ্‌সি বন-আব্‌ডালে,
হাপসি-বদন সব উঁকি দেয়, ভয় দিয়া ডালে।
কিম্ভূত-আকার অতি চমৎকার
প্রকাশ পাইয়া উঠে জোনাক-মশালে।

উদাহরণের সাহায্যে স্বপ্নপ্রয়াণের কাব্য-সৌন্দর্য অনুধাবন করা আদৌ সম্ভব নয়। কারণ এই কাব্যের প্রায় সর্বত্র নানা রঙের, নানাভাবের রূপ ছড়াইয়া আছে। কবি এক আশ্চর্য রূপ-জগতে পাঠককে লইয়া যান। এই বিষয়ে বিশিষ্ট সমালোচক প্রথমনাথ বিশীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—" 'এল ডোরাডো'র পথে সোনা-মানিকের ছড়াছড়ির ন্যায় বিচিত্র সৌন্দর্যে স্বপ্নপ্রয়াণের পথঘাট আকীর্ণ। সে-সব এতই প্রচুর যে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবার আবশ্যক হয় না। দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন সৌন্দর্যসৃষ্টিতে ইচ্ছা করেন তখন তাঁহার প্রতিভায় যেন বান ডাকে, আর সেই বানের মুখে কত দূর-দূরান্তের স্বপ্নকুসুম ভাসিয়া আসে, যেমন ঐশ্বর্য তেমনি প্রাচুর্য। স্বপ্নপ্রয়াণ্ গ্রন্থের যে কোনো পত্র ইহার সাক্ষ্য দিবে। সত্য বলিতে কি, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস, নব্য বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এ বিষয়ে আর কেহ তাহার সমকক্ষ নয়। এত সৌন্দর্য একখানি কাব্যে বাংলা সাহিত্যে বিরল।"

প্রশ্ন ৪। স্বপ্নপ্রয়াণের ভাষা ও চিত্ররচনানৈপুণ্যের আলোচনা কর। অথবা, **"স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যটি রচনাসৌকর্যে ও অভিনব কল্পনার ভাষা-প্রকাশেই একটি উচ্চস্তরের কাব্য বলিয়া স্বীকৃত হইবার যোগ্য।"—আলোচনা কর।**

উত্তর। দ্বিজেন্দ্রনাথের "স্বপ্নপ্রয়াণ" কাব্যটি বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করিবার যোগ্য। কাব্যটি পড়িয়া প্রথমেই মনে হয় একটি তত্ত্বকথা প্রকাশই কবির অভিপ্রায়। কাব্যতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিতে করিতে তিনি অধ্যাত্মজীবনভাবনায় প্রবেশ করিয়াছেন। এই তত্ত্বচিন্তাটি কাব্যের মেরুদণ্ডস্বরূপ। উহাকে রূপে স্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্যই এই রূপক কাব্যের আয়োজন কবি করিয়াছেন। কিন্তু কাব্যের লক্ষ্য বহুক্ষেত্রে উপলক্ষ হইয়া পড়ে। এ-কাব্যের তত্ত্বগত অভিপ্রায়টি শেষ পর্যন্ত উপলক্ষে পরিণত হইয়াছে এমন কথা বলা যায় না। কবি আদ্যন্ত লক্ষ্য সম্বন্ধে অভ্রান্ত ছিলেন। কিন্তু কবির শিল্পপ্রবণতা তত্ত্বের লক্ষ্যকে সর্বস্ব বলিয়া মনে করিতে পারে নাই। লক্ষ্যের পক্ষে যাহা হয়ত অতিরিক্ত সেইরূপ একটি রূপজগতে রঙের চিত্রের জগৎ তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের চিত্তের বৈশিষ্ট্যই এইরূপ। ইহা-না করিয়া তিনি পারিতেন না। তাঁহার মনের পক্ষে তত্ত্ব যেমন অপরিহার্য—সেইরূপ অপরিহার্য এই বর্ণের কল্পনার ছবির বিহ্বল আনন্দ। এবং এই দ্বিতীয় ব্যাপারটিই প্রমাণ দেয় দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিত্ব তাঁহার তত্ত্বভাবনার বাহনমাত্র ছিল না।

দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিত্ব স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের চারিধারে একটি সৌন্দর্যস্বপ্নের রমণীয় জগত তৈরী করিয়াছে। "স্বপ্নপ্রয়াণের লেখায় পদে পদে বিস্ময়ের আবির্ভাব, কথায় কথায় অপ্রত্যাশিত অভাবিতপূর্ব অথচ চিরপরিচিত চিত্ররাজি। ভাষা চোখেই পড়ে না, চিত্রই জাগিয়া উঠে।" প্রকৃতপক্ষে কাব্যরসিকের কাছে ইহার তত্ত্বাংশের

গভীরতার মূল্য বিশেষ নাই—তাহারা চিত্ররস উপভোগের জন্যই এই কাব্যের কাছে যাইবেন। সমালোচক সতীশচন্দ্র রায় এই কাব্যের চিত্রায়োজনের বৈশিষ্ট্য দেখাইতে গিয়া লিখিয়াছেন, "আনন্দরাজার সভা, হরষ উল্লাস দুটি বালকের ব্যবহার; নন্দনপুরের বন-নদী-কান্তারের দৃশ্য; চিত্রলেখার হস্তে সরস্বতী, যশোদা, সীতা প্রভৃতির চিত্র; নৌকায় চড়িয়া প্রমোদপুর গমন; প্রমোদপুরের চটুল, বিলাসী অধিবাসীগণ ও সভার রঙ্গময় নৃত্যগীত—বিষাদপুরের তালবেতাল, পেত্তিনী মাসী, বীভৎস অরণ্য—বিষাদপুরের বিড়ালের খঞ্জনী বাজানো, কাকাতুয়ার 'টাকুটুকু আহারে' 'কালো যেন লোহা' রসনানড়ানো, হাড়গিলার থলিয়া ঝুলানো,—বিষাদপুরের হাহা-হুহু গন্ধর্ব, জাড্য মন্ত্রী, অন্ধকার সভা; রসাতলের গভীর অন্ধকারে ভৈরব কাপালিক, কালীপূজা, শ্মশান, উল্কামুখী, বড়াইবুড়ি প্রভৃতি—সমরপ্রয়াণে যুদ্ধের বর্ণনা, মৈত্রদেবের 'বন্ধনপাশ' ত্যাগ করা; দুর্ভিক্ষের অগ্নিবাণ-বৃষ্টি; বাণে বাণে কাটাকাটি; এবং অবশেষে শান্তি-প্রয়াণের তপোগিরি, শ্রেয়, শ্রেয়ঃ পথ, স্বর্ণবেত্রহস্তে সুসঙ্গ; গিরিশিরে দাঁড়াইয়া ঋষিদলের স্তবগান সর্বত্রই আমাদের স্বদেশী প্রাকৃতিক দৃশ্য; দেশী বিচিত্র রূপকথা ও কাহিনী; আমাদের পরিচিত তান্ত্রিক-সাধনার ভীষণতা, দেশী রামায়ণ-পুরাণের যুদ্ধ-বর্ণনা এবং আমাদের স্বদেশী ধর্মশাস্ত্রের কথা আমাদের মনে পড়িয়া যায়।"

কবির চিত্র-রচনায় প্রাণের স্বতোৎসারিত আনন্দধারা সর্বদা প্রবহমান। মাঝে মাঝে তাহার মধ্যে শুনা যায় বয়স্ক শিশুমনের হর্ষের সুর। কখনও কবি ছায়ানিবিড় অরণ্য, শব্দময়ী ঝরণার ধার, ঝিল্লি-ঝঙ্কারের ছবি আঁকিয়াছেন।—

যথায় মহাবট, শিরে জট, অতি নিবিড়;
পালিছে চুপে-চাপে, খোপে-খাপে, অযুত নীড়।
নমনা নামি নামি, ঊর্ধ্বগামী হইয়া উঠি
বহে বিপুল ভার; অন্ধকার ধরে ভ্রূকুটি॥
যে দিকে আঁখি যায়, ছায়ে ছায় সকল ঠাঁই।
ঝিল্লি ছাড়ে বোল উতরোল বিরাম নাই॥
হোতায় তালগাছে রহিয়াছে গগন ঢাকা।
আলসে ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া ঢুলিছে শাখা॥
হেতায় ঝরঝর, ঝরঝর, ঝরণা ঝরে।
পাদপ, মর মর, মর মর, শবদ করে॥
কি জানি, কোথা হতে, বায়ুপথে, আসিছে গীত
বীণার ঝঙ্কার, হয় আর আচম্বিত॥

ঝুরি নামানো মহাবটের নিবিড় অন্ধকার, ঝিল্লির একটানা তান, আকাশ আড়াল করা তালপাতার বিস্তার, ঝরণাধারার শব্দ, বৃক্ষপত্রের মরমর ধ্বনি—কবি বস্তুর রূপ ও ধ্বনিকে মিলাইয়া একটা ছায়াঘন স্বপ্নজগত গড়িয়া তুলিয়াছেন;—তাহা অপেক্ষাও বড় কথা—এই সবকিছুর সঙ্গে একটা অতিরিক্ত মানসবর্ণ তিনি মিশাইয়া দিয়াছেন, তাহা হইল মুগ্ধ অলস অবশ শিথিলতা, রোমাঞ্চিত সুখস্তব্ধতার ভাব।

কবি বনচর প্রাণীদের গতি আর শব্দকে শব্দচিত্রে যখন বাঁধিয়া দিলেন, তখনও একটা সরল সতেজ শিশুর প্রাণস্পর্শী কৌতুকবোধ তাহার মধ্যে কম্পিত হইতে থাকে।—

কভু বাদুড়ের পাখা
ঝাপটি তরুশাখা
গতি করিয়া বাঁকা
বাজিয়া যায়।
কভু বা বন-বিড়াল
বাহিয়া উঠি ডাল
লয়ে লুটের মাল
লাফায় গায়॥
গরজন সুবিকট
হইল সন্নিকট
গো-মৃগ ঝট্‌পট্
খুঁজে আড়াল।
কখনো বা ঝোপ-ঝাড়
করিয়া তোড়-পাড়
পলায় দুদ্দাড় মৃগের পাল॥

অতি পরিচিত এবং লোকপ্রচলিত ধ্বনিগুলিকে কাজে লাগাইয়াছেন কবি। এবং সমগ্রতঃ ছবিটির মধ্যে একটা সজীব প্রাণচাঞ্চল্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। ক্বচিত গাম্ভীর্য থাকিলেও তাহা লঘু মেজাজের রঙ্ লইয়া দেখা দেয়। ইহারই সঙ্গে দেখা যায়—কিম্ভূতকিমাকার, অদ্ভুত অবিশ্বাসের চিত্রাঙ্কনেও কবির বিশেষ প্রবণতা এবং আশ্চর্য দক্ষতা। অবশ্য গম্ভীর ভীষণের ছবি আঁকিতে গিয়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে কবি অন্তর কোনো লঘু মনোভাব বা বালসুলভ কৌতুক-কৌতূহলকে প্রশ্রয় দেন নাই—এমন উদাহরণও বড় অল্প নয়। যেমন, পাতালপুরীর রূপবর্ণনার সাফল্য—

রসাতল গভীর তিমির এক গ্রাসয়ে সকল!
দেখে যদি মর্ত্য কেহ প্রান্তে দাঁড়াইয়া, সে কি আর
আসে ফিরে! আপদ-মস্তক ঘুরি, টলিয়া চরণ
কণ্টকিয়া কেশজাল, বিস্ফারিয়া নয়ন-যুগল,
তমোগর্ভে তলাইয়া শেষপৃষ্ঠে লভে শেষ গতি!

"দীর্ঘপদী এই পয়ারের ছন্দও যেমন স্বচ্ছন্দচারী, ধ্বনিও যেমন গম্ভীর, বিষয়ও তেমনি অদৃষ্টপূর্ব। কালানল-প্রজ্জলিত নরকের বর্ণনা করিতে গিয়া দান্তে ইহার চেয়ে কী ভয়াল রোমহর্ষণ চিত্র আঁকিয়া থাকিবেন, অনুমান করিতে পারি না।"

দ্বিজেন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্রে "যখন যে ভাব তখন সেই ভাবের আশ্চর্যরকমে, পরিপূর্ণরকমে উদ্‌বোধন দেখা যাইবে। বহির্জগতের এত চিত্র, এত পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র বাংলার আর কোনো কাব্যেই নাই।" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই চিত্র-রচনায় এমন ভাষারই ব্যবহার করিয়াছেন যাহাতে আশ্চর্য না হইয়া পারা যায় না। একদিকে বিষয় অনুসারে তাঁহার কাব্যের শব্দের ঢঙ্ বদলাইয়া যায়—ধ্বনি এবং ধ্বনির ভাবানুসঙ্গ বদলাইয়া যায়। কবিসাহিত্যিক ভাষার সহিত একেবারে ঘরোয়া কথাকে মিলাইয়া দিয়াছেন। লোকের মুখে প্রচলিত শব্দ ও ভাষারীতিকে তিনি অভিজাত মার্জিত ভাষার সহিত যুক্ত করিয়াছেন। অথচ তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্যবলে তিনি উহাদের মিলাইয়াছেন। কোথাও তাল কাটে নাই।

দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা নিজেই বলিয়াছেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মনে যদি এমন কোনো ভাব উদিত হয়, যাহা প্রকাশের উপযুক্ত খাঁটি দেশী ভাষায় প্রকাশ করা যায়, তাহাকে প্রকাশের জন্য বিদেশী idiom-এ অনুবাদ করিতে যাইব কেন? আমি কখনোও ও পথ মাড়াইনি।" এই মনোভাবের ফলেই দেখিতে পাই, নিত্য লোকব্যবহার্য শব্দ এত প্রচুর পরিমাণে স্বপ্নপ্রয়াণে ব্যবহৃত হইয়াছে। সেকালের কবিতায় লৌকিক শব্দের ব্যবহার একরূপ নিষিদ্ধ ছিল। সেদিক হইতে দেখিলে দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষাব্যবহার অনেকখানি বৈপ্লবিক সন্দেহ নাই। কথ্য ভাষার নিজস্ব একটা জোর আছে। তাহার গতি দ্রুত এবং তাহা অত্যন্ত জীবন্ত। দ্বিজেন্দ্রনাথ এই গতিকে এবং প্রাণোজ্জ্বলতাকে সুনিপুণভাবে কাজে লাগাইয়াছেন। এই বিষয়ে সেকালের বিশিষ্ট সমালোচক সতীশচন্দ্র রায় বলিয়াছেন, "এই কাব্যে, আমাদের জীবন্ত সক্রিয়, ঘাতশীল প্রতিদিনের গন্ড হইতে শব্দ বাছিয়া আনিয়া সেই ভাষার মধ্যেই নানা রসের জোয়ার ছুটাইয়া দেওয়া হইয়াছে, বিচিত্র সংস্কৃত শব্দগুলিকেও দেশী বাংলার সঙ্গে গলাইয়া, নানা বিচিত্র মিলের তটে বাঁধিয়া, নানারূপ ছন্দের খাতে প্রবাহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমাদের চিরপরিচিত বন্ধু যে এত কথা কহিতে পারে, আমাদের গৃহদ্বারের স্রোতটি যে গিরিশিখর পর্যন্ত উঠিতে পারে, পাতাল পর্যন্ত ডুব মারিতে পারে, ইহা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া যাইতে হয়। স্বপ্নপ্রয়াণের এইরূপ দেশী ভাষা বলিয়াই, ইহার চিত্রগুলি এত অনায়াসে আমাদের চক্ষের উপর নাচিয়া উঠে, ভাবগুলি নেশায় ধরার মাতা এত চট্ করিয়া আমাদের মনটিকে ধরিয়া ফেলে।"

গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থতালিকা

১। কবি শ্রীমধুসূদন—মোহিতলাল মজুমদার
২। আধুনিক বাংলা সাহিত্য—মোহিতলাল মজুমদার
৩। বঙ্গসাহিত্যে নবযুগ—শশিভূষণ দাশগুপ্ত
৪। মহাকবি মধুসূদন—আশুতোষ ভট্টাচার্য
৫। মাইকেল মধুসূদন (জীবন-ভাষ্য)—প্রমথনাথ বিশি
৬। বাংলার কবি—প্রমথনাথ বিশি
৭। মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প—ক্ষেত্রগুপ্ত
৮। কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী—ক্ষেত্রগুপ্ত
৯। মধুসূদনের কাব্যবৃত্ত—জীবেন্দ্র সিংহ রায়
১০। রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস—সম্পাদক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ভূমিকা),
১১। নবীনচন্দ্রের কবিকৃতি—সুবোধচন্দ্র রায়
১২। উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত—বীরেশ্বর পাঁড়ে
১৩। প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি—প্রিয়নাথ সেন
১৪। রচনাবলী—সতীশচন্দ্র রায়।

চতুর্থ পত্র · দ্বিতীয়ার্ধ

কাব্যসঞ্চয়ন

[সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত]

[গ্রন্থ-পরিচয়ঃ রবীন্দ্রানুজ কবিদের মধ্যে বিশিষ্টব্যক্তিত্ব সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জীবৎকাল ১৮৮২ সাল হইতে ১৯২২ সাল পর্যন্ত। তাঁহার চৌদ্দ পনেরখানা কাব্য-গ্রন্থ হইতে শ্রেষ্ঠ ও প্রতিনিধিত্বমূলক কবিতাবলী সঙ্কলন করা হইয়াছে "কাব্যসঞ্চয়ন" গ্রন্থে। কবির মৃত্যুর পরে ১৯৩০ সালে এই সঙ্কলন প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের নামকরণ রবীন্দ্রনাথের।]

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১॥ সত্যেন্দ্রনাথের মেধা, জ্ঞানপিপাসা ও বাণীসাধনার নিষ্ঠা তাঁহার কবিতার ছত্রে ছত্রে জাজ্বল্যমান। এ বিষয়ে তথ্যমূলক আলোচনা কর।

(ক. বি., ১৯৬৭)

অথবা,

"সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর বহু পঠন, বহু বিদ্যা, বিপুল আগ্রহ এবং প্রচুর শব্দ-সংগ্রহের জোরে এ অঞ্চলে (ভাব প্রকাশের আদর্শে ও ছন্দের অভিনবত্বে) উল্লেখযোগ্য প্রয়াস দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই গুণগুলির ।ভিশয্যই সত্যেন্দ্রনাথকে কবিকীর্তির চরম সার্থকতা লাভ করিতে দেয় নাই।" ৬.ই অভিমতের বিচার কর। **(ক. বি., ১৯৫৮)**

অথবা,

বহুব্যাপ্ত বিষয়-বৈচিত্র্য সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। তাঁহার কাব্যরচনার উপর এই বিষয়-বিস্তারের কিরূপ ফলাফল হইয়াছে তাহা বুঝাইয়া দাও।

উত্তর। রবীন্দ্র-অনুজ কবিগোষ্ঠীর মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রহিয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথকে কোনোমতেই অন্ধ রবীন্দ্রানুকারক বলা চলে না। তিনি রবীন্দ্রভাবজগত ও প্রভাবপরিমণ্ডলের মধ্যেও নিজের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য তৈয়ারী করিয়া লইয়াছিলেন। বিষয়নির্বাচনে এবং রূপায়নভঙ্গিতে সত্যেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাঁহার কবিতায়, একটু সতর্ক পাঠকের নিকট ইহা সহজেই ধরা পড়িবে।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সামগ্রী প্রসঙ্গে মন্তব্য করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, জ্ঞানের য় লইয়া সাহিত্যের কারবার নয়, সাহিত্যের কারবার ভাবের বিষয় লইয়া। ।কন্তু সত্যেন্দ্রনাথের আচরিত কাব্যধর্মের মধ্যে এই চিন্তার অনুসরণ দেখা যায় না। সত্যেন্দ্রনাথ নেহাৎ ভাবের বিষয়ে প্রায়ই সন্তুষ্টচিত্ত ছিলেন না, ভাবকে চিন্তার সহিত

যুক্ত না করিয়া তিনি স্বস্তি পাইতেন না, এবং জ্ঞানের বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ ছিল অত্যন্ত তীব্র। আধুনিক কালের কবিতায় অবশ্য 'ভাবের' সহিত ভাবনার উপযুক্ত স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞানের বিষয়কেও কাব্যজগতে অপাংক্তেয় করিয়া রাখা চলে না এ যুগে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র। বংশগত সূত্রে অধ্যয়নলিপ্সা তাঁহার চরিত্রে বর্তাইয়াছিল কিনা তাহা সঠিক বলা যায় না। কিন্তু অধ্যয়নের প্রবল বাসনা তাঁহার ছিল। বাংলা ইংরেজি সংস্কৃত ভাষা মোটামুটি সব শিক্ষিত বাঙালীরই জানা থাকে। সত্যেন্দ্রনাথ ফরাসি ভাষা শিখিয়াছিলেন, কতকটা জার্মান এবং ফার্সি ভাষাও জানিতেন। পড়িবার নেশা তাঁহার ছিল সুপ্রচুর এবং বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি তাঁহার ছিল আগ্রহ। তাঁহার ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহের বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে— ইতিহাস হইতে ভূতত্ত্ব, রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও সমাজতথ্য, পুরাণ প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডারটি ছিল পরিপূর্ণ। এবং এ বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের কোনোরূপ নির্বাচনী প্রবণতা ছিল না। জ্ঞানের বিশেষ মহলের প্রতি একাগ্রচিত্ত আকর্ষণ তাঁহার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। নির্বিচার অধ্যয়ন ও তথ্য-সংগ্রহেই তাঁহার উৎসাহ ছিল এইরূপ মনে করিবার কারণ রহিয়াছে।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় এই জ্ঞানচর্চার ও বিষয়-বৈচিত্র্যে আগ্রহের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। কবিতার বিষয়-নির্বাচনে এবং রূপনির্মাণে উভয়ত: কবির এই অধ্যয়ন-বহুলতা, জ্ঞানপিপাসা এবং নিষ্ঠাপূর্ণ তথ্য-সঞ্চয়কে কাজে লাগানো হইয়াছে। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে পরিস্ফুট করিয়া তোলা যাইতে পারে এবং ইহার ফলে কবিতার শিল্পসার্থকতায় হানি ঘটিয়াছে কিনা তাহাও পরীক্ষা করা চলিতে পারে।

"তাজ" কবিতায় তাজমহলের রূপের মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য কবি ব্যবহৃত বিভিন্ন জাতীয় প্রস্তরের নামোল্লেখ করিয়াছেন—

সিংহলী নীলা, রাঙা আরবী প্রবাল,
তিব্বতী ফিরোজা পাথর,
বুন্দেলী হীরা-রাশি, আরাকানী লাল,
সুলেমানী মণি থরে থর,
ইরানী গোমেদ, মরকত থাল থাল,
পোখ্‌রাজ, বুঁদি, গুলনর,
চার-কো পাহাড়-ভাঙা মসী মর্মর,
চীনা তুঁতী, অমল স্ফটিক,
যশলমীরের শোভা মিশ্র-বদর
এনেছে ঢুঁড়িয়া সব দিক,
মধুমৎস্বিষ্‌ মণি ভুখিয়া পাথর,
দেউলে দেওয়ালী মণি শিখ।

এইসব পাথরের মধ্য হইতে রঙের বিভিন্নতার ইঙ্গিত মিলিতে পারে, নামের বহুলতা ও সংগ্রহের বিপুল বিস্তারের কথাও জানা যায়— কিন্তু সব মিলিয়া রূপভোগের কোনো বিশিষ্টতা আত্মপ্রকাশ করে নাই। এখানে নানা রঙের উল্লেখ আছে—সব মিলিয়া একটা রঙ ফুটে নাই বা বিচিত্রের ঐকতান বাজিয়া উঠে নাই। কিছু আরবী, ফারসী শব্দ ও নামের সাহায্যে মোগলাই ঐশ্বর্যবৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত মিলিবার সম্ভাবনা ছিল—কিন্তু কবির মনে অনুরূপরসঘন কোনো আবেদনসৃষ্টির বাসনা ছিল বলিয়া মনে হয় না। ফলে এ জাতীয় তথ্য-সঙ্কলন কবির নিষ্ঠা ও জ্ঞানস্পৃহার পরিচয় বহন করে, রূপসার্থক কবিত্বের সহিত ইহার সম্পর্ক মাত্র নাই।

কবির জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করিয়া দিবার প্রবৃত্তি বহু কবিতাকে তালিকাচয়নে পরিণত করিয়াছে। যেমন "জাতির পাঁতি" কবিতায় তথাকথিত 'নিম্ন' বর্ণগুলির পরিচয় প্রদানের চেষ্টা লক্ষ্য করা যাইতে পারে—

বাউরী, চামার, কাওরা, তেওর,
পাটনী, কোটাল, কপালী, মালো,
বামুন, কায়েৎ, কামার, কুমোর,
তাঁতি, তিলি, মালি, সমান ভালো ;
বেনে, চাষী, জেলে, ময়রার ছেলে,
তামুলী, বারুই তুচ্ছ নয়,
মানুষে মানুষে নাহিক তফাৎ,
সকল জগৎ ব্রহ্মময়।

উদ্ধৃতাংশের শেষ চরণটিই মূল ভাববস্তু। সেই ভাবটি প্রকাশ করিবার জন্ম একুশটি বিভিন্ন জাতির নামোল্লেখ অপ্রয়োজনীয়। উহা কবিতার রসাস্বাদকে কোনো দিক দিয়াই সাহায্য করে না। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে এ জাতীয় তালিকা সংগ্রহ অপরিহার্য ছিল, কারণ তাঁহার জ্ঞানের বিস্তার এবং তীক্ষ্ণ বস্তুনিষ্ঠা। আমাদের সমাজের জাতিভেদ প্রথার বাস্তব রূপটি ফুটাইয়া তুলিবার জন্ম কবি তাঁহার বস্তুবোধকে কাজে লাগাইয়াছেন।

কবির নানা কবিতায় ভূগোল ও ইতিহাসের জ্ঞান চমৎকার কাজ করিয়াছে। সে সব ক্ষেত্রে ভূগোল ও ইতিহাস-সম্পর্কিত বস্তুবোধ রূপসৌকর্যের সহিত সমন্বিত হইয়াছে। ভূগোল আনিয়াছে প্রকৃতি-সৌন্দর্যকে আর ইতিহাসের জ্ঞান ঐতিহ্য গৌরবের ভাবটি সৃষ্টি করিয়াছে। বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতে গিয়া কবি লিখিয়াছেন—

মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে—বরদ বঙ্গে ;—
বাম হাতে যার কমলার ফুল ; ডাহিনে মধুক-মালা,
ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মুকুট, কিরণে ভুবন আলা,

এই চারটি চরণ কবির সুতীক্ষ্ণ ভৌগোলিক চেতনার উপরে দাঁড়াইয়া কাব্যমাধুর্য বিকীর্ণ করিতেছে। গঙ্গা বহুধারায় বিভক্ত হইয়া দক্ষিণ বঙ্গের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। কবি তাই "মুক্তবেণীর গঙ্গা" কথাটির ব্যবহার করিয়াছেন। যে গঙ্গা একধারায় প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে দীর্ঘপথ সেই গঙ্গাই বাংলাদেশে তাহার একবেণী খুলিয়া দিয়াছে শতধারায়। বঙ্গদেশের বামভাগে আসামের কমলাবন, দক্ষিণে সাঁওতাল পরগণার মহুয়াগাছের সারি আর উত্তরভাগে কাঞ্চনজঙ্ঘার সূর্যকরোজ্জ্বল পর্বতশৃঙ্গ। কবি এই তথ্যকেই একটি সুন্দর ভাষাচিত্রে রূপান্তরিত করিয়াছেন।

কোথাও আবার কবি বাংলাদেশের নদীর তালিকা রচনা করিতে গিয়া নাম-অর্থের তাৎপর্য আবিষ্কারের বালসুলভ নেশায় মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন—

'ইচ্ছামতী' ইচ্ছা তোমার, 'অজয়' তোমার জয় ঘোষে,
'পদ্মা' হৃদয়-পদ্ম-মৃণাল সঞ্চারে বল হৃদ্‌কোষে ;
'ডাকাতে' আর 'মেঘনা' তোমায় ডাক্‌ছে মেঘের মন্দ্রে গো,
'ভৈরবে' আর 'দামোদরে' জপছে 'মাভৈঃ' মন্ত্রে গো,
রাঢ়ের 'ময়ূরাক্ষী' তুমি, বঙ্গে 'কপোতাক্ষী' তুই,
সাপের ভীতি রমায় প্রীতি দুই চোখে তুই সাধিস্ দুই।

অধিকাংশ কবিতায় কবি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের মুহুর্মুহু উল্লেখ করিয়াছেন। স্বল্পজ্ঞাত পৌরাণিক বিষয়ের উল্লেখ কবির সুগভীর অধ্যয়ন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করে। আপাত-নিঃসম্পর্কিত ঐতিহাসিক বিষয়ের মধ্যে তাৎপর্য আবিষ্কারেও কবির জ্ঞানপরিধির বিস্তারই অনুভব করা যায়। যেমন—

(১) জগতে দ্বিতীয় রুরু তুমি সাজাহান
(২) গঙ্গাহৃদি-বঙ্গ-মুখো ফৌজ আলেকজান্দারী
(৩) রাইদাস মুচি, সুদীন কসাই
গণি শুকদেব-সনক সাথে
(৪) আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে,
দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।
(৫) কোথায় মায়া-রাষ্ট্র বিপুল মাওরি-পেরু-লঙ্কা-মিশর জোড়া
(৬) কই বাবিলন, আরব, ইরান? কই মাসিডন, রয় কি না রয় জীয়া
রথ-পাখীদের জরদ্‌গবের সাজ!

এইরূপ শত শত উদাহরণ কবির ইতিহাসপুরাণে সুবিস্তৃত ও সুগভীর জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। কোথাও তাহার সুমিত ব্যবহার চিত্রমুখী, কোথাও আবার ভাবময়। বহুক্ষেত্রে তাহা নেহাৎই অতিব্যবহারে কবিতার সৌন্দর্যকে ভারাক্রান্ত করিয়াছে।

রাজনৈতিক বিষয় লইয়া লেখা কবিতায়, মনীষীজীবন-বন্দনায়ও সত্যেন্দ্রনাথ সাংবাদিক ও চরিতকারের নিষ্ঠা ও নিপুণতা লইয়া খুঁটিনাটি তথ্যসংগ্রহে বিশেষ মন দিয়াছেন। ফলে অনেক রচনায় ভাবাবেগ ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে, অনেক কবিতায়

ব্যক্তিত্বের কেন্দ্রীয় রূপটি তথ্যপ্রাচুর্যে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রসঙ্গে "গান্ধীজী"; রবীন্দ্রনাথকে লইয়া রচিত অনেকগুলি কবিতা, "সাগর-বন্দনা" প্রভৃতির নামোল্লেখ করা চলে।

সমগ্রতঃ সিদ্ধান্ত করা চলে যে সত্যেন্দ্রনাথ জ্ঞানের বিষয়কে প্রায়ই স্বাদে উপভোগ্য করিয়া তুলিতে পারেন নাই। কবিতা জ্ঞানলাভের স্থান নহে। তবে জ্ঞানপ্রবুদ্ধ কবিচিত্তের উজ্জ্বলতা উপভোগের বিষয় হইয়া উঠিতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথে জ্ঞানের কথা আছে তবে প্রায়ই তাহা উপভোগের সামগ্রী নয়।

প্রশ্ন ২॥ মনীষীবন্দনা এবং চরিত্রমূলক কবিতার আদর্শ কি? এই বিষয়ে তোমার মতামত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়া সত্যেন্দ্রনাথের এই জাতীয় কবিতার বৈশিষ্ট্য এবং মূল্য নির্ণয় কর।

অথবা, **সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার কবিতার একটি প্রধান বিষয়রূপে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনকথা অবলম্বন করিয়াছেন। ইহার কারণ কি? এই শ্রেণীর কবিতারচনায় তিনি কতটা সফল হইয়াছেন বিচার কর।**

উত্তর। মনীষীদের বা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনচরিত রচনা করা প্রবন্ধসাহিত্যের বিষয় বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। কোনো প্রাবন্ধিক যখন চরিতগ্রন্থ রচনা করেন তখন উহার লক্ষ্য থাকে উক্ত বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনের একটি তথ্যনিষ্ঠ সামগ্রিক পরিচয় উপস্থিত করা। তাঁহাকে তথ্য সংগ্রহ করিতে হয়, প্রতিটি তথ্যের সত্যাসত্য যাচাই করিতে হয়, বিতর্কিত প্রসঙ্গগুলি সম্পর্কে প্রমাণাদি উপস্থিত করিতে হয়, তথ্যাদি যুক্তভাবে বিন্যাস করিতে হয়। উক্ত ব্যক্তি যে যুগের লোক তাহার পূর্বপরিচয় দেওয়া হয়। যে কার্যের জন্য তিনি বিখ্যাত, সেই কার্যের বিবরণ দেওয়া দরকার—তাহার মূল্য নির্ণয়ও করিতে হয়। জীবনচরিতের আবেদন হইল জ্ঞান ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে। কিন্তু কোনো কবি যদি মনীষীর জীবনকাহিনীকে অবলম্বন করিয়া কবিতা লিখিতে চান তিনি অবশ্যই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু সৃষ্টি করিতে চাহিবেন। কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনকাহিনী জানিবার জন্য কেহই কবিতা পড়িবেন না। অনুরূপ জ্ঞানলাভের বাসনা থাকিলে নির্ভরযোগ্য চরিত্রগ্রন্থই পাঠ করা বিধেয়। কবিতায় কবিচিত্তের ছাপ থাকা চাই। আলোচ্য ব্যক্তি যে-বিশেষরূপে মণ্ডিত হইয়া উঠে তাহার উপাদান শুধু বস্তুজগতের নয়, রচয়িতার চিত্তলোকেরও। রবীন্দ্রনাথের জীবনকথা জানিবার জন্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "রবীন্দ্রজীবনী" পড়াই উচিত। কিন্তু "বাইশে শ্রাবণ" কবিতায় মহাকবির মৃত্যুকেও উপলক্ষ করিয়া যতীন্দ্রনাথ আপনার জীবনবোধ, রবীন্দ্রনাথের কবিব্যক্তিত্ব তাঁহার নিজচিত্তে যে বিশিষ্ট অনুভূতি জাগাইয়া তোলে তাহারই রূপ দিয়াছেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথের যে ভাবমূর্তি সৃষ্ট হইয়াছে উহার মধ্যে যতীন্দ্রনাথও মিশিয়া আছেন। সেই কারণেই সুকান্ত ভট্টাচার্যের "রবীন্দ্রনাথের প্রতি" কবিতায় চিত্রিত রবীন্দ্রনাথ হইতে ঐ মূর্তি পৃথক। কারণ, ঐ দ্বিতীয় কবিতায় রবীন্দ্রচিত্রের সঙ্গে সুকান্ত ভট্টাচার্যের মনোভাব জড়াইয়া আছে। ইহা দ্বারা বুঝা যায়,

মনীষীপ্রসঙ্গ কবিতার বিষয়বস্তু হইলেও সেক্ষেত্রেও বস্তুনিষ্ঠা বা objectivity নয়, ভাবনিষ্ঠা বা subjectivity-ই লক্ষ্য হওয়া উচিত। আলোচ্য ব্যক্তির একটি ভাবরূপই (কবি কি ভাবে তাঁহাকে অনুভূতিতে ধরিবেন তাহা সম্পূর্ণ কবির নিজস্ব ভাবনা) প্রত্যাশিত। এক্ষেত্রে লক্ষ্য কোনো জ্ঞানাহরণ নয়, স্বাদগ্রহণ।

চরিতপ্রসঙ্গে রচিত সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাগুলির মধ্যে পূর্বোক্ত আদর্শ কতখানি অনুসরণ করা হইয়াছে তাহা বিশেষভাবে বিচার্য।

সত্যেন্দ্রনাথ মনীষীদের জীবনকথা, বিশিষ্ট বিখ্যাত মানুষদের প্রসঙ্গ লইয়া অনেকগুলি কবিতা লিখিয়াছেন। মনে হয়, এই জাতীয় কবিতা রচনায় সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ প্রবণতাই ছিল। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখা কবিতা আছে অনেকগুলি— "নমস্কার" (দুইটি), "আভ্যুদয়িক", "শ্রদ্ধাহোম", "আলোর তোড়া", "অর্ঘ্য", "জ্যোতির্ময়", "দিগ্বিজয়ী", "কবিপ্রশস্তি", "কবিজুবিলি" প্রভৃতি; বুদ্ধদেব সম্বন্ধে লেখা—"বুদ্ধবরণ", "বুদ্ধপূর্ণিমা", "ঘুমগুম্ফা", "পরিব্রাজক", "মহানামন্" প্রভৃতি। বাংলাদেশের মনীষীদের সম্বন্ধের লেখা কবিতাই বেশী—"সাগর-তর্পণ" (বিদ্যাসাগর), "মনীষীমঙ্গল" (জগদীশচন্দ্র), "অর্ঘ্যপঞ্চক" (কৃত্তিবাস), "রাজর্ষি", "রামমোহন", "মহাকবি মধুসূদন", "কালীপ্রসন্ন সিংহ", "টিকিমেধ যজ্ঞ" (কালীপ্রসন্ন সম্পর্কিত); "শতবার্ষিকী" (প্যারীচাঁদ মিত্র), "দীনবন্ধু মিত্র", "১৪ই জ্যৈষ্ঠ" (অক্ষয়কুমার); "হেমচন্দ্র", "কবি-তিরোভাব" (গোবিন্দচন্দ্র), "দেশবন্ধু" (রমেশচন্দ্র দত্ত), "তারকা সপ্তক" (দ্বিজেন্দ্রলাল), "আচার্য হরিনাথ দে", "আচার্য ত্রিবেদী" (রামেন্দ্রসুন্দর)। ভারতীয় মনীষীদের সম্বন্ধে লেখা কবিতা কম - "গান্ধীজী", "গোখলে" তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বিশ্ববান্ধবদের মধ্যে যীশু ("বড়দিন"), "ঋষি টলষ্টয়", "নিবেদিতা" প্রভৃতির প্রসঙ্গ স্থান পাইয়াছে।

কবির নির্বাচিত প্রসঙ্গগুলির মধ্য হইতে তাঁহার মানসপ্রবণতা কিছুটা বোঝা যায়। বাঙালীজাতির অতীত ও বর্তমান গৌরব সম্পর্কে তিনি অতিশয় উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। বাঙালী মনীষীদের কীর্তিকথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করিয়া সত্যেন্দ্রনাথের কবিচিত্ত সেই গর্বের আন্দোলন উপভোগ করিয়াছে। বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে অনেকগুলি কবিতা লেখা হইয়াছে। উহাদের মধ্যে কবির পূর্বোক্ত মনোভাব যেমন কাজ করিয়াছে তেমনি বাংলা কাব্যের যুগগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সহিত কবির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও ছিল। তবে সেই ব্যক্তিগত সম্বন্ধের উত্তপ্ত সুর ঐ কবিতাগুলিতে ধরা পড়ে নাই। মহাকবির প্রতি ভক্তের শ্রদ্ধাঞ্জলিই উহাদের বিষয়বস্তু।

সত্যেন্দ্রনাথের বহুকবিতায় স্বাদেশিকতার একটি গভীর প্রত্যয় প্রকাশ পাইয়াছে। স্বদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমুগ্ধতার সঙ্গে, অতীতের গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা এই সব কবিতায় দেখা যায়। পরাধীন দেশের স্বাধীনতার বাসনা, বিদেশীশাসকবিরোধী মনোভাব তাঁহার খুবই তীব্র ছিল। এই মনোভাবের বশবর্তী হইয়াই তিনি অধিকাংশ মনীষীবন্দনায় কবিতা লিখিয়াছেন। তাঁহার অবলম্বিত বাঙালী, বিশিষ্ট ব্যক্তিরা

উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্ত সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজসংস্কার প্রভৃতি নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য কার্য করিয়াছেন। গান্ধীজী বা তিলকের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইয়াছেন স্বাধীনতা-আন্দোলনে তাঁদের অবদানের জন্ত। টলস্টয়ের ন্যায় বিদেশী মনীষীর শ্রদ্ধালাভ করিয়াছেন তাঁহাদের উদার মতবাদের জন্ত। সত্যেন্দ্রনাথ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ এবং ধনতন্ত্রী সভ্যতার বিরোধী হইলেও সঙ্কীর্ণচেতা ছিলেন না। বিদেশী চিন্তানায়কেরা যেখানে সত্য ও ন্যায়ের কথা বলিয়াছেন কবির সশ্রদ্ধ নমস্কার সেখানে অবারিত। তাই বলা যায়—সত্যেন্দ্রনাথের মনীষীবন্দনামূলক কবিতা কবির রাজনৈতিক-সমাজনৈতিক ভাবনার একটি বিশেষ ধরনের প্রকাশ।

সত্যেন্দ্রনাথের জ্ঞানসন্ধানী, তথ্যপ্রিয় চিত্তও এই শ্রেণীর কবিতা রচনায় তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনকাহিনী জানিবার একটি স্বাভাবিক কৌতূহল তাঁহার ছিল। চরিত-রচয়িতার নিষ্ঠায় তিনি তথ্যাদির আলোচনা করিতেন। ইহারই অন্যতম ফলশ্রুতি ঐ জাতীয় কবিতা-রচনা।

এইবারে মনীষী-বন্দনামূলক কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ কি পরিমাণ সাফল্যলাভ করিয়াছেন তাহার বিচার করা যাইতে পারে।

"আভ্যুদয়িক" কবিতা রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি উপলক্ষে রচিত। পরাধীন বঙ্গভূমির এই আন্তর্জাতিক সম্মানের অতি সাধারণ স্তরের একটি উল্লসিতভাব এই কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। কোনোরূপ গাঢ় ব্যক্তিগত সুর ইহার মধ্যে নাই। বরং একটা বালসুলভ আনন্দোচ্ছ্বাস ও তরল চাপল্যের ভাবই অধিকাংশ স্তবকে ছড়াইয়া আছে—

> অন্ধকার এই ভারত উজল রবি তোমার রশ্মি মেখে,
> তাই তো তোমার অর্ঘ্য এল নৈশ রবির মুলুক থেকে,
> তাই তো কুবের-পুরীর পারে দীর্ঘ উষার তুষার-পুরী
> সোনার বরণ ঝর্ণা ঝরায় গলিয়ে গুহার বরফ খুঁড়ি;

নোবেলের দেশ নরওয়ের "নৈশ রবির মুলুক", "দীর্ঘ উষার তুষার-পুরী" বলার মধ্যে জ্ঞানসাধকের মনোবৃত্তি তৃপ্তি পাইতে পারে, তরুণ প্রাণ ইহার অর্থ আবিষ্কারে এক-ধরনের আনন্দলাভ করিতে পারে; কিন্তু যথার্থ কাব্য-কল্পনার পরিচয় উহার মধ্যে নাই। "নমস্কার" কবিতায়ও রবীন্দ্র-বন্দনা। কিন্তু ভাবঘটিত কোনোরূপ ঐক্য ইহার মধ্যে নাই। কয়েকটি স্তবকে দেখিতে পাই তাঁহার কবিমাহাত্ম্যের আলোচনা, পরে তাঁহার ঋষিত্ব, একটি স্তবকে জালিয়ানওয়ালাবাগ-প্রসঙ্গ, ইউরোপের যুদ্ধক্ষত অবস্থায় তাঁহার শান্তিদূতের ভূমিকা রূপায়িত হইয়াছে। মাঝে-মাঝে ভৌগোলিক তথ্য-চয়নের বালকোচিত চেষ্টা—

> নিশীথে মশাল জেলে যায় আগে নাচে দিনেমার,
> ওলন্দাজ খুলিতাজ যার লাগি কাতারে কাতার
> শীতে হিমে রাজপথে দাঁড়াইয়া ছবি প্রতীক্ষার,
> ঘন্দ্ব ভুলি 'হূণ', 'গল' যার লাগি রচে অর্ঘ্যভার…।

রবীন্দ্র বিষয়ক এইসব কবিতায় কবির কোনো বিশিষ্ট মনোভাবের ঐক্যসূত্র সক্রিয় নয়। বিচ্ছিন্নভাবে কোনো-কোনো স্তবক চিত্রে রমণীয়, কোথাও শব্দচয়ন সতর্ক কিন্তু সর্বব্যাপী ভাববিশিষ্টতার অভাব লক্ষণীয়।

তথ্যভারে ভারাক্রান্ত হইয়া সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হইয়াছে "গান্ধীজী" নামক কবিতা। গান্ধীজীর জীবনের যাবতীয় ঘটনা সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন কবি। মাঝে-মাঝে স্বাজাত্যবোধের উত্তেজনা আছে। বেশীর ভাগই ছন্দোবদ্ধ তথ্যের মাল্য-রচনা।—

কাফ্রির ভিটা আফ্রিকা-ভূমে প্রিটোরিয়া-নগরীতে,
বারে-বারে ক্লেশ সহিল যে ধীরে, স্বদেশবাসীর প্রীতে,
উপনিবেশের অপ-হুজুরের না মানি' জিজিয়া-কর,
মুদি-মাকালিরে আত্মার বলে শিখাল যে নির্ভর,
বারণ যাদের ওঠা ফুটপাতে তাদেরি স্বজাতি হ'য়ে,
ফুটপাতে হাঁটা পণ যে করিল গোরার চাবুক সয়ে,…ইত্যাদি।

কবিতাটি এরূপ গদ্যাত্মক তথ্যসংগ্রহ মাত্র। শুধু ছন্দের সহযোগ ইহাকে কবিত্বের স্তরে উন্নীত করিতে পারে নাই। গান্ধীজীর কোনো ভাবমূর্তি এই কবিতার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে নাই।

"সাগরতর্পণ" কবিতায়ও বিদ্যাসাগরের পৌরুষদৃঢ় মূর্তিটি ধরবার কোনো রূপ চেষ্টা কবি করেন নাই। কিছু বিক্ষিপ্ত ভাবনা ও শ্রদ্ধা সূত্রহীনভাবে স্তবকে-স্তবকে ছড়াইয়া আছে। তাহার মধ্যে আবার বিদ্যাসাগরের চটি লইয়া যে প্রগল্‌ভতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা একান্ত তারল্যেরই পরিচায়ক—

তেমন মানুষ না পাই যদি খুঁজব তবে, হায়,
ধূলায় ধূসর বাঁকা চটি ছিল যা ওই পায় ;
সেই যে চটি উচ্চে যাহা উঠত এক-একবার
শিক্ষা দিতে অহঙ্কতে শিষ্ট ব্যবহার।
সেই যে চটি—দেশী চটি—বুটের বাড়া ধন,
খুঁজব তারে, আনব তারে, এই আমাদের পণ,
সোনার পিঁড়েয় রাখব তারে, থাকব প্রতীক্ষায়
আনন্দহীন বঙ্গভূমির বিপুল নন্দী-গাঁয়।

গল্পের আসরে যে প্রসঙ্গ লইয়া রসিকতা জমানো যায়, কবিতার রাজ্যে তাহার এই অবারিত প্রবেশে সত্যেন্দ্রনাথ কোনোরূপ দ্বিধা অনুভব করেন নাই।

বুদ্ধদেবকে লইয়া রচিত কবিতাও বেশীর ভাগ তথ্যমূলক—সাময়িক প্রয়োজন মিটাইতে লেখা, বুদ্ধদেবের অহিংসা ও মৈত্রীমন্ত্রের প্রতি কবির শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও কবিতায় তাহা রূপে সার্থক হইয়া উঠে নাই। মাত্র "বুদ্ধ-পূর্ণিমা" কবিতাটি ললিত ছন্দে একটি শান্ত পবিত্র ভাবকে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছে। বুদ্ধদেবের কারুণ্য কবি

ভাষাবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সামগ্রিকভাবে বলা চলে এই শ্রেণীর কবিতায় কচিৎ সাফল্য আসিয়াছে—তথ্যপ্রাচুর্য, কেন্দ্রচ্যুতি এবং ভাব-গাঢ় মূর্তি রচনায় ব্যর্থতাই বেশী প্রকট।

প্রশ্ন ৩॥ সত্যেন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য তাঁহার অনুবাদ কবিতাগুলির মধ্যে কতটা প্রকাশ পাইয়াছে—আলোচনা করিয়া দেখাও।

অথবা,

অনুবাদ কবিতার আদর্শ কি? সত্যেন্দ্রনাথ কবিতার অনুবাদ কর্মে কি পরিমাণ সাফল্য অর্জন করিয়াছেন বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও।

উত্তর। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মৌলিক কবিতা রচনার পাশাপাশি অনুবাদ কবিতা রচনায়ও বিশেষ আগ্রহের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার বহুসংখ্যক অনুবাদকবিতা "তীর্থরেণু", "তীর্থসলিল", "মণিমঞ্জুষা" প্রভৃতি গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। অনুবাদ কর্মের মধ্য দিয়া কবির মনোভাবের কিরূপ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহার বিচার করিবার পূর্বে অনুবাদ-কবিতার মূল বৈশিষ্ট্য লইয়া আলোচনা করা উচিত।

অনুবাদ বা ভাষান্তরের রীতি সাহিত্যে বহু-পূর্বকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কাহিনীকাব্য বা গল্পোপন্যাসের অনুবাদে ঘটনা, বর্ণনা ও চরিত্ররূপ ভাষান্তরেও অনেকটা রক্ষা পায়। কিন্তু খণ্ড কবিতার ক্ষেত্রে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতিই মূল কথা। ব্যক্তিচিত্তের বাসনা-কামনা-বেদনা দ্বারা সেই অনুভূতি গড়িয়া উঠে এবং তা ভাষার বিশিষ্টতার মধ্যে সুনিশ্চিতভাবে রূপায়িত হয়। শব্দের থাকে দুইটি দিক —একটি হইল ধ্বনির দিক, অপরটি অর্থের। রূপান্তরিত ভাষায়ও মূলের অর্থটুকু বজায় থাকে। কিন্তু মূল ভাষার ধ্বনিবিশিষ্টতা অনূদিত ভাষায় ধরিয়া রাখা সম্ভব নয়। এক একটি ভাষার ধ্বনি এক-একরূপ। অনুবাদক তাই মূল ভাষার শব্দ-পরিমণ্ডলটি গড়িয়া তুলিতে পারেন না। অনূদিত কবিতার মধ্য হইতে আমরা মূলের অর্থটুকু মাত্র পাই—স্বাদটুকু পাওয়া কঠিন। অনূদিত গীতি-কবিতায় মূলের সামান্য প্রতিরূপই মাত্র ধরা সম্ভব।

অনুবাদক কোন্ আদর্শটি অনুসরণ করিবেন তাহা লইয়া পণ্ডিত-অনুবাদকদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকে বলেন মূলের যথাযথ অনুবাদ করাই উচিত। নিউম্যান বলেন, "মূলের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য সাধ্যমত অনুবাদকের রক্ষা করা কর্তব্য। মূলের ভাষা যত বেশী বিদেশী তত বেশী সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।" এই নীতি অনুসরণের ফলে বিদ্বান ব্যক্তিরা খুশি হইতে পারেন, কিন্তু পাঠকের সাহিত্যরসাস্বাদ বাসনার তৃপ্তি হইবার কোনোরূপ সম্ভাবনা নাই। কাব্যানুবাদের এ-জাতীয় আদর্শ গৃহীত হইতে পারে না। এই জন্যই অনুবাদের আদর্শ সম্বন্ধে দ্বিতীয় মতটি অনুধাবনযোগ্য বলিয়া মনে হইবে। ই. ভি. রিউ লিখিয়াছিলেন, "সেই অনুবাদই শ্রেষ্ঠ যা তার পাঠকদের কাছে বোধগম্য। মূল বই সমকালীন পাঠকদের মধ্যে যে ভাবাবেদন সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার নিকটতম আবেদন যে অনুবাদ নিজস্ব পাঠকবর্গের মধ্যে সৃষ্টি

করিবে তাহাই শ্রেষ্ঠ অনুবাদ।" আক্ষরিক অনুবাদের তুলনায় এই মতবাদ অনেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ।

কাব্যানুবাদের এই আদর্শের কথা মনে রাখিয়া সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ কবিতা-গুলির বিচার করিতে হইবে।

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ কবিতাগুলির সাহায্যে তাহার চিত্তলোকের বিশিষ্ট প্রবণতাকে ধরিবার উপায় নাই। নানা ভাষার, নানা মেজাজের, নানা কালের কবিদের রচনা তিনি সমান উৎসাহে অনুবাদ করিয়াছেন। কোথাও নির্বাচনী মনোভাব লক্ষ্য করা যায় না। অথর্ববেদ এবং অ্যালেন্ পো, বদলেয়র এবং লি-পো, হাফিজ এবং বিবেকানন্দে তাঁর সমান আসক্তি। প্রাচীন চীনা কবিতা এবং আধুনিক জর্মন কবিতা তাঁকে সমান আকর্ষণ করে। আবার হোমর, ওমর খৈয়াম, ব্রাউনিং ও কীট্সের মত বিভিন্ন মেজাজের কবিতার অনুবাদ করতে তিনি সমান উৎসাহ দেখাইয়াছেন। কাব্যানুবাদ একটি নিষ্ঠাপূর্ণ সাহিত্যিক সাধনা ছিল না সত্যেন্দ্রনাথের কাছে। উহা ছিল বিশ্বমানবমৈত্রীর মন্ত্রোচ্চারণ। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

আমার কণ্ঠে গাহিছেন ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস!
দান্তে হোমার, শেক্সপীয়ার, কণ্ঠে করিছে বাস!
গেটে হুগো বায়রণ,
হেভজু, হাফেজ, স্যাফো, অবৈয়ার, খুস্‌হাল, টেনিসন্।
ওমর খৈয়াম্ আসিয়া মিলেছে, এসেছে ভল্টেয়ার;
হায়েন্ এসেছে, শেলি, সাদি, কীটস, বার্নস, বেরাঞ্জার
আরো যে এসেছে কত
মোদের পদ্মবনে জগতের জুটেছে মধুব্রত।

কাজেই বলা যায়, সত্যেন্দ্রনাথের বৈচিত্র্যসন্ধানী মনই এই অনুবাদ-কর্মের পিছনে কাজ করিয়াছে। নানা দেশের নানা কবির লেখা অনেক কবিতা তিনি পড়িয়াছেন। নিজের শৈল্পিক অনুভূতির বিশিষ্ট প্রবণতার বশবর্তী হইয়া কোনোরূপ নির্বাচন-কুশলতার পরিচয় তিনি দেন নাই। নিজের অধ্যয়ন বিস্তারের ও বৈচিত্র্যের একটি প্রদর্শনী খুলিয়া ধরিয়াছেন যেন। ইহার পশ্চাতে সত্যেন্দ্রনাথের বিশ্বমানবের সহিত মিলিত হইবার একটি বাসনা বোধ হয় কাজ করিয়াছে।

সত্যেন্দ্রনাথ নিজে ইংরেজী, ফরাসী, ফার্সি, সংস্কৃত এবং কিছুটা জর্মন ভাষা জানিতেন। এইসব ভাষা হইতে অনুবাদের সময় তিনি মূলের অনুবাদই করিয়াছেন। ইংরেজীর সাহায্যে অন্য ভাষার কবিতা অনুবাদ করিয়াছেন। ফলে তাঁহার অনুবাদ-সংগ্রহে মূলের সরাসরি অনুবাদ এবং অনুবাদের অনুবাদ উভয় শ্রেণীর কবিতাই স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অনুবাদ শিল্পগুণে ন্যূন হইতে বাধ্য। মূল ভাষার সহিত পরিচয় না থাকায় কবি সে সব ক্ষেত্রে শব্দগত বিশিষ্টতা সম্পর্কে কোনো ধারণাই লাভ করিতে পারেন না। কাজেই অনুবাদের মধ্যে উহার প্রতিফলনের কোনো প্রশ্নই

উঠে না। তবে মূল হইতে সরাসরি অনুবাদের সময়ে কবির মন মূল ভাষার শব্দতাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত থাকেন এবং তাহাকে কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিতে পারেন।

সংস্কৃতভাষা হইতে অনুবাদ করিবার একটি বিশেষ সুবিধা আছে। সংস্কৃত শব্দের ধ্বনিগৌরব অনেকখানি বাংলা ভাষায় স্বাভাবিকভাবেই রক্ষা করা সম্ভব। সত্যেন্দ্রনাথ অবশ্য সংস্কৃত কবিতার অল্পই অনুবাদ করিয়াছেন। তবে বেদ-উপনিষদের সূক্ত ও স্তোত্রের অনুবাদে একটি গাঢ় গাম্ভীর্যের সুর, উদাত্ত মহিমার ভাব রক্ষিত হইয়াছে। কালিদাস হইতে অনূদিত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে মূলের ললিত কমনীয়তা সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে।

কালিদাস—"অহিণবমহু লোলুবো তুমং তহ পরিচুম্বিহ চুঅমঞ্জরিম্।
কমলবসইমেত্ত নিব্বুও মহুঅর বিম্হরিওসি নং কহং ॥

সত্যেন্দ্রনাথ—নূতন মধুর লালসা-লোলুপ অলি হে
আম্রমুকুলে গিয়েছিলে তুমি চুমিয়ে।
আজি কমলের দুয়ারে মাত্র বুলিয়ে
একেবারে তারে গেল কি ভ্রমর ভুলিয়ে ?

'ল' ধ্বনির অত্যধিক ব্যবহার, প্রতি চরণের শেষে 'হে' এবং 'য়ে' ধ্বনির উপস্থিতি একটি বিগলিত সুর আনিয়া দিয়াছে। তবে এ ধরনের সাফল্যের পরিমাণ বেশী নাই। অনেক ক্ষেত্রেই বিষয়ের ভাষান্তর মাত্র ঘটিয়াছে—ভাবরস বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই।

ফার্সি কবিতার অনুবাদেও কবির সাফল্য মিশ্র ধরনের। ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ-এর অনুবাদ করিতে গিয়া সত্যেন্দ্রনাথ মূলের সুর বজায় রাখিতে পারেন নাই।

বনচ্ছায়ায় কবিতার পুঁথি পাই যদি একখানি,
পাই যদি এক পাত্র মদিরা, আর যদি তুমি রাণী
সে বিজনে মোর পার্শ্বে বসিয়া গাহ গো মধুর গান,
বিজন হইবে স্বর্গ আমার তৃপ্তি লভিবে প্রাণ।

উদ্ধৃত রুবাই অনুবাদে ফার্সি কবিতার সুর বা ওমরের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় নাই। ফার্সি শব্দের অব্যবহার এই ব্যর্থতার জন্য কতকটা দায়ী। তুলনায় সাহায্যে বিষয়টি ভালো করিয়া বোঝা যাইতে পারে। মোহিতলাল হাফিজের একটি কবিতাংশের অনুবাদ করিয়াছেন।

হাফিজ—
আগর আঁ তুরকে শীরাজী
বেদস্ত্ আরদ দিলে মারা।
বখালে হিন্-দুয়শ্ বখ্শম্
সমরকন্দ ও বোখারা রা ॥

মোহিতলাল— শীরাজের সেই তুরাণী রূপসী
বে-দরদী,
যদি কোনোদিন দরদ্ বোঝে এ সুখ-হারার,
লাল সে গালের কালো তিলটির বদলে গো,
দিয়ে দিতে পারি সমরকন্দ বোখারা আর।

ফারসি শব্দের সুব্যবহার করিবার জন্য এই অনুবাদে একটি মদির বিহ্বল অনুভূতি সঞ্চারিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন কবি। সত্যেন্দ্রনাথ হাফিজের অনুবাদ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

প্রিয়া যবে পাশে, হস্তে পেয়ালা, গোলাপের মালা গলে ;—
কেবা সুলতান ? তখন আমার গোলাম সে পদতলে।
মোল্লার কাছে মোর বিরুদ্ধে করিয়ো না অনুযোগ,
তাঁর আছে হায়, আমারি মতন সুরামত্ততা রোগ।
প্রিয়ারে ছাড়িয়া থেক না হাফেজ ! ছেড় না পেয়ালা লাল,
এ যে গোলাপের চামেলির দিন—এ যে উৎসব কাল।

এ অনুবাদও অসার্থক নয়। কিন্তু ফার্সি শব্দের তুলনায় তৎসমজাতীয় শব্দের প্রতিই কবির অতিরিক্ত আকর্ষণ মনে হয়। অথচ মোহিতলাল-নজরুল ফার্সিশব্দ ব্যবহার করিয়াই হাফেজ, ওমর, সাদি প্রভৃতির কবিতার মেজাজ বাংলা কবিতায় ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ইংরেজী কবিতার অনুবাদে সত্যেন্দ্রনাথের সাফল্য একেবারেই মাঝারি ধরনের। উদাহরণ হিসাবে কয়েকটি কবিতার উল্লেখ করা হইতেছে। কীটসের "La Belle Dame Sans Mersi"-এর অনুবাদের নাম দিয়াছেন "নিঠুরা সুন্দরী"। মূলে আছে—

I See a lily on thy brow
With anguish moist and fever dew ;
And on thy cheek a fading rose
Fast Withereth too.

অনুবাদে আছে—

কমলের মত ধবল-ললাটে
কেন বা ছুটিছে কাল-ঘাম
কপোল-গোলাপ উঠিছে শুকায়ে
নাহি বিরাম।

এখানে বিষয়ের ভাষান্তর মাত্র রহিয়াছে। "anguish moist and fever dew" এই শব্দগুলির মধ্যে ঘনীভূত হইয়া আছে যে উত্তেজনা "কালঘাম" শব্দে তা কিছুই রক্ষিত হয় নাই।

কীটসের অন্যান্য কবিতা অনুবাদেও দেখা যায় ভাবান্তর যথোপযুক্ত হইলেও স্বাদের সাদৃশ্য রক্ষিত হয় নাই। উদাহরণ হিসাবে In a drear-nighted December (Stanzas এর অন্তর্ভুক্ত) অনুবাদ 'দুখ শর্বরী মাঘে" কবিতার উল্লেখ করা চলে। সত্যেন্দ্রনাথের "দিবাস্বপ্ন" কবিতাটি "The Reverie of Poor Susan" এর অনুবাদ। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার রোমান্টিক ভাবব্যাকুলতার পরিচয় সত্যেন্দ্রনাথে নাই। আক্ষরিক অনুবাদের সাহায্যে তিনি কোনো মায়াজগৎ আদৌ গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। শেলীর বিখ্যাত "To a Skylark" নামক কবিতার অনুবাদ করিতে গিয়া সত্যেন্দ্রনাথ রোমান্টিক স্বপ্নকল্পনা ও স্বপ্নভঙ্গের তীব্র আর্তিকে মোটেই ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই।

শেলীর—

We look before and after
And pine for what is not :
Our sincerest laughter
With some pain is fraught
Our sweetest songs are those that
tell of saddest thought.

সত্যেন্দ্রনাথ—

আগে পাশে চাহি চারিভিতে
কামনা—কোথাও যাহা নাই
আমাদের প্রাণের হাসিতে
মিশে আছে বেদনা সদাই
সবচেয়ে সুমধুর গান—সবচেয়ে দুখের কথাই।

এই সব নিদর্শনের সাহায্যে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে যে সত্যেন্দ্রনাথ অনুবাদ করিয়াছেন অনেক, আদর্শ অনুবাদক তাঁহাকে বলা চলে না। মূলের ভাব ও স্বাদ অল্প কয়েকটি স্থলেই মাত্র তিনি পাঠকদের মনে সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছেন।

প্রশ্ন ৪। রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন—

তুমি বঙ্গভারতীর তন্ত্রী-পরে
একটি অপূর্ব তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে।
সে তন্ত্র হয়েছে বাঁধা ; ইত্যাদি।

কি সে অপূর্ব তন্ত্র? বাংলা কাব্যধারায় সত্যেন্দ্রনাথ নতুন কি দান করিয়াছিলেন—তাহার বিচার কর।

অথবা, **রবীন্দ্র-অনুজ কবি হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথের বিশিষ্টতা বুঝাইয়া বল। তিনি কতটা রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, কতটা রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত ছিলেন এবং কতটাইবা সেই প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে চাহিয়াছিলেন তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দাও।**

অথবা, "সে যুগের তথাকথিত রবীন্দ্রানুসারী কবিদের দুর্বলতার লক্ষণগুলি সত্যেন্দ্রনাথ সযত্নে পরিহার করিতে চেয়েছিলেন।"—উক্তিটির পর্যালোচনা কর। (ক. বি., ১৯৬১)

অথবা, "একান্ত, রবীন্দ্রপ্রভাবিতযুগে আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য তাঁকে প্রধানতঃ কাব্যের কারুকৃতির উপরেই নির্ভর করতে হয়েছিল।" সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যমূল্যবিচারে এই সিদ্ধান্ত কতখানি স্বীকার্য? (ক. বি., ১৯৬২)

অথবা, "সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রযুগের কবি কিন্তু তাঁহার স্বাতন্ত্র্যও ছিল"—মন্তব্যটির বিশদ আলোচনা কর। (ক. বি., ১৯৬৬)

উত্তর। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রপ্রভাব সর্বব্যাপক হইয়া উঠিয়াছিল। তখন কয়েকজন নবীন কবি আবির্ভূত। বয়সে তাঁহারা অনেক তরুণ ছিলেন। নূতন বয়োধর্মের গুণে তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধ হইতে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনের চেষ্টা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা ঘটে নাই। তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের আদর্শটি অনুসরণ করিবার জন্যই আগ্রহী হইয়া উঠিলেন। ১৯২২ সালে সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। এই সময়ের মধ্যে করুণানিধানের "ঝরাফুল", "শান্তিজল", "ধানদূর্বা"; যতীন্দ্রমোহন বাগচীর "লেখা", "রেখা", "অপরাজিতা", "নাগকেশর", "জাগরণী"; কুমুদরঞ্জনের "শতদল", "বনতুলসী", "উজানি", "একতারা", "বীথি", "বীণা", "বনমল্লিকা", "নূপুর", কালিদাস রায়ের "কুন্দ", "কিশলয়", "পর্ণপুট", "বল্লরী", "ব্রজরেণু", "ঋতুমঙ্গল", "ক্ষুদকুঁড়া" প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। সমকালীন অন্যান্য যে সব কবি রবীন্দ্রানুগামী বলিয়া কথিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে পূর্বোক্ত চারজনই প্রধান। তাঁহারা সত্যেন্দ্রনাথের সমকালীন কবি। অনেকেই সত্যেন্দ্রনাথের ন্যায় "ভারতী" পত্রিকার আসরে নিত্য যাতায়াত করিতেন। সত্যেন্দ্রনাথের ন্যায় তাঁহারাও অনেকে রবীন্দ্রনাথের নিকট সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ উহাদের ন্যায় একই গোষ্ঠীভুক্ত হইয়া পড়েন নাই।

উক্ত কবি চতুষ্টয় রবীন্দ্র-জীবনবোধ এবং ভাষারীতিকেই চরম বলিয়া মনে করিতেন। জীবনকে যে পৃথক করে দেখা যায়, অনুরূপ ভাষায় প্রকাশ করা যায়, একথা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই। তবে রবীন্দ্রনাথের প্রতিরূপ গড়িয়া তোলা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই দেখিতে পাই রবীন্দ্রভাবপরিমণ্ডলের একটা সহজ ও তরল রূপকেই তাহারা বাণীবদ্ধ করিতে চান। ইহাদের কবিতার প্রধান লক্ষণগুলি হইল—

প্রথমতঃ, প্রকৃতিপ্রীতি। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবোধের অনুসরণে ইহারাও প্রকৃতিকে কাব্যমধ্যে মুখ্য ভূমিকা দিতে চাহিয়াছেন। প্রকৃতির বিশেষ করিয়া একটি দিক—পল্লীবাংলার রূপাঙ্কনে ইঁহাদের আগ্রহ সবচেয়ে বেশী। পল্লীপ্রকৃতি এবং প্রকৃতির আশ্রয়ে বিকশিত মানবজীবনের সহজ সরল রূপের প্রতি ইঁহাদের প্রীতি ও ভালবাসা বাধাহীন। নগরের জীবন মাত্রেই ইহাদের নিকট কৃত্রিম।

গ্রামজীবনের অকৃত্রিমতার পূজারী ইহারা। তবে রবীন্দ্রনাথের নিসর্গচেতনার অভ্যন্তরে যে দার্শনিক গভীরতা কাজ করিয়াছে তাহার স্পর্শ উঁহাদের কবিতায় মেলে না।

দ্বিতীয়তঃ, বৈষ্ণবতা। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবদর্শনের লীলাবাদকে ঔপনিষদিক ব্রহ্ম-চেতনার সহিত মিশ্রিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রানুসারী কবিরা বৈষ্ণবতাকে খুব সরলভাবে গ্রহণ করিয়া ছলেন। ইঁহারা কেহ কেহ নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু সকলেই বৈষ্ণব মাধুর্য ও কোমলতার সুরটিকে অনুসরণ করিয়াছেন। এই সূত্রে ভক্তিবিহ্বলতা তাঁহাদের কবিতায় একটা প্রধান বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, প্রেমানুভূতির ক্ষেত্রে এই কবিরা রবীন্দ্র-অনুসৃত ইন্দ্রিয়াতীত, দেহাতীতের ধ্যান করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যেমন রোমান্টিক সৌন্দর্য্য-চেতনার চরম লোকে প্রয়াণ করিয়াছেন, অনুগামী কবিরা সেখানে সংসার সীমার চারপাশে আবর্তিত হইয়াছেন।

চতুর্থতঃ, কবিতার আঙ্গিকের ক্ষেত্রে এই কবিরা চিরাচরিত কতগুলি রীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। Poetic diction বা কবিভাষার ব্যবহারে ইঁহারা রবীন্দ্রপন্থা গ্রহণ করিয়াছেন। উপমাদি-চয়নেও কবিগুরু ইঁহাদের আদর্শ।

পঞ্চমতঃ, সমগ্রতঃ জীবনের কোমল-মধুর সুরই ইঁহারা শুনাইয়াছেন। সে ক্ষেত্রেও গুরুর প্রদর্শিত পথেই ইঁহাদের যাত্রা। কঠোর কঠিন জীবন-জিজ্ঞাসা হইতে কবি চতুষ্টয় দূরে থাকিয়াছেন।

রবীন্দ্রানুজ এই কবিদের কাব্যপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিতে গিয়া সমালোচক প্রমথনাথ বিশী লিখিয়াছেন, "তাঁহাদের সকলেরই কবিপ্রতিভার মূলে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব—যদিও এ বিষয়ে কমবেশি আছে, যেমন কুমুদরঞ্জনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রপ্রভাব ন্যূনতম। রবীন্দ্রপ্রভাবের পরেই বৈষ্ণবকাব্যের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। কুমুদরঞ্জনে ও কালিদাস রায়ে এ প্রভাব সব চেয়ে বেশি কার্যকরী হইয়াছে, যতীন্দ্রমোহনের ক্ষেত্রে তাহার প্রভাব স্বল্পতম। কিন্তু এই চারজনের উপরেই পল্লীপরিবেশের প্রভাব সবচেয়ে প্রবল ও সবচেয়ে ফলপ্রসূ হইয়াছে। কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসিবার আগে সেই যে একসময়ে জীবনের দীর্ঘকাল পল্লীবঙ্গে কাটাইয়াছিলেন, সেই স্মৃতি মানসপ্রতিমা গড়িতে তাঁহাদের প্রভূততম সাহায্য করিয়াছে। করুণানিধান ও যতীন্দ্রমোহন মনে মনে পল্লীবাসী ছিলেন, কালিদাস রায় এখনো আছেন, কুমুদরঞ্জন তো কায়মনোবাক্যে এখনো পল্লীবাস করিতেছেন। আধুনিক কবিগণের জীবনতন্ত্রে নগর একটি প্রধান উপাদান, সেইজন্য তাঁহাদের কাব্য জটিল ও অনেকাংশে দুর্বোধ্য (নাগরিক জীবনের রহস্যও জটিল ও দুর্বোধ্য)। পল্লীপরিবেশের উৎস হইতে প্রভাবিত বলিয়া ইঁহাদের কাব্য সরল ও প্রাঞ্জল। সাধারণভাবে ইঁহাদের কাব্যে আদিরসের স্বল্পতা, দাম্পত্য সম্পর্ককে অবলম্বন করিয়া যে প্রেম বিকশিত হয় তাহার বিকাশ ও লীলা ইঁহাদের কাব্যে যথেষ্ট আছে—এদিকে ইঁহারা অক্ষয় বড়াল ও দেবেন্দ্র সেনের অনুগামী; কিন্তু যে প্রেম সামাজিক সম্পর্ক স্বীকার করে না,

আপনি আপনার নিয়ম রচনা করিয়া নরনারীর জীবনে ইন্দ্রজাল বয়ন করিয়া বেড়ায়, সে প্রেমের অভাব এই সব কবির কাব্যে। তবে এ বিষয়েও কমবেশি আছে। যতীন্দ্রমোহন ও করুণানিধানে মাঝে মাঝে এ প্রেম দূরাগত জলন্ত উল্কার মত দেখা দিয়া থাকে, বুঝিতে পারা যায় যে তাহারা এ গৃহের অধিবাসী নয়, চলিয়া যাইবার মুখে একবার জলিয়া গেল; কিন্তু কুমুদ মল্লিক ও কালিদাস রায়ের কাব্যে এ প্রেম নাই বলিলেই চলে। এখন এই প্রেমের রূপটির অভাব তাঁহারা ভক্তিতে পূরণ করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন।" [বাংলার কবি]

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার ভাববৃত্তের এবং রূপায়ন-পদ্ধতির বিচার-বিশ্লেষণ করিলে কোথাও কোথাও রবীন্দ্রানুজ উক্ত কবিগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক সাদৃশ্য দেখা যাইতে পারে। কিন্তু মূলে ইঁহাদের সহিত সত্যেন্দ্রনাথের পার্থক্য রহিয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ প্রকৃতির নানা প্রসঙ্গ লইয়া কবিতা লিখিয়াছেন। ঋতুর বৈচিত্র্য, নানাবিধ ফুল, নদী, পাহাড়, সমুদ্র তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু বিশেষভাবে পল্লীবাংলার প্রতি ব্যাকুলবিহ্বল প্রীতির সুর তাঁহার কোনো কবিতায়ই নাই। সত্যেন্দ্রনাথ বৈষ্ণব ভাবুকতায় আচ্ছন্ন নন। ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমের গান গাহিবার প্রবণতাও তাঁহার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। সমকালীন রবীন্দ্রানুকারী কবিদের সঙ্গে তিনি নিজেকে মিশাইয়া ফেলিতে চাহেন নাই। ঐ পথে চলিলে রবীন্দ্রপ্রভাবের ছত্র-চ্ছায়াতলে হারাইয়া যাইতে হইবে এ ভাবনা কবির ছিল।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যেভাবে জীবনকে দেখিতেন সেই দৃষ্টি যে সত্যেন্দ্রনাথের উপযোগী নয় তাহা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। আবার সমকালীন কয়েকজন কবি (উঁহাদের মধ্যে কয়েকজন তরুণতর) রবীন্দ্রপ্রভাবের বাহিরে যাইবার জন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর "সনেট পঞ্চাশৎ" ও "পদচারণা" তাঁহার জীবৎকালেই প্রকাশিত হইয়াছিল। মোহিতলালের "স্বপনপসারী" প্রকাশিত হইয়াছে, "বিস্মরণী"র অনেক কবিতা রচিত হইয়াছে। নজরুলের "অগ্নিবীণা" প্রকাশিত হইয়াছে, "দোলন চাঁপার" কতক কবিতা লেখা হইয়াছে। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের "মরীচিকা"র অনেক কবিতা লেখা হইয়াছে। এই চারিজন কবি রবীন্দ্রানুজ কবিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্র-ভাববৈশিষ্ট্য তাঁহারা মানিয়া লইলেন না। সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিকোণ হইতে জীবন ও জগতের ভাষ্য তাঁহারা লিখিতে চাহিলেন।

প্রমথ চৌধুরী রোমান্টিক ভাবব্যাকুলতাকে পরিহার করিলেন। গাঢ় গভীর অনুভূতির স্থানে তির্যক বুদ্ধিদৃপ্ত দৃষ্টিভঙ্গীকে বরণ করিলেন। কৌতুকহাস্যে বেদনার বাষ্প উড়াইয়া দিলেন। মোহিতলাল দেহবাদী জীবন-চেতনাকে ক্লাসিক সংহত রূপে বদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলেন। ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমের স্থানে তিনি আনিয়াছিলেন 'দেহের আধারে ধৃত' জীবনের অদ্ভুত রহস্য। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতায় দুঃখবাদী জীবনচেতনা প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। নজরুল ইসলাম উদ্দাম প্রেম এবং উচ্চকণ্ঠ বিদ্রোহের গান গাহিয়াছেন। এইভাবে রবীন্দ্র-প্রচারিত মূল্যবোধ সম্পর্কে এই নবীন

করিয়া অবিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ একটি স্বতন্ত্র মূল্যবোধের দিকে প্রবণতাও দেখাইয়াছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ যে ইহাদের কাব্যধারার সঙ্গে পরিচিত থাকিবেন ইহাই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই সব কবির জীবনচেতনা মূলতঃ তাঁহাকে আকর্ষণ করে নাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারা হইতে তাঁহার মানসপ্রবণতা যতই ভিন্নমুখী হউক, উহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার বাসনা তিনি কখনও অনুভব করেন নাই।

এই ভাবে বিচার করিলে দেখা যায় সমকালীন কবিদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের স্থানটি একটু বিশিষ্টই ছিল। তিনি রবীন্দ্রানুগামী কবিদের হইতে স্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। আবার রবীন্দ্রপ্রভাব অস্বীকার করিয়া যাঁহারা কাব্যক্ষেত্রে নতুন নতুন ভাবধারা আমদানী করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহাদের সহিত সমপর্যায়ভুক্ত হন নাই সত্যেন্দ্রনাথ। তিনি এই উভয় ধারার মাঝামাঝি একটি স্থান নিজের জন্য তৈরী করিয়া লইয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রের কবিতার দ্বারা বঙ্গভারতীর বীণায় যে নবতারের সংযোজন করিবার কথা রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন তাহা এই দিক দিয়াই তাৎপর্যপূর্ণ।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার কবিতায় রবীন্দ্রপ্রভাবপরিমণ্ডলের বাহিরে থাকিবার জন্য যে সব বিষয়, ভাব, বাচনরীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন সেগুলি সব মিলিয়া একটি বিশিষ্ট শিল্পীব্যক্তিত্ব রূপ পাইয়াছে।

প্রথমতঃ, সত্যেন্দ্রনাথ সর্ববিধ প্রত্যক্ষ বিষয়, বুদ্ধিগম্য প্রসঙ্গ, বাস্তব ঘটনার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যভাণ্ডারে এইসব বিষয় বারংবার ব্যবহৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞানচর্চা ও তথ্যনিষ্ঠা সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার বিষয় হিসাবে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি কবিতার রূপায়নের ক্ষেত্রেও উহাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই সূত্রেই সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় ইতিহাস, ভূগোল, পুরাতত্ত্ব এবং বিচিত্র ঐতিহ্যমণ্ডিত বিষয়বস্তুর প্রাচুর্য আসিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবনা সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার একটি প্রধান প্রসঙ্গ। তিনি জাতীয় আন্দোলনের একটা প্রবল স্রোতের মধ্যে কবিতা লিখিয়াছেন। ১৯০৫ হইতে ১৯২২ সালের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ হইতে অসহযোগ পর্যন্ত বাংলাদেশের জীবনে যে রাষ্ট্রনৈতিক চাঞ্চল্য ছিল সত্যেন্দ্রনাথ তাহাকে নানা ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ। জাতীয় স্বাধীনতা এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাব বেশ স্পষ্টভাবেই বহু কবিতায় প্রকাশিত।

প্রশ্ন ৫। সত্যেন্দ্রনাথের লঘু তরল কল্পনাবিলাসের প্রতি একটি গভীর আকর্ষণ ছিল। ইহার প্রতিফলন তাঁহার রচিত কবিতার মধ্যে কিরূপভাবে ঘটিয়াছে? এই শ্রেণীর কবিতার শিল্পসাফল্য সম্পর্কে তোমার ধারণা কি বুঝাইয়া বল।

অথবা, ইংরেজী সমালোচনা-সাহিত্যে "Fancy" এবং "Imagination" নামে দুইটি কথা প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা বিচারে এই পারিভাষিক শব্দগুলি কতটা ব্যবহৃত হইতে পারে?

উত্তর। ইংরেজী সমালোচনা শাস্ত্রে কল্পনার দুটি প্রকারভেদ লইয়া বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে। বস্তুকে অতিক্রম করিয়া কবির অনুভূতি, উপলব্ধি এবং সৃষ্টি-কৌশল যখন বহুদূরে ছড়াইয়া পড়ে; অজানা, অপরিচিত, দূরবর্তী সৌন্দর্যলোককে আবিষ্কার করিতে চায়; জীবনের ধূলিমালিন্যের উপরে, বিবর্ণতার উপরে বর্ণাঢ্য রূপলোক গড়িয়া তোলে—সেই কবিশক্তিই কল্পনা নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। কল্পনার সহিত আপাতদৃষ্টিতে বস্তুসত্যের একটি কঠোর ও আপোষহীন বিরোধিতা রহিয়াছে। কিন্তু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে কল্পনা বাস্তবের বিরোধী নয়। বাস্তবে কবিহৃদয়ের যে-সব বর্ণাঢ্য ভাবনা চরিতার্থ হয় না, যে আদর্শ সৌন্দর্যের জগত কখনও জীবনে সত্য হইয়া উঠে না অথচ যাহার জন্য মানবচিত্তের ব্যাকুল কামনা কখনো নিবারিত হয় না, কল্পনার দ্বারা সেই কাম্য রূপলোককে ভাষাবদ্ধ করেন কবি। এই জাতীয় কল্পনাকে গাঢ় ও অনিবার্য সৌন্দর্যকল্পনা বা imagination নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই Poetic imagination-এর মধ্যে একটা "High seriousness" বা গভীর নিগূঢ় জীবনবোধ থাকে।

কিন্তু আর এক জাতের কাব্যকল্পনা আছে যাহার মধ্যে কোনো গভীরতা থাকে না। জীবন সম্পর্কে কোনোরূপ বড ভাবনার পরিচয় ইহার মধ্যে পাওয়া যায় না। কবি যেন বাস্তব জীবনের ভার ও দায়িত্ব আর সহ্য করিতে না পারিয়া কল্পনার জগতে সাময়িকভাবে পলাইয়া যান। এই কল্পনা যেমন লঘু, তেমনি তরল। একটা হাল্কা ভাব ইহার চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। কোনো সৌন্দর্যচেতনার দ্বারা কবি এখানে ব্যাকুল হন না—রহস্যঘন কোনো উপলব্ধি তাঁহাকে এক অনির্বচনীয় বেদনার জগতে লইয়া যায় না। তিনি একধরনের স্ফূর্তিতে যেন মত্ত হইয়া ওঠেন। কখনও তিনি ভাষা ও ছন্দ লইয়া খেলা করিতে ভালোবাসেন, কখনও শব্দে শব্দে ছবি আঁকেন, রঙ ফোটান, সুর জাগান। কিন্তু কখনই তাহার মধ্য হইতে কোনো বিশিষ্ট জীবনভাবনা খুঁজিয়া পাইতে চান না। এই জাতীয় কল্পনাবিলাস ও সাহিত্যিক খেয়ালিপনাকে Fancy বলা হইয়া থাকে।

স্বভাবতঃই Fancy জাতীয় কল্পনার সহযোগে রচিত কবিতা কখনই Imaginative কবিতার সমজাতীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কিন্তু উহাদের মধ্যে অত্যুচ্চ শ্রেণীর কাব্যস্বাদ না মিলিলেও সীমাবদ্ধভাবে উহাও সার্থক হইয়া উঠিতে পারে। উহার মধ্যে পাঠকমনের খুশি হইয়া উঠিবার মত উপকরণ মিলিতে পারে।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসম্ভারের একটা বড় অংশই তরল ও লঘু কল্পনার ফল। তিনি এ শ্রেণীর কবিতা লিখিতে ভালবাসিতেন। এমন কি অনেক ভাবগম্ভীর

কবিতায়ও তিনি কল্পনাবিলাসিতাকে প্রশ্রয় দিয়াছেন। যেমন, রবীন্দ্রপ্রশস্তি করিতে গিয়া তাঁহার বিশ্বব্যাপী সমাদরের প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

নিশীথে মশাল জেলে যার আগে নাচে দিনেমার,
ওলন্দাজ খুলি তাজ যার লাগি কাতারে কাতার
শীতে হিমে রাজপথে দাঁড়াইয়া ছবি প্রতীক্ষার,
দ্বন্দ্ব ভুলি 'হুন' 'গল্' যার লাগি রচে অর্ঘ্যভার···ইত্যাদি।

এই জাতীয় চিত্রকল্পনা কবির বালকোচিত উল্লাসের রঙে রঞ্জিত। মূল ভাবনার ও বিষয়ের গাম্ভীর্য ইহা দ্বারা একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু বহু কবিতা আছে যাহাদের বিষয়বস্তু লঘু, সাময়িক এবং বহিরঙ্গ। সে সব কবিতায় কবির খেয়ালখুশির কল্পনা শব্দ ও চিত্রে রঙ ধরাইয়াছে। উহাদের সাফল্য তাই স্বীকার করিয়া লইতে হয়। উহারা বড় বা মহৎ কবিতা না হইতে পারে, কিন্তু উহারা উপভোগ্য কবিতা সন্দেহ নাই। সত্যেন্দ্রনাথ কেন এই শ্রেণীর কবিতা রচনায় অতটা আগ্রহ দেখাইয়াছেন তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। সত্যেন্দ্রনাথের কবিচিত্তের মধ্যে একটা বালসুলভ উচ্ছলতা ও কৌতূহলোদ্দীপক ভাব ছিল। কোনো জিনিসই তিনি খুব তলাইয়া দেখিতে চাহিতেন না। বাহির হইতে সদ্যদৃষ্ট রঙ রেখা তাঁহার বহির্মুখী ইন্দ্রিয়গুলিকে আকর্ষণ করিত। আবার বস্তুমুখ্য দৃষ্টিভঙ্গিকে কবি তরল কাল্পনিকতার সূক্ষ্ম আবরণে ঢাকিয়া দিতে চাহিয়াছেন।

প্রথমেই ধরা যাউক "কিশোরী" নামক কবিতার কথা। কবি একটি সৌন্দর্যমূর্তির . করিয়াছেন এই কবিতায়। সেইদিক দিক দিয়া দেখিতে গেলে রবীন্দ্রনাথের 'মানসসুন্দরী' এবং বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদা'র সহিত ইহার তুলনা করা চলে। সত্যেন্দ্রনাথ কিশোরীকে বিশ্বসুন্দরী রূপে কল্পনা করিয়াছেন ঠিকই কিন্তু ভাবে ভাষায় রূপে তাহার মধ্যে রূপকথার ঢঙটিই বড় হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মানসসুন্দরী "বাসনাবাসিনী" এবং

"স্বর্গ হতে মর্ত্যভূমি করিছ বিহার"

অথবা, "উষার গলিত স্বর্ণে রাঙিছ মেখলা।"

এই রূপচিত্রে সৌন্দর্য উপলব্ধি নিখিলকে গাঢ়ভাবে আন্দোলিত করে। আর সত্যেন্দ্রনাথের ভাষাচিত্র—

তার সীঁথায় রাঙা সিঁদুর দেখে
রাঙা হল রঙন ফুল,
তার সিঁদুর টিপে খয়ের টিপে
কুঁচের শাখে জাগ্‌ল ভুল!
নীলাম্বরীর বাহার দেখে
রঙের ভিয়ান্ লাগল মেঘে।···

কবি সত্যেন্দ্রনাথের কল্পনার সৌন্দর্যলক্ষ্মী তাই কখন মনের গভীরে প্রবেশ করে না, কিন্তু রসে রঙে বাহিরের মহলকে সাময়িকভাবে রঞ্জিত করে।

তিনি তাই "পরী"দের গানই বেশী গাহিয়াছেন। পরী বলিতেই কিশোরের কল্পনার কথা মনে আসে। স্বর্গলোকের যে পরম সৌন্দর্যের কামনা "অপ্সরা" শব্দটিকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে, পরীদের মধ্যে সে জাতীয় ভাবাসঙ্গের সামান্য ইঙ্গিতও মেলে না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাবনা যেখানে উর্বশীকে আশ্রয় করে সেখানে সত্যেন্দ্রনাথ লালপরী সবুজপরী জর্দাপরী নীলপরীর কথা বলিতে বলিতে উল্লাস বোধ করেন। এই কবিতাগুলি শুধু খেয়ালখুশির মেলা—নানারঙের বেলুন ওড়ানো বা ফুলঝুরির খেলা।

"সবুজপরী" কবিতার মূল ভাবটি তারুণ্যের জয়গান। কিন্তু সেই ভাবটিকে বিকশিত করিয়া তুলিবার চেষ্টামাত্র নাই। গোটা কবিতাটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে কবিমন রঙের নেশায় মত্ত। সবুজ রঙকে শব্দে রূপান্তরিত করিবার নেশা যেন কবিকে পাইয়া বসিয়াছে। সারা পৃথিবী একটি হাল্কা সবুজের তরঙ্গ-চাঞ্চল্যে উছলিয়া উঠিতেছে—

সবুজ পরী! সবুজ পরী! সবুজ পাখা দুলিয়ে যাও,
এই ধরণীর ধূসর পটে সবুজ তুলি বুলিয়ে দাও।
তরুণ-করা সবুজ সুরে
সুর বাঁধি গো ফিরে ঘুরে,
পাগল আঁখির পরে তোমার যুগল আঁখি ঢুলিয়ে চাও।

কখনও সবুজকে নিংড়াইয়া লইয়া ঔজ্জ্বল্যে রূপান্তরিত করিতেছেন—সবুজের মধ্য হইতে বিদ্যুতের কটাক্ষ বিচ্ছুরিত হইতেছে, কখনও তাহার কোমল সজল কান্তি কবির চোখে মেদুরতা বিস্তৃত করিয়াছে।

"লালপরী" কবিতাটিকে আপাতদৃষ্টিতে রঙের খেলা বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু আসলে এখানে কবি দেখার বস্তুকে স্পর্শের বস্তুতে পরিণত করিয়াছেন। লালের তীব্রতাকে কমাইয়াছেন, লালরঙের সঙ্গে চিরকাল বিজড়িত যে ভাবাসঙ্গ—যৌবনের উগ্রমাদকতা—তাহাকে একেবারে বদলাইয়া ফেলিয়াছেন। লালের মধ্য হইতে একটি কোমল পেলব স্পর্শসুখ তিনি ছাঁকিয়া লইয়াছেন। বিশেষতঃ একটি বাৎসল্যের রস উহার সহিত মিশ্রিত হইয়া উঠিয়াছে।

লাল পরী গো। লাল পরী!
ইন্দ্রসভার সুন্দরী!
কখন্ আসিস্ কখন্ যাস্।
কার গালে যে গাল বোলাস্!
কার ঠোঁটে যে ঠোঁট থুলি!
কার হাতে পায়ে তুলতুলি—

"বিদ্যুৎপর্ণা" কবিতায় কল্পনাউৎস গাঢ় ও গভীর হইয়া উঠিতে পারিত। কবির মর্ত্যপ্রীতি এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের "স্বর্গ হইতে বিদায়" কবিতায় "স্বর্গভূমি স্বর্গ নহে, সে যে মাতৃভূমি" বলিয়া যে জীবনচেতনা প্রকাশ করা হইয়াছে তাহারই প্রভাবে এই কবিতাটি গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু শব্দে ছন্দে চিত্রে এখানে "শুধু অকারণ পুলকে ক্ষণিকের গান" গাওয়া হইয়াছে। কাজেই সমস্ত ব্যাপারটা একটা মহৎ জীবনবোধ হইয়া উঠিতে পারে নাই, একটা ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নচারিতা মাত্র থাকিয়া গিয়াছে—

স্বপনের ভুল মোরা
ভুল-ভরা ভূলোকে।

"তাতাঁরসির গান", "ইল্‌শে গুঁড়ি" প্রভৃতি কবিতায় লঘুকল্পনাশ্রয়ী কবি সোজাসুজি বালকদের দলের সঙ্গী হইয়া উঠিয়াছেন। তালরসের ভিয়ান চড়াইলে গ্রামের কিশোরচিত্ত যে সুরে নাচিয়া উঠে অথবা ইল্‌শেগুঁড়ির বৃষ্টিতে যে ধরনের স্ফূর্তি অনুভব করে তাহাই এই দুটি কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। স্বাদ বস্তুটিকে শব্দের মাধ্যমে শিল্প-উপভোগে পরিণত করা হইয়াছে তাতারসির গানে। ইল্‌শে গুঁড়িতে বর্ষাপ্রকৃতির খেয়ালি দিকটি, নানা চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য যাহা বালকের দৃষ্টিতে ধরা পড়িবার মত তাহাই চিত্রে ধরা পড়িয়াছে।

এই জাতীয় কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার দুইটি বিশিষ্ট প্রবণতা হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতে পারিয়াছেন। জ্ঞানবিজ্ঞানের তথ্যচয়ন এবং স্বাদেশিকতা প্রচারের মোহ—এই কাজ দুটিকে তিনি কখনই ছোট মনে করেন নাই। কিন্তু খেয়ালী কল্পনার আশ্রয়ে কবিতা লিখিতে গিয়া তিনি যেন ঐ দুইটি বিশিষ্টতা হইতে ছুটি লইয়াছেন। বস্তুর ভার, জ্ঞান ও তথ্যের চাপ, কোনো আদর্শবাদী ধ্যানধারণা না থাকায় এখানে কবি শব্দ অর্থ, চিত্ররচনা, রেখা ও রঙের ব্যবহার, ইন্দ্রিয়স্বাবেদনে বিপর্যয়মূলক বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে গিয়া নানারূপ পরীক্ষানিরীক্ষা চালাইয়াছেন। পূর্বে সেইসব পরীক্ষাবৈচিত্র্যের কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

চিত্ররচনার বৈশিষ্ট্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য "পাল্কীর গান", "দূরের পাল্লা"। প্রথম কবিতায় স্পষ্ট চিত্রাঙ্কনই প্রথমতঃ চোখে পড়ে। রঙের ব্যবহার আছে। কিন্তু তাহা ছবির সুনিশ্চিত রেখাবদ্ধ সীমাকে ভোলায় না। দ্বিতীয়তঃ, এই স্পষ্টরেখ চিত্রগুলি কিন্তু চলচ্চিত্র। ছয় বেহারার পাল্কী হইতে ছবিগুলি দেখা। বাস্তব জীবনের এবং একান্ত পরিচিত। কিন্তু দ্রুতগতি লাভ করায় স্থির চিত্র হইতে ইহাদের জাত আলাদা। কবি গতিশীল চিত্রপরম্পরায় মৃদু ভাবের রঙ বুলাইয়াছেন। বেহারাদের ক্লান্তি প্রকৃতির রুদ্ররূপ প্রভৃতি ভাবের স্পর্শ ছবিগুলিকে উপভোগ্য করিয়াছে এবং স্থির হইয়া পড়িতে দেয় নাই।

এই চলমানতা দূরের পাল্লায়ও আছে। তবে গতি কিছু ধীর। ছবিগুলি সর্বদা

স্পষ্ট নয়। কখনও ধ্বনি-আশ্রয়ী ('ঝক্‌ঝক্ কলসীর বক্‌বক্ শোন গো"), কখনও বর্ণপ্রধান ("পান্নার টাকশাল") মাঝে মাঝে রূপকথামূলক ("ডাইনী যেন ঝামরচুলো")।

পরীক্ষানিরীক্ষার দিক হইতে "পিয়ানোর গান" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ শব্দের চিত্রধর্মকে একেবারে নস্যাৎ করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। শব্দের ধ্বনি বা Sound-মাত্রকে আশ্রয় করিয়া এক ধরনের শ্রুতি-রম্যতার সৃষ্টি করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কবিতার শব্দগুলি অর্থহীন কোলাহল নয়। যে কোন শব্দ জুড়িয়া দিলেই অর্থহীনতা সৃষ্টি করা যায়। তাহার মধ্যে কোন শিল্পকৃতি নাই। সত্যেন্দ্রনাথ শব্দ সমবায়কে অর্থপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। সব মিলিয়া একটা অর্থ হয়। কিন্তু অর্থোদ্ধারের জন্য কবি আমাদের মনকে অবকাশ দেন না। কানই উহার সব তাৎপর্য শোষণ করিয়া লয়।

তুল্ তুল্ টুক টুক
টুক টুক তুল্ তুল্
কোন্ ফুল তার তুল্
তার তুল্ কোন্ ফুল?
টুক্ টুক্ রঙ্গন
কিংশুক ফুল্ল
নয় নয় নিশ্চয়
নয় তার তুল্য।

এই শব্দের ঝঙ্কারেই পাঠকের কান ভরিয়া যায়। এখানেই সত্যেন্দ্রের খেয়ালী কল্পনা এক নূতন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষায় সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

এই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে সর্বশেষে উল্লেখ করিতে হয়, "কাজরী পঞ্চাশৎ" "কুঙ্কুম পঞ্চাশৎ" "গুজরাটি গরবী"র ন্যায় শ্লোক সংগ্রহকে। প্রেমের চটুল মধুর ক্ষণিক স্ফূর্তি ও চাঞ্চল্যকে অবলম্বন করিয়া এই রঙীন কাব্য-বুদ্বুদগুলি রচিত। স্বল্পস্থায়ী এই সব শ্লোকে রামধনুর নানা রঙ্ প্রতিফলিত। ইহাদের উপভোগ করিয়া জীবনের অতল সত্যে পৌঁছানো যায় না। কিন্তু সাময়িক খুশির মূল্যে ইহাদের সীমাবদ্ধ সাফল্য অবশ্যস্বীকার্য।

প্রশ্ন ৬॥ সত্যেন্দ্রনাথ চিত্র ও সঙ্গীতের কবি—এই মতের গ্রহণযোগ্যতা বিচার কর। **[ক. বি. '৬৭]**

অথবা, সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যপ্রেরণার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ইহাতে উচ্চাঙ্গের কল্পনাশক্তির বিকাশ কতখানি, ছন্দ এবং চিত্রের আপাত-রম্যতার উন্মাদই বা কী পরিমাণ? **[ক. বি. '৬৫]**

অথবা, সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় সঙ্গীত ও চিত্রধর্মিতার যে যুক্তবেণী রচিত হয়েছে, তার গ্রন্থন-নৈপুণ্য বিশ্লেষণ কর। **[ক. বি. ১৯৬৩]**

উত্তর। কবিতার প্রধান উপাদান দুইটি—চিত্র ও সঙ্গীত। যে কোনও কবিকেই এই দ্বিবিধ উপাদানের উপরে নির্ভর করিয়া আপনার অভিপ্রায় পালন করিতে হয়। স্বর একটা দিক তাহার ধ্বনিঝঙ্কার বা Sound effect এর দিক। এই দিকটি আশ্রয় করিয়া এবং কবিতার ব্যবহৃত ছন্দের সহযোগে সঙ্গীতধর্মটি গড়িয়া ওঠে। অপরদিকে শব্দের যে অর্থতাৎপর্য তাহা পাঠকের মনের পটে একটি চিত্র আঁকিয়া তোলে। শব্দ দিয়া চিত্র গড়িয়া তোলা সর্বদাই কবির একটি প্রধান লক্ষ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। উপমাদির ব্যবহারও ঐ একই উদ্দেশ্যে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য—"ভাষার মধ্যে ··ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য প্রধানত ভাষার মধ্যে দুইটি জিনিস মিশাইয়া থাকে, চিত্র এবং সংগীত। কথার দ্বারা যাহা বলা চলে না ছবির দ্বারা তাহা বলিতে হয়। সাহিত্যে এই ছবি আঁকার সীমা নাই। উপমা-তুলনা-রূপকের দ্বারা ভাবগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে চায়। 'দেখিবারে আঁখি পাখি ধায়' এই এক কথায় বলরাম দাস কী না বলিয়াছেন? ব্যাকুল দৃষ্টির ব্যাকুলতা কেবলমাত্র বর্ণনায় কেমন করিয়া ব্যক্ত হইবে? দৃষ্টি পাখির মতো উড়িয়া ছুটিয়াছে, এই ছবিটুকুতে প্রকাশ করিবার বহুতর ব্যাকুলতা মুহূর্তে শান্তিলাভ করিয়াছে। এ ছাড়া ছন্দে বাক্যবিন্যাসে সাহিত্যকে সংগীতের আশ্রয় তো গ্রহণ করিতেই হয়। যাহা কোনোমতে বলিবার জো নাই এই সংগীত দিয়াই তাহা বলা চলে। অর্থবিশ্লেষ করিয়া দেখিলে সে কথাটা যৎসামান্য হইয়া পড়ে। কথার মধ্যে বেদনা এই সংগীতই সঞ্চার করিয়া দেয়। অতএব চিত্র এবং সংগীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সংগীত ভাবকে গতিদান করে। চিত্র দেহ এবং সংগীত প্রাণ।" [সাহিত্য: সাহিত্যের তাৎপর্য]

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিত্র ও সঙ্গীতধর্মের কথা বিশেষভাবে বলিবার কোন কারণ আছে কিনা সে প্রশ্ন তোলা যাইতে পারে। প্রতিটি কবিকেই যদি এই দুইটি উপাদানের সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়, সেক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথকেই বিশেষভাবে ছবি ও গানের কবি বলিবার কারণ থাকে না।

তবুও অনেক সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথের চিত্রধর্মিতার কথা বিশেষভাবে বলিয়াছেন, তাঁহার কবিতার গীতিরসের উল্লেখও করিয়াছেন। এই বিষয়ের আলোচনায় সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার সত্যেন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্যটি অনুধাবনের চেষ্টা করিয়াছেন, "সত্যেন্দ্রনাথের মন ছিল চোখ দুইটির একেবারে ঠিক পিছনেই, এবং কানও ছিল অতিশয় প্রখর; অর্থাৎ, সমস্ত মনখানি ছিল বহির্জগতের দিকে উন্মুখ। এজন্য···তাঁহার কবিতায় দুইটি জিনিস নানা ভঙ্গিতে প্রকাশ হইতে দেখি—দেখার আনন্দ ও শোনার আনন্দ।···তাঁহার কবিতার আরও এক দিক আছে, ধরণীর রূপ-রং-রেখার দিক—পঞ্চেন্দ্রিয়-সাক্ষী প্রকৃতির বহুবর্ণের ঘাগরী, এবং তাহার নৃত্যচপল চরণযুগের মঞ্জীরধ্বনি। সত্যেন্দ্রনাথ এই রূপের সন্ধান সর্বত্র করিয়াছিলেন—যেমন শিল্পে, তেমনি নিসর্গে। ···রঙ ও রূপের সন্ধানে যেমন তাঁহার চোখের

ক্লান্তি নাই তেমনিই কানেরও কি পিপাসা!" [আধুনিক বাংলা সাহিত্য: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত]

মোহিতলালের সমালোচনার মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের চিত্র ও সঙ্গীতধর্মের বৈশিষ্ট্যটি অনেকখানি নিহিত রহিয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথের মন খাঁটি কাব্যকল্পনা বা উচ্চাঙ্গ গভীর ভাবনার জগতে প্রবেশ করিয়া "কোন অপ্রত্যক্ষ জগৎ বা দূর-দুর্লভ আদর্শ ভাবমোহে আবিষ্ট হয় নাই।" অর্থাৎ সত্যেন্দ্রনাথের চিত্ররচনায় নৈপুণ্য এবং ছন্দহিল্লোল একটা বড় কাব্যচেতনার অচ্ছেদ্য অংশরূপে উপলব্ধির বিষয় নয়।

বহু কবিতায় তথ্যনিষ্ঠা সত্যেন্দ্রনাথকে চিত্রগঠন হইতে কখনও কখনও বিচ্যুত করিয়াছে। তাজমহলের নানা পাথরের তালিকারচনায় কবির কৌতূহলোদ্দীপক মনোভাব ও জ্ঞানস্পৃহা বড় হইয়া উঠিয়াছে—

সিংহলী নীলা, রাঙা আরবী প্রবাল,
তিব্বতী ফিরোজা পাথর,
বুন্দেলী হীরা রাশি, আরাকানী লাল,
সুলেমানী মণি থরে থর,
ইরাণী গোমেদ, মরকত থাল থাল
পোখ্‌রাজ বুঁদি, গুল্‌নর।

তালিকা চিত্র নয়। তালিকারচনার পেছনে থাকে জানার আনন্দ, সেই মনোভাবকে সংযত করিয়া দেখার আনন্দে রূপান্তরিত করিতে হয়, তাহা না হইলে ছবি গড়িয়া ওঠে না। সত্যেন্দ্রনাথ বহুক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পৌরাণিক ঘটনার বহুল উল্লেখ করিতে গিয়াও চিত্ররচনায় সাফল্যে পৌঁছিতে পারেন নাই। তাহা ছাড়া গভীর ভাবগর্ভ, কল্পনার রঙে রঞ্জিত চিত্রাঙ্কনে সত্যেন্দ্রনাথ কখনই প্রবণতা বোধ করেন নাই। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ রোমান্টিক কবিকুলের ন্যায় সত্যেন্দ্রনাথের চিত্রগুলি স্পষ্ট হইতে অস্পষ্ট রহস্যব্যাকুলতার দিকে, সীমা হইতে অসীমের দিকে ছুটিয়া যায় না। সত্যেন্দ্রনাথের চিত্ররচনার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিতে গিয়া বিশিষ্ট সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়াছেন—"ছড়ার ঝোঁকে, ছন্দের নৃত্যহিল্লোলে, অনভিজাত ও বিদেশ হইতে আহৃত চটুল শব্দের ধ্বনিময় প্রয়োগে, রং ও তুলির লঘু টানে, সৌন্দর্যের অনায়াসসিদ্ধ চিত্রাঙ্কনে, সর্বোপরি মানস উল্লাস ও উত্তেজনার উপচাইয়া-পড়া উচ্ছলতায় তিনি তাঁহার কবিতায় এই কল্পনালীলাকে মনোহর, সহজ-অনুভব-বেদ্য রূপ দিয়াছেন। অলংকৃত, মন্থরগতি, অভিজাত ভীষণ ও গভীরতর অতন্দ্রনিয়ন্ত্রণ হইতে কবিতাকে মুক্তি দিয়া তিনি ইহাকে চলমান জীবনস্রোত, প্রাণের সহজ গতিবেগের সহিত এক ছন্দে গাঁথিয়াছেন—সৌন্দর্যের গন্ধমন্থর কুঞ্জবন হইতে বাহির করিয়া বাস্তব জীবনের ছুটিয়া-চলা, হোঁচট-খাওয়া মৃত্তিকা স্পর্শে অশালীন উদ্দামতার সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন।" ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যেন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে "বিস্ময়-

বিস্ফারিতনেত্র, বংশীরবে উৎকর্ণ নৃত্যপর হরিণে"র সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। এই তুলনার মধ্যেই সত্যেন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার মূল সূত্রটি নিহিত রহিয়াছে।

সত্যেন্দ্রনাথ ভাষাচিত্র রচনায় বিচিত্র কারুকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। 'পালকির গান" প্রভৃতি কবিতায় চলচ্চিত্রের ঢঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাস্তব চিত্রের চলমান রূপ প্রকাশিত। চিত্রগুলি যেথায় স্পষ্ট কিন্তু দ্রুত ধাবমান। তাছাড়া পাল্‌কি বেহারাদের উৎসাহ, শ্রান্তি প্রভৃতির রঙে রঞ্জিত হওয়ায় চিত্রগুলি উপভোগ্যও হইয়া উঠিয়াছে।

কুকুরগুলো শুঁকছে ধূলো,—
ধুঁকছে কেহ ক্লান্ত দেহ।
ঢুকছে গরু দোকান-ঘরে
আমের গন্ধে আমোদ করে।

একান্ত সাধারণ মৃত্তিকাস্পর্শী চিত্র-অঙ্কনের ঝোঁক এখানে লক্ষ্য করার মত। এর পাশে গম্ভীর সুরের তৎসম শব্দ-ভারাক্রান্ত চিত্রের প্রতি কবির ঝোঁক যে কম নয় তার নিদর্শনও সুপ্রচুর। যেমন "মহাসরস্বতী" কবিতার মহাকাব্যোপম চিত্রাবলী—

শক্তির বিভূতি তুমি, তুমি মহাশক্তি সমুদ্ভবা;
সপ্ত স্বর্গ-বিহারিণী। অন্ধকারে তুমি ঊষা-প্রভা!
স্বর্গে-সুপ্ত ভর্গদেব মগ্ন সদা তোমারি স্বপনে;
সবিতৃসম্ভবা দেবী সাবিত্রী সে আনন্দিত মনে
বন্দে ও চরণে।

পৌরাণিক-ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ কখনো কখনো শুধু উল্লেখে পর্যবসিত না থেকে হয়ে উঠেছে চিত্র। সেখানে বর্ণবাহুল্য এবং ধ্বনিসমারোহ লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের প্রিয় প্রসঙ্গ লঘু-তরল কল্পনাশ্রয়ী চিত্ররচনা।

[৫ নং প্রশ্নোত্তরে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।]

চিত্রের তুলনায় সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় সঙ্গীতের স্থান যে গৌণ তাতে সন্দেহ নাই। সঙ্গীতের আবেদন নির্বিশেষের দিকে, চিত্রের লক্ষ্য বিশেষ বস্তু। অনেক কবি ইহাদের মধ্যে মিলন ঘটান। অনেকের চিত্র সঙ্গীতে সমর্পিত আত্মা। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় সুর চিত্রটির অনুগামী। তাঁহার ছন্দে ও শব্দে যে সুর জাগিয়া ওঠে তাহা বস্তুর চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়; চিত্রকে গতি দেয়, নৃত্যপর করে, কিন্তু উধাও হইয়া উড়িয়া ছুটে দেয় না দিগন্তে।

সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দে প্রধানতঃ চটুলতাই প্রশ্রয় পায়। প্রকৃতির যে গানে আত্মা

ব্যাকুল হয় তাহা সত্যেন্দ্রনাথের চিত্তকে অধিকার করিতে পারে নাই। তাঁহার "গ্রীষ্মের সুর" আসলে চিত্রাশ্রয়ী ভাবের অনুরণন মাত্র। "পাকীর গান" ছড়ার সুরে ধরা চিত্রখণ্ডের গতি। "তাতারসির গান" বালক মনের চঞ্চল কৌতূহল। "পিয়ানোর গান"-এ শব্দকে মুখ্য করিয়া অর্থভারমুক্ত করিয়া তোলার এক আশ্চর্য প্রয়াস।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে সুরের কবি বলা হয় বিশেষ করিয়া তাঁহার ছন্দোবৈচিত্র্যের প্রতি আকর্ষণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া। তাঁহার কবিচিত্তের বিশেষ লঘু খেয়ালিপনা সেখানেও অভিব্যক্ত।

প্রশ্ন ৭॥ একদিকে ক্ল্যাসিকাল ভঙ্গীর সংযম, অন্যদিকে রোমান্টিক ভঙ্গীর ব্যাকুলতা,—সত্যেন্দ্রনাথের কবি-স্বভাবের মধ্যে এই দুয়েরই প্রকাশ দেখা যায়।—এই মন্তব্যের যাথার্থ্য নিরূপণ কর। [ক. বি., '৬০]

অথবা, "রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী ও উচ্ছ্বসিত বাগ্‌ভঙ্গী সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাকে উপভোগ্য করিলেও স্থায়ী মূল্য সম্বন্ধে সংশয় অপনোদন করিতে পারে নাই।" এই মন্তব্যের যাথার্থ্য বিচার কর। [ক. বি, '৬৪]

উত্তর। "জার্মান কবি হেনরিক হাইনে রোমান্টিক রচনাকে চিত্রকলার সহিত এবং ক্ল্যাসিকাল রচনাকে মূর্তিশিল্পের সহিত তুলনা করিয়াছেন। চিত্রে বিষয়াতিরিক্ত বহু অর্থের ব্যঞ্জনা থাকে, তাহার পটভূমিকার দৃশ্যসন্নিবেশ ভাব ও অর্থকে বহুদূর প্রসারিত করিয়া দেয়; তা'ছাড়া তাহাতে ছায়া ও আলোকের খেলা, চোখের ধাঁধা রহিয়াছে—ধরিবার ছুঁইবার কিছুই নাই। অপর পক্ষে, কোন মূর্তিরচনার মধ্যে আমরা একটা পরিষ্কার আয়তন পাই, তাহার কোনখানটায়ই ধাঁধা নয়, অপরিস্ফুট নয়। তাহার কোথাও অসীমতার ব্যঞ্জনা নাই, তাহাকে চারিদিক হইতে স্পর্শ করিয়া অনুভব করা যায়; তাহার মধ্যে শিল্পী যে সৌন্দর্য ফুটাইতে চাহিয়াছে, তাহা বস্তু বা বিষয়কে ছাড়াইয়া নহে, অথচ অসম্পূর্ণ নয়। মোটের উপর, অর্থ নহে—ভাবে যাহা গভীর, শব্দ হইতে শব্দাতিরিক্ত ভাবসৃষ্টি যাহার উদ্দেশ্য, প্রকাশ অপেক্ষা ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনা যাহাতে অধিক,—তাহাকেই আমরা রোম্যান্টিক রচনা বলিতে পারি।" [মোহিতলাল মজুমদার: আধুনিক বাংলা সাহিত্য]

ক্ল্যাসিকাল এবং রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির যে পার্থক্যের কথা সমালোচক এখানে বলিয়াছেন তাহা মোটামুটি সর্বজনগ্রাহ্য। উহারই মাপকাঠিতে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যধর্মের বৈশিষ্ট্যটি অনুধাবন করা যাইতে পারে।

সত্যেন্দ্রনাথের বাগ্‌ভঙ্গীতে উচ্ছ্বাস মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা যায়, কল্পনায় তরলতা তাঁহার বহু রচনায় প্রাণধর্ম বলিয়া চিহ্নিত হইতে পারে। কিন্তু ইহাদের যথার্থ

কবিচিত্তের গাঢ় ব্যাকুলতা বলা চলে না—প্রকৃত রোম্যান্টিকতার লক্ষণ ইহারা নয়। কারণ সত্যেন্দ্রনাথের উচ্ছ্বাস প্রায়ই রাজনৈতিক উত্তেজনা মাত্র—

দিনে দীপ জ্বালি ওরে ও খেয়ালী! কি লিখিস্ হিজিবিজি?
নগরের পথে রোল ওঠে শোন্ গান্ধিজী! গান্ধিজী!
বাতায়নে দেখ্ কিসের কিরণ! নব জ্যোতিষ্ক জাগে
জন-সমুদ্রে ওঠে ঢেউ, কোন্ চন্দ্রের অনুরাগে!

রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়া উপলক্ষে কবির উল্লাস বালকের ন্যায় প্রগল্ভ,—

অন্ধকার এই ভারত উজল রবি তোমার রশ্মি মেখে
তাই তো তোমার অর্ঘ্য এল নৈশ রবির মুলুক থেকে
তাই তো কুবের-পুরীর পারে দীর্ঘ উষার তুষারপুরী
সোনার বরণ ঝর্ণা ঝরায় গলিয়ে গুহার বরফ-ঝুরি।

বিদ্যাসাগরের চটিজুতা লইয়া কবির যে বাগ্‌বিস্তার তাহা উচ্ছ্বসিত হইতে পারে, কিন্তু রোম্যান্টিক ব্যাকুলতা হইতে বহু দূরবর্তী। এ-বিষয়ে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—"আমরা যেন পরিচিত জগৎ ও কাব্যলোক হইতে বহুদূরে এক আদিম শৈশব-কল্পনার রাজ্যে রূপকথার এক রহস্যপুরীর মধ্যে নীত হইয়াছি। এই গোধূলিছায়াচ্ছন্ন, রূপের চমকে মুহুর্মুহু চকিত, স্বপ্নাবিষ্ট প্রদেশই সত্যেন্দ্র-কল্পনা-বিকাশের সর্বাপেক্ষা অনুকূল প্রতিবেশ।···শিশুচিত্তের অবাধ, তরল প্রবহমানতা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিচিত্র আবেদনের প্রতি ইহার নিবিড় মোহের সঙ্গে যদি কবিত্বশক্তির অতি-সহজে উত্তেজিত, উল্লাস-উন্মুখতার যোগ হয়, তবে সেই যোগফল কবি সত্যেন্দ্রনাথ।···যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকিলে সাময়িকতার মধ্যে চিরন্তনতাকে আবিষ্কার করা সম্ভব, সদ্যোঢালা সোডার বোতলের ফেনা-স্ফীতির মধ্যে বিলম্বলব্ধ, স্থায়ী গুণবিশিষ্ট, রুচিকর স্বাদ অনুভব করা যায়, সত্যেন্দ্রনাথের সেই গভীর-অনুপ্রবেশী কল্পনা ছিল না।···প্রথম কামড়ে কাঁচা ফলের যে অংশ রসাল বলিয়া মনে হয়, পূর্ণ পরিপক্বতার পরিণত মিষ্টতা সব সময়ে সে অংশে নিহিত নয়। সত্যেন্দ্রনাথ অনেক সময়ে প্রথম কামড়ের সদ্য-উচ্ছ্বসিত কাব্য-কোলাহলের ও ভাব-তারল্যের কবি।"

সত্যেন্দ্রনাথের উচ্ছ্বাস ও আবেগের উত্তেজনার মধ্যে রোম্যান্টিক কল্পনাতিশয্য বা ভাবব্যাকুলতার স্পর্শমাত্র নাই। কবি প্রত্যক্ষদৃষ্ট বস্তুর রূপ ও রঙ, শব্দ ও তালের দ্বারা আবিষ্টচিত্ত। রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবনা, ইতিহাস ভূগোল ও পুরাণের জ্ঞান ও তথ্যরাজি বিষয় হিসাবে তাঁহার প্রিয়। এই জাতীয় বিষয়কে অবলম্বনমাত্র করিয়া রোম্যান্টিক কবিপ্রাণ আপনাকে প্রতিফলিত করে, আপন কল্পনাকে দিগন্তস্পর্শী

ও অনির্বচনীয় করিয়া তোলে। সত্যেন্দ্রনাথ কদাপি তাহা করেন নাই। বস্তুর নিজস্বরূপ ও পরিবেশ প্রকাশ করিতে তিনি আগ্রহী। তাঁহার কবিতায় প্রকৃতির যে রূপ আছে উহাও বস্তুঅনুগ রূপ, ভাবপ্রধান ও ব্যঞ্জনাধর্মী নয়। যেমন পদ্মার উন্মত্ত রূপ প্রকাশ করিতে গিয়া কবি তাহাকে—

হে পদ্মা! প্রলয়ঙ্করী! হে ভীষণা! ভৈরবী সুন্দরী!
হে প্রগল্‌ভা! হে প্রবলা! সমুদ্রের যোগ্য সহচরী
তুমি শুধু; নিবিড় আগ্রহ তার পারগো সহিতে
একা তুমি; সাগরের প্রিয়তমা অয়ি দুর্বিনীতে!

বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। পদ্মা নদীকে সমুদ্রের প্রেয়সী বলার মধ্যে কল্পনার যে স্পর্শ আছে তাহা বস্তু-অতিক্রমী নয়। রোম্যাণ্টিক কল্পনা বস্তুকে অতিক্রম করে, বস্তুকে রূপান্তরিত করে, বস্তুর উপরে আত্মাকে আরোপ করে এবং একটা অস্পষ্ট রহস্যমণ্ডিত জগতের দিকে লইয়া যায়। সত্যেন্দ্রনাথের চিত্ররূপ স্পষ্ট; ভাবনার মধ্যে আত্মার প্রতিফলন নেই। শরতের প্রভাতের শান্তকোমল নিম্নোদ্ধৃত রূপটি বাংলা দেশের নিজস্ব প্রকৃতির যথার্থ দর্পণ—

ভোর হল রে, ফর্সা হল, তুল্‌ল উষার ফুল-দোলা!
আন্‌কো আলোয় যায় ছাখা ওই পদ্মকলির হাইতোলা!
জাগ্‌ল সাড়া নিদ্‌মহলে,
অ-থই নিথর পাথার-জলে—
আল্‌পনা ছায় আল্‌তো বাতাস, ভোরাই সুরে মন্‌ ভোলা!

যথার্থ ক্ল্যাসিকাল দৃষ্টিভঙ্গীই এইরূপ স্পষ্ট ছবি আঁকিয়া আনন্দ পায়।

সত্যেন্দ্রনাথের বহু কবিতা লঘু কল্পনাবিলাসের ফল। বস্তুর চারপাশে একটা রঙের আলপনা, সুরের গুনগুনানি, নূপুরের চঞ্চল তাল সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই খেয়ালী কল্পনাকে রোম্যাণ্টিক কল্পনা বলিয়া মনে করা সঙ্গত হইবে না। এই দুই জাতীয় কল্পনার পার্থক্য নির্ণয় করিতে গিয়া বিশিষ্ট সমালোচক বলিয়াছেন, "ইংরেজীতে কবিমানসের একটি বৃত্তিকে Fancy বলে। ইহা ঠিক imagination নয়। Imagination-কে আমরা বাংলায় যেমন 'সৃজনী-কল্পনা' বলিতে পারি তেমনই, এই Fancy-কে কবিমনের একরূপ লীলা বিলাস বা 'খেয়ালী-কল্পনা' বলা যাইতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথের এইরূপ কল্পনা খুব বেশী মাত্রায় ছিল। তাঁহার উপমাগুলিতে এই 'খেয়ালে'র উৎকৃষ্ট পরিচয় আছে। এমনও বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার মনে যেন সর্বদাই এই খেয়ালের ক্রিয়া চলিত—কোন বস্তুকে চিত্রিত করিবার সময়ে, এমন কি

কোন ভাব বা চিন্তাকেও ব্যক্ত করিবার ছলে, তাঁহার মনের এই যে বিলাস তাহাই বিচিত্র উপমাচিত্রে চিত্রিত হইতে চাহিত।"

কাজেই সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় খেয়ালী কল্পনার লঘু-তরল স্পর্শ দেখিয়া তাহাকে রোম্যান্টিকতা বলিয়া ভুল করিবার কারণ নাই।

তবে তাঁহার ক্ল্যাসিকতা সম্পর্কে যাহা বলা হয় তাহাও বহিরঙ্গ দিক দিয়াই মাত্র সত্য। যথার্থ ক্ল্যাসিকদৃষ্টির কবির মধ্যে বোধের ও রূপায়ণের যে ভারসাম্য থাকে সত্যেন্দ্রনাথে তাহা ছিল না। এতখানি বালসুলভ তারল্য ক্ল্যাসিক রীতির স্পষ্টতা, বিশ্বাস ও যুক্তিনিষ্ঠার পরিপন্থী।

প্রশ্ন ৮॥ বাংলার প্রকৃতির যে ধ্বনি-ঝংকৃত রূপোজ্জ্বল চিত্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখনীতে বিকশিত হয়েছে, অন্য কোনো বাঙালী কবির কবিতায় তা অলভ্য।—সত্যেন্দ্রনাথের এই বিশিষ্টতাটির বিচার প্রসঙ্গে এই মন্তব্যটির যাথার্থ্য নির্ণয় কর। [ক. বি., '৬২]

অথবা, **সত্যেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে পল্লী-বাংলার রূপ কিরূপ বৈচিত্র্য-মণ্ডিত হইয়াছে ও কাব্যানুভূতির দ্বারা কিরূপ পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহা আলোচনা কর।** [ক. বি., '৬৫]

উত্তর। রবীন্দ্র-অনুজ কবিরা বাংলা দেশের প্রকৃতির ছবি আঁকিতেই বিশেষ আগ্রহ বোধ করিয়াছিলেন। কুমুদরঞ্জন-যতীন্দ্রমোহন-কালিদাস রায় পল্লী-বাংলার কবি বলিয়া সেকালে পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। নগরজীবন ও আধুনিকতার প্রতি বিরূপতা তাঁহাদের পল্লীপ্রীতির একটি প্রধান সুর রূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রায় একই কালের কবি সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায়ও বাংলার পল্লী-গ্রামের রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বাংলার বর্ষা ও শরতের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার বিশেষ সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়াছেন। বাংলা দেশের বর্ষার নিজস্ব রূপ আছে। সত্যেন্দ্রনাথের বর্ষাসংক্রান্ত কবিতার সংখ্যাও বড় কম নয়। রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রের মৃত্যুতে লিখিয়াছিলেন—

বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্বদ্বারে,
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তারে
তোমার নবীন ছন্দে? আজিকার কাজরি গাথায়
ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে পাতায় পাতায়;
বর্ষে বর্ষে এ দোলায় দিত তাল তোমার যে বাণী
বিদ্যুৎ নাচন গানে, সে আজি ললাটে কর হানি
বিধবার বেশে কেন নিঃশব্দে লুটায় ধূলি-'পরে।

সন্দেহ নাই বাংলার বর্ষার বিচিত্ররূপ ও অজস্র সুর সত্যেন্দ্রনাথের বহু সংখ্যক কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। "কাজরি-পঞ্চাশতে"র পঞ্চাশটি ক্ষুদ্র কবিতা, বর্ষা, ভাদ্রশ্রী, ইল্‌শেগুঁড়ি, বর্ষানিমন্ত্রণ প্রভৃতি বহু কবিতা প্রমাণ দেয় বাংলার বর্ষা বারবার কবির মন ভুলাইয়াছে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় সত্যেন্দ্রনাথ বর্ষার গাঢ়প্রবল রূপের ততখানি ভক্ত নয়। নিবিড় ঘন গহন মেঘে চিত্ত আপ্লুত হয়, ডুবিয়া যায়—কবিচিত্ত প্রেম-অনুভূতির গভীরে প্রবেশ করিতে চায়। বর্ষার সেই আকুল করা রূপ, অনুভূতির সেই গাঢ় নির্জনতা সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় বড় প্রকাশ পায় নাই। তিনি ইল্‌শে-গুঁড়ির চপল চটুল ভঙ্গীতে ভুলিয়াছেন। ইল্‌শেগুঁড়িতে তার চিত্ত বালকের মত উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তার ছবিগুলি যেমন লঘু তেমনি খেয়ালি।

কেয়া ফুলে ঘুণ লেগেছে
পড়তে পরাগ মিলিয়ে গেছে,
মেঘের সীমায় রোদ জেগেছে,
আলতা-পাটি শিম।
ইল্‌শেগুঁড়ি! হিমের কুঁড়ি,
রোদ্দুরে রিম্‌ঝিম্।

এমন কি যখন প্রণয়-বিহ্বলতার মৃদু সুর আমন্ত্রিত হইয়াছে, তখনও তাহা লঘু খুনসুড়ি মাত্র। চটুলতাকে কোন দিক দিয়াই তাহা অতিক্রম করিয়া যায় নাই—

এস তুমি যূথীর বনে দুকূল বুলাবে;
কোল দিয়ে ঐ কেলি-কদম-মুকুল খুলাবে।
বাইরে আজ মলিন ছায়া
মলিদা-রং মেঘের মায়া,
অন্তরে আজ রসের ধারা রঙীন্ গুলাবে!
এস তুমি মোহের হাওয়া মিহিন্ বুলাবে।

সত্যেন্দ্রনাথের বর্ষা-বন্দনায় বাংলার বর্ষার পূর্ণরূপ নাই। কবি আপন চিত্ত-প্রবণতার অনুগামী তাহার বিশেষ লঘু খেয়ালীপনার রঙ্ ও সুরই মাত্র ধরিয়াছেন। কিন্তু আংশিক হইলেও সে-সব ছবির মধ্যে অভিজ্ঞতার সত্য প্রতিফলিত হইয়াছে।

বাংলার অপর বিশিষ্ট ঋতু শরৎও সত্যেন্দ্রনাথের প্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সত্যেন্দ্র-স্মৃতি বিষয়ক কবিতায় লিখিয়াছিলেন,

আশ্বিনে উৎসব সাজে শরৎ সুন্দর শুভ্র করে
শেফালির সাজি নিয়ে দেখা দিবে তোমার অঙ্গনে;
প্রতি বর্ষে দিত সে যে শুক্লরাতে জ্যোৎস্নার চন্দনে
ভালে তব বরণের টিকা……।

আসলে বর্ষার বৈচিত্র্য শরতে নাই। বর্ষার দীর্ঘকালস্থায়ী চিত্তদ্রবীভূত করিবার বিশেষ ভাবরূপ মাধুরীর স্থানে শরতে আছে একটা খেয়ালখুশির, ছুটির ও খেলার সুর। সত্যেন্দ্রনাথের মনের সঙ্গে তাহার সহজ সম্পর্ক ঘটিয়াছে। শরৎ সত্যেন্দ্র-কবিতায় আশ্চর্য লঘু আমেজ ও হাল্কা রঙ্ ধরিয়া দেখা দিয়াছে।

(১) ধানের ক্ষেতের সবুজে কে আজ সোহাগ দিয়ে ছুপিয়েছে!
সেই সোহাগের অটুট পরাগ টোপর-পানায় টুপিয়েছে।

—[ভোরাই]

(২) সাঁঝে আজ কিসের আলো,
ভুলালো মন ভুলালো।
ফাগুয়ার ফাগ মিলালো
শরতের মেঘের মেলায়। —[সাঁঝাই]

(৩) কালো মেঘের কোল্‌টি জুড়ে আলো আবার চোখ চেয়েছে!
মিশির জমি জমিয়ে ঠোঁটে শরৎরাণী পান খেয়েছে!

—[চিত্র শরৎ]

এই শিশুর ন্যায় চঞ্চল শরৎ বাংলার পল্লীর পরিচিত ও অতিপ্রিয় বৎসরান্তিক অতিথি। তার রূপের বিশিষ্টতা সত্যেন্দ্রনাথ ধরিয়া রাখিয়াছেন একাধিক কবিতায়।

ঋতুচক্র লইয়া কোন দার্শনিক ভাবনায় সত্যেন্দ্রনাথ ব্যাকুল হন নাই। বাংলার প্রকৃতিতে এবং জীবনে যে সব ঋতু সর্বাধিক প্রত্যক্ষ তাহাদের ছবিই কবি আঁকিতে চাহিয়াছেন। তাই যে গ্রীষ্ম তাহার তীব্র দাবদাহ লইয়া অধিকাংশ কবিকে আকর্ষণ করিতে পারে না, তাহা সত্যেন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার বিষয় হইয়াছে।

সত্যেন্দ্রনাথ পল্লীপ্রকৃতি বিষয়ে কোনরূপ ভাবালুতা প্রকাশ করেন নাই। নাগরিক জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া পল্লীতে প্রত্যাবর্তনের কথা বলেন নাই। কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ কবিতার অলংকরণ, খেয়ালি কল্পনার বর্ণবিচ্ছুরণ এবং চটুল ছন্দের নূপুর নিক্কণ ভেদ করিয়া যাহা চোখে পড়ে তাহা বাংলার পল্লীর বাস্তব ছবি ছাড়া কিছুই নয়।

পাল্‌কির গানে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বেহারারা ছুটিয়া চলিয়াছে। গ্রামের বসতি অঞ্চল, হাট, জমির আল, পাটের ক্ষেত চলচ্চিত্রের ছবির মত ছুটিয়া চলিয়াছে। কবি তাহাদের নৃত্যপর ভঙ্গীই দেখিয়াছেন, চলার আনন্দ, ছবি দেখার আনন্দ মিলিয়া

গিয়াছে। গ্রামজীবনের দারিদ্র্য বা জীর্ণতার কথা কবি মনে রাখেন নাই। তিনি দাঁড়ের ছিপ নদীপথে চলিয়াছে। কবি নদীর দুই ধারের মাঠের গ্রামের গাছের দিনের রাত্রের তারার ছবি দেখিয়াছেন। ছেলেমানুষের কৌতূহল এবং কল্পনা তাহাদের রাঙাইয়াছে। অথবা আলংকারিক নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনায়—

ভাঁটফুলে তোর আগুন ঝাঁটায়, জল-ছড়া দেয় বকুল তায়,
ভাট শালিকে বন্দনা গায়, নকীব হেঁকে চাতক ধায়।

ভিত্তিতে বাংলার ভাঁট আর বকুল ফুল, শালিক আর চাতক পাখির কথাই স্থান পাইয়াছে।

সত্যেন্দ্রনাথের রাজনীতি-সমাজনীতি-মনীষীবন্দনা এবং সাময়িক প্রসঙ্গাশ্রয়ী কবিতাগুলি ছাড়া অন্যত্র পল্লীবাংলাই তাঁর রচনার ভিত্তি। পল্লীর গানের রঙিন কল্পনার আড়াল-আবডাল দিয়াও বাংলার পরিচিত ফুল পাতার গন্ধ ও বর্ণ উঁকি দেয়। কবির ইন্দ্রিয়গুলি অত্যন্ত সজাগ। মোহিতলালের ভাষায়, "তাঁহার কবিতায় আরও একটি দিক আছে, ধরণীর রূপ-রঙ-রেখার দিক—পঞ্চেন্দ্রিয়-সাক্ষী প্রকৃতির বহুবর্ণের ঘাগরী, এবং তাহার নৃত্যচপল চরণের মঞ্জীরধ্বনি।" এখানে ধরণী বলিতে বাংলাদেশ। কিন্তু প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় উপলব্ধিকে অতিক্রম করিয়া আরও দূরে আরও গভীরে, কোন ভাবতাৎপর্যে, কোন জীবনচেতনায় তাঁহার এই রূপ-পরিক্রমা কখনই প্রবেশ করে নাই।

তাহা ছাড়া পল্লীজীবনের বিভিন্ন দৃশ্য ও সঙ্গীত তাঁহার বালসুলভ কৌতূহলকে ও বিস্ময়কে যতখানি তৃপ্ত করিয়াছে তীক্ষ্ণ বস্তুবোধকে ততটা লালন করে নাই। তাঁহার গ্রামগুলি চিত্রময়, বর্ণময়, শব্দময়। কিন্তু বাংলার পল্লীর দারিদ্র্য, রূপহীনতার ভাবনা কবিকে পীড়িত করে নাই যাহা যতীন্দ্রমোহন-কুমুদরঞ্জনকে ভাবিত করিয়াছে।

কাব্যচয়নিকা

অক্ষয়কুমার বড়াল

[**কবি-পরিচয়**—অক্ষয়কুমার বড়াল ১৮৬৮ হইতে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রভাবধারায় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের সমকালে কবিতা রচনা করিলেও তিনি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা আদৌ প্রভাবিত হন নাই। তাঁহার কাব্যগ্রন্থগুলির নাম—"প্রদীপ", "কনকাঞ্জলি", "ভুল", "শঙ্খ", এবং "এষা"। প্রথম তিনটি কাব্যে কবির মনের একটি গভীর দ্বিধা প্রকাশিত হইয়াছে। কবি প্রেমের ক্ষেত্রে বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে পারেন নাই। ফলে একটা গভীর অতৃপ্তি কবিতাগুলির মধ্যে প্রকাশিত। শেষোক্ত দুইটি কাব্যে তিনি এই দ্বিধামুক্ত উপলব্ধিতে পৌঁছিয়াছেন।

"কাব্য চয়নিকা" বইটিতে অক্ষয়কুমারের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ হইতে কবিতা চয়ন করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। কবির অধিকাংশ ভালো কবিতাই গ্রন্থটিতে সঙ্কলিত হইয়াছে। উহাদের সাহায্যে কবিপ্রতিভার একটি সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।]

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। অক্ষয়কুমারের "এষা" একটি শোককাব্য। শোককাব্য রূপে ইহার বৈশিষ্ট্য বুঝাইয়া দাও। এবং কাব্য হিসাবে ইহার সাফল্যের পরিমাণ নির্ণয় কর।

অথবা, **শোককাব্য বলিতে কি বুঝা যায়? অক্ষয়কুমারের "এষা"কে শোককাব্য বলা কতটা সঙ্গত, বিশ্লেষণ কর।**

উত্তর ঃ জীবনের নানা উপলব্ধি কাব্য বিষয়রূপে সচরাচর গৃহীত হইয়া থাকে। বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে যেগুলি চিত্তকে গভীরভাবে নাড়া দেয় তাহা কাব্যের অবলম্বন হইয়া উঠিবে ইহা খুব স্বাভাবিক। প্রিয়জনের মৃত্যু উপলক্ষে কবিতা রচনার আদর্শ আমরা ইংরাজী কবিতা হইতে পাইয়াছি। এই জাতীয় কবিতার রূপ বা ভাবকল্পনার দিক হইতে কোন নূতন আদর্শ স্থির করা চলে না। যে কোন শ্রেণীর কবিতার সাফল্যের যে নিরিখ, এক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হইবার কোন কারণ নাই।

তবে শোককাব্যের ক্ষেত্রে কবিদের ব্যক্তিগত শোকোচ্ছ্বাসই কাব্যসার্থকতার প্রধান বাধা হইয়া দাঁড়ায়। অতি নিকট আত্মীয় বা বন্ধুবিয়োগ কবির হৃদয়কে সাধারণ মানবহৃদয়ের ন্যায় শোকে বিহ্বল করে। কিন্তু শোকের প্রকাশই কবিতা হইয়া উঠিতে পারে না। নিজ নিজ ভাষায় প্রাকৃতজন শোক প্রকাশ করিয়া থাকে। কবির শোক লইয়া তাহার কোন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নাই। শোকের ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসকে সংযত করিয়া তাহাকে ভাষাচিত্রে রূপান্তরিত করিতে না পারিলে তাহা কবিতারূপে স্বীকৃত হইবে না। প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় "শোককে শ্লোক করিয়া তুলিতে হইবে।"

কিন্তু এখানেও একটি, প্রশ্ন থাকিয়া যায়। কবির ব্যক্তিগত শোকের অভিজ্ঞতা যদি সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক করুণরসের আশ্রয় হইয়া উঠে তাহা হইলে সাধারণ করুণরসাত্মক কাব্যের সঙ্গে উহার আর কোন পার্থক্য থাকে না। সেক্ষেত্রে ব্যক্তিগত শোকের অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করিবার তাৎপর্য কোথায়? অথবা উহাকে "শোককাব্য" এই স্বতন্ত্র নামে চিহ্নিত করিবারই প্রয়োজন কি?

কাজেই শোককাব্যের স্বতন্ত্র শ্রেণী এবং স্বাদের কথা স্বীকার করিতে হইলে উহার বিশিষ্টতার দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। সন্দেহ নাই ইহাও এক শ্রেণীর করুণ রসাত্মক কাব্য। প্রাকৃত শোকোপলব্ধিকে সংযত করিয়া শিল্পসম্মত রূপদান এখানেও প্রয়োজন। কিন্তু শোককাব্যের বিষয়বস্তু কবির ব্যক্তিজীবন হইতে সংগৃহীত। ফলে ব্যক্তিগত উপলব্ধির একটি অতিরিক্ত উত্তাপ ইহার মধ্যে সঞ্চারিত হইবে ইহাই প্রত্যাশিত। কবি একান্ত নৈর্ব্যক্তিক করুণরস প্রধান কাব্য লিখিবেন না। আবার ব্যক্তিহৃদয়ের ছাপ দিতে গিয়া, প্রাকৃত জনের শোকোচ্ছ্বাসের স্তরে ইহাকে অবনমিত করিবেন না।

অবশ্য শোককাব্যের মধ্যেও নানা ধরনের রচনা স্থান পাইয়াছে। কখনও কখনও আত্মীয় বান্ধবের জন্য শোকপ্রকাশ না করিয়া কবি কোন নামকরা ব্যক্তির মৃত্যুকে অবলম্বন করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন। সেখানে মৃতব্যক্তির চরিত্রমাহাত্ম্য কাব্যরূপ পাইয়া থাকে। অবশ্য এ জাতীয় কবিতা প্রায়ই সাময়িকের গণ্ডী অতিক্রম করে না। অবশ্যই শোককবিতা কখনও দার্শনিক মননশীলতায়ও পরিণত হইতে পারে। সমালোচক Hudson বলিয়াছেন, "often too the philosophic and speculative elements become predominant in it, sometimes even to the total subordination of the purely personal interest, the poet brooding upon his subject, being moved to mediation over questions immediately raised by it, or over the deepest problems of life and destiny as in Shelley's 'Adonais' and Browning's 'La Saisiaz." বাংলা ভাষায় এ জাতীয় কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের লেখা "সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত" (পূরবী কাব্যের অন্তর্ভুক্ত)। আবার কচিৎ সমালোচক-কবির রচনায় শোককবিতা সমালোচন-কবিতায় পরিণত হইয়াছে— "the elegy in modern literature has often been used as a vehicle for literary criticism." কিন্তু তবুও বিশুদ্ধ শোককবিতা বা elegy-এর সংজ্ঞা হইল, "this is a brief lyric of mourning, or direct utterance of personal bereavement and sorrow." (W. H. Hudson : An Introduction to the study of English Literature.)। "সাহিত্য সন্দর্শনে" শোকগীতির সাফল্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "শোকানুভূতির আন্তরিকতাই শোকসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ের মানদণ্ড। কোন কোন শোকসঙ্গীতে কবির ব্যক্তিগত বেদনা সর্বমানবের বেদনারূপে ভাষা পাইয়া থাকে। ইহাতে অবশ্য উহার মর্যাদা আরও বর্ধিত হয়।"

[অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র দাস]

অক্ষয়কুমার বড়ালের "এষা" একটি শোককাব্য। কবির স্ত্রী-বিয়োগের পরে, মৃতাপত্নীকে স্মরণ করিয়া কাব্যটি রচিত। বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবিদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের "আলেখ্য" কাব্যের অনেক কবিতা মৃতাপত্নীকে স্মরণ করিয়া লেখা। রবীন্দ্রনাথের "স্মরণ" কাব্যটির নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর "অশ্রুকণা" মৃতস্বামীর উদ্দেশ্যে রচিত শোককাব্য।

অক্ষয়কুমার বড়ালের "এষা" কাব্যের অনেক কবিতায় বাঙালী গৃহস্থের দাম্পত্য-জীবনের পটভূমিটি জীবন্ত। কোন রোমান্টিক কল্পনা যেন সে-সব কবিতায় দূরবর্তী ভাবজগতের দীপ্তি বা ব্যঞ্জনা আনিতে পারে নাই। কবির শোকাশ্রুর উত্তাপ সে-সব কবিতায় স্পষ্ট।

মরণে কি মরে প্রেম? অনলে কি পুড়ে প্রাণ?
বাতাসে কি মিশে গেল সে নীরব আত্মদান?
জীবন-জড়ান-সত্য সকলি কি মিথ্যা আজ?
গৃহ ছাড়ি গৃহলক্ষ্মী শুইয়া শ্মশান-মাঝ।

প্রথম তিনটি চরণে কবির যে ভাবনা ব্যাকুলতা, শেষ চরণের হাহাকারের মধ্যে তাহা মৌন হইয়া গিয়াছে। জীবন ও মৃত্যুর নির্মম ও বাস্তব ব্যবধান একটি চিত্রের নিষ্ঠুরতায় রূপ পাইয়াছে। যাহাকে ঘেরিয়া এত মমতা, সবের যে ছিল রক্ষণীয়া আজ এই কঠিন পৃথিবীতে তাহার একাকী অবস্থান।

অনন্ত তমিস্র পথে প্রেমময়ী রমণীর একক কঠিন যাত্রার কল্পনাটি কবিকে নিবিড়-ভাবে বিঁধিয়াছে। পুরোহিতের মন্ত্রে মৃতা নারী প্রেতমাত্র—"যে জীবা—অনল-দগ্ধা"; কিন্তু স্বামীর প্রেমের দৃষ্টিতে সে যেন সর্বচিত্তযুক্তা, শুধু সংসার বন্ধন চ্যুতা; তাই তাহার অসহায় রূপের কল্পনা বারংবার কবির রচনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন—

পিতা নাই, মাতা নাই, পতি-পুত্র নাই,
অতি-অসহায়—
সকল বন্ধন ছিঁড়ে একাকিনী কোথা ফিরে—
অনলে, অনিলে, শূন্যে, কোথায়—কোথায়!

কবি বস্তুবাদী নন। মৃত্যুর পরে পঞ্চভূতাত্মক দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইবে এরূপ বিশ্বাস তাঁহার নাই। হিন্দুর প্রেতবাদে তাঁহার আস্থা আছে। কিন্তু দেহহীন আত্মার বিশ্বদেবের অভিমুখে বা প্রেতপুরীতে গতি হইবেই এ বিষয়ে প্রচলিত ধারণায় তাঁহার চিত্ত নিশ্চিন্ত নয়—

কোথায় ক্ষরিছে মধু, কোথায় হে বিশ্বদেব,
কোথা প্রেতপুরী!

প্রেমীর মনই সবাপেক্ষা অশান্ত। বস্তুতান্ত্রিক বা আত্মবাদী কোন রূপ সান্ত্বনায়ই তাহার প্রেমিকচিত্ত, গৃহস্থস্বামীর মমতাপূর্ণ হৃদয় শান্তি লাভ করে না। যেন দেহ-ধারিণী রমণী জগৎ-বন্ধনছিন্ন হইয়া নিরাশ্রয় অনন্ত অপ্রাণের মহাশূন্যে নিয়ত

পরিক্রমা করিতেছে। এই ভাবনায় কবির চিত্ত বিক্ষত। তাই তাঁহার জ্বলন্ত হৃদয়ের অক্ষরে লেখা হয়—

হা প্রিয়ে—শ্মশানদগ্ধা, হও পরকাশ!
ত্যজিয়াছ মর্ত্য ভূমি
তবু আছ—আছ তুমি!
তুমি নাই—কোথা নাই, হয় না বিশ্বাস;

প্রেম ও যৌবনের স্মৃতির গুঞ্জরণ কবির ভাষাচিত্রে রূপায়িত হইয়াছে। সেই স্তবকগুলি যেন মুহূর্তের স্বপ্ন পরিক্রমা, কোমল মধুর ও সদ্যঃপাতি। পদ্মপত্রে নীরবিন্দুর ন্যায়, স্বাদু উজ্জ্বল কিন্তু পতনোন্মুখ—

এখনো কাঁপিছে তরু, মনে নাহি পড়ে ঠিক,—
এসেছিল—বসেছিল ডেকেছিল হেথা পিক!
এখনো কাঁপিছে নদ, ভাবিতেছে বার বার,—
ঢলিয়া কি পড়েছিল মেঘখানি বুকে তার!

অবশ্য কবির স্মৃতি এ জাতীয় রোমান্টিক কল্পচিত্র রচনায়ই মাত্র নিয়োজিত হয়। সংসারের দৈনন্দিন কর্ম সেবা যত্ন ও আলাপের বস্তুভিত্তি পর্যন্ত তাহা প্রসারিত। একটি ঘরোয়া পারিবারিক জীবনের সুর ইহাদের মধ্যে বাজিয়াছে।

অনেকগুলি কবিতায় সন্তানহারা শিশুদের অবলম্বন করিয়া পত্নীহারা পিতার শোক আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। দাম্পত্য প্রেমবিরহ এবং বাৎসল্যরসের সহজ মিশ্রণে কবিতাগুলি উপভোগ্য।

কিন্তু অন্য একটি দিক হইতে, অক্ষয়কুমারের কাব্য ধারার বিবর্তনে "এষার" একটি বিশিষ্ট স্থানে রহিয়াছে। ইংরেজী রোমান্টিক কাব্য কল্পনার আদর্শে কবি একটি মানসী প্রেয়সীর সন্ধান করিতেছিলেন; কিন্তু বাঙালী কবি বাস্তব দাম্পত্য-জীবনে যে গৃহিনীকে পাইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার প্রণয়বাসনা অতৃপ্ত থাকে নাই। বাস্তব জীবনকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া কাব্যকল্পনাশ্রিত প্রণয় বেদনাকে একটা স্বতন্ত্র মানস জগত করিয়া তুলিতে তিনি পারেন নাই। আবার দাম্পত্য-জীবনকে কল্পনার প্রেমস্বর্গ ভাবিয়া ডানা গুটাইয়াও বসেন নাই। ফলে তাঁহার প্রথম দিককার কাব্যগুলিতে একটি আভ্যন্তর দ্বন্দ্ব, তৃপ্তির মধ্যে একটি অতৃপ্তির সুর বারংবার প্রকাশ পাইয়াছে কবির পত্নীর মৃত্যুতে সেই দ্বন্দ্ব ঘুচিয়াছে। উহারই ফলস্বরূপ রচিত "এষা" কাব্যটির তাই শোককাব্য হিসাবে তথা কবির চিত্তবিবর্তনের দিক দিয়া তাৎপর্যময় ভূমিকা রহিয়াছে। এ বিষয়ে বিশিষ্ট সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য "কবি-বিধাতা কবির প্রতি নিরতিশয় প্রসন্ন ছিলেন, তাই কবি ও মানুষটির মধ্যে এতকাল যে দ্বন্দ্ব ছিল, তাহা দূর করিয়া জীবনের সহিত কাব্যের—প্রেয়সীর সহিত মানসীর এমন কঠিন মিলন ঘটাইয়াছিলেন।......যে অত্যুচ্চ মানস-আদর্শকে তিনি কখনও ত্যাগ করিতে পারেন নাই, জীবনের শেষভাগে তাঁহার সেই অভিমান ধূলিসাৎ হইয়াছে, প্রকৃতির পরিশোধের মতই সেই অবাস্তব বিরহ-বেদনা বাস্তব পত্নীশোকে রূপান্তরিত

হইয়াছে। যাহাকে তিনি ভাবের নক্ষত্রলোক ভিন্ন আর কোথাও চিনিয়া লইতে পারেন নাই—তিনি যাহাকে সাধারণ মর্ত্যসঙ্গিনীরূপে না দেখিয়া ভাব-কল্পনার জ্যোতির্মণ্ডল মধ্যবর্তিনীরূপে দেখিতে চাহিয়াছেন, তাহাকেই তিনি সামান্য মানবীর মধ্যে, স্নেহমমতাময়ী গৃহধর্মচারিণী পত্নীরূপে চিনিতে পারিয়া, এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্ব অভিমান ত্যাগ করিয়া, যে সুরে সেই অতুলনীয় শোক-গাথা রচনা করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার জীবনে তথা কাব্যে সিদ্ধিলাভ ঘটিয়াছে।"

[আধুনিক বাংলা সাহিত্য]

যেমন "কনকাঞ্জলি" "প্রদীপ" বা "ভুল" কাব্যের জ্যোতির্ময়ী কল্পনাসুন্দরী মানসীকে "এষা"য় গৃহিনীরূপে স্মৃতির বেদনারুদ্ধ কণ্ঠে অনুভব করিয়াছেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে মৃতাপত্নীকে বিশ্বলীন দেবীরূপে কল্পনা করিয়া সর্বসংশয় মুক্ত হইতে চাহিয়াছেন। যদিও তিনি "একাকিনী", "বিষাদিনী", এবং "কাতর নেত্রে ধরিত্রী কোথায়" দেখিতেছেন, কিন্তু তিনি "বৈকুণ্ঠের উপকণ্ঠে স্বর্ণ-অলিন্দায় ভর দিয়া" আছেন। এবং—

নীলবাসে দেহ ঢাকা,
মেঘে ঢাকা শশী রাকা,
ঝলকে ঝলকে কিবা আভা উছলায়!
সবৃন্ত মন্দার দুটি
বাম করে আছে ফুটি;
সোনার আঁচল লুঠি পড়ে রাঙ্গা পায়।

প্রশ্ন ২। অক্ষয়বড়াল বলিয়াছেন—

**"আজো তৃপ্তি অবসরে
সে অতৃপ্তি হা-হা করে।"**

তৃপ্তির মধ্যে কবি প্রাণের এই অতৃপ্তির কারণ কি? উহার স্বরূপ নির্ণয় কর। কবি এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিয়াছিলেন কিনা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাও।

অথবা, সমালোচকের ভাষায়, "ঘর সংসারের মমতা, আত্মীয় ও বন্ধুপ্রীতি, সামাজিক রক্ষণশীল মনোবৃত্তি—এ সকল তাঁহার চরিত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাইত। ইহাই যেন তাঁহার জন্মগত সংস্কার। এই জন্মগত সংস্কার অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া তাঁহার কাব্যে অপূর্ব উৎকণ্ঠা ও মানসদ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছে।" এই মতামতের যাথার্থ্য বিচার কর। কবির মধ্যে কি যথার্থ কোন রূপ মানসদ্বন্দ্ব ছিল? থাকিলে, কবি কখনও তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন কিনা বল।

উত্তর: অক্ষয়কুমার বড়াল রবীন্দ্রনাথের সমকালীন কবি। বিহারীলালের ভাবশিষ্য, তাঁহার চিত্তধর্ম রোমান্টিক। সমকালীন মহাশক্তিধর কবি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁহার উপরে পড়ে নাই। কিন্তু বিহারীলালের আদর্শে তিনি কাব্যকল্পনার কেন্দ্রে

একটি রমণীশক্তিকে অনুভব করিতে চাহিয়াছেন। অথচ বিহারীলালের সঙ্গেও তাঁহার কবি-চিত্তের সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্য বড় কম ছিল না। বিশেষ করিয়া ইংরেজী কাব্যের আন্তরিক চর্চার মধ্য দিয়া শেলীর প্রভাব তাঁহার উপরে বেশ গভীরভাবেই পড়িয়াছিল। অথচ তাঁহার কাব্যস্বভাব শেলী হইতেও কত পৃথক।

বিহারীলাল, দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সহিত অক্ষয়কুমার বড়ালের কবি প্রকৃতির তুলনা করিলেই তাঁহার অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ অনুভব করা যাইবে। বিহারীলালের কাব্যে একটা ধ্যানস্থ আত্মলীনতা, একটা তাত্ত্বিক বস্তু-অতিরেক লক্ষ্য করা যায়। বাস্তব জীবনসত্যের মুখোমুখি দাঁড়াইবার প্রয়োজন যেন তাঁহার নাই। অক্ষয়কুমার বড়াল কিন্তু এই বাস্তবকে এড়াইতে পারেন নাই। "পাশ্চাত্ত্য কাব্যের যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক কল্পনা এযুগে বাংলা কাব্যে সংক্রমিত হইয়াছিল—রবীন্দ্রনাথের অত্যুচ্চ প্রতিভাই তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া কাব্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছে—ভারতীয় ভাবুকতার দুর্দ্ধর্ষ idealism এ বিষয়ে রবীন্দ্রপ্রতিভার সহায়তা করিয়াছে। অক্ষয়কুমার খাঁটি বাঙালী, দেবেন্দ্রনাথও তাই,—ভাবকল্পনার সঙ্গে ভাবুকতার সেই দুর্দ্ধর্ষ শক্তি ইহাদের প্রকৃতি তথা প্রতিভার অনুগত নহে। বস্তুর বাস্তবতাকে অক্ষয়কুমার কখনও কল্পনায় গ্রাস করিতে পারেন নাই—দেবেন্দ্রনাথের মত চিন্তালেশহীন ভাবাতিরেকের সাহায্যে বাস্তবমুক্তির উপায় তাঁহার কবিপ্রকৃতির পক্ষে অসম্ভব। অতএব বড়াল কবির কবি-জীবনে বস্তু ও কল্পনা, হৃদয় ও মনোবৃত্তি, প্রেম ও সংশয় প্রভৃতির দ্বন্দ্ব নিরবচ্ছিন্ন হইয়া আছে।...বিহারীলাল ও দেবেন্দ্রনাথের মত তিনি ভাবভোলা কবি ছিলেন না; রবীন্দ্রনাথের মত অনাসক্ত আর্টিষ্টও তিনি নহেন।" [মোহিতলাল মজুমদার; অক্ষয়কুমার বড়াল ; আধুনিক বাংলা সাহিত্য।]

একদিকে বাঙালীজীবনের গভীর প্রভাব তাঁহার অস্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত ছিল। সংসারী মানুষ হিসাবে তাঁহার পত্নীর সহিত প্রীতি মমতার যে বন্ধন ছিল, দাম্পত্যপ্রণয়ের যে সম্পর্ক ছিল তাহাকে তিনি অবহেলা করিতে পারেন নাই। বিহারীলালে স্বপ্নাতুর কল্পনা গৃহের জায়াকে অনায়াসে সারদায় রূপান্তরিত করিয়া ভাবভোলা চিত্তে তাঁহার ধ্যানে মগ্ন হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় পত্নীকেই কল্পনার রঙে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছেন কবি। এই কল্পনার বর্ণবিন্যাস জীবনের প্রতিদিনের ছোটখাটো সুখদুঃখকেই উপভোগের সামগ্রী করিয়া তোলে। তাঁহার মধ্যে ভাবনা অপেক্ষা নেশার মত্ততাই যেন বেশী। বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব কবি অনুভব করেন নাই। রবীন্দ্রনাথে যে অতৃপ্তি আছে তাহার স্বরূপও একেবারেই ভিন্ন ধরনের। তিনি মানসসুন্দরীকে গৃহবধূর মধ্যে ধরিতে চান নাই। সংসার জীবন এবং প্রণয়কল্পনা দুটি স্বতন্ত্রধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। কল্পনা ও বাস্তব মিলিল না কেন ইহা লইয়া কবি ব্যাকুল হইয়া পড়েন নাই।

অক্ষয়কুমার বড়ালের প্রথম তিনটি কাব্য "প্রদীপ" "কনকাঞ্জলি" এবং "ভুল"। এই কাব্য তিনটির মূল বিষয়বস্তু প্রেম। সেই প্রেমের মধ্যে কল্পনার মাধুর্য, একটি মৃদু কোমলতার সুর অনুভব করা যায়—

যা, বায়ু, তাহার কাছে—
সে বুঝি ঘুমায়ে আছে,
নিয়ে যা গানটি মোর ধীরে ধীরে তার কাছে ;
নিয়ে যাস্ বুকে করে,
দেখিস্ পড়ে না ঝরে,
বড় ভয় হয় মনে—বুঝিতে না পারে পাছে। (বায়ু-দূত)

কামনার একটু সৌরভ, একটু লুকোচুরির রোমাঞ্চ থাকিলেও তাহা যেন নবপরিণীত দম্পতির প্রথম প্রণয়ের সহিত জড়িত—তাহা মহাকাশের নয়, গৃহের সামগ্রী।

কিন্তু দাম্পত্য-প্রণয়কে অবলম্বন করিয়া, কল্পনায় রঙে রসে তাহাকে কিছুটা সজ্জিত করিয়া প্রকাশ করিয়াই অক্ষয়কুমার নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন। অক্ষয়কুমারের স্বভাবজ ভাবুকতা ও একান্ত subjective কল্পনামুখিতা দাম্পত্য প্রেমের তৃপ্তিতে অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস এবং হাহাকার লইয়া আসিল। "প্রদীপ" কাব্যের "যদি" কবিতাটির কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিবার মত। কবি বলিয়াছেন প্রেম গোলাপ হইলে এবং হৃদয় পল্লব হইলে হৃদয়ের কম্পন এবং প্রেমের বর্ণ-সৌষ্ঠব তিনি ভাষাচিত্রে প্রকাশ করিতে পারিতেন। প্রেম রাগিণী হইলেও কবি মাত্র সুর লহরী তুলিতেন। স্তবকে স্তবকে কবিতাটি যতই সমাপ্তির দিকে আগাইয়াছে ততই চিত্তের সহজ সরল কল্পনা-বিলাসিতার স্থানে তীব্র যন্ত্রণা, গভীর দার্শনিক জিজ্ঞাসা দেখা দিয়াছে। প্রেমের অবাধ কল্পনা, প্রিয়ার মুখ-চোখের হাসি

আছাড়ি পড়িত আসি—
ছিঁড়ে যেত প্রতি শিরা—দেহের বন্ধন !

কবি প্রেমকে গহন কান্তার এবং হৃদয়কে দাবানলের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। দাবানলের তুলনায়ই চিত্তগভীরের ভীষণ অতৃপ্তি প্রকাশ পাইয়াছে--

ক্ষোভে রোষে নিরাশ্বাসে
গ্রাসিতাম গ্রাসে গ্রাসে—
রহিত অস্তিত্ব তার আমাতে কেবল !

কিন্তু কবিতার সমাপ্তির স্তবকে কবি নিজ হৃদয়কে মৃত্যুর সহিত তুলনা করিয়াছেন।

প্রেম যদি হইত জীবন
মরণ হইত যদি হৃদি

জীবন ও মরণ পরস্পর পরস্পরকে ঘিরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে। এই চিরকাল ব্যাপী দুস্তর বিরহ-বোধ অক্ষয় বড়ালের প্রথম কাব্য হইতেই প্রকাশ পাইতে থাকে। কবি কামনা এবং প্রাপ্তির মধ্যে এক কাল্পনিক দূরত্ব সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মিলিত হইবার প্রাণপ্রাণ প্রয়াস এবং ব্যর্থতার কথা বলিয়াছেন—

অহো ! এ কি হৃদয়ের রণ—
পরস্পরে করিতে আপন !

সবারি বিভিন্ন গতি, অথচ সবারি মতি
ভাঙ্গিতে এ পার্থক্য-বন্ধন !—(হৃদয়-সংগ্রাম)

"কনকাঞ্জলি" কাব্যেরও একই সুর। কবির সুতীব্র রোমান্টিক প্রণয় পিপাসা জীবনের একান্ত বাস্তব মৃত্তিকার পাত্রে পূর্ণ হইবার নয়। তৃষ্ণার নিবৃত্তি ঘটে না, চুম্বন অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। বাস্তব এবং স্বপ্নের মধ্যকার দ্বন্দ্বের শেষ নাই। মিলন চঞ্চল, ক্ষণস্থায়ী, কবি তাই বিদায় লইয়া বিরহ-সাগরে প্রয়াণ করিতে চান। অতৃপ্তির খেদ বরং ভালো, তৃপ্তিতে নরকের জ্বালা—

তৃপ্তির নরকে জলি অতৃপ্তির খেদে।

"ভুল" কাব্যগ্রন্থের ক্ষুদ্রাকার কবিতাগুলিতে প্রেমানুভূতির একধরনের তীব্রতা প্রকাশ পাইয়াছে। কবি নিজে তাঁহার প্রেম পিপাসার স্বরূপ বুঝিতে পারেন না। উহার তীব্রতা উহার যন্ত্রণাকে প্রকাশ করিবার জন্যই তিনি উপযুক্ত শব্দ এবং চিত্র-কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কবি যখন বলেন—

সুরে মোর গরল নিশ্বাস,
বলুক ; বলো না গরবিনি !
হৃদয় কে জড়ায়ে রয়েছে ?
তুমি, তুমি বিষাক্ত-সর্পিণি !

তখন মোহিতলালের দেহের পাত্রে জীবনের রস পান করিবার সুতীব্র আগ্রহ সম্ভূত অস্থৈর্যের সঙ্গে উহাকে তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু অক্ষয় বড়ালের তৃষ্ণা অতৃপ্তি ও যন্ত্রণা সম্পূর্ণ কল্পনা ও ভাবুকতার স্তরের। ইন্দ্রিয়ের উপভোগবাসনা উহাকে তীব্র করিয়া তোলে নাই। এই বিষয়টির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সমালোচক বলিয়াছেন, "প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত, তাঁহার সেই অতি-উর্ধ্বগ ভাব সর্বস্ব কামনাতেও বাস্তবের ক্ষুধা বর্তমান। তিনি নর ও নারীর বাস্তব সম্পর্কে'র—পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বৈততত্ত্বের—ভাবনা কখনও ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার এই প্রেমকে আত্মা:তি বলিবার কারণ এই যে, তিনি এই দ্বৈতের অপরার্দ্ধকে আপনারই মানসলোকে সন্ধান করিয়াছেন —অত্যুগ্র মন্ময়তার ফলে তাঁহার সেই মানসী-প্রণয়িনী তাঁহার নিজেরই প্রতিচ্ছবি—অপরার্দ্ধ নয়, আত্মঅর্দ্ধেই প্রতিকৃতি। বাস্তবকে তিনি উপেক্ষা করিতে বা স্বকীয় কল্পনায় গ্রাস করিতে সমর্থ নহেন ; বরং নর-নারীর বাস্তব-মিলন-রহস্য তাঁহাকে সমধিক আকুল করে···।" (মোহিতলাল)

কিন্তু কল্পনার ও স্বপ্নের মধ্যে যে আশা ও পিপাসা অনুভূত হয় তাহা অনির্বচনীয়, বুঝাইতে যেমন পারা যায় না, বুঝিতেও নয়।—

সেই আশা, যে পিপাসা,
সেই ভুল, ভালবাসা
বুঝেছি ছুঁয়েছি প্রাণে স্বপনে সঙ্গীতে—
বুঝাইতে গেলে যায়,

বুঝিতে পারি না হায়,
চাহি চারিভিতে!

সেই "বুঝানো" ও "বুঝা" যায় না যে-অনুভূতি, দরশন পরশনের অতীত সেই প্রেমকে; সেই কল্প-প্রণয়িনীকে কবি বাস্তব জীবনে, সংসারের মূলে আবদ্ধা রমণীর মধ্যে খুঁজিয়াছেন; পান নাই, কারণ উহা পাওয়া যায় না। বেদনাহত সঙ্গীতের যে উৎস সেই খোঁজায় এবং না পাওয়ায়।

জীবনের এই আধখানা
দরশপরশাতীত আশা—
এ রহস্যে কোন অর্থ নাই?
একি শুধু ভাবহীন ভাষা?

অপর এক সমালোচক এই অতৃপ্তির কারণ খুঁজিতে গিয়া একটু পৃথক ব্যাখ্যানে প্রবেশ করিয়াছেন "অক্ষয়কুমারের কবিতা রোমান্টিক উৎকণ্ঠায় তীব্র;…দেবেন্দ্রনাথের মতই তিনি প্রেমের জগতে গৃহ-সুখ-পিপাসু। কিন্তু তাঁর প্রণয়তৃষ্ণা গৃহাশ্রয়ী হলেও, গৃহসীমাতেই তৃপ্ত হতে পারেনি। ঘরের প্রেমকে অক্ষয়কুমারের কবি-কল্পনা বিশ্বাভিসারী করেছে। এক দিকে গৃহের নির্জন নিভৃত সৌন্দর্য উপভোগের আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে বিশ্বাভিমুখিতা তাঁর সম্ভোগের মধ্যে তৃষ্ণাকে আস্বাদনের মধ্যে অতৃপ্তিকে উৎকণ্ঠিত করে রেখেছে। 'নারী বন্দনার' কবিতায় কবি বলেছেন,—

রমণী রে সৌন্দর্যে তোমার
সকল সৌন্দর্য আছে বাঁধা।
… .. …
সৌন্দর্যের মেরুদণ্ড তুমি
বিশ্বের শৃঙ্খলা তোমা পরে।

এই রমণীকে কবি নিভৃতে আত্মস্থ করতে চেয়েছেন, নিত্য দিনের সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়ে। তখনই পরবর্তী কবিতায় উৎক্ষিপ্ত হয়েছে অতৃপ্ত অস্বস্তি।" [ডঃ ভূদেব চৌধুরী]

অক্ষয় বড়াল এই তীব্র রোমান্টিক অনুভূতিকে বাস্তবে চরিতার্থ করিবার একটি সুযোগ পাইলেন যখন তিনি পত্নীহারা হইলেন। মৃতা পত্নী কবির কাছে জ্যোতির্ময়ী অনন্ত নিবাসিনী, ব্রহ্মলোকবাসিনী রূপাতীত হইয়া উঠিয়াছেন। অথচ সংসারের প্রতিটি কাজে, বাৎসল্যে ও সেবায় তাঁহার যে স্পর্শ আজ স্মৃতি মাত্র উহার অনুধ্যানে কবি-হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছে। যিনি জ্যোতির্ময় তিনি গৃহবন্ধন বশীভূতা ছিলেন এই উপলব্ধিতে এক ধরনের আত্মিক দ্বন্দ্ব মুক্তির সুর বাজিয়াছে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'তাঁহার পত্নীবিয়োগ উপলক্ষ্যে রচিত "এষা" গভীর বেদনাবোধের সহিত দার্শনিক তত্ত্বজিজ্ঞাসার এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করিয়াছে।"

প্রশ্ন ৩। "অক্ষয়কুমার বড়ালের কল্পনাভঙ্গী রোমান্টিক হইলেও প্রকাশ-ভঙ্গীতে নিগূঢ় সংযমের পরিচয় আছে।" এই মন্তব্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অক্ষয়কুমারের শিল্পরীতি ও প্রকাশভঙ্গীর বিশিষ্টতাটি বুঝাইয়া দাও।

অথবা, **ভাষা হিসাবে যাহাকে ক্লাসিকাল বলা যায়, অক্ষয়কুমারের কাব্যের আদ্যন্ত তাহাই·····ভাবসংহতি ও অর্থগৌরব এই দুয়েরই প্রতি দৃষ্টি থাকায় গীতি-কাব্য রচনাতেও তাঁহার ভাষা অতিশয় লঘু বা তরল হইতে পারে নাই।" অক্ষয়-কুমারের ভাষারীতি ও রচনাভঙ্গীর আলোচনা প্রসঙ্গে উপরোক্ত মন্তব্যের যাথার্থ্য বিচার কর।**

উত্তর : অক্ষয়কুমার বড়াল রোমান্টিক কল্পনার কবি। তিনি প্রণয় উপলব্ধির ক্ষেত্রে একটি রহস্যজড়িত অনির্বচনীয়তা কামনা করিয়াছেন এবং উহাকে বাস্তবে না পাইবার জন্য তীব্র মানসযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু কবিতার শিল্পরূপ বিষয়ে তিনি ছিলেন অতি সচেতন। আবেগ-উচ্ছ্বসিত ও তরঙ্গিত হইলেই তাহার তারল্য কাব্যে প্রকাশযোগ্য হইয়া উঠে না। ভাবাবেগকে রূপে প্রকাশ করাই কবির কাজ। উচ্ছ্বাস রূপ না ধরিলে কাব্য হইয়া উঠে না। কোন কোন রোমান্টিক কবি চিত্তভাবকে প্রকাশ করিতে গিয়া তাহাকে তরল করিয়া ফেলেন। অনেকের কবিতায় আত্মহারা অসংযমের ভাবটিই বড় হইয়া উঠে। এদিক দিয়া অক্ষয়কুমার বড়াল শুধু স্বতন্ত্রই নন, সচেতনও বটে। তিনি উচ্ছ্বাসকে সংযত করিবারই পক্ষপাতী।

লক্ষ্য করিবার মত তাঁহার বহুসংখ্যক কবিতা আকারে খুবই ছোট। "প্রদীপ" কাব্যের 'ভাবুকতা', 'কবিত্ব', 'তর্কে', 'কবি ও নায়িকা', 'অভেদে প্রভেদ', 'যদি', 'বায়ুদূত', 'হৃদয় সংগ্রাম', "কনকাঞ্জলি"র অন্তর্ভুক্ত 'কতদিন পরে' 'আসি তবে'; "ভুল" কাব্যের 'উপহার' 'জগতে', 'গান মোর', 'তার ভালবাসা', 'পথে', 'যদি' 'হলে তোমা হারা', 'ও কথা', অত্যন্ত ছোট আকারের কবিতা। অনেকগুলি সনেটের চেয়েও আকারে ছোট। ক্ষুদ্র রচনার প্রতি কবিচিত্তের এই আকর্ষণ তাঁহার শিল্পীমনের সংযম বোধেরই পরিচায়ক।

এই সংযম ভাষাকে মার্জিত একাগ্র এবং বহুভাবপ্রকাশক করিয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে। চিত্রধর্মের প্রতি কবি একান্ত অনুগত থাকেন নাই। তাঁহার কবিতায় ভাব ভাবনা ও চিত্রের আভাস মিলিয়া গিয়াছে। বহু কবি চিত্র রচনায় প্রবণ। ভাবকে তাঁহারা চিত্রে রূপান্তরিত করেন, অথবা ভাবের বর্ণে চিত্রকে রঞ্জিত করেন। অক্ষয়কুমার পূর্ণ চিত্র রচনা করিতেন না। তাহার অতৃপ্তি ও পিপাসার তীব্রতা চিত্রকে ছাপাইয়া যাইতে চায়। কবি চিত্রের ইঙ্গিতমাত্র করেন। একটি ভাবের ব্যঞ্জনার দিকে চিত্রের ইঙ্গিতটিকে প্রসারিত করিয়া দেওয়াই কবির লক্ষ্য। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করিয়া তোলা যাইতেছে—

হাহা, হৃদি বিনির্মিত অস্থি-মজ্জা-মেদে।
পরিমাণে কুতূহলী
ফুলে শেষে পায়ে দলি,
তৃপ্তির নরকে জলি অতৃপ্তির খেদে।

হৃদয়কে অস্থি-মজ্জা-মেদে গঠিত বলিয়া বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। হৃদয়ের সুকুমারত্ব, কল্পনা কোমলতা এবং প্রেম স্বপ্নকে বাস্তবের আঘাতে বিপর্যস্ত করিয়াছেন কবি "অস্থি-মজ্জা-মেদ" এই তিনটি শব্দের সাহায্যে। কিন্তু শব্দ তিনটি চিত্রে গাঁথা পড়ে নাই। ইহার অভ্যন্তরের ভাবটিকে পরের দুইটি চরণে একটি ছবিতে বদ্ধ করা হইয়াছে। মধুর লোভে ফুলের দেহটিকে পদদলিত করার ছবি। কিন্তু পরের চরণেই ভাবানুভূতির তীব্রতা ছবির কোন দৃশ্যমানতায় সীমাবদ্ধ থাকে নাই। 'নরক' শব্দটি একটা আধা Visual আবেদন সৃষ্টি করে বটে কিন্তু 'তৃপ্তি'কে নরকের সঙ্গে উপমিত করায় বিরোধী ভাবের সংঘর্ষে একটা তীব্রতার অনুভূতি জাগে, 'জ্বলে' শব্দটি সেই অনুভূতিকে তীক্ষ্ণতর যন্ত্রণাবহ করিয়া তোলে।

কখনও কখনও কবি ভাবাত্মক চিত্রের সম্পূর্ণ বন্ধনকে আবেগের বাহন করিয়া তুলিয়াছেন। এরূপ চিত্রের সাফল্যও শিল্পকলার দিক হইতে অপ্রশংসনীয় নয়। যেমন "প্রদীপ" কাব্যের "যদি" কবিতায় সুসজ্জিত স্তবকে স্তবকে প্রেম ও হৃদয়ের দ্বন্দ্বকে বিকশিত করিয়া তোলা হইয়াছে। প্রতিটি স্তবকেই যেন এক একটি পূর্ণ ছবি রূপধারণ করিয়াছে। ভাবচিত্রগুলির মধ্যে একটা ক্রমোচ্চতার ভাব লক্ষ্য করা যায়। ছয় স্তবকের কবিতার পঞ্চম স্তবকের চিত্রটি সর্বাধিক উত্তেজিত—

প্রেম হত গহন কান্তার,
হৃদি যদি হত দাবানল—
ক্ষোভে রোষে নিরাশ্বাসে
গ্রাসিতাম গ্রাসে গ্রাসে—
রহিত অস্তিত্ব তার আমাতে কেবল!

কিন্তু সমাপ্তির স্তবক উপমাধর্মী ছবির পূর্ববর্তী সব সমারোহকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। প্রেমকে জীবন এবং হৃদয়কে মরণের সহিত উপমিত করিলে তাহারা কোন দৃশ্যমানতার বোধ জাগায় না। জীবন ও মরণের পরস্পরকে বেষ্টন করিয়া আবর্তিত হইবার মধ্যে একটা অস্পষ্ট চিত্রাভাস ভাবের তীব্রতার মাত্র সৃষ্টি করে—

প্রেম যদি হইত জীবন
মরণ হইত যদি হৃদি—
সে নাহি চাহিত ফিরে',
আমি রহিতাম ঘিরে'—
সুখে দুঃখে ঘুরিত সে আমার পরিধি!

যেখানে কবি নির্বাচিত শব্দের সহায়তায় একটি মধুর ও মৃদু ভাবপরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন সেখানেও তরল হইয়া উচ্ছ্বাসিতেরেকের নিকট আত্মসমর্পণ করেন নাই। উদাহরণ হিসাবে "প্রদীপ" কাব্যের "বায়ুদূত" কবিতার উল্লেখ করা চলে। 'ঈষৎ পরশ করি", "দেখিস পড়ে না ঝরে", "কোমল কিশোর হৃদে", "লতাদের বাহুদোলা", "একটু জোছনা মেখে,/একটু গোলাপে থেকে", "হৃদয়-কোরক", "বন-হরিণীর মত" "চমকিয়া না পালায়"—এই জাতীয় ভাষাব্যবহার সচেতন, মাঝে মাঝেই ইহারা

চিত্রের আভাস আনে, চিত্রটিকে সম্পূর্ণ করিয়া বা ইন্দ্রিয়ানুগ আবেদনের বস্তু করিয়া তুলিবার প্রতি ইহাদের গরজ নাই, মূল ভাবটি ফুটাইয়া তুলিবার দিকেই ইহাদের লক্ষ্য।

আবার সুতীব্র ইন্দ্রিয়-ভিত্তিক অনুভূতিকে প্রণয় যন্ত্রণাকে প্রকাশ করিবার জন্যও কবি উপযুক্ত শব্দ নির্বাচনে ব্যর্থ হন নাই।

স্বরে মোর গরল নিশ্বাস,
বলুক ; বলো না গরবিনি !
হৃদয় কে জড়ায়ে রয়েছে ?
তুমি, তুমি বিষাক্ত সর্পিণি !

উপমার মধ্যে মাঝে মাঝে তির্যক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া কবি স্বাদকে বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছেন। স্বরের শ্রুতিগম্য আবেদনকে বিষশ্বাসের স্পর্শগম্যতার সঙ্গে উপমিত করা হইয়াছে। কামনা ও অতৃপ্তির তীব্রতা বুঝাইয়াছে শেষোক্ত চিত্রকল্পে—"বিষাক্ত সর্পিণি"—এই একটি শব্দের ব্যবহারে।

শব্দ, শব্দদ্বারা ভাববাহী চিত্রের আমেজ সৃষ্টি সম্পর্কে অক্ষয়কুমারের সতর্কতার ফলে ভাবের উচ্ছ্বাস প্রবণতাকেও কবি সংযত ও সংহত ভাবে প্রকাশ করিতে পারেন।

মুখ তার দেখিলে যখন,
আনন্দে মুমূর্ষু হয়ে যাই ;
ভালবাসা— তার ভালবাসা
পেলে আমি বাঁচিব কি ছাই।

"আনন্দ" এবং "মুমূর্ষু" শব্দদ্বয়ের বৈপরীত্য, "ভালবাসা" শব্দটির দ্বিত্ব কবির আবেগের তীব্রতাকে ধরিয়া রাখিয়াছে—তাহাকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে হয় নাই। কবি অনুভূতির আন্তরিকতার সূত্রে "মুমূর্ষু" এবং "ছাই"—সাধু এবং একান্ত কথ্য বুলিকে একই অভিপ্রায়ে কাজে লাগাইয়াছেন।

ক্ষণস্থায়ী অলস অংশ মুহূর্তকে প্রকাশ করিতে গিয়াও কবি কখনও সংযমচ্যুত হন নাই। পদ্মপত্রে জলবিন্দু বিন্দুমাত্র বলিয়া যতটা নয়নলোচন তরল প্রাচুর্য থাকিলে তাহা বিনষ্ট হইত। এই বোধটি অক্ষয়কুমারের ভালভাবে ছিল। "পথে" কবিতায় ("ভুল" কাব্য) বাক্য শেষে "ে:" যুক্ত হওয়ায় মৃদুতার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু একান্ত সংক্ষিপ্ততা ও সংহতি কবিতাটিকে শিল্পসিদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

"এষা" কাব্যের মধ্যে কতগুলি সহজ পারিবারিক চিত্র স্থান পাইয়াছে। চিত্রগুলি কখনও বাৎসল্য রসাশ্রয়ী, কখনও দাম্পত্য প্রণয়সম্পৃক্ত। এরূপ বস্তুধর্মী সহজ ছবি কবির পূর্ববর্তী কোন কাব্যেই দেখি না। কিন্তু এইসব চিত্রের কোনটিই শিল্প চমৎকারিত্বের অত্যুচ্চ স্তরে উঠিতে পারে নাই। বরং শব্দের ইঙ্গিতে, বা উপমার আভাসে অর্দ্ধস্ফুট চিত্র যেখানে ভাবব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ সেখানেই অক্ষয়কুমার সর্বাধিক শিল্পসার্থক। অন্যান্য কাব্যের ন্যায় "এষা"তেও রচনারীতির এই বৈশিষ্ট্যটি সম্পূর্ণ বজায় রহিয়াছে। যেমন—

(১) পিতা নাই, মাতা নাই, পতি-পুত্র নাই,
অতি অসহায়—
সকল বন্ধন ছিঁড়ে একাকিনী কোথা ফিরে—
অনলে, অনিলে, শূন্যে, কোথায়—কোথায়!

(২) এ রুদ্ধ কুটীরে মোর এসেছিল কোন্ জনা?
এখনো আঁধারে যেন ভাসে তার রূপ-কণা!
মূরছিয়া পড়ে দেহ, আকুলিয়া উঠে মন,—
শয়নে তৈজসে বাসে কাঁপে তার পরশন!

(৩) হা প্রিয়ে—শ্মশান-দগ্ধা, হও পরকাশ!

প্রথম উদাহরণে অরূপকে রূপের ইঙ্গিতে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন কবি। "পিতামাতা পতিপুত্রের" উল্লেখে পারিবারিক রসের পটভূমিটি জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন—উহাদের সহিত পুনঃপুনঃ "নাই" শব্দের যোগে একটি সর্বব্যাপক শূন্যতার বোধ জাগাইয়া তুলিয়াছেন। "কোথায়" শব্দটির দ্বিত্ব যেন মহাশূন্য "নাই"-এর পেছনে ব্যর্থ ব্যাকুল সন্ধান। দ্বিতীয় উদাহরণের অভিপ্রায় এক। মৃতাপত্নীর স্মৃতিকে চিত্রের ইঙ্গিতে দর্শনযোগ্য করে তোলার চেষ্টা। "ভাসে তার রূপকণা" এবং "কাঁপে তার পরশন" এই শব্দগুচ্ছই রূপের আভাসে অরূপকে উপলব্ধির বিষয় করিয়াছে। তাহার রূপ নাই, রূপকণা অন্ধকারে ভাসিতেছে স্পর্শ-কল্পনাকে দর্শনেন্দ্রিয়ের স্থান গ্রহণ করিতে দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় উদাহরণে "শ্মশানদগ্ধা" শব্দটির নির্মম বাস্তবতা কবিচিত্তের ক্ষতমুখ উদ্ঘাটিত করিয়াছে।

অক্ষয় বড়াল সতর্ক সচেতন কবি। সংযম তাঁহার শিল্পীচিত্তের মূল ধাতু। শোকের উচ্ছ্বাসকে তিনি শ্লোকে রূপান্তরিত করিতে জানেন। এবং শব্দের দ্বারা চিত্রের ইঙ্গিতে অভিপ্রেত ভাবগভীরে প্রবেশ করেন।

প্রশ্ন ৪। অক্ষয়কুমার বড়ালের "পান্থ" কবিতাটি ওমর খৈয়ামের অনুসরণে রচিত। কবিতাটির ভাব ও ভাষারীতির স্বরূপ বিশ্লেষণ কর। ওমর খৈয়ামের সঙ্গে তুলনায় ইহার শিল্পোৎকর্ষের পরিমাণ নির্ণয়ের চেষ্টা কর।

উত্তর ঃ একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পারস্যের খোরেসানে ওমর খৈয়ামের জন্ম। গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় তিনি উচ্চস্তরের পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। পারস্যের সুলতানের বিশিষ্ট সভাসদরূপে তাঁহার এই বৈজ্ঞানিক পারদর্শিতাকে গাণিতিক ও জ্যোতিষিক চিন্তার নানাবিধ সংস্কার সাধনের কাজে লাগান হয়। তাঁহার কাব্য সাধনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, "During the few ntervals when he was free of his computations, Omar indulged himself in the pleasures of poetry. He celebrated wo intoxicants : verse and the wine. Before he died in 1123 he had omposed some five hundred epigrams in quatrains, or rubais, eculiar in rhyme and pungent in effect. The stanzas were, for the

most part, independent, they embodied a terse and self-contained idea. But they were connected, if not unified, by a central philosophy: a vigorous, free thinking hedonism, a casual but frank appeal to enjoy the pleasures of life without too much reflection" (Introduction to Edward Fitzgerald's "Rubaiyat of Omar Khayyam" by Louis Untermeyer)

"পান্থ" কবিতায় ওমর খৈয়ামের মুক্ত অনুবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে। কবিতাগুলি 'রুবাই'-এর ভঙ্গীতে রচিত। প্রত্যেকটি এক একটি চতুষ্পদী। প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ চরণে মিল, তৃতীয় চরণটির সঙ্গে কাহারও মিল নাই। ১৮৬০ সালে ইংরেজী ভাষায় এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড রুবাইয়াতের যে অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা গোটা ইউরোপে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। বাংলাদেশের ইংরেজী-জানা পাঠকমহলেও ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। এই অনুবাদটি অদ্যাবধি ওমরের নির্ভরযোগ্য ইংরেজী ভাষান্তর বলিয়া পণ্ডিত মহলে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। মনে হয় অক্ষয়কুমার উক্ত অনুবাদের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের ভিক্টোরিয় মূল্যবোধের উপরে ফিটজেরাল্ডের অনুবাদ যে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত লেখক বলিয়াছেন, "The Rubaiyat served as a small but concentrated expression of the revolt against Victorian conventions, the prevailing smugness, the false acquiescence and hypocritical prudery. Religion had been confronted by science; noble ideals had come into conflict with practical necessity, roaring machinery was threatening to dispel the once pervasive 'sweetness and light'. The message of Fitzgerald's Rubaiyat was something of a slogan and something of an escape; it turned imperial commercialism to an idealised paganism."

পূর্বতন মূল্যবোধের সঙ্গে কোনরূপে আপস না করিয়া একটা বিদ্রোহের ভঙ্গীতে ইহা আত্মপ্রকাশ করিল। মধ্যবিত্ত নিষেধের বিরুদ্ধে "সাকী-সুরা-সঙ্গীতে"র পক্ষে গৌরব ঘোষণা করিল। একটা বিপর্যস্ত ও অবদমিত-চিত্ত যুগের নিকট নূতন জীবন বাণী উচ্চারিত হইল—'That the glories of this world are better than Paradise to come; that it is wise to take the cash and let the credit go; that life is a meaningless game played by helpless pieces; that worldly ambitions turn into ashes; that in the end—an end which comes all too quickly—wine is a more trustworthy friend and a better comforter than all the philosophers."

ওমর খৈয়ামের কবিতার মূল বাণীটি সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদের ভাষায় প্রকাশ করা যাইতে পারে—

বনচ্ছায়ায় কবিতার পুঁথি পাই যদি একখানি,
পাই যদি এক পাত্র মদিরা, আর যদি তুমি রাণী
সে বিজনে মোর পার্শ্বে বসিয়া গাহ গো মধুর গান,
বিজন হইবে স্বর্গ আমার তৃপ্তি লভিবে প্রাণ ;

ইহার পাশে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ফিটজেরাল্ডের ইংরেজী অনুবাদ রাখিয়া দেখা যাউক—

A book of verses underneath the Bough
A jug of wine, a loaf of Bread and Thou
Besides me singing in Wilderness—
Oh, Wilderness were Paradise enow!

, loaf of Bread" কথাটি সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদে বাদ গিয়াছে। অন্যথায় তাঁহার অনুবাদ অর্থের দিক দিয়া যথাযথ। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় চরণে চরণে মিলের ভঙ্গী মূলের সুরটি ধরিয়া রাখিতে পারে না। বিশেষতঃ মদিরাবিহ্বল স্বর্গদ্রোহী জীবনতৃষ্ণার রস সত্যেন্দ্রনাথের ভাষান্তরে আদৌ রক্ষিত হয় নাই। ইহার পাশে অক্ষয়কুমার বড়ালের ভাবানুবাদের নিদর্শন লওয়া যাক—

নদীকূলে তরুতলে দূর্বাদলে বসি
তুমি বাজাইবে বীণা সুধীরে, রূপসী!
আমি শুধু চেয়ে রব মদিরা-আলসে—
সেই স্বর্গ—উঠে যাহে দেবত্ব বিকশি'।

অক্ষয় বড়াল ভাবানুবাদই করিয়াছেন। যথাযথ আক্ষরিক অনুবাদ তিনি করিতে চান নাই। কিন্তু মূলের রস ও সুর বজায় রাখিবার সমস্ত প্রয়াস করিয়াছেন। মিলের ভঙ্গীতে তিনি মূলানুগ। "মদিরা-আলস" শব্দটির ব্যবহারে উপযুক্তভাব প্রকাশিত। শেষ চরণের বাক্‌রীতিও দৃপ্ত ঔদ্ধত্যে উজ্জ্বল—সত্যেন্দ্রনাথের শেষ চরণের ন্যায় বিবরণধর্মী নয়।

আসলে অক্ষয়কুমার ভাবানুবাদই করিতে চাহিয়াছেন। কোথাও কোথাও দেশীয় প্রসঙ্গের দ্বারা বিদেশী ভাব পরিবেশকে পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছেন। যেমন—প্রাচীন গৌরবের ও সৌন্দর্যের সর্বব্যাপী বিনষ্টি বুঝাইতে গিয়া কবি বলিয়াছেন—

কে বলিবে সত্য নয়—এ পলাশ মূলে
অর্জুনের তপ্ত রক্ত নাহি আজ ফুলে!
কে বলিবে সত্য নয়—ফুটে নাই আজ
সীতার সে পদ্ম-চক্ষু এ পদ্ম-মুকুলে!

মূল কবিতায় ছিল—

I sometimes think that never blows so red
The Rose as where some buried Cæsar bled;
That every Hyacinth the Garden wears
Dropt in her Lap from some once lovely Head,

এইভাবে কিছু দেশীয় নামের ইঙ্গিতে কবি বাঙালী পাঠকদের মনে মূল কবিতার সমজাতীয় ভাবাবেশ জাগ্রত করিতেই চাহিয়াছেন। অনুবাদে মাঝে মাঝে বিস্ময়কর চমৎকারিত্ব দেখাইয়াছেন অক্ষয়কুমার। ফিট্জেরাল্ডের অনুবাদের সঙ্গে তুলনা করিলেই তাঁহার সার্থকতার স্বরূপ অনুধাবন করা যাইবে—

Ah, with the Grape my fading life provide,
And wash the Body whence the Life has died,
And lay me, shrouded in the living Leaf,
By some not unfrequented Garden-side.

—(ফিট্জেরাল্ড)

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—কাহারে না সাধি,
সুরায় ডুবায়ে দেছি সর্ব আধি ব্যাধি।
মৃত্যুকালে দেহ মোর প্রক্ষালিয়া মদে,
নবীন দ্রাক্ষার তলে দিও গো সমাধি।

—(অক্ষয়কুমার)

শেষ দুইটি চরণের কল্পনা ও রূপায়ণ ফিট্জেরাল্ডের অনুবাদকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে সন্দেহ নাই। আবার,

And that inverted Bowl they call the sky,
Where under crawling coop'ed we live and die,
Lift not your hands to It for help—for It
As impotently moves as you or I.

—(ফিট্জেরাল্ড)

সৃজন-মদির'-পানে পূর্ণ মনোরথ,
উলটি দেছেন শূন্য পাত্র মরকত;
কেবা কার তত্ত্ব লয়, কে জানে নিশ্চয়
নিদ্রিত না জাগ্রত স্বয়ম্ভূ শাশ্বত!

—(অক্ষয়কুমার)

অক্ষয়কুমারের অনুবাদে 'It' এবং "impotently moves" শব্দ দুটির তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনা স্থান পায় নাই। "শূন্য পাত্র মরকত" অবশ্য বর্ণাঢ্য ভাষান্তর। কিন্তু ওমরের ঈশ্বর বিষয়ক চরম নিস্পৃহতার ভাবটি অক্ষয়কুমার ঠিক আনিতে পারেন নাই।

কবিতার সমাপ্তিতে অক্ষয়কুমার মূল হইতে বেশ দূরে সরিয়া আসিয়াছেন। ওমরের শেষ শ্লোকটিতেও সাকী এবং শূন্য সুরাপাত্রের কথা আছে—

And when like her, Oh Saki, you sha'l pass
Among the guests star-scatter'd on the grass,
And in your joyous errand reach the spot.
Where I made one—turn down an empty glass!

(ফিট্জেরাল্ড)

ওমরের মনে হতাশা নাই, মৃত্যুর পরবর্তী কল্পিত এই চিত্রে সাকীর জীবনশেষের „হিত সুরাপাত্র উজাড় করিয়া দিবার উপমা ব্যবহৃত। কবি পথ ভুলেন নাই, কারণ পথের শেষ যে মৃত্তিকায় সে বোধে তিনি অটল। অক্ষয়কুমার কিন্তু হতাশা-ব্যঞ্জনার ছবি আঁকিয়াছেন, ইহা অবিশ্বাসীর চিত্তলোকের প্রতিফলন, বিশ্বাস করিবার স্থান পাইলে যে মন বাঁচিয়া যাইত।—

সম্মুখে দাঁড়ায়ে চির-অন্ধ বিভাবরী
কি ফল বিলম্বে আর, উঠ ত্বরা করি
সহায় সম্বল নাই, গেছি পথ ভুলে
যেতে হবে বহুদূর,—দীর্ঘ পথ পড়ি'!

অক্ষয়কুমার বড়াল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ওমরের অনুসরণে কবিতা লিখিয়াছেন। আমাদের দেশের সামাজিক মননে মধ্য ভিক্টোরিয় নীতিবাদ এবং ব্রাহ্ম আদর্শবাদ তখনও সমানে চলিতেছে। ইংলণ্ডের যে সাংস্কৃতিক পরিবেশে ফিট্‌জেরাল্ড রুবাইয়াতের অনুবাদ করিয়াছিলেন অনেকটা সদৃশ পরিস্থিতিতে অক্ষয়কুমারের এই অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছিল। অনুবাদে অক্ষয়কুমার মূলের ভাব সৌন্দর্যকে অনেকখানিই রক্ষা করিয়াছিলেন। তবে এই মুক্ত অনুবাদে কচিৎ কিছু স্বতন্ত্র ভাবনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

মূলানুসরণের দিক দিয়া অবশ্য লেখকের প্রধান ত্রুটি ফার্সিশব্দের অব্যবহারে। ইংরেজী ভাষার তুলনায় এক্ষেত্রে বাংলা ভাষার সুযোগ অনেক বেশী। বহু ফার্সি শব্দ বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজীতে ফার্সি শব্দের প্রয়োগ সামান্যই সম্ভব। অক্ষয় বড়াল ঐ জাতীয় শব্দের ব্যবহারে মূলের ভাবপরিবেশ কতকটা সৃষ্টি করিয়া লইতে পারিতেন।

প্রশ্ন ৫। অক্ষয়কুমারের কল্পনায় যে রমণীর মূর্তি ধরা পড়িয়াছে, যাহা তাঁহার কাব্যসাধনাকে মূলতঃ নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে, তাহার পরিচয় দাও।

উত্তর। বাংলা দেশের আধুনিক কালের রোমান্টিক কবিরা অনেকেই কাব্য কল্পনার কেন্দ্রে একটি রমণীকে অনুভব করিতে চাহিয়াছেন। উহাকে কাব্য কল্পনার মূল অনুপ্রেরণাও বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই রমণীর রূপ ও ভাব কল্পনায় বাস্তব ও অপার্থিব নানাবিধ উপাদান সমন্বিত হইয়া থাকে—কবির নিজস্ব মেজাজ অনুযায়ী ঐ সব উপাদানের নানা আনুপাতিক সংমিশ্রণ ঘটিয়া থাকে। বিহারীলাল সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অক্ষয়কুমার ও রবীন্দ্রনাথ এই চারিজন কবি সম্পর্কেই ঐ কথাটির অল্পাধিক সত্য। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পড়ি—

মানসরূপিনী ওগো বাসনাবাসিনী
আলোকবসনা ওগো নীরবভাষিণী'
স্বর্গ হতে মর্ত্যভূমি
… … …

করিছ বিহার, সন্ধ্যার কনক বর্ণে
রাঙিছে অঞ্চল—প্রভৃতি।

এই মানসসুন্দরীকে কবি কখনও বলিয়াছেন "সোনারতরীর মেয়ে" কখনও "জীবনদেবতা" "অন্তর্যামী" পরবর্তীকালে "লীলাসঙ্গিনী" রূপে ইহাকেই বন্দনা করিয়াছেন। "এই মানসী কবিপ্রাণের অতিসূক্ষ্ম সৌন্দর্য উপভোগের বাসনাবাসিনী দেবতা।" এখানে বাস্তব অবাস্তবের দ্বন্দ্ব নাই, আছে কেবল একটি অতি মধুর বিরহ-বিলাস। কবির এই বিশ্বাস আছে—

আছে এক মহা উপকূল
এই সৌন্দর্যের তটে, বাসনার তীরে
মোদের দোঁহার গৃহ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কল্পনা-কেন্দ্রের এই বাসনারূপিনীকে বাস্তব জীবনের মধ্যে কখনই অনুসন্ধান করেন নাই ; কোন প্রাকৃত নারীর আভাস প্রতিচ্ছায়া উহার উপরে পড়িলেও শিল্পীর অনুপ্রেরণা হিসাবেই উহাকে কবি কাজে লাগাইয়াছেন। বিহারীলালের "সারদা" একটি বিশিষ্ট নারী শক্তি। জায়া রূপে এই শক্তিই সংসারে দেখা দেয় আবার সকল কাব্যকল্পনার উৎসে প্রেরণা ও প্রতিভা রূপে ইহা বিরাজ করে। সৃষ্টির মূলে যে সৌন্দর্যশক্তি আছে, যে উৎস হইতে বিশ্বব্যাপী বিচিত্র রূপলোক উৎসারিত সেই শক্তিই সারদা। বিহারীলাল সংসারের রমণীতে ভাববিহ্বল চিত্তে সারদার বিশ্বব্যাপ্ত ছায়াপাত অনুভব করিয়াছেন মাত্র। বাস্তবকে গভীরভাবে যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে চাহেন নাই বলিয়া অনায়াসে বলিতে পারিয়াছেন—

তবে কি সকলই ভুল।
নাই কি প্রেমের মূল,—
বিচিত্র গগন ফুল কল্পনা লতার ?
... ...
এ ভুল প্রাণের ভুল,
মর্মে বিজড়িত মূল,
জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত বল্লরী।

সুরেন্দ্রনাথ নারীকে কোন আধ্যাত্মিক কাল্পনিক সৌন্দর্যসত্তারূপে অনুভব করিতে চাহেন নাই। জায়া ও জননীরূপে বিচিত্র মানবিক-পারিবারিক সম্পর্কের মধ্য দিয়া তাহার যে রূপ প্রকট হইয়া উঠে উহাকেই রূপায়িত করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহার কাব্যে। কাব্যের নামও দিয়াছিলেন "মহিলা" কাব্য। পারিবারিক বাস্তব রূপকে কিছুটা idealise করা, কিছুটা ভাবনাকে প্রসারিত করিয়া দেওয়ায় উহার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অনেকটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এই মাত্র। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের নারীকে কাব্য কল্পনার কেন্দ্রীয় প্রেরণা রূপে গ্রহণ করিলেও তাহাকে বাস্তব পরিচয়ের বাহিরে অস্পষ্ট রহস্যলোকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দেন নাই। কবির সেই মনোভাব নিম্নোদ্ধৃত কবিতার মধ্যেই অনেকটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—

সবিলাস বিগ্রহ মানস সুষমার,
আনন্দের প্রতিমা আত্মার
সাক্ষাৎ সাকার যেন ধ্যান কবিতার,
মুগ্ধমুখী মূরতি মায়ার ;
যত কাম্য হৃদয়ের,
সংগ্রহ সে সকলের—
কি বুঝাব ভাব রমণীর,
মণি-মন্ত্র মহৌষধি সংসার-ফণির।

এই কবিদের সহিত তুলনায় অক্ষয়কুমারের কল্পনাকেন্দ্রের নারীর স্বরূপ অনুধাবন করা যাইতে পারে। তাঁহার কল্পনায় নারী একদিক দিয়া দেখিতে গেলে অত্যন্ত Subjective। এ বিষয়ে বিগত যুগের প্রখ্যাত সম্পাদক-সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির উক্তি, "অক্ষয়কুমারের কবিতায় নারী ভোগের উপাদান নহে। কবি নারীকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানসপুষ্প অর্ঘ্য দিয়াছেন। তিনি রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হন, কিন্তু বিহ্বল হইয়া পিশিত পিণ্ডের পূজা করেন না। এই জন্য তাঁহার প্রেমের কবিতায় রক্তরাগ নাই। সে প্রেম সর্বত্র অগ্নিপূত শুদ্ধ হেম। তাহা ভোগতৃষ্ণার আকাঙ্ক্ষা নহে—আত্ম বিস্মৃত ভক্তের আত্মবিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা!"

অক্ষয়কুমার নারীর কল্পনায় একদিকে বিশ্বময়ী আদ্যাপ্রকৃতির ভাব অন্যদিকে সংসারাশ্রয়ী মমতাবদ্ধ ভাবের কথা যুগপৎ বলিয়াছেন—

তুমি বিধাতার স্ফূর্তি কঠোরে কোমল মূর্তি
শুষ্ক জড় জগতের নিত্য নব ছলা!
উপচয়ে দশ হস্তা অপচয়ে ছিন্নমস্তা
মায়াবদ্ধা, মায়াময়ী, সংসার বিহ্বলা।

বিশ্বগ্রাসী প্রলয় পাগল মহোচ্ছ্বাস রূপী পুরুষকে স্নেহ মমতায় বন্ধনে বাঁধিয়া তিনিই সংসারী করিয়া তোলেন। কবি তাঁহাকে শান্তি-স্বস্তি-দাত্রী, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, সৃষ্টিকর্ত্রী, পালয়িত্রী, আত্মমধ্যা, স্বয়ংস্থিতা, মুগ্ধা, আশ্লেষরূপা, বিশ্লেষকাতরা, সৌন্দর্যে অপরাজিতা এবং ভবদুঃখহরা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কবির বর্ণনাভঙ্গীতে একটা গাঢ় গভীর স্তোত্রপাঠের সুর লাগিয়াছে যেন। নারী এবং বিশ্বপ্রকৃতি একই সত্যের দুটি দিক। কবি নিজেকে সেই পরিপূর্ণ শান্ত শুদ্ধ সত্যের মধ্যস্থিত ক্ষণস্থায়ী এক যন্ত্রণাদগ্ধ বিদ্যুৎ-প্রকাশ রূপে অনুভব করিয়াছেন—

একবার নারী, তব প্রেম মুখ হেরি,
আরবার প্রকৃতির শ্যাম বুক হেরি,
মনে হয়,—দুইজনে দুখানি মেঘের মত
রহিয়াছ জগতেরে ঘেরি।
আমি—তোমাদের মাঝে একটি বিদ্যুৎসম

চকিতে জ্বলিয়া,
মিশায়ে—মিলায়ে, যাই মিশিয়া—মিলিয়া।

কামনাবাসনাতীক্ষ্ণ পুরুষহৃদয় ক্ষণকালের জন্য প্রকাশিত হইয়া মিলিয়া যায়, কিন্তু নারীশক্তি প্রকৃতির ন্যায় চিরন্তনী। কবির এই ভাবনার পশ্চাতে হিন্দু তান্ত্রিক দর্শনের নিঃসন্দিগ্ধ প্রভাব রহিয়াছে।

কিন্তু হিন্দুর দার্শনিক চেতনার সঙ্গে আধুনিক রোমান্টিক সৌন্দর্য-চেতনাও মাঝে মাঝেই জড়াইয়া মিশিয়া গিয়াছে। বিশ্বের সব সৌন্দর্যের মূল কারণ রূপে তিনি নারীকে অনুভব করিয়াছেন—"সৌন্দর্যের মেরুদণ্ড তুমি"। রবীন্দ্রনাথের "জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে, তুমি বিচিত্ররূপিনী"—এই বোধের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের সৌন্দর্য-চেতনার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে—

রমণী রে, সৌন্দর্যে তোমার
সকল সৌন্দর্য আছে বাঁধা।

[নারীকে কেন্দ্র করিয়া বাস্তব ও কল্পনার দ্বন্দ্ব এবং তাহার সমাধান বিষয়ক আলোচনা ইহার পরে যোগ করিতে হইবে। উহার জন্য ২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।]

প্রশ্ন ৬। "মানববন্দনা" কবিতাটির মূল ভাব অক্ষয়কুমারের কাব্য কল্পনার সাধারণ প্রবাহের সহিত সুসঙ্গত কিনা আলোচনা কর? কবি কি কারণে এই কবিতাটি লিখিয়াছিলেন বলিয়া তোমার মনে হয়? কাব্যমূল্যের দিক দিয়া ইহার মূল্যনির্ধারণের চেষ্টা কর।

উত্তর। অক্ষয়কুমার বড়ালের "মানববন্দনা" কবিতাটি একটি বিশিষ্ট রচনা। ইহার বিষয়বস্তু এবং ভাবকল্পনা মোটামুটিভাবে বাংলা কবিতার ধারায় ব্যতিক্রমরূপে গণ্য হইতে পারে। এই জাতীয় বিষয়বস্তু লইয়া যে বাংলা সাহিত্যে কোন কবিতা-রচনা হয় নাই—সে কথা অংশ্য সত্য নয়। উনবিংশ শতাব্দীর আরও কোন কোন কবি ইতিহাস ভূবিদ্যার জ্ঞানকে কবিতায় রূপান্তরিত করিতে চাহিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র প্রভৃতির মননপ্রধান কবিতাগুলির (Refl.ective poems) কথা এই-প্রসঙ্গে স্মরণ করা চলে। তাঁহার "দশমহাবিদ্যা"য় শক্তির দশরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া কবি মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু বহির্মুখী কবিদের কাছে অনুরূপ নানা বিষয়ের উপস্থাপনা এক কথা এবং অন্তর্মুখী রোমান্টিক কবির নিকট ঐ জাতীয় বিষয়ের অনুশীলন অনেকখানি স্বতন্ত্র ধরনের ব্যাপার। সেই কারণেই কাব্যপাঠকের নিকট অক্ষয়কুমার বড়ালের "মানববন্দনা" বেশ বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

কবিতাটির মধ্যে মানবমহিমার প্রতি কবির শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর কবিরা বাঙালীর চিত্তলোকের নবজাগরণের সুর প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বাংলাদেশের প্রথম যুগের রোমান্টিক কবিরাও প্রাকৃত জীবনের দিকে পিছন ফিরিয়া শুধু আপন অন্তরের গভীরে ডুব দেন নাই। বহির্জগতের বৃহৎ ও মহৎ সত্যকে, জ্ঞানের বিস্ময়কে তাঁহারা অনেকেই অস্বীকার করেন নাই, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কবিতায়ও

স্থান দিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার "মহিলা" কাব্য রচনার সময়ে আভ্যন্তর প্রেরণা যতই বোধ করুন না কেন, নবযুগের নারী-মুক্তির ধারণার দ্বারাও বিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিলেন। অক্ষয়কুমারের কাব্যের কেন্দ্রে রহিয়াছে নারী-প্রেম এবং তৎসম্পর্কিত কল্পনা ও বাস্তববোধের দ্বন্দ্ব। ইহা যতই subjective হউক, নারীসম্পর্কিত ভাবনার উৎসে নবযুগের সামগ্রিক মানবমহিমায় বিশ্বাস অবশ্যই কিছুটা কাজ করিয়া থাকিবে। মানুষের প্রতি যে শ্রদ্ধার ফলে তাঁহার কাব্য সর্বদা নারী-বন্দনায় মুখর, তাহারই প্রভাবে অন্ততঃ একবারের জন্য তিনি মানুষের (শুধু নারীর নয়) সামগ্রিক মহিমা-উপলব্ধির চেষ্টা করিয়াছেন। সেইভাবে দেখিলে এই কবিতাটি অক্ষয়কুমারের কাব্যধারায় স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করিয়া থাকিলেও, ব্যাপারটি অসঙ্গত ও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

পাঁচটি কাব্যের অধিকাংশ কবিতায় একই প্রেম ও অন্তর্দাহের গান গাহিয়াছেন অক্ষয়কুমার। ইহা তাঁহার মনের একমুখীতার পরিচয় দেয়। কিন্তু একমুখীতা সর্বগ্রাসিতায় পরিণত হইলে কবিহৃদয়ে কখনও কখনও মুক্তিকামনা দেখা দেওয়া সম্ভব। সেই বৈচিত্র্যসন্ধানী চিত্তই নবতর বিষয়বস্তুর দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে "মানববন্দনা" কবিতায়।

অক্ষয়কুমার বড়াল তাঁহার প্রিয়-প্রসঙ্গের বাহিরে দুটি বিশিষ্ট কবিতা লিখিয়াছেন। ওমর খৈয়ামের অনুবাদস্বরূপ "পান্থ" এবং "মানববন্দনা" ইহাদের মধ্যে জীবনবোধের ভিত্তিগত মিল আছে। পান্থে ভোগবাদী জীবনের জয়গান—এককথায় মানুষের মর্ত-লীলার মহিমা প্রচার—

কবে ধরা হবে স্বর্গ, কিংবা রসাতল,
দর্শনে বিজ্ঞানে কাবো চির কোলাহল।
যে যাহার ভেরী তুরী বাজায় আপনি—
নগদে সন্তুষ্ট আমি, ধারে কিবা ফল !

ধরা এবং ধরার মানুষকে লইয়াই কবির "মানববন্দনা" রচিত। কবির মনের সঙ্গে এই প্রসঙ্গের কোন স্বাভাবিক বিরোধ নাই। "পান্থ" এবং "মানববন্দনা" উভয় কবিতার মধ্যে ঈশ্বর বিষয়ে একটা বিশুদ্ধ বিরুদ্ধতার সুর শোনা যায়। এই সুরটি কবিচিত্তের একটি বিশেষ সুর – অন্যত্র আস্তিক্যবাদের মধ্যে নাস্তিক্যবাদের সুপ্তপ্রায় ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়; এক্ষেত্রে নাস্তিক্যবাদই তীব্র। এই দুইটি কবিতা তাই অক্ষয়বড়ালের কাব্যপ্রতিভার দিক দিয়া অসঙ্গত নয়, বরং কবিকে সম্পূর্ণভাবে বুঝিবার পক্ষে প্রয়োজনীয়।

কবিতা হিসাবে "মানববন্দনা" বেশ উচ্চস্থান দাবি করিতে পারে। পূর্ণ আত্ম-কেন্দ্রিক ভাবনার রূপদানে দক্ষ কবি এখানে গোটা মানবজাতির ইতিহাসে প্রবেশ করিয়াছেন। এই স্বতন্ত্র জাতের কাজেও তিনি যথাযোগ্য সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। এ শ্রেণীর কবিতা সচরাচর অতিমাত্রায় objective বা বস্তুনিষ্ঠ হইয়া উঠে। কবি-হৃদয়ের সহিত উহার যেন কোন মমত্বের বন্ধনই থাকে না। অক্ষয়কুমার এই কবিতায় ইতিহাসের জ্ঞানকে হৃদয়ের উল্লাস ও শ্রদ্ধার সঙ্গে যুক্ত করিয়াছেন। মানব সভ্যতাকে

দূরের স্বতন্ত্র বস্তুরূপে না দেখিয়া, নিজেকে উহার সহিত মিলাইয়া দেখা, আদি মানবের বিপদে নিজের মর্মযন্ত্রণা ভোগ, সাফল্যে উল্লাসের অনুভূতি কবির রচনাটিকে বর্ণনামূলক কবিতায় পরিণত হইতে দেয় নাই।

কাতর আহ্বান সেই মেঘে মেঘে উঠি,
লুটি গ্রহে গ্রহে,—

এই কাতরতা কি শুধু আদি মানবের, কবির প্রাণ কি ভাষাভঙ্গীতে উহার সহিত ওতপ্রোত জড়িত হইয়া যায় নাই? কবির ভাষায় তাই প্রথম দিকের তৃতীয় পুরুষসূচক বাগ্‌বিন্যাস কয়েকটি স্তবক পরেই উত্তম পুরুষে রূপান্তরিত।

অর্দ্ধ-দগ্ধ মৃগমাংস কার সাথে বসি
করিনু ভক্ষণ?

অথবা

কার আশীর্বাদ লয়ে অগ্নিসাক্ষী করি
হইনু সংসারী?

অসভ্য বা সভ্য—সর্বস্তরের মানুষদের একজন হইয়া উঠিয়াছেন কবি। মানুষের বন্দনা কবির আত্মগৌরবখ্যাপনের মত শুনাইয়াছে। Subjective কবি ইতিহাস-পুরাতত্ত্বের প্রসঙ্গ আপন আত্মার অংশ করিয়া তুলিয়াছেন। কবিতাটির সাফল্যের মূলে এই কারণটি বর্তমান।

কবিতাটিতে শব্দ ও অর্থের সার্থক মিলন ঘটিয়াছে। কবি তথ্যের ভারে কবিতাটিকে কোথাও ভারাক্রান্ত করিয়া তোলেন নাই। কবিতার প্রথম দিক চিত্ররূপময়। শ্বাপদ-সঙ্কুল আদি পৃথিবীর ভীষণতার বস্তুধর্মী নিম্নোদ্ধৃত চিত্র রচনাকৌশলে বিশেষ নৈপুণ্যের চিহ্নবাহী—

ধরিত্রী অরণ্যে ভরা, কর্দমে পিচ্ছিল—
সলিলে শিশিরে।
শাখায় ঝাপটি পাখা গরুড় চীৎকারে,
কাণ্ডে সর্পকুল;
সম্মুখে শ্বাপদ-সঙ্ঘ বদন ব্যাদানি
আছাড়ে লাঙ্গুল।

বিভীষণের রূপ এবং স্নিগ্ধ মমতার চিত্র—উভয়তঃ কবি সফল হইয়াছেন। কিন্তু সর্বত্রই প্রকাশভঙ্গীতে একটি গাম্ভীর্য বজায় রহিয়াছে। কবি মাঝে মাঝে কোমল হইয়াছেন, কিন্তু কোথাও তরল হন নাই।

কবিতাটির স্বাভাবিক গাম্ভীর্য মাঝে মাঝে মহিমায় নভস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন ঋক্‌মন্ত্রের বজ্রস্তনিত রণন যেন কবির ভাষায় শ্রুত হইয়াছে। মানুষকে যেখানে কবি 'বিবর্তবুদ্ধি, বিদ্যুৎমোহন, বজ্রমুষ্টিধর" বলিয়া নমস্কার জানাইয়াছেন, গ্রহে গ্রহে তাহার পদধ্বনি শুনিয়াছেন, যেখানে তাহার চিন্তার ও কর্মের বিপুল

অদ্বৈর্যের কথা বলিয়াছেন, এবং যেখানে মানুষের সৃষ্টিরহস্য-ভেদকারী রূপ বিস্ময়ের রঙে আঁকিয়াছেন—এইরূপ তিনটি স্তবকে কবিতাটি "great art" হইয়া উঠিয়াছে। ভাবনার মধ্যে যে মহিমার বীজ রূপে তাহা সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের কর্মে ও চিন্তায়, অনুভূতিতে সৃষ্টিতে সদাচাঞ্চল্য ও পরিবর্তনশীলতা কবির ভাষায় সমুদ্র-তরঙ্গের ব্যাকুলতা লইয়া দেখা দিয়াছে—

নমি, হে বিশ্বগ-ভাগ! আজন্ম-চঞ্চল,
বিচিত্র বিপুল!
হেলিছ-দুলিছ সদা, পড়িছ আছাড়ি!
ভাঙ্গি সীমা-কূল!
কি ঘর্ষণ—কি ধর্ষণ, লম্ফন-গর্জন,
দ্বন্দ্ব মহামার!
নাহি তৃপ্তি, নাহি শ্রান্তি, নাহি ভ্রান্তি ভয়,
কোথায়—কোথায়!

এবং সর্বশেষ স্তবকে cosmic হইতে মহামানবত্বের বিশাল ধারণাকে আনিয়া কবি শ্রমজীবী জনসাধারণের প্রতি যে মৃত্তিকাশায়ী প্রণাম জানাইয়াছেন তাহাতে কবিতার মানবিক মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে—

নমি, কৃষি-তন্তু-জীবি, স্থপতি, তক্ষণ
কর্ম—চর্মকার!
অদ্রি তলে শিলাখণ্ড—দৃষ্টি অগোচরে
বহ অদ্রি-ভার!

কল্পনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[**কাব্য-পরিচয়**—'কল্পনা' কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৩০৭ বঙ্গাব্দে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যবিবর্তনের ধারায় এই কাব্যগ্রন্থটির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। জনৈক বিশিষ্ট সমালোচক লিখিয়াছেন, " 'চৈতালি' হইতে আরম্ভ করিয়া 'কথা ও কাহিনী'র মধ্য দিয়া রবীন্দ্র-কবিমানসের একটি পরিণতির ধারা লক্ষ্য করা যায়। নিরবচ্ছিন্ন শিল্পীর মাধুর্যময় জীবন হইতে, সৌন্দর্য, প্রেম ও জীবনের রসসম্ভোগ হইতে কবি একটু সরিয়া আসিয়া জীবনের গভীরতর অংশের দিকে—মানবের শাশ্বত সত্য-স্বরূপের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। ত্যাগ, সত্য, ন্যায় ও ধর্মনিষ্ঠা, যাহা মানবের বৃহত্তর জীবনের অঙ্গ, তাহার প্রতি কবির চিত্ত গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে।…'কল্পনা'তে পূর্বের রসসম্ভোগের জীবন হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে, আবার সেই সঙ্গে পূর্বজীবনের সৌন্দর্য ও মাধুর্যের অনুভূতি পূর্বস্মৃতির পথ বাহিয়া একটি মনোরম কল্পলোকের ঐশ্বর্য ও বর্ণচ্ছটা বহন করিয়া অপরূপভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। দুইটি বিভিন্নমুখী ধারা মিশিয়াছে একত্রে এইগ্রন্থে।" (ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : রবীন্দ্রকাব্যপরিক্রমা।)]

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। "কল্পনা" কাব্যে রবীন্দ্রনাথ অতীত ভারতের সৌন্দর্য ও লাবণ্যের মধ্যে মানস-পরিক্রমা করিয়াছেন।" এই মন্তব্যটির তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও।

অথবা, "রবীন্দ্রকাব্যে কালিদাসের প্রভাব 'কল্পনা'য় বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছিল।"—এই বিষয়ে তোমার অভিমত বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর।

উত্তর। প্রাচীন ভারতের জীবনাদর্শ এবং কাব্যসৌন্দর্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ ছিল। বর্তমানের জীর্ণ জীবন এবং ধূলিমলিন প্রাত্যহিকের বন্ধন হইতে তিনি মুক্তি পাইতে চাহিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহার রোমান্টিক কল্পনা কখনও প্রকৃতির নিভৃত জগতে, কখনও প্রাচীন ভারতের মানসলোকে, কখনও আবার অনির্বচনীয় রহস্যজড়িত জগতে প্রধাবিত হইয়াছে 'কল্পনা' কাব্যে ইহার একটি বিশেষ দিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। রোমান্টিক কল্পনা কবিকে অতীতচারী করিয়া তুলিয়াছে। এই অতীতচারণা রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল সংস্কৃত কবিদের অনুপ্রেরণার মধ্যে। "সমগ্র সংস্কৃত-সাহিত্যের সহিতই রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল, এবং গ্রহণও হয়ত করিয়াছিলেন বহুস্থান হইতে বহুপ্রভাব; কিন্তু তাঁহার গভীরতম যোগ ছিল কবি কালিদাসের সঙ্গে। মোটের উপরে কালিদাস তাঁহার নিকটে সমগ্র সংস্কৃত কবিগণের প্রতিনিধিস্থানীয় ছিলেন।" [ত্রয়ী : শশিভূষণ দাশগুপ্ত]।

মানসীর যুগে রবীন্দ্রনাথের কবিতার উপরে কালিদাসের প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। নববর্ষার আগমনে তিনি "মেঘদূত" এবং উজ্জয়িনীর কথা স্মরণ করিয়াছিলেন—

সেদিন সে উজ্জয়িনী-প্রাসাদ-শিখরে
কী না জানি ঘনঘটা, বিদ্যুৎ-উৎসব,
উদ্দাম পবন-বেগ গুরু গুরু রব।

কালিদাসের মেঘদূতে এবং উজ্জয়িনী নগরী যেন তিনি চিরকালের মানবচিত্তের বিরহবেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন।

"কল্পনা" কাব্যের কতকগুলি কবিতায় এই প্রভাব আরও বাড়িয়া গিয়াছে; এবং কবি যে এই কাব্যে অতীতভারতে—কালিদাস প্রমুখের কাব্য-কল্পিত একটি বর্ণবস্তু জগতে মানস-পরিক্রমা করিয়াছেন তাহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না। "বর্ষামঙ্গল" এর ভাষা, চিত্ররচনা, কল্পনাভঙ্গী সর্বত্র—কবিতাটির সারা দেহে কালিদাসের রচনা ও কল্পনারীতির ছাপ লাগিয়া রহিয়াছে।

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিক ললনা,
জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত-নয়না,
মালতিমালিনী কোথা প্রিয়-পরিচারিকা
কোথা তোরা অভিসারিকা।
ঘনবনতলে এস ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা,
আনো বীণা মনোহারিকা।
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা॥

"তরুণী-পথিক-ললনা" আসিয়াছে "প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসত্যঃ" (মেঘদূত) হইতে; "তড়িৎ-চকিত-নয়না"-র উৎসে সক্রিয় "বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈঃ" (মেঘদূত); "ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা"-র প্রেরণা মিলিয়াছে "পাদন্যাসৈঃ ক্বণিত-রসনাঃ" (মেঘদূত)-প্রভৃতির মধ্যে। প্রায় গোটা কবিতায় আমরা যে সৌন্দর্য উপভোগ করি তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাসের যুগ্মবেণু ও বীণার ঝঙ্কার শুনা যায়। এই দুই কবি-চিত্ত যেন মিলিয়া গিয়া এই কবিতায় বিস্ময়কর সৌন্দর্য-সৃষ্টি করিয়াছে। ডঃ ক্ষুদিরাম দাস লিখিয়াছেন—'ভ্রষ্টলগ্নে' যে অনুতাপদগ্ধা বিরহিণীর চিত্র আঁকা হয়েছে তিনি সাজ-সজ্জায় ভঙ্গীতে বাক্যে প্রাচীন, যদিও বয়সে নবীনা। 'অলস চরণে বসি বাতায়নে এসে, নতুন মালিকা পরেছি শিথিল কেশে' অথবা 'কনকমুকুর হাতে লয়ে বাতায়নে, বাঁধিতেছিলাম কবরী আপন মনে' প্রভৃতি সম্পূর্ণ একালের নায়িকার চিত্র নয়। 'সোনার খাঁচায় ঘুমায় মুখরা শারী·· ধূপের ধোঁয়ায় ধূসর বাসরগেহ' প্রভৃতি চিত্র সেকালের প্রতীক্ষমানা নায়িকাদের বিলাসগৃহ-চিত্র।" নিঃসন্দেহে এই সব কবিতায় প্রাচীনকালের বর্ণবহুল বিলাসবহুল কল্পসৌন্দর্যের স্বাদই লক্ষ্য। কিন্তু কিছু কিছু কবিতায় স্বাদকে ছাপাইয়া নিগূঢ় ভাবনায় তিনি উত্তীর্ণ।

"মদনভস্মের পূর্বে ও পর অপূর্ব প্রেমের কাব্য কুমারসম্ভবের প্রণয়লীলার উদ্দীপন-বিভাবগুলিকে আশ্রয় করে দক্ষ কবির লিরিক কল্পনা মাত্র। 'মদনভস্মের পর' কবিতাটিতে মদনকে প্রকৃতি ও মানবের যাবতীয় রমণীয় সম্পর্কের সারভূত বস্তুর অদৃশ্য কারণরূপে আধুনিক কবি দেখেছেন।" (রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয় : ক্ষুদিরাম দাস)

"মদনভস্মের পূর্বে" এবং "মদনভস্মের পর" কবিতা দুইটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবন-ভাবনার গভীরতর পরিচয়ও লক্ষ্য করা যায়। প্রথম কবিতাটিতে প্রণয়-দেবতা, মানবচিত্তে যৌবনে যে বিচিত্র লীলা-বিলাসের সৃষ্টি করে, তাহারই উজ্জ্বল-বিহ্বল বর্ণনা। বলা যাইতে পারে এই কবিতায় 'প্যাসনে'র লীলা, কুমারসম্ভবের অকালবসন্তের ভাবনার সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য আছে। দ্বিতীয় কবিতায় দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছে কামদেব। বিশ্বব্যাপী সূক্ষ্ম প্রণয়তৃষ্ণা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কি সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বাসি,
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।

'প্যাসন' এই ভাবে 'সাব্লিমেটেড্' হইয়াছে। প্রেমকে দেহ-ভাবনা মুক্ত করা রবীন্দ্র কাব্যসাধনার একটি মুখ্য সুর। কুমারসম্ভব কাব্যের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ("প্রাচীন সাহিত্য" গ্রন্থে) তিনি ইহাকেই কালিদাসের কাব্যের কেন্দ্রীয় ভাবনারূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আলোচ্য কবিতা দুইটি এই দিক দিয়া রবীন্দ্র জীবনদর্শনের সহিত জড়িত।

"কল্পনা" কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা "স্বপ্ন" আলোচ্যধারার সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট কবিতা। কবি বাস্তব জীবনের জীর্ণতা হইতে প্রতিদিনের ধূলিমলিন স্বার্থদষ্ট অভিজ্ঞতা হইতে মুক্তি পাইতে চান। তিনি কল্পনার ডানায় ভর করিয়া, স্বপ্নের মধ্য দিয়া গিয়া উপনীত হন কালিদাসের কাব্যবর্ণিত প্রাচীন ভারতে উজ্জয়িনী-নগরীতে। কালিদাস যেমন মেঘদূতে অলকাপুরীর কল্পনা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেইরূপ উজ্জয়িনীপুরীকে কামনার মোক্ষধামরূপে অনুভব করিয়াছেন। সেখানেই তিনি পাইবেন "পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।" এই প্রিয়া "বিধাতার আদি সৃষ্টি।" কবিকল্পনার পরম কাম্যধন। সব সৌন্দর্যের সারভূতা। কালিদাস যক্ষরমণীর মধ্যে উত্তর মেঘে যাহাকে দেখিয়াছিলেন, তাহারই বেশে ভূষায় এই রমণী রবীন্দ্র-স্বপ্নে আবির্ভূতা—

মুখে তার লোধ্র রেণু, লীলা-পদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,
তনুদেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা।

কালিদাসের "মেঘদূতে" পাই—

হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননেশ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারুকর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥

রবীন্দ্রনাথ উজ্জয়িনীপুরী, এবং প্রাসাদের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার আদর্শও তিনি কালিদাসের নিকট হইতেই পাইয়াছেন। এই অতীত সৌন্দর্য-সম্ভোগ যতই রমণীয় হউক না কেন, উহা তো নেহাৎই স্বপ্নচারণা। সেই আদর্শ সৌন্দর্যলোক, সেই পরমকাম্য-মানসসুন্দরীকে জীবনে লাভ করা সম্ভব নয়, মাত্র স্বপ্নে তাহাকে পাওয়া যায়। কিন্তু তবুও সে কতদূরে—

মুখে তার চাহি
কথা বলিবারে গেনু, কথা আর নাহি,
সে ভাষা ভুলিয়া গেছি, নাম দোঁহাকার
দুজনে ভাবিনু কত—মনে নাহি আর।
দুজনে ভাবিনু কত চাহি দোঁহা-পানে,
অঝোরে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়ানে।

স্বপ্নমিলন যে কত ব্যর্থ তাহা মর্মান্তিকভাবে বুঝা গেল। কাছে আসিয়াও প্রিয়াকে কবি পাইলেন না। অতীতের সহিত বর্তমানের ব্যবধান কত দুস্তর, কল্পনার সহিত বাস্তবের। কাম্যধনকে চাওয়া যায়, যথার্থ পাওয়া যায় না। অতীত সৌন্দর্যসম্ভোগের মধ্য হইতে এই সুতীব্র সৌন্দর্য-বিচ্ছেদের সুর প্রকাশ পাইয়া কবিতাটিকে বিশিষ্টতা দিয়াছে।

প্রশ্ন ২। 'কল্পনা'র সমালোচনা প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচকের উক্তি—"এখন নূতন জীবনযাত্রায় পক্ষ বিস্তার করিয়া দিতে হইবে, কিন্তু হায়, কোন্ পথে কোন্ ভাব-লোকে যে নূতন করিয়া উড়িতে হইবে তাহার কোন ঠিকানা নাই। বাস্তবিক বড় একটি সকরুণ বিষাদের সঙ্গে কল্পনায় বার বার পিছন ফিরিয়া গত জীবনের সমস্ত প্রিয় জিনিসগুলির দিকে কবিকে তাকাইতে হইতেছে।"—এই বক্তব্যের তাৎপর্য কি? ইহা তুমি যথার্থ বলিয়া মনে কর কি?

উত্তর। কল্পনা কাব্য রবীন্দ্রকাব্যধারায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। সোনার তরী হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রকবিতায় সৌন্দর্যসম্ভোগের এবং মর্ত্যমমতার অতি ঘনিষ্ঠ আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতি ও মানবজীবনের যেখানে যাহা কিছু আনন্দ আছে তাহা কবি আকণ্ঠ পান করিতে চাহিয়াছেন। কল্পনা কাব্যেও একদিকে সেই সৌন্দর্যরসসম্ভোগ চলিয়াছে। 'স্বপ্ন', 'মদনভস্মের পূর্বে', 'মদনভস্মের পর', 'ভ্রষ্টলগ্ন' প্রভৃতি নানা কবিতায় তিনি প্রাচীনভারতীয় সৌন্দর্য-লোকের মধ্যে অবগাহন করিয়া তাহার রূপ রস গন্ধ বর্ণের স্বাদ পাইতে চাহিয়াছেন। কিন্তু উহার পাশাপাশি অপর একটি সুর—একটি প্রবলতর সুর "কল্পনা" কাব্যে

রহিয়াছে। "কল্পনা" কাব্যে কবি জীবনের বৃহত্তর আহ্বান শুনিতে পাইয়াছেন। এই আহ্বান পূর্বের কোন কাব্যে শুনা যায় নাই এমন নয়। "চিত্রা" কাব্যের "এবার ফিরাও মোরে" কবিতায় মহাজীবনের কর্তব্য ও কর্মের পথে আহ্বান তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত একটা ভাবউপলব্ধির আত্মিক সমাধানে তিনি পৌছিতে চাহিয়াছিলেন। এই জাতীয় বিচ্ছিন্নভাবে একটি দুটি কবিতায় সৌন্দর্যের গাঢ় মোহ হইতে উত্থানের সুর মাত্র নয়—কবি কল্পনাতে বহু কবিতায় রসভোগের জগত হইতে নিজেকে বিচ্যুত করিয়া লইবার কথা বলিয়াছেন।

"দুঃসময়" কবিতাটি কাব্যের মুখবন্ধরূপে সর্বপ্রথমে স্থাপিত হইয়াছে। কবি নিজের চিত্তকে একটি নীড়বাসী বিহঙ্গের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়-বিহঙ্গকে এই চিরপরিচিত নীড়ের বন্ধন ছাড়িয়া যাইতে হইবে। এতদিনের রসরূপ সম্ভোগ আর নয়; এবার কঠোর কঠিন জীবন-সত্যের সন্ধানে যাত্রা করিতে হইবে। এই নূতন পথে বহু ভয়, বহু সংকোচ, বহু সন্দেহ রহিয়াছে। এই দুঃসাহসিক অভিযানের যাত্রীকে কে আশার বাণী শুনাইবে? সর্ববিধ জাগতিক আশা-নৈরাশ্যের উর্ধ্বলোকে তাহার অভিযান। এতদিনের আচরিত রসজীবনের সহিত এই নূতন সত্যসন্ধানের পার্থক্য কবির ভাষায় চমৎকার প্রকাশ পাইয়াছে—

এ নহে মুখর বন-মর্মর গুঞ্জিত
এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে;
এ নহে কুঞ্জ কুন্দ-কুসুমরঞ্জিত,
ফেনহিল্লোল কল-কল্লোলে দুলিছে,
কোথা রে সে তীর ফুল-পল্লব পুঞ্জিত,
কোথা রে সে নীড়, কোথা আশ্রয়-শাখা।

"অসময়" কবিতাটির মধ্যেও অনুরূপ জীবনবোধ প্রকাশ পাইয়াছে। "অজানা নূতনপথের ও গন্তব্যস্থানের ভয়-সংশয়, তাহার গোপন কঠিন আকর্ষণ এবং মানব ও প্রকৃতির সৌন্দর্য-মাধুর্যপূর্ণ এই পরিচিত পৃথিবীর মনোহর মায়া কবির চিত্তে প্রবল সংগ্রামের সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি তীর্থের পথে অবশেষে বাহির হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার গভীর সন্দেহ হইতেছে—তীর্থদেবতার মন্দিরে পৌঁছিতে পারিবেন কিনা…।" [ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য: রবীন্দ্র কাব্য-পরিক্রমা] পশ্চাতের কাব্য-সৌন্দর্যের বহু বর্ণ-বিহ্বল জীবনাদর্শ এবং বৃহতের মহতের সন্ধানের পরিচিত কঠিন পথে চলার সংশয় তাহাকে বিলম্ব করাইয়াছে বহুকাল।

বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি,
এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে।

অবশ্য "দুঃসময়ে" সংকল্পের প্রবলতা ও দুঃসাহস ব্যঞ্জিত, "অসময়ে" ক্লান্তি ও নৈরাশ্যের সুর বড় হইয়া উঠিয়াছে।

প্রভাতে আমায় ডেকেছিল সবে ইঙ্গিতে,
বহুজনমাঝে লয়েছিল মোরে বাছিয়া—

যবে রাজপথ ধ্বনিয়া উঠিল সঙ্গীতে
তখনো বারেক উঠেছিল প্রাণ নাচিয়া।
এখন কি আর পারিব প্রাচীর লঙ্ঘিতে,
দাঁড়ায়ে বাহিরে ডাকিব কাহারে বৃথা সে!

"অশেষ" কবিতায় প্রকাশিত ভাবটিতে দুই বিরোধী অনুভূতির আকর্ষণ লক্ষ্য করিবার মত। এই কবিতায় জীবনদেবতাকে আবার স্মরণ করা হইয়াছে। "চিত্রা"র জীবনদেবতার ঔজ্জ্বল্য ও সর্বব্যাপকতা এখন অনেকটা ফিঁকে হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু দুই প্রতিকূল ভাবনার সন্ধিস্থলে আবার তাঁহার কথা কবির রচনায় স্থান পাইয়াছে। পুরাতন রসসম্ভোগের জগতে "সারাদিন ছিন্ন বাঁধা পলাতক বালকের মত" বাঁশি বাজাইবার দায়িত্ব কবি পাইয়াছিলেন। সে কাজ যেন আজ শেষ হইয়াছে। কবি আজ ক্লান্ত। কিন্তু কবির জীবনদেবতা তাঁহাকে বিশ্রামের ও বৈরাগ্যের সুযোগ দিলেন না। নবতর দায়িত্বভার দিয়া কঠিন কর্মের মধ্যে তাহাকে আহ্বান করিলেন। সেই আহ্বানে সাড়া না দিয়া কবি পারেন না, সব ক্লান্তি জড়িত কণ্ঠে তাঁহাকে জাগ্রত হইতে হয়—

জগতে সবারি আছে সংসার-সীমার কাছে
কোনোখানে শেষ—
কেন আসে মর্মচ্ছেদি সকল সমাপ্তি ভেদি
তোমার আদেশ?
বিশ্বজোড়া অন্ধকার সকলেরি আপনার
একেলার স্থান—
কোথা হতে তারো মাঝে বিদ্যুতের মতো বাজে
তোমার আহ্বান?

একদিক দিয়া দেখিতে গেলে "বৈশাখের" প্রকৃতিবন্দনার মধ্যেও কবি এই নবীন কঠোর বিলাসহীন, যৌবনোচ্ছলতাশূন্য, ক্লান্তিহরা শক্তির আমন্ত্রণই শুনিয়াছেন। বৈশাখের আহ্বানে সন্ন্যাসীর দৃপ্ত সাধনপথের সুর যেন বাজিয়া উঠিয়াছে—

ছাড়ো ডাক, হে রুদ্র বৈশাখ!
ভাঙিয়া মধ্যাহ্নতন্দ্রা জাগি উঠি বাহিরিব দ্বারে
চেয়ে রব প্রাণীশূন্য দগ্ধতৃণ দিগন্তের পারে
নিস্তব্ধ নির্বাক্।

এই কবিতার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রখ্যাত রবীন্দ্র-সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখিয়াছিলেন, "সুখদুঃখ, আশা ও নৈরাশ্যের দ্বারা ক্রমাগত জীবনকে খণ্ডিত করিয়া আপনার দিকে তাহাকে টানিয়া রাখিবার যে বেদনা কবিকে পীড়ন করিতেছিল, সেই আপনার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য সমস্ত 'কল্পনা'র কবিতাগুলির মধ্যে কি কান্না! সেই আপনার সমস্ত- সুখদুঃখের উপরে বৈশাখের রুদ্র-রৌদ্র-বিকীর্ণ, বিস্তীর্ণ বৈরাগ্যের

গেরুয়া অঞ্চল পাতিয়া দিয়া আপনাকে দগ্ধ করিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিবার আকাঙ্ক্ষাই 'হে রুদ্র বৈশাখে'র গম্ভীর ছন্দে প্রকাশ পাইয়াছে।" এই কারণেই কবি বলিয়াছেন—

জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার
লোলুপ চিতাগ্নিশিখা, লেহি লেহি বিরাট অম্বর
নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতস্তূপ বিগত বৎসর
করি ভস্মসার
চিতা জলে সম্মুখে তোমার।

এই ভাবনার একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা "বর্ষশেষ"। কবিতাটির অর্থবিশ্লেষণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজে অনেক কথা বলিয়াছেন—"১৩০৫ সালের বর্ষশেষ ও দিনশেষের মুহূর্তে একটা প্রকাণ্ড ঝড় দেখেছি।...এই ঝড়ে আমার কাছে রুদ্রের আহ্বান এসেছিল। যা-কিছু পুরাতন ও জীর্ণ তার আসক্তি ত্যাগ করতে হবে—ঝড় এসে শুক্‌নো পাতা উড়িয়ে দিয়ে সেই ডাক দিয়ে গেল। এমনি ভাবে চিরনবীন যিনি, তিনি প্রলয়কে পাঠিয়েছিলেন মোহের আবরণ উড়িয়ে দেবার জন্য। তিনি জীর্ণতার আড়াল সরিয়ে দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করলেন। ঝড় থামল্। বললুম—অভ্যস্ত কর্ম নিয়ে এই যে এতদিন কাটালুম, এতে চিত্ত তো প্রসন্ন হলো না। যে আশ্রম জীর্ণ হয়ে যায়, তাকেও নিজের হাতে ভাঙতে মমতায় বাধা দেয়। ঝড় এসে আমার মনের ভিতরে তার ভিতকে নাড়া দিয়ে গেল, আমি বুঝলুম বেরিয়ে আসতে হবে।" কবিতাটি ঝড়ের বর্ণনা হিসাবেও অত্যুৎকৃষ্ট।

ধূসর পাংশুল মাঠ, ধেনুগণ ধায় ঊর্ধ্বমুখে,
ছুটে চলে চাষি।
ত্বরিতে নামায় পাল নদীপথে ত্রস্ত তরী যত
তীরপ্রান্তে আসি।
পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহ্নের পিঙ্গল আভাস
রাঙাইছে আঁখি—
বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায়
উৎকণ্ঠিত পাখি।

কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা আদৌ কবির লক্ষ্য নয়। এই ঝড় তাঁহার নিকট নব-জীবনের প্রতীক হইয়া উঠিয়াছে। কবি আপনার হৃদয়ের দরজা খুলিয়া বাহিরের সব বৃষ্টি-ঝড়কে বুকের মধ্যে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। হৃদয়ের মধ্যে পুরাতনের যাহা-কিছু নিষ্ফল সঞ্চয় আছে তাহাকে কবি আজ ধূলি ও তৃণের মতই উড়াইয়া দিবেন। রস-সৌন্দর্যের জন্য যাহা কিছু পিপাসা সঞ্চিত ছিল অন্তরে ভয়ঙ্করের বেশে জাগ্রত এই নবীন তাহাকে তীক্ষ্ণভাবে বিদ্ধ করিল। "বসন্তের আবেশহিল্লোলে পুষ্পদল চুমি" অথবা "মর্মরিত কূজনে গুঞ্জনে" জীবনে পূর্বে বারংবার দেখা দিয়াছে যে সৌন্দর্যসত্য আজিকার আবির্ভাব তাহা হইতে একেবারে স্বতন্ত্র। ফুলের পাপড়ির পেলব সৌন্দর্য

নয় আর, ফলের পরিপূর্ণতা লইয়া আসিয়াছে ঝড়ের বেশে নিষ্ঠুর নবীন। কবি তাঁহার আহ্বানে সাড়া না দিয়া পারেন না—

হে দুর্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল,
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংসভ্রংশ করি চতুর্দিকে
বাহিরায় ফল,
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ—
প্রণমি তোমারে।

এই নবীন জীবনে পৌঁছিয়া কবি কি করিবেন? "রাত্রি" কবিতার উদাত্ত গম্ভীর ভাষায় কবি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়ানুগ সৌন্দর্য-মুগ্ধতা আর নয়, এবং বিপুল নিঃশব্দ উদ্‌যোগের সহগামী হইতে চাহিয়াছেন কবি। মহাশর্বরীর গাঢ় স্তম্ভিত তমিস্রায়—

পীড়িত ভুবন লাগি মহাযোগী করুণাকাতর,
চকিতে বিদ্যুৎ-রেখা-বৎ
তোমার নিখিললুপ্ত অন্ধকারে দাঁড়ায়ে একাকী
দেখেছে বিশ্বের মুক্তিপথ।

সেখানে—সেই বাক্যহীন জাগ্রত সভার সভাকবি হইবার প্রার্থনা জানাইয়াছেন রবীন্দ্রনাথ।

প্রশ্ন ৩। "কল্পনা" কাব্যের প্রকৃতিবিষয়ক কবিতাগুলি অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথের নিসর্গচেতনার পরিচয় দাও। "কল্পনা" নিসর্গচেতনায় পূর্ববর্তী কাব্যগুলির তুলনায় কোন নূতন সুর লক্ষ্য করা যায় কি না বল।

উত্তর। রবীন্দ্রকাব্যের একটি মূল সুর প্রকৃতি। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে তিনি শুধু অনন্ত সৌন্দর্যের আধার দেখিতে পাইয়াছেন তাহাই নয়, উহার মধ্যে তিনি জীবন্মুক্তির ছন্দ অনুভব করিয়াছেন। জনৈক বিশিষ্ট সমালোচক এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "আয়তনের দিক থেকেও যেমনি, গভীরতায়ও তেমনি প্রকৃতিই কবিজীবনের শ্রেষ্ঠ প্রেরণা।...সৃষ্টির মূল উৎসে হলেন বিশ্বদেবতা, এটি কবিজীবনের একটি গভীর উপলব্ধি। প্রকৃতি এবং মানুষ তারই প্রকাশ। কিন্তু বিশ্বদেবতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা, তার সঙ্গে একাত্মতার গভীর অনুভূতি কবির জীবনে কখনও আসে নি। তাঁর যত কাছেই তিনি গিয়ে থাকুন, নিজের অস্তিত্ব লোপ করে দেওয়ার মতো মনোভাব তাঁর কখনও হয় নি। কিন্তু বিশ্বদেবতার প্রকাশস্বরূপ প্রকৃতির গভীরতায় তাঁর এই রকম আত্মবিলোপের পরিচয় আছে। ভগবদ্ভক্তি তাঁর কাব্যের প্রেরণা, কিন্তু প্রকৃতি তাঁর সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ।...আপনার সমস্ত সত্তা দিয়ে কবি প্রকৃতির দেহে নূতনতর বিকাশের বর্ণ এঁকে দিয়েছেন। প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে তাঁর কবি-জীবনের

আর কোনো আশ্রয় নেই।" [অমিয়কুমার সেন: প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ]। রবীন্দ্রনাথ "ছিন্নপত্রে" প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার আত্মিক ঐক্যের ভাবটিকে উত্তপ্ত ভাষায় ও ঘনিষ্ঠ সুরে প্রকাশ করিয়াছেন। "যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে—সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর করে কাঁপছে।......এই পৃথিবীর সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের যে একটা বহুকালের গভীর আত্মীয়তা আছে নির্জনে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি করে অন্তরের মধ্যে অনুভব না করলে সে কি কিছুতেই বুঝা যায়!"

পূর্বোক্ত মনোভাবের পটভূমিতে "কল্পনা" কাব্যে প্রকৃতি কি রূপ লইয়া ধরা দিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। এই কাব্যে অনেকগুলি কবিতায় প্রত্যক্ষতঃ প্রকৃতি-প্রসঙ্গ স্থান পাইয়াছে। যেমন—"চৈত্ররজনী", "বর্ষামঙ্গল" "শরৎ", "বর্ষশেষ", "ঝড়ের দিনে", "বসন্ত", "বৈশাখ", "রাত্রি"। ইহা ছাড়া—নানা কবিতায় প্রকৃতির নানা চিত্র নানা সূত্রে প্রবেশ করিয়াছে। ইহাদের মুখবন্ধ স্বরূপ "প্রকাশ" নামক কবিতাটির স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

"প্রকাশ" কবিতাটিতে বিশ্বপ্রকৃতি জুড়িয়া যে নিরন্তর প্রেমলীলা চলিয়াছে তাহার কথাই কবি বলিয়াছেন। মৌন গুপ্ত সেই প্রকৃতিলোকের প্রণয় চলিয়াছিল হাজার হাজার বছর ধরিয়া—

হাজার হাজার বছর কেটেছে, কেহতো কহে নি কথা—
ভ্রমর ফিরেছে মাধবীকুঞ্জে, তরুরে ঘিরেছে লতা,
চাঁদেরে চাহিয়া চকোরী উড়েছে, তড়িৎ খেলেছে মেঘে,
সাগর কোথায়·খুঁজিয়া খুঁজিয়া তটিনী ছুটেছে বেগে,
ভোরের গগনে অরুণ উঠিতে কমল মেলেছে আঁখি,
নবীন আষাঢ় যেমনি এসেছে চাতক উঠেছে ডাকি।

একমাত্র কবির চোখেই তাহা ধরা পড়িয়াছিল, মানুষেরা তাহা জানিতে পারে নাই। প্রকৃতির সেই গোপন প্রণয়কথা কবির কাব্যে প্রকাশ পাইল। মানুষের সংযত প্রেম উহার আদর্শে উদ্বেল হইয়া উঠিল। প্রকৃতির ও মানুষের নিগূঢ় সম্পর্ক এবং প্রকৃতির নিকট হইতে মানুষের প্রণয়শিক্ষা রবীন্দ্র প্রকৃতিবোধের একটি মূল বিশ্বাস।

"মানসী" কাব্যের পূর্বে প্রকৃতির সৌন্দর্য-সম্ভোগ কবি করিয়াছেন বিচ্ছিন্নভাবে এবং এবং কতকটা প্রথানুগ রীতিতে। "মানসী"তে এই বিষয়ে কিছু গভীরতর ভাবনা কবির কাব্যে দেখা গিয়াছে। তবুও এই পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ মনস্থির করিতে পারেন নাই। ঐ কাব্যের কোন কোন কবিতায় যেমন জড়প্রকৃতি সম্বন্ধে ভীতি ও সন্দেহ প্রকাশ পাইয়াছে আবার কোন কোন কবিতায় মাতৃরূপা মমতাময়ী প্রকৃতির বন্দনা তিনি গাহিয়াছেন। "সোনারতরী" হইতে প্রকৃতিকে সচেতন শক্তিরূপে, কল্যাণীরূপে, সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তির প্রতীক এবং আত্মার আত্মীয়রূপে কবি নিশ্চিতভাবে

অনুভব করিয়াছেন। এই অনুভূতিতে আর কোনরূপ বিঘ্ন ঘটে নাই। জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত এই উপলব্ধি অটুট ছিল।

তবুও "কল্পনা"'র প্রকৃতিরূপে ঐ বিশ্বাসের মধ্যেই একটি নূতন মূর্তি লক্ষ্য করি। সচরাচর তিনি প্রকৃতির শান্তরূপের উপাসক। এই কাব্যে কিন্তু রুদ্র, কঠোর ও গম্ভীর রূপ বারবার প্রকাশ পাইয়াছে। দুই একটি কবিতায় মাত্র নয়, অনেকগুলি কবিতায় এই রূপটি শিল্পসফলতার সহিত প্রকাশ পাইয়াছে। যেমন,

(১) ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে
বাধা বন্ধ হারা।

অথবা,
পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহ্নের পিঙ্গল আভাস
রাঙাইছে আঁখি,
বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায়
উৎকণ্ঠিত পাখি। (—বর্ষশেষ)

(২) ধুলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক—
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ। (—বৈশাখ)

(৩) তোমার তিমিরতলে যে বিপুল নিঃশব্দ উদ্‌যোগ
ভ্রমিতেছে জগতে জগতে
আমারে তুলিয়া লও, সেই তার ধ্বজচক্রহীন
নীরবঘর্ঘর মহারথে। (—রাত্রি)

পূর্ববর্তী কোন একটি কাব্যের বহুসংখ্যক কবিতায় গম্ভীর ও রুদ্র প্রকৃতির রূপ এইভাবে ধরা পড়ে নাই।

"কল্পনা" কাব্যের প্রকৃতিচেতনার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল ইহার অতীতাশ্রয়ী রূপ-সম্ভোগ। ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্যের যুগে বিশেষ করিয়া কালিদাসের কাব্য-সম্ভারের মধ্য হইতে প্রকৃতি-প্রসঙ্গ এবং তৎসংশ্লিষ্ট উপমাদি ও রূপকল্প সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাহার স্বাদবৈচিত্র্য দূরত্বের তথা বিরহ-বিচ্ছিন্ন বেদনার সূত্রে ধরিয়া রাখিয়াছেন। "বর্ষামঙ্গল" কবিতাটিকে ইহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন রূপে গণ্য করা যাইতে পারে। যেমন—

স্নিগ্ধসজল মেঘকজ্জল দিবসে
বিবশ প্রহর অচল আলস আবেশে।
শশিতারাহীন অন্ধতামসী যামিনী
কোথা তোরা পুরকামিনী।
আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে,
জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে,
চমকে দীপ্ত দামিনী।

প্রভৃতি চরণগুলি কালিদাসের "মেঘদূতে"র নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকের কথা অবশ্য স্মরণ করাইয়া দেয়—

গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং
রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচি ভেদ্যৈস্তমোভিঃ।
সৌদামন্যা কনকনিকষস্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্বীং
তোয়োৎসর্গস্তনিতমুখরো মাস্ম ভূর্বিক্লবাস্তাঃ॥

'শ্যাম গম্ভীর সরসা' 'নবযৌবনা বরষা'র যে বর্ণনা কবি করিয়াছেন তাহাতে 'উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে' এবং 'গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে'—তাহা ঠিক বাংলা দেশের বর্ষা নহে। উহা বহু যুগের ওপার হইতে কবির মনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। "স্বপ্ন" কবিতায় প্রিয়ার সজ্জার উপাদানরূপে লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম, কুন্দকলি ও কুরুবকের যে আয়োজন কবি করিয়াছেন তাহা প্রাচীন কাব্যধৃত প্রকৃতি-প্রসঙ্গ হইতে আহৃত। অথবা প্রকৃতি বিষয়ক নিম্নোদ্ধৃত কল্পচিত্র কালিদাস-প্রমুখ প্রাচীন কবিদের কথাই স্মরণ করায়—

কী কথা উঠে মর্মরিয়া বকুলতরু-পল্লবে,
ভ্রমর উঠে গুঞ্জরিয়া কী ভাষা।
ঊর্ধ্বমুখে সূর্যমুখী স্মরিছে কোন্ বল্লভে
নির্ঝরিণী বহিছে কোন পিপাসা।

(—মদনভস্মের পর)

"কল্পনা" কাব্যের প্রকৃতিবোধের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ডঃ অমিয়কুমার সেন লিখিয়াছেন, "ঋতুবর্ণনা রবীন্দ্রনাথের কাব্যযাত্রার পথে পথে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রয়েছে। কিন্তু কল্পনা কাব্যেই বোধহয় সর্বপ্রথম ঋতুগুলিকে পুরুষ বা নারীরূপে আঁকবার সচেতন এবং সফল প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যাবে। বর্ষাকে নবযৌবনা নারীরূপে, বসন্তকে পীতাম্বর পরিহিত যৌবনের রূপে এবং বৈশাখকে পিঙ্গল-জটাধারী রুদ্র সন্ন্যাসীরূপে কল্পনা করে কবি তাদের নূতন করে সৃষ্টি করেছেন।" [প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ]। আরও পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঋতুপর্যায়ের অন্তরালে রুদ্র নটরাজের প্রলয় নৃত্যের কল্পনা করিয়াছেন। সে বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে গিয়া কবি স্বয়ং বলিয়াছেন, যে নটরাজের নৃত্যের তালে তালে প্রকৃতিতে নূতন ঋতুর আগমন ঘটে, পুরাতন ঋতু তাহার পত্রপল্লব লইয়া ঝরিয়া পড়ে। নটরাজের এক পা প্রকৃতিতে, অন্য পায়ের তাল পড়ে মানবচিত্তে। ফলে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তলোকে নূতন ভাব নূতন প্রেম জাগিয়া উঠে। কল্পনা কাব্য রচনার কালে ঋতুচক্র সম্পর্কিত এই ধারণাটি কবির মনে স্পষ্ট হইয়া ওঠে নাই। কিন্তু ইহার পূর্বাভাস এই কাব্যেই প্রথম কতকটা মিলিল।

গ্রীষ্ম প্রকৃতির মধ্যে কবি এক রুদ্র সন্ন্যাসীর রূপের কল্পনা করিয়াছেন। পূর্ব-বৎসরের সৌন্দর্যোপভোগের ফলে জমিয়া ওঠা গ্লানি দূর করেন তিনি। ঠিক এই রূপ ও

ভাবটিই "বৈশাখ" কবিতায় জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। "দীপ্তচক্ষু শীর্ণ সন্ন্যাসী" বৈশাখকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিয়াছেন—

জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার
লোলুপ চিতাগ্নিশিখা, লেহি লেহি বিরাট অম্বর,
নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতস্তূপ বিগত বৎসর
করি ভস্মসার।

গ্রীষ্মের "প্রাণীশূন্য দগ্ধতৃণ দিগন্তের" যে বাহ্য ছবি কবিতাটিতে ধরা পড়িয়াছে তাহা একান্তভাবে বঙ্গপ্রকৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট।

কবির বর্ষাকল্পনার মূল সুর হইল "তপের তাপের বাঁধন কাটুক রসের বর্ষণে"। গ্রীষ্মের দাহ যেমন শান্ত হয়, তেমনি সর্ব-ইন্দ্রিয়রুদ্ধ সন্ন্যাসীর কৃচ্ছ্রতামূলক তপস্যার উপরে জয়ী হয় মানুষের প্রেমব্যাকুল হৃদয়ার্তি। "বর্ষামঙ্গল" কবিতায় নিবিড় বর্ষায় প্রণয়তৃষ্ণার ভাবটিই প্রকাশ করা হইয়াছে। তবে এ কবিতায় বর্ষার রূপটি যেন প্রাচীন কাব্যাদি হইতে সংকলিত—বাংলা দেশের বর্ষার বাস্তব ছবিটি যেন এই কবিতায় ধরা পড়ে নাই।

অপরপক্ষে "শরৎ" কবিতাটিতে বাংলাদেশের পল্লীপ্রকৃতির একটি সহজ সরল রূপ প্রকাশ পাইয়াছে।

মাতার কণ্ঠে শেফালি মাল্য
গন্ধে ভরিছে অবনী।
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত
শুভ্র যেন সে নবনী।

এ যেন শরতের চিরকালীন বঙ্গজননীর ছবি। কিন্তু শরৎঋতুর সহিত অবকাশের একটি মূল ভাব কবি জড়াইয়া দিয়াছিলেন। বর্তমান কবিতাটিতে তাহার চিহ্ন মেলে না। ইহা বাহিরের প্রকৃতিরূপের ছবিতেই সমাপ্ত।

"বসন্ত" কালের যে ছবি কাব্যটিতে স্থান পাইয়াছে তাহার সহিত যুগযুগান্তরের প্রেমোন্মাদনার সম্পর্ক কবি আবিষ্কার করিয়াছেন—

সখা, সেই অতিদূর সদ্যোজাত আদি মধুমাসে
তরুণ ধরায়
এনেছিলে যে কুসুম ডুবাইয়া তপ্ত কিরণের
স্বর্ণ মদিরায়,
সেই পুরাতন সেই চিরন্তন অনন্ত প্রবীণ
নব পুষ্পরাজি
বর্ষে বর্ষে আনিয়াছ—তাই লয়ে আজো পুনর্বার
সাজাইলে সাজি।

"আনন্দের প্রগল্‌ভ লীলায়, নবযৌবনের ক্ষ্যাপামির তরঙ্গে ফুলে ফুলে, শোভা থেকে নূতন সুষমায় বসন্ত কেবলি আপনাকে নিঃশেষ করিয়া দিতে থাকে।" এই ভাবটি

"কল্পনা" কাব্যে ধৃত কবিতাটিতে স্থান পাইয়াছে। বসন্ত ঋতু মদনদেবের ব্যক্তি-মূর্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে।

"বর্ষশেষ" কবিতার অবলম্বন বাংলা দেশের কালবৈশাখীর ঝড়। উহার বাস্তব চিত্রটি এখানে প্রাণবন্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু উহার মধ্যে একটি নিগূঢ় ঋতুভাবনার বীজও রহিয়াছে। সারা বৎসরের জমিয়া থাকা ভোগের ক্লান্তি দূর করে এই ঝড়, নবভাব, নবজীবনের আহ্বান আনে।

ইহার পরে আবার আসে সংযমের আত্মশাসন ও কঠোরের তপস্যার কাল গ্রীষ্ম।

"কল্পনা" কাব্যে ঋতুচক্রের একটু আভাসে রবীন্দ্রভাবনার সূত্রটি পাঠ করা যায়।

প্রশ্ন ৪। "একদিকে রূপজগতের বিচিত্র উপভোগ অন্যদিকে সে জগৎ ত্যাগ করিয়া কঠোর কর্মে ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইবার আহ্বান এবং ইহার মধ্যে পড়িয়া কবি-হৃদয়ের ব্যাকুলতা—কল্পনা কাব্যের ইহাই মূল সুর।" এই মন্তব্যটির তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও। তুমি কি উহাকে "কল্পনা'র মূল সুর বলিয়া মনে কর?

উত্তর ঃ রবীন্দ্রকাব্যে পর্বে পর্বে নূতন জীবনোপলব্ধি এবং সৌন্দর্য-চেতনা প্রকাশ পাইয়াছে। দীর্ঘকাল একটি ভাববৃত্তে নিমজ্জিত থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ফলে বৈচিত্র্য এবং পরিবর্তনের ধারা তাঁহার কাব্যপ্রবাহে লক্ষ্য করা যায়। "সোনারতরী" কাব্য হইতেই রবীন্দ্র-রচনায় মর্ত্য জীবনের প্রতি গাঢ় আসক্তি, রূপরসগন্ধের উপভোগ গাঢ় বর্ণে ও আবেগঘন রূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। "সোনারতরী" হইতে "ক্ষণিকা পর্যন্ত মূল সুরটি রূপ উপভোগের। "খেয়া" কাব্যে প্রকৃতপক্ষে অরূপানুভূতির একটি আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার সূত্রপাত। কিন্তু উহার পূর্বেই কবি রূপজগৎ হইতে মাঝে মাঝেই বিদায় লইতে চাহিয়াছেন। "চিত্রা" কাব্যের "এবার ফিরাও মোরে" কবিতার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে। পলাতক বালকের মত কর্ম হইতে দূরে সৌন্দর্য-সাধনার এই যে বাঁশী তিনি বাজাইতেছেন তাহার জন্য একটু অপরাধবোধ যেন কবিকে পীড়িত করিয়াছে। নিজেকে আহ্বান জানাইয়াছেন, "ওরে তুই ওঠ আজি, আগুন লেগেছে কোথা, কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি, জাগাতে জগৎজনে।" উহার ফলশ্রুতি যাহাই হউক না কেন, এই জাগ্রত হইবার বাসনা, সৌন্দর্যধ্যানের বিপরীত মেরুতে স্থাপিত কর্মলোকের প্রেরণাটি লক্ষ্য করিবার মত। অবশ্য "চিত্রা" কাব্যে এই আহ্বান সাময়িক বলিয়া মনে হয়। কবি মূলতঃ সৌন্দর্য-তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করিয়াছেন, জীবনদেবতা তত্ত্বের মধ্যে রূপসাধনার ও জীবনসাধনার একটি মিল খুঁজিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই জগৎ ছাড়িয়া যাইবার আমন্ত্রণ যথার্থ গভীর হইয়া দেখা দিয়াছে 'কল্পনা" কাব্যে আসিয়া। "কল্পনা" কাব্যটি বিশ্লেষণ করিলে যুগপৎ দুইটি সুরের অস্তিত্ব অনুভব করা যাইবে। কল্পনায় রূপজগতের মোহ, সৌন্দর্য-উপভোগের ইন্দ্রিয়ানুগ রীতি পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। পাশা-পাশি এমন কবিতার সংখ্যাও বড় কম নয় যেখানে অন্তর জগতে প্রবেশ করিবার আকাঙ্ক্ষা আছে। অবশ্য কল্পনায় এই অন্য জগৎটি নিশ্চিতভাবেই অধ্যাত্ম-উপলব্ধির জগৎ নয়। কিন্তু একটি তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারা কবিচিত্ত সর্বদা

ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। ফলে কোন কোন কবিতায় বিষণ্ণতা, কখনও ব্যাকুলতা, আবার খনও হতাশা প্রকাশ পাইয়াছে।

"কল্পনা" কাব্যে কবিচিত্তের এই দ্বিমুখী সুরের দ্বন্দ্বজাত আভ্যন্তর ব্যাকুলতা মুখবন্ধের কবিতা দুঃসময়ে গাঢ়বর্ণে এবং ধ্বনিঝঙ্কৃত ভাষায় প্রকাশিত। যে নূতন জীবনবোধের মধ্যে কবিহৃদয় উড়িয়া যাইতে চাহিতেছে তাহাতে স্নেহমোহের বন্ধন নাই, গৃহ নাই, ফুলশেজ রচনা নাই, শুধু আছে অনন্ত আকাশ আর উড়িয়া চলিবার ডানা। যে রোমান্টিক জগতে কবির তখনও অবস্থান তাহার সাহায্যেই কবি বুঝাইয়াছেন আর সে জীবন নয়, অন্য কিছু তিনি চাহিতেছেন—

এ নহে মুখর বনমর্মরগুঞ্জিত,
এ যে অজগর-গরজে সাগর ফুলিছে ;
এ নহে কুঞ্জকুন্দকুসুমরঞ্জিত,
ফেন হিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে।
কোথা রে সে তীর ফুলপল্লবপুঞ্জিত,
কোথা রে সে নীড়, কোথা আশ্রয়শাখা!
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

কবি "বনমর্মরগুঞ্জিত", "কুন্দকুসুমরঞ্জিত" যে "কুঞ্জে"র কথা বলিয়াছেন, "ফুলপল্লবপুঞ্জিত" যে "তীর", যে "নীড", যে "আশ্রয়শাখা"র কথা বলিয়াছেন তাহার বিস্তৃত পরিচয় রহিয়াছে অনেকগুলি কবিতায়। কল্পনা কাব্যে বিশেষ করিয়া প্রাচীন ভারতীয় পরিবেশে কল্পনাবলে প্রবেশ করিয়া তাহার সৌন্দর্যস্বাদ লাভের চেষ্টা লক্ষ্য করিবার মত। প্রাচীন ভারতের যে স্বাদ তিনি পাইতে চাহিয়াছেন তাহা প্রধানতঃ কালিদাসাদির কাব্য-নাট্যে ধৃত জীবনের রূপ। এই রূপজগতের প্রতি আকর্ষণ তাঁহার পূর্ববর্তী বহু কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। "মানসী"র "মেঘদূত", "চিত্রা"র "বিজয়িনী", "আবেদন" প্রভৃতি কবিতায় উহার চমৎকার নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু "কল্পনা"র "চৌরপঞ্চাশিকা", "বর্ষামঙ্গল", "মদনভস্মের পূর্বে", "মদনভস্মের পরে", "স্বপ্ন", "প্রকাশ", "ভ্রষ্টলগ্ন", "বসন্ত" প্রভৃতি অনেকগুলি কবিতায় প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত কাব্যজগতে সৌন্দর্যসন্ধান বিষয়বস্তুরূপে অবলম্বিত।

"বর্ষামঙ্গল" কবিতায় কবি কেকাকলরবে মুখর, নীল-অরণ্য-শিহরিত, নিখিলচিত্তহরষা যে বর্ষার বর্ণনা দিয়াছেন তাহা বাংলা প্রকৃতির নহে। তাহার সহিত "মেঘদূত" প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যকল্পনার বহু বর্ণবিহ্বল এবং ঝঙ্কারতরঙ্গিত ছবি ও সুর প্রকাশ পাইয়াছে।—

কেতকী কেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।

তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবনশিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া··· ।

এইরূপ অধিকাংশ স্তবকেই নূতনের পাত্রে পুরাতনের রস পান করান কবি। ইহার প্রতিটি ভাবসঙ্কেত "মেঘদূত" ও "গীতগোবিন্দে"র রূপ ও সঙ্গীতলোকে পাঠকদের নিয়ে যায়। "মদনভস্মের পূর্বে" এবং "মদনভস্মের পর" কবিতা দুইটি "কুমারসম্ভব" কাব্যের কথা মনে করাইয়া দেয়। অবশ্য শেষোক্ত কবিতাটিতে প্রাচীনের পাত্রে নবীন ভাব-রসের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন কবি। কামদেবতাকে ভোগবাসনার ঊর্ধ্বলোকে দেহাতীত ইন্দ্রিয়াতীত অনির্বচনীয়তায় রূপান্তরিত করা হইয়াছে। এই জাতীয় কবিতাগুলির মধ্যে "স্বপ্ন" কবিতাটি রচনানৈপুণ্যে এবং বেদনার গাঢ় উপলব্ধিতে অতি উচ্চাঙ্গের সৃষ্টিরূপে গণ্য হইতে পারে। কবি উত্তরমেঘে বর্ণিত অলকাপুরীর অনন্ত যৌবনা যক্ষরমণীদের আদর্শে তাঁহার মানসী-প্রেয়সীকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার হাতে লীলাপদ্ম, লোধ্ররেণু সে মুখে মাখিয়াছে, কেশে পরিয়াছে কুরুবক, সিঁথিতে কদম্বকোরক এবং কর্ণে শিরীষফুল। শিপ্রাতীরে উজ্জয়িনীতে কবি স্বপ্নাবেশে প্রয়াণ করিয়াছেন এবং পূর্বজনমের প্রথমা প্রেয়সীর সন্ধান পাইয়াছেন। এই স্বপ্ন-চারণা এবং প্রাচীন সৌন্দর্যের উপভোগ কবিতাটির ভাষা ও শব্দচিত্রের রক্তিম উত্তাপে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু কবিতাটি শুধু বহিরঙ্গ ইন্দ্রিয়োপভোগে সমাপ্ত নয়। প্রাচীন কালের শোভাসৌন্দর্যশুচিতা, সেই বর্ণবিহ্বলতা, গাঢ় রক্তরাগ বাস্তব জীবনে আর মিলিবে না—ইহার সুনিশ্চিত অনুভবের ফলে একটা গভীর হৃদয়ার্তি এই কবিতায়ই ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বপ্নে যাহাকে কবি পাইলেন তাহার ভাষা, তাহার নাম পর্যন্ত আর মনে করিতে পারিলেন না।

"বসন্ত" কবিতায় কবি চিরকালের অনঙ্গদেবকে স্মরণ করিয়াছেন। তাহার আমন্ত্রণে বিশ্বব্যাপী যে চাঞ্চল্য যে প্রণয়োন্মাদনার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার রূপ আঁকিয়াছেন। এই রূপায়নেও প্রাচীন ও চিরন্তন যেন সমন্বিত হইয়াছে। বসন্ত ঋতু যেন কামদেবের সহিত একাকার হইয়া গিয়াছে।

অযুত বৎসর আগে হে বসন্ত, প্রথম ফাল্গুনে
মত্ত কুতূহলী
প্রথম যেদিন খুলি, নন্দনের দক্ষিণ-দুয়ার
মর্তে এলে চলি,
অকস্মাৎ দাঁড়াইলে মানবের কুটির প্রাঙ্গণে
পীতাম্বর পরি,
উতলা উত্তরী হতে উড়াইয়া উন্মাদ পবনে
মন্দার মঞ্জরী,
দলে দলে নরনারী ছুটে এল গৃহদ্বার খুলি
লয়ে বীণাবেণু—

মাতিয়া পাগল নৃত্যে হাসিয়া করিল হানাহানি
ছুঁড়ি পুষ্পরেণু।

কন্তু এই মদিরবিহ্বল ও কামনোচ্ছল সৌন্দর্য-ভোগে রবীন্দ্রনাথ আজ আর নিশ্চিত থাকিতে পারিতেছেন না। তাই "বসন্তের" কাছাকাছি মদনভস্মের দেবতারূপে রুদ্র সন্ন্যাসী "বৈশাখে"র উদ্বোধনী গাহিয়াছেন কবি। তাহার রূপ বৈরাগ্যের, সর্ববিধ ভোগলালসার গ্লানি মুহূর্তে নিবারণ করিবার।

রুদ্র নূতন আহ্বান জানাইয়াছেন। ফুলপল্লবপুঞ্জিত, কুন্দকুসুমরঞ্জিত সৌন্দর্যমোহের নীড়টি ছাড়িয়া আসিতে হইবে। সম্মুখে গহন কালো রাত্রি, অনন্ত আকাশে কোথাও আশ্রয়ের ইঙ্গিতটুকু নাই। স্নেহমোহবন্ধন, ফুলশেজ রচনা হইতে আজ বিদায় লইয়া কবির চিত্তবিহঙ্গ সব আশা কামনা বিসর্জন দিয়া ছুটিয়া চলিবে সেই অনন্তের অভিমুখে—

আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ-অঙ্গন
উষা-দিশা-হারা নিবিড়-তিমির-আঁকা—
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা।

কবি ভাবিয়াছিলেন দীর্ঘকাল ধরিয়া সৌন্দর্যলোকের যে তান তিনি ধরিয়া আসিয়াছেন, রূপজগতের যে বর্ণঘনমূর্তি তিনি শব্দভাত করিয়াছেন, এইবার তাহা হইতে মুক্তি মিলিবে। এইবার তাঁহার অবকাশ। কিন্তু কবির চিত্তনিয়ন্ত্রণী শক্তি অবকাশ দিলেন না তাঁহাকে। বিশ্রামের কোন অধিকার তাঁহার নাই। আবার নূতন পথে নূতন উত্তেজনায় বাহির হইয়া পড়িবার জন্ম তাঁহার নিকট আহ্বান আসিয়াছে। "অশেষ" কবিতায় এই ভাবটিই কবি প্রকাশ করিয়াছেন।

নূতনের স্বরূপ উপলব্ধি, তাহার রুদ্ররূপে আগমন, এবং পুরাতনের সব বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্ম কবিহৃদয়ের সুতীব্র আগ্রহ সর্বাপেক্ষা সার্থকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে "বর্ষশেষ" কবিতায়। এই কবিতাটি রচনা সম্পর্কে কবি নিজেই লিখিয়াছিলেন, "১৩০৫ সালে বর্ষশেষ ও দিনশেষের মুহূর্তে একটা প্রকাণ্ড ঝড় দেখেছি।...এই ঝড়ে আমার কাছে রুদ্রের আহ্বান এসেছিল। যা-কিছু পুরাতন ও জীর্ণ তার আসক্তি ত্যাগ করতে হবে—ঝড় এসে শুকনো পাতা উড়িয়ে দিয়ে সেই ডাক দিয়ে গেল। এমনি ভাবে চিরনবীন যিনি, তিনি প্রলয়কে পাঠিয়েছিলেন মোহের আবরণ উড়িয়ে দেবার জন্যে। তিনি জীর্ণতার আড়াল সরিয়ে দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করলেন। ঝড় থামল। বললুম—অভ্যস্ত কর্ম নিয়ে এই যে এতদিন কাটালুম, এতে চিত্ত তো প্রসন্ন হলো না। যে আশ্রয় জীর্ণ হয়ে যায়, তাকেও নিজের হাতে ভাঙতে মমতায় বাধা দেয়। ঝড় এসে আমার মনের ভিতরে তার ভিতকে নাড়া দিয়ে গেল, আমি বুঝলুম বেরিয়ে আসতে হবে।" কবি মহান ভাবকল্পনায় সমুন্নত এক মহাজীবনকে কামনা করিতেছেন। এতদিন পুষ্পপেলব সৌন্দর্য জগতে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। এইবার তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া চরম ফলশ্রুতি প্রকাশ পাইবে। সত্য বাহিরে

আত্মপ্রকাশ করিবে। এতকাল যাহাকে পরম সাধনার ধন বলিয়া মনে করিতেন তাহার মোহবন্ধন মুক্ত হওয়া বড় সহজ নহে। তাহাতে হৃদয়ে বড় বেদনা উপস্থিত হয়। কবি সেই বেদনা সহ্য করিয়াও প্রবল নিষ্ঠুর নূতনকে বরণ করিবেন—

হে দুর্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল।
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে
বাহিরায় ফল—
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ
প্রণমি তোমারে।

"কল্পনা" কাব্যে এই দুই ভাববৃত্তের আভ্যন্তর দ্বন্দ্বটাই বড় কথা। এই নবীন সত্যের যথার্থ রূপ কবিচিত্তে ঠিকভাবে যেন ধরা পড়িতেছে না। আসলে একটা বিষণ্ণতায় চিত্ত ভরিয়া উঠিতেছে। রবীন্দ্রনাথের আদি সমালোচকদের অন্যতম অজিত-কুমার চক্রবর্তী বলিয়াছেন, 'চিত্রা', 'সোনারতরী'র জীবনের কাছে বিদায়। এখন নূতন জীবনের যাত্রায় পক্ষবিস্তার করিয়া দিতে হইবে, কিন্তু হায়, কোন্ পথে কোন্ ভাবলোকে যে নূতন করিয়া উড়িতে হইবে তাহার কোনো ঠিকানা নাই।...বাস্তবিক বড় একটি সকরুণ বিষাদের সঙ্গে কল্পনায় বার বার পিছন ফিরিয়া গতজীবনের সমস্ত প্রিয় জিনিসগুলির দিকে কবিকে তাকাইতে হইতেছে।"

প্রশ্ন ৫। "কল্পনা" কাব্যে বঙ্গজননীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপক যে কবিতাগুলি আছে সাধারণ স্বাজাত্যবোধক কবিতার সহিত উহাদের তুলনা কর। ইহাদের কাব্যোৎকর্ষের পরিমাণ নির্ণয় কর।

উত্তর ঃ রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় ১৩০৭ অব্দে কল্পনা কাব্যটি প্রকাশ করেন। উহার কিছুকাল আগে কবিতাগুলি রচিত হইয়াছে। তখন ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ এবং তৎসংশ্লিষ্ট জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সূচিত হয় নাই। একটা বৃহৎ স্বাজাত্যবাদী আন্দোলনের মধ্যে সমগ্র জাতি চঞ্চল হইয়া উঠে নাই। তবে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ জুড়িয়া দেশ ও জাতির প্রতি গভীর ভালোবাসামূলক সৃষ্টিশীল রচনা পাওয়া যাইতেছে এবং হিন্দুমেলা জতীয় নানাবিধ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে "কড়ি ও কোমল" এবং "মানসী" তে জাতিপ্রেমমূলক কিছু কবিতা স্থান পাইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই ব্যঙ্গাত্মক। ছদ্ম জাতীয়তার আস্ফালনকে কবি নির্মম ভাবে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। অপর কোনো প্রসঙ্গে কবিতা বা গদ্য রচনায় রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ এতটা তীব্র হইয়া উঠে নাই। পাশাপাশি গানের মধ্যে কবির স্বদেশপ্রেমের আর একটি রূপ মিলিতেছে। কবি বঙ্গজননীর একটি পবিত্র কোমল স্নেহবিগলিত মাতৃমূর্তির কল্পনা করিয়াছেন। "কল্পনা" কাব্যে দেশপ্রেমমূলক

কবিতা ও গান অনেকগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে। "আশা", "বঙ্গলক্ষ্মী", "শরৎ", "মাতার আহ্বান", "ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ", "সে আমার জননী রে", "ভারতলক্ষ্মী", "উন্নতিলক্ষণ", প্রভৃতি কবিতা একটি সঙ্কলনে স্থান পাওয়ায় "কল্পনা" কাব্যে ইহা একটি বিশিষ্ট আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

উল্লিখিত কবিতাগুলির মধ্যে "উন্নতিলক্ষণ" ব্যঙ্গধর্মী কবিতা। ইংরেজ প্রভুদের প্রতি অতিরিক্ত আনুগত্য, জাতীয় মনীষীদের সম্পর্কে ঔদাসীন্য, ভক্তিপ্রণতচিত্তে সাহেব-সেবা, নিজ ভাষার প্রতি অবহেলা, সর্বরকমে বিদেশীয়ানা চালচলনের অনুসরণ, হিন্দুধর্মকে বৈজ্ঞানিক বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ব্যঙ্গবিদ্ধ হইয়াছে। যেমন—

গেল যে সাহেব ভরি দুই জেব
করিয়া উদর পূর্তি,
এঁরা বড়োলোক করিবেন শোক
স্থাপিয়া তাহারি মূর্তি।

কখনও কখনও ব্যঙ্গের সুর তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। সেখানে দ্বিজেন্দ্রলালের "হাসির গানে"র ভাষারীতির ও বাচনভঙ্গীর সহিত ইহাদের সাদৃশ্য অনুভব করা যায়—

লোকটি কে ইনি, যেন চিনি চিনি,
বাঙালী মুখের ছন্দ—
ধরনে ধারনে অতি অকারণে
ইংরাজি-তরো গন্ধ!
কালিয়া-বরন, অঙ্গে পরন
কালো হ্যাট কালো কুর্তি,
যদি নিজদেশী কাছে আসে ঘেঁষি
কিছু যেন কড়ামূর্তি!
ধুতি পরা দেহ দেখা দিলে কেহ
অতিশয় লাগে লজ্জা,
বাংলা আলাপে রোষে সন্তাপে
জ্বলে ওঠে হাড় মজ্জা!

এঁরাই স্বদেশীয় প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য—এই কথা ভাবিয়া কবি লজ্জিত হইয়াছেন।

অন্য কবিতা ও গানগুলির মধ্যে বঙ্গ দেশের একটি মাতৃমূর্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন কবি। বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" গানের প্রভাব এই কল্পনার উপরে কার্যকর হইয়াছে। কিন্তু বঙ্কিম-কল্পনায় যাহা একটা বৃহৎ আইডিয়া, নিত্যকার ঘরসংসারের মধ্যে যাহা সীমাবদ্ধ নয়, রবীন্দ্রনাথে তাহাই সংসারের অতি পরিচিত রমণীর সহিত সংশ্লিষ্ট। এই বাস্তব গৃহরমণীর মূর্তিটিই ক্রমে বৃহৎ ব্যাপক হইয়া সমগ্র জাতির দেশজননী হইয়া উঠিয়াছেন।—

তোমার মাঠের মাঝে, তব নদীতীরে,
তব আম্রবন ঘেরা সহস্র কুটিরে,
দোহনমুখর গোষ্ঠে, ছায়াবটমূলে,
গঙ্গার পাষাণঘাটে দ্বাদশ দেউলে,
হে নিত্যকল্যাণী লক্ষ্মী, হে বঙ্গজননী,
আপন অজস্র কাজ করিছ আপনি
অহর্নিশি হাস্যমুখে।

রবীন্দ্র-কল্পনায় বঙ্গজননীর একদিকে বাঙালীর রমণী, রক্তমাংসের বাস্তব গৃহলক্ষ্মী, অন্যদিকে বাংলাদেশের প্রকৃতি—

মাতার কণ্ঠে শেফালি মাল্য
গন্ধে ভরিছে অবনী।
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত
শুভ্র যেন সে নবনী।

ইহাকে জড়াইয়া এবং ইহাকে ছাড়াইয়া বঙ্গজননী প্রকাশিত। তিনি সমগ্র জাতির মঙ্গল বিধান করেন। তিনি একটি অতিশায়িত শক্তিরূপময়ী। কিন্তু তিনি বাঙালীর বাস্তব জীবনের প্রতিভূও।

বাঙালীর বর্তমান হীনাবস্থা ও শক্তিহীন দরিদ্ররূপ, তাহার দেশভক্তিহীন বক্তৃতাসর্বস্বতা কবির চোখে পড়িয়াছে। তিনি উহাতে প্রতিবাদ না করিয়া পারেন নাই। দেশকে ভালবাসিয়াই দেশের উন্নতি করা সম্ভব। এই বিশ্বাস কবির গান ও কবিতাগুলির মধ্যে দৃপ্ত কণ্ঠে প্রকাশ পাইয়াছে। দুঃখ দারিদ্র্যকে ঘৃণা করিলে চলিবে না।

তোমার যা দৈন্য মাতঃ তাই ভূষণ মোর

কবি দেশের যাহা কিছু আছে তাহাই ভক্তিভরে গ্রহণ করিবেন, বিদেশের নিকট ভিক্ষার ঝুলিটি তুলিয়া ধরিবেন না—

পুণ্য হস্তে শাক অন্ন তুলে দাও পাতে
তাই যেন রুচে,
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে
তাহে লজ্জা ঘুচে।

এই গভীর স্বদেশপ্রীতিই কবিতাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহার মধ্যে পরাধীনতার জন্য বেদনাবোধ আছে, বিদেশীদের প্রতি মুখোপেক্ষীদের মনে স্বদেশপ্রেম সঞ্চারের বাসনা আছে। পরবর্তীকালের অনেকের কবিতায় স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলার যে প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় এখানে তাহা নাই। জাতির অতীত গৌরবের জন্য মহিমা কীর্তনও এ কাব্যে লক্ষ্য করা যায় না। "নৈবেদ্যে" সেই ভাবটি খুব প্রবল হইয়া উঠে আরও কিছু পরবর্তীকালে।

"কল্পনায়" কবি অবশ্য নিষ্ক্রিয় দেশবন্দনায় গান মাত্র করেন নাই। তিনি মাতৃকায় হইয়া জাতিকে ঘরে ফিরিবার আহ্বান জানাইয়াছেন—

বারেক তোমার দুয়ারে দাঁড়ায়ে
ফুকারিয়া ডাকো জননী।
প্রান্তরে তব সন্ধ্যা নামিছে
আঁধারে ঘেরিছে ধরণী।
ডাকো "চলে আয়, তোরা চলে আয়,"
ডাকো সকরুণ আপন ভাষায়
সে বাণী হৃদয়ে করুণা জাগায়,
বেজে ওঠে শিরা ধমনী।

প্রশ্ন ৬। কল্পনা কাব্যের ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য লইয়া আলোচনা কর। কাব্যটিকে উপভোগ্য করিয়া তুলিতে এবং কবির ভাবকল্পনাকে যথাযোগ্যভাবে প্রকাশ করিতে উহার সাফল্যের পরিমাণ নির্ণয় কর।

উত্তর : বড় কবির ভাবোপলব্ধি এবং রূপরচনা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহে পর্বে পর্বে ভাবকল্পনা যেমন অগ্রসর হইয়াছে, রূপরচনারও তেমনি যথা-যোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কল্পনা কাব্যের রূপরীতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই যে কথাটি মনে রাখা দরকার তাহা হইল সোনার তরী হইতে ক্ষণিকা পর্যন্ত কবির কাব্য গ্রন্থগুলি মূলতঃ একটি ভাববৃত্তে আবর্তিত। উহা হইল মর্ত্য জীবনের সৌন্দর্য সম্ভোগ। অবশ্য এই সৌন্দর্য সম্ভোগ নিশ্চিত নয়, প্রায়ই সৌন্দর্য জগৎ হইতে বিদায় লইবার বাসনা প্রকাশিত, যেমন এই "কল্পনা" কাব্যেই ঐ দ্বিতীয় সুরটি অতি প্রকট। অবশ্য অন্তরে সুরবৈচিত্র্য পূর্বোক্ত মূল সুরের চারিপার্শ্বে নানাবিধ গৌণ রাগিণী বাজাইয়াছে। রূপরচনার দিক দিয়া "চৈতালী" কাব্যটি উহার সনেট প্রাচুর্যের জন্য স্বভাবতঃই অপর কাব্যগুলি হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। "ক্ষণিকা" কাব্যটি একটু লঘু চটুল ভঙ্গীতে রচিত। চলিত ভাষার দ্রুতগতি ইহার রচনারীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য পর্বের অপর তিনটি মুখ্য কাব্যে অর্থাৎ "সোনার তরী", "চিত্রা" এবং "কল্পনা"র ভাষা ও চিত্ররচনার মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে কিছু মিল যেমন আছে, তেমনি পার্থক্যও আছে যথেষ্ট।

—"কল্পনা"র প্রকাশভঙ্গীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল আলঙ্কারিক বাগ্‌রীতির ঐশ্বর্য। বিশিষ্ট রবীন্দ্র-সমালোচক ডঃ ক্ষুদিরাম দাস এই বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন—"কল্পনা কাব্যে অনুপ্রাসবাহুল্য ও ব্যঞ্জনাময় শব্দের প্রয়োগে কবিকে যে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে দেখা যায় তা এর পূর্বে দেখা যায় না। বস্তুতঃ কল্পনার কয়েকটি কবিতাই ভাষাশিল্পীর সুন্দর কাব্যদেহ নির্মাণের সজ্ঞান প্রচেষ্টার উদাহরণ, ফলতঃ, কোথাও একটু কৃত্রিম এমন অভিমত প্রকাশ করলে বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। ...কিন্তু কেবল সুললিত ধ্বনিমাত্রিক ছন্দেই নয়, 'বিলম্বিত যতির পয়ারশ্রেণীর ছন্দেও কবি ভাবানুযায়ী শব্দচয়নশক্তির সার্থক প্রয়াস দেখিয়েছেন। 'বর্ষশেষ' এর উজ্জ্বল

দৃষ্টান্ত। এখানে 'ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কাল বৈশাখীর নৃত্য,' 'নিশি নিশি রুদ্ধঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের ধূমাঙ্কিত কালি', 'উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের জলদর্চিরেখা' এবং 'খিন্ন শীর্ণ জীবনের শতলক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা উৎসর্জন করি' প্রভৃতি কাব্যাংশে নূতনতর শব্দযোজনার দ্বারা কবি যে দীপ্ত গম্ভীর ভাব ব্যঞ্জিত করতে চাইছেন, তা অতি স্পষ্ট। এমন ঘটনা ইতিপূর্বে আর ঘটেনি। এই জন্য আমরা কল্পনা কাব্যকে কবির ভাষা নিয়ে পরীক্ষামূলকতার একটি বিশিষ্ট অধ্যায় বলে মনে করি।" [রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়।]

কল্পনায় শব্দের ধ্বনি-ঝঙ্কারপূর্ণ দিককে অনুপ্রাসে বাজাইয়া তুলিয়া কবি এক বিস্ময়কর শ্রবণরমনীয়তার সৃষ্টি করিয়াছেন। কচিৎ আতিশয্যদুষ্ট বলিয়া মনে হইলেও অধিকাংশক্ষেত্রেই ইহাদের প্রয়োগ সার্থক। নিম্নে ইহার কয়েকটি মাত্র নিদর্শন উদ্ধার করা হইল—

১. যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া।
২. এ নহে কুঞ্জকুন্দকুসুমরঞ্জিত, ফেনহিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে।
৩. কেতকী কেশরে কেশপাশ করো সুরভি
৪. বঙ্কিম সঙ্কীর্ণ পথে দুর্গম নির্জন
৫. নবীন নবনী নিন্দিত করে দোহন করিছ দুগ্ধ

শব্দালঙ্কারের মধ্যে বিশেষ করিয়া অনুপ্রাসের দিকেই কবির ঝোঁক লক্ষ্য করিবার মত। উহার এরূপ ঘনঘটা পূর্বের কোন কাব্যে দেখা যায় নাই। এইরূপ ঘটিবার কারণ সংস্কৃত কাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব। কখনও কখনও বহিরঙ্গীয় ও আতিশয্য-পূর্ণ বলিয়া মনে হইলেও কবি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংস্কৃতের ধ্বনিমন্ত্রকে আপনার প্রতিভার অঙ্গীভূত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ভাবকল্পনা তথা রসাবেগের সহিত উহার সহজ সমন্বয় ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। "ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল", "তপঃক্লিষ্ট তপ্ততনু", "দগ্ধতাম্র দিগন্তের", "শস্যশূন্য তৃষাদীর্ণ মাঠ", "রহি রহি দহি দহি" প্রভৃতি বচনবিন্যাস এবং অনুপ্রাস প্রয়োগের ফলে রুদ্র জলন্ত বৈশাখের একটি পরিপূর্ণ প্রাকৃতিক মূর্তি ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে।

সংস্কৃত কাব্যানুগ ভাষাচয়নই শুধু নয়, চিত্রনির্মাণও "কল্পনা" কাব্যের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কল্পনাকাব্যের প্রধান কবিতাগুলিতে বর্তমান জীবনের দৈনন্দিনের ছবি বড় ধরা পড়ে নাই। "সোনার তরী" বা "চিত্রা"য় মর্ত্যপ্রেম প্রকাশ করিতে গিয়া এই জাতীয় চিত্ররচনার প্রাচুর্য লক্ষ্য করি। আরও বেশী পাওয়া যায় "গল্পগুচ্ছে" এবং "ছিন্নপত্রাবলীতে"। "চিত্রা"য় পাশাপাশি প্রাচীন ভারতীয় কাব্যাদির দ্বারা প্রভাবিত কল্পচিত্রের পরিমাণও কম নয়। লক্ষ্য করিলে দেখা যায় বর্তমান পরিচিত জীবনের ছবিগুলি অনাড়ম্বর ভাষায় চিত্রিত। কবির হৃদয়াবেগ সেখানে স্বল্প তরঙ্গিত। যদিও মমত্বের রঙটি হৃদয়কে স্পর্শ করে। অপরক্ষেত্রে সংস্কৃত কাব্য-প্রভাবিত চিত্রগুলি আলঙ্কারিক ভাষারীতিকে বহুল ব্যবহার করিয়াছে। সেখানে বর্ণবিহ্বলতা এবং গাঢ় কামনার রঙ লাগিয়েছে। ইন্দ্রিয়ানুগ আবেদন সেখানেই তীব্র—কবির সমগ্র

হৃদয়বৃত্তি যে প্রবল বেগে আলোড়িত হইতেছে শব্দবন্ধে তাহা অপ্রকাশিত থাকে নাই। "কল্পনা"র এই শেষোক্ত ধারায় চিত্রই স্থান পাইয়াছে। কবি এই জাতীয় চিত্ররচনায় দ্বারা একই সঙ্গে দুইটি অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়াছেন। প্রথমতঃ, প্রাচীনের স্বাদ পাঠকমনে সঞ্চারিত করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, কামনা-বাসনা-বিভ্রমে উদ্বেলিত পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ একটা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন—

১. মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দ কলি, কুরুবক মাথে,
তনু দেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা।

২. দলে দলে নরনারী ছুটে এল গৃহ দ্বার খুলি
লয়ে বীণাবেণু—
মাতিয়া পাগল নৃত্যে হাসিয়া করিল হানাহানি
ছুঁড়ি পুষ্পরেণু।

এইরূপ বহু উদাহরণ কাব্যময় ছাড়াইয়া আছে।

"কল্পনা" কাব্যের অনেক চিত্র অনেক বাক্যাংশ সংস্কৃত কাব্যাদির অনুসরণে রচিত। বহুক্ষেত্রে অত্যুচ্চ কাব্যানুবাদরূপে ঐ সব অংশকে গ্রহণ করা চলে।

"কল্পনা" কাব্যের রূপরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল ইহার চিত্র-প্রাধান্য। সঙ্গীতধর্ম এ কাব্যে অনুপস্থিত এরূপ কথা অবশ্য বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্য বিষয়েই সেরূপ সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। তবে "কল্পনা" কাব্যে চিত্ররীতিই প্রাধান্য। এমন কি "বর্ষশেষ", "অশেষ", "দুঃসময়" কবিতায় যেখানে কবিচিত্তের একটি গাঢ় ব্যাকুল আর্তি প্রকাশ পাইয়াছে সেখানেও চিত্ররচনায় বিরাম নাই। সুরটি, ব্যাকুল উচ্ছ্বাসটি চিত্রগুলিকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া, ক্বচিৎ বিদীর্ণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

সব দিকের বিচারে "কল্পনা" কাব্যের রূপরীতি বৈশিষ্ট্যের দাবি করিতে পারে।

প্রশ্ন ৭। "অতীতচারী যে কল্পনার স্বর্ণপ্রদীপের আলোকে রোমান্টিক কবির স্বপ্ন সঞ্চরণ কল্পনা-র কয়েকটি কবিতার আশ্রয়ে রবীন্দ্রনাথের সেই সুদূরাভিসারী মানসিকতার পরিচয় দাও। **[ক. বি., ১৯৬২]**

অথবা, **"কল্পনার 'সৌন্দর্য' ও প্রেমানুভূতির কবিতাগুলিতে প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্য-মাধুর্যের স্মৃতি কিভাবে রূপায়িত হইয়াছে উপযুক্ত দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাহা বিচার কর।** **[ক. বি., ১৯৬০]**

উত্তর : [১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য। সম্পূর্ণ একই রূপ উত্তর হইবে।]

প্রশ্ন ৮। তাঁহার "কল্পনা" কাব্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, 'বিরাট চিত্তের সঙ্গে মানব-চিত্তের ঘাত-প্রতিঘাত' ইহার কোন কোন কবিতার মূল প্রেরণা। এই উক্তিটির আলোচনা কর। **[ক. বি., ১৯৬১]**

অথবা, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "কল্পনা" প্রসঙ্গে বলেছেন যে, "বিরাটচিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের ঘাত-প্রতিঘাত" উক্ত কাব্যের কোন কোন কবিতার মূলে প্রেরণা।" এ উক্তিটি "কল্পনা"র কোন্ কোন্ কবিতা সম্বন্ধে প্রযোজ্য তার বিচার কর।

[ক. বি., ১১৫৯]

উত্তর : [২ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য। সম্পূর্ণ একই রূপ উত্তর হইবে।]

প্রশ্ন ৯। 'কল্পনা'র কবিতাগুলি সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—"এক জাতের কবিতা আছে যা লেখা হয় বাইরের দরজা বন্ধ করে। আবার এক জাতের কবিতা আছে যা মুক্তদ্বার অন্তরের সামগ্রী, বাইরের সমস্ত কিছুকে আপনার মধ্যে মিলিয়ে নিয়ে।" কবি কর্তৃক উল্লিখিত এই দুই জাতের কবিতার উদাহরণ উদ্ধার করিয়া কবির মন্তব্যটি বুঝাইয়া দাও। [ক. বি., ১১৬০]

উত্তর : [৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য। সম্পূর্ণ একই রূপ উত্তর হইবে।]